”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৪ • সংখ্যা ৪২ • জুন ২০০৫

মহাকাশ যুদ্ধ
হাবল টেলিস্কোপ
না খেয়ে চার বছর
ডিজিটাল হাসপাতাল
অক্সিজেনের খোঁজে
ভবিষ্যতের কম্পিউটার
বিবর্তনের মূলমন্ত্র : মৃত্যু ও সময়
সায়েন্স ফিকশন : মহাজাগতিক ক্ষুধা

অমরত্বের পথে মানুষ

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৪
সংখ্যা ৪২
জুন ২০০৫

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-কম্পিউটার-স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ম্যাগাজিন

এ সংখ্যার সূচি.....

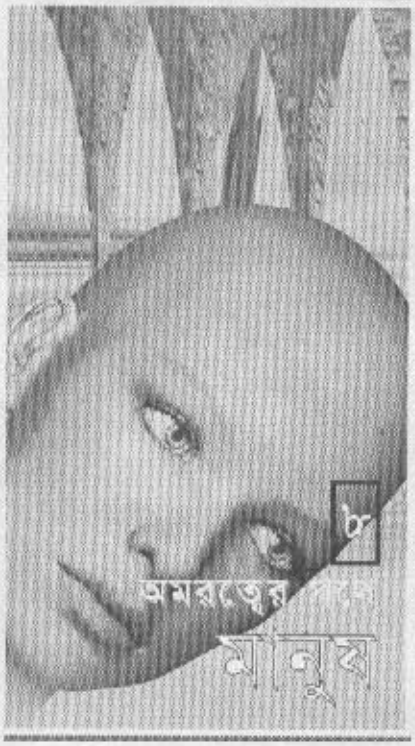

১৪
বিবর্তনের মূলমন্ত্র
মৃত্যু ও সময়

অন্যান্য রচনা

না খেয়ে চার বছর /৭
ডিজিটাল হাসপাতাল /১০
হাবল টেলিস্কোপ : বিদায়ের ঘন্টা বাজছে/১২
মিক্কিওয়ের গামা রশ্মি বিস্ফোরণ /১৭
অক্সিজেনের খোঁজে /১৮
সিডিএমএ টেকনোলজি/২০
সনির গেমস-এ সন্ত্রাসী রাষ্ট্র /২২
মানুষের অপারধ প্রবণতা/২৫
কথা বলবে সার্চ ইঞ্জিন/২৯
ভবিষ্যতের কম্পিউটার /৩০
মহাকাশ যুদ্ধ /৩২
অ্যান্টিমিটার এবং একটি হীরা /৩৪
গুঁয়াপোকা /৩৬
পরিবেশ বিপর্যয় রুখতে
কতটা প্রস্তুত বাংলাদেশ/৩৮
ডারউইন : একজন সাহসী বিজ্ঞানী /৩৯
বাড়ছে সুপার স্বাস্থ্যবানদের সংখ্যা /৪০
ই- মেইল যুদ্ধ /৪২
সায়েন্স ফিকশন : মহাজাগতিক ক্ষুধা/৪৪

নিয়মিত বিভাগ

৪ চিঠিপত্র
৫ বিজ্ঞান বিশ্বের নতুন খবর
২৬ বিজ্ঞান প্রজন্ম
বিতর্ক ৩৭
বিজ্ঞান কুইজ ৪৭

সম্পাদক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক
আতাউর রহমান বাবুল

সহযোগী সম্পাদক
এস এম মুকুল

সহকারী সম্পাদক
সরোয়ার হোসেন
গৌতম রায়

অতিথি লেখক
মাসুদ কামাল
ড. অরূপ রতন চৌধুরী
ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল

নিয়মিত লেখক
রেহানা পারভীন রুমা
পারভীন সুলতানা, শান্তা মারিয়া
ফারহানা মিলি, হিটলার এ হালিম
মাহবুব আনোয়ার শুভ, শফি ইসলাম
মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাদাত শাহরিয়ার
এ কে এম মুনির হোসেন
আনোয়ারুল হক খান

সার্কুলেশন
আমিনুল ইসলাম সোহাগ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫০৯৫, ৭১২৫০৫৪,
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৭১৭৫০৯৫

বিপণন
৩৭/১, বাংলাবাজার
দ্বিতীয় তলা, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫০৫৪, ০১৭১-১২০৭০১

মূল্য : পনের টাকা

প্রফেসর'স প্রকাশন, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত।

ই-মেইল : editor_sworld@yahoo.com

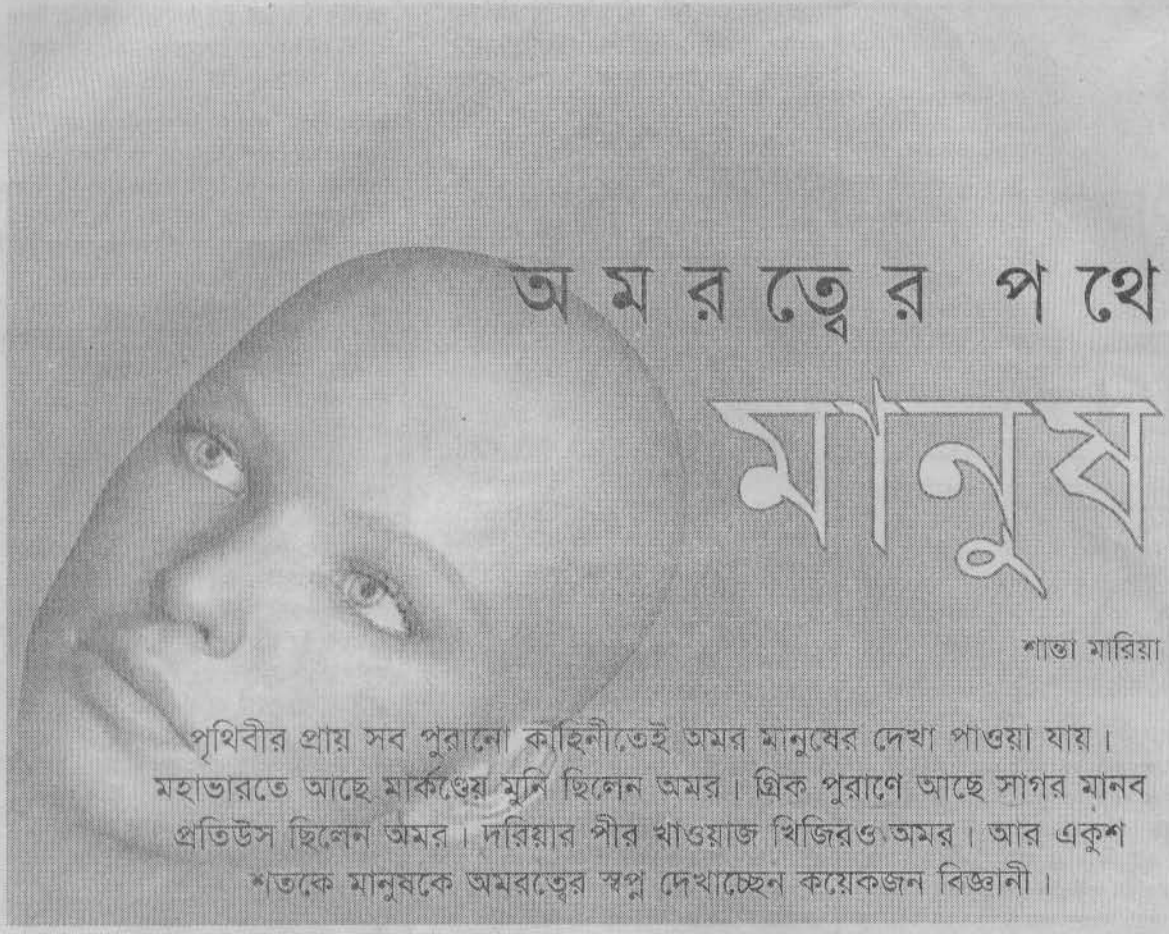

অমরত্বের পথে মানুষ

শান্তা মারিয়া

পৃথিবীর প্রায় সব পুরানো কাহিনীতেই অমর মানুষের দেখা পাওয়া যায়। মহাভারতে আছে মার্কণ্ডেয় মুনি ছিলেন অমর। গ্রিক পুরাণে আছে সাগর মানব প্রতিউস ছিলেন অমর। দরিয়ার পীর খাওয়াজ খিজিরও অমর। আর একুশ শতকে মানুষকে অমরত্বের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন কয়েকজন বিজ্ঞানী।

মামুন ও অদিতি কথা বলছিলেন। মামুন বললেন, 'গত শতাব্দীতে আমি বায়োটেকনোলজি নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর গবেষণা করেছিলাম। এই শতাব্দীতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, আর আগামী শতকে স্পেস টেকনোলজি নিয়ে পড়ার ইচ্ছা আছে।' অদিতি উত্তর দিলেন, 'তুমি তো জানো গবেষণার চেয়ে বেড়াতেই আমার বেশি ভালো লাগে। এই গ্যালাক্সির অনেক গ্রহে আমি গিয়েছি। এবার ইচ্ছা আছে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির কোনো গ্রহে বেড়াতে যাবো। দু-তিন শ'বছর লাগবে। আশা করা যায় পাঁচশ বছর পরে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।' মামুন ও অদিতির কথাবার্তা শুনে চমকে ওঠার কিছু নেই, ওরা অমর মানুষ। সময় তাই ওদের জন্য কোন সমস্যা নয়। এটা কি গাঁজাখোরি গল্প? না, একদল বিজ্ঞানী সত্যিই মানুষের অমরত্বের কথা ভাবছেন। গত দশ হাজার বছরে মানবজাতি যত স্বপ্ন দেখেছে; যেমন— আকাশে ওড়া, ইচ্ছামতো অদৃশ্য হতে পারা, টাইম ট্রাভেল ইত্যাদি তার মধ্যে প্রাচীনতম স্বপ্ন হলো অমর হওয়া।

মৃত্যু মানুষের প্রথম ও প্রধানতম শত্রু। এ শত্রুকে পারাভূত করার জন্য মানুষ যুগে যুগে কত না কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। ম্যাজিকের চর্চা শুরুই হয়েছিল মৃত্যুকে জয় করার চেষ্টার মাধ্যমে। কিন্তু মৃত্যুকে জয় করার কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। পিরামিড গড়ে তার মধ্যে মৃতদেহ মমি করে রেখে দিয়েছে প্রাচীন মিশর, প্রাচীন মায়া, ইনকা ও আস্তেক সভ্যতার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। মমি করা হতো এই আশায়, যেন সুদূর ভবিষ্যতে সে দেহে আবার প্রাণ সঞ্চার করা যায়। গ্রিক, রোমান, আসেরীয়, নরওয়েজীয় প্রাচীন ভারতীয় সব দেবদেবীই অমর। নরওয়েজীয় দেবতার অ্যাসগার্ড গ্রিক দেবতাদের অলিম্পাস এবং ভারতীয় দেবদেবীর বাসস্থান স্বর্গে শুধু অমর ব্যক্তিরা বসবাস করেন। শুধু তাই নয়, সব দেশের দেবদেবী অমৃত পান করিয়ে মর্ত্যের মানুষকে অমর করতে পারেন। অমর হওয়ার জন্য অমৃত পান করার তৃষ্ণা মানুষের চিরন্তন। পৃথিবীর প্রায় সব পুরানো কাহিনীতেই অমর মানুষের দেখা পাওয়া যায়। মহাভারতে আছে মার্কণ্ডেয় মুনি ছিলেন অমর। গ্রিক পুরাণে আছে সাগর মানব প্রতিউস ছিলেন অমর। দরিয়ার পীর খাওয়াজ খিজিরও অমর। আর একুশ শতকে মানুষকে অমরত্বের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন কয়েকজন বিজ্ঞানী। 'মৃত্যুর সমস্যা' দূর করার লক্ষ্যে কাজ করছে ইন্সটিটিউট অব বায়োমেডিক্যাল জোরানটোলজি। জেরোনটোলজি হলো বিজ্ঞানের নতুন একটি শাখা। বার্ধক্যের বায়োলজি নিয়ে গবেষণা করা হয় এ শাখায়। মানুষ কেন বৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধ হওয়ার ফলে দেহে কি ধরনের পরিবর্তন আসে তা নিয়ে সম্প্রতি এ শাখায় বিজ্ঞানীরা প্রচুর গবেষণা করেছেন। এ শাখার বিজ্ঞানীরা অবশ্য অমরত্বের চেয়ে মানুষের আয়ু বাড়ানোরই চেষ্টা করছেন। কিন্তু শুধু আয়ু বৃদ্ধি নয় সরাসরি অমরত্বের কথা ভাবছেন এমন কয়েকজন বিপ্লবী বিজ্ঞানীও রয়েছেন।

এমন কয়েকজন বিজ্ঞানী হলেন মারভিন মিনগাস্কি, কুরজোয়েল, গ্রেগরি স্টক, আব্রে ডি গ্রে। মারভিন মিনস্কি ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভাগের অধ্যাপক। কুরজোয়েল অমরত্বের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করছেন। তার রচিত বইয়ের নাম 'ফ্যানটাসটিক ভয়েজ : লাইফ লং এনাফ ট লিভ ফর এভার।' এ বইটি রে কুরজোয়েল এবং টেরি গ্রসম্যান যৌথভাবে লিখেছেন। আব্রে ডি গ্রে কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেস্টিকস বিভাগে কর্মরত আছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেগরিস্টিক একটি বই লিখেছেন যার নাম 'বিডাজাইনিং হিউম্যানস আওয়ার ইন এভিটেবল জেনেটিক ফিউচার'। এ বইতে তিনি দেখিয়েছেন যে, অমরত্ব তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব। এরা মনে করেন বার্ধক্য মানুষের জীবনের কোনো অনিবার্য সত্য নয় বরং এটি একটি কারিগরি সমস্যা। মানবদেহের এই কারিগরি সমস্যার সমাধান করা গেলেই

কুরজুয়েল সঠিক খাদ্যকে অমরত্বের পথে এক নম্বর ব্রিজ হিসেবে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অ্যালকোহল সিগারেট এমনকি কফি পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন।

কুরজুয়েলের বর্তমান বয়স ৫৬ বছর। কিন্তু দেহে ও মনে তিনি ৪০ বছর বয়সীদের মতো স্বাস্থ্যবান। তার কোষকলার ক্ষয়কে তিনি রোধ করতে পেরেছেন। অমরত্বের দ্বিতীয় ব্রিজ হলো মেডিক্যাল টেকনোলজির উন্নয়ন। স্টেম সেল

ওলশানস্কি। আব্রে ডি গ্রে অবশ্য এসব সমালোচনা মোটেই কেয়ার করেন না। আব্রে ডি গ্রে বলেছেন, 'আমি একজন তাত্ত্বিক জেরোনটোলজিস্ট। তাতে কি? পদার্থ বিদ্যায় যারা ল্যাবরেটরিতে ধরাবাঁধা কাজ করেছেন তাদের চেয়ে অনেক বেশি অবদান রেখেছেন যারা আপাতত দৃষ্টিতে দুঃসাহসিক বা অসম্ভব বলে তৎকালে বিবেচিত তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন। আমি এমন অনেক কিছুই দেখতে পাই যা গৎবাঁধা শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানীরা দেখতে পান না।'

তবে আব্রে ডি গ্রে শুধু তাত্ত্বিকভাবে অমরত্বের তত্ত্ব উপস্থাপন করেই সন্তুষ্ট নন। ২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ুসীমা অন্তত হাজার বছর করার পরিকল্পনা রয়েছে তার। এ বিষয়ে গবেষণার জন্য চাই প্রচুর অর্থ। অন্তত একশ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। এ গবেষণার অর্থায়নে এগিয়ে এসেছে বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা। ডি গ্রে এর প্রস্তাব যেমন নাটকীয়, তার চেহারাও তেমনি নাটকীয়। বুক পর্যন্ত লম্বা দাঁড়ি ও চুলের ধরনে তাকে অনেকটা রাসপুতিনের মতোই দেখায়। রাসপুতিন রাশিয়ার জার পরিবারের কাছ থেকে অজস্র অর্থ হাতিয়ে নিয়েছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার চমক দেখিয়ে। অনেকে ভাবছেন আব্রে ডি গ্রে রাশপুতিনের কৌশলই অবলম্বন করেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজিস্ট মিশেল রোজের মতে, 'স্বাভাবিক মৃত্যু একটি বোগাস কথা।' তিনি ৩০ বছর ধরে ফ্রুট ফ্লাই এর ওপর গবেষণা

অমরত্বের দ্বিতীয় ব্রিজ হলো মেডিক্যাল টেকনোলজির উন্নয়ন। স্টেম সেল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে হার্ট, লাংগস ও কিডনির মতো অঙ্গ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

বার্ধক্যজনিত মৃত্যুর সমস্যাও দূর হবে। অমরত্বকামী বিজ্ঞানীরা তাদের ধ্যানধারণা নিয়ে সভা, সমিতি, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছেন। অমরত্বের ধারণাটিকে তারা জনপ্রিয় করে তুলেছেন যাতে এ বিষয়ে গবেষণায় কোনো সরকারি বা নৈতিক বাধা উপস্থিত না হয়। মানুষ জন্ম লাভ করে, তারুণ্যে উপনিত হয়। তারপর বৃদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করে। এ হলো মানুষের জীবনের স্বাভাবিক চক্র। দুর্ঘটনা, রোগবালাই, আত্মহত্যা বা এ ধরনের ঘটনায় যদি মৃত্যু না হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বার্ধক্যের কারণে মৃত্যু ঘটে মানুষের। অমরত্বকামী বিজ্ঞানীরা মানুষের এ বার্ধক্যজনিত মৃত্যুকে রোধ করতে চান। কুরজুয়েলের মতে, বায়োটেকনোলজি দ্বারা বার্ধক্যও রোধ করা সম্ভব। কুরজুয়েল অমরত্বের তত্ত্বকে 'এ ব্রিজ টু এ ব্রিজ' নামে অভিহিত করেছেন। কুরজুয়েল ব্যক্তিগত অমরত্বের জন্য ২৫০ ধরনের সাপলিমেন্টারি খাদ্য গ্রহণ করেন। আর মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বেশকিছু পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছেন। দেহে তারুণ্য ধরে রাখার জন্য কোষকলার ক্ষয়কে রোধ করতে হবে।

ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে হার্ট, লাংগস ও কিডনির মতো অঙ্গ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে কোরীয় বিজ্ঞানীদের অঙ্গ উৎপাদনের জন্য আবিষ্কৃত ক্লোন পদ্ধতি কাজে লাগানোর কথা বলেছেন কুরজুয়েল। যে কোনো সময় হার্ট, কিডনি কিংবা অন্য দরকারি অঙ্গ বদলে নেয়া যাবে। তৃতীয় ব্রিজ হলো ন্যানোটেকনোলজির উন্নয়ন।

কুরজুয়েল সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, মানুষকে অমর করা সম্ভব। তবে এ শতাব্দীতেই তা সম্ভব হবে কিনা তা বলতে পারছেন না কুরজুয়েল। আব্রে ডি গ্রে তার মৃত্যুর সমস্যা সমাধানের সূত্রের নাম দিয়েছেন এসইএনএস (স্ট্র্যাটেজিস ফর ইঞ্জিনিয়রড নেগলিজিবল সেনসেনস)। আব্রে ডি গ্রে বার্ধক্য প্রক্রিয়ার ফলে দেহের যে ক্ষয় হয় তা বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে পূরণ করার সাতটি কৌশল তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। ডি গ্রে এর সমালোচক ওলশানস্কি অবশ্য বলেছেন ডি গ্রে চমক সৃষ্টি করার জন্য যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তা বাস্তবে সম্ভব হবে না। তাছাড়া ডি গ্রেকে প্রকৃত বিজ্ঞানী বলতেও রাজী নন

করছেন। তার মতে বার্ধক্য প্রক্রিয়া এবং তদজনিত স্বাভাবিক মৃত্যু রোধ করা সম্ভব। তবে অমরত্বকামী বিজ্ঞানীদের কড়া সমালোচনা করেছেন জে ওলশানস্কি। তিনি ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োডেমোগ্রাফার। তিনি বলেন, মানুষের আয়ু বৃদ্ধির গবেষণাসমূহ মূলত হয়েছে গোলকৃমি, ফ্রুট ফ্লাই ইত্যাদি নিম্নস্তরের প্রাণীর উপর। সুতরাং আয়ু বৃদ্ধির মানসিক প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়নি। একজন মানুষ ৮০ কিংবা ৯০ বছর বাঁচবে এই পরিকল্পনাতেই ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ছক থাকে। স্কুল, কলেজ, চাকরি ইত্যাদি সময়সীমাও সেই অনুযায়ী সাজানো হয়। কিন্তু মানুষের আয়ু যদি এখন ২০০, ৩০০ কিংবা ৫০০ বছর হয় তাহলে এ জীবন নিয়ে সে কি করবে সে কথাও তো ভাবতে হবে। তার মতে শুধু দেহকে দীর্ঘায়ু বা অমর করলেই চলবে না, মনের স্বাস্থ্যের কথাও ভাবতে হবে।

যাই হোক মানুষ যদি সত্যিই শ শ বছর বেঁচে থাকতে পারে, কিংবা অমরত্ব পেয়েই যায় তাহলে জ্ঞানচর্চার জন্য অফুরন্ত সময় পেয়ে যাবে মানুষ— এ কথা বলাই বাহুল্য।

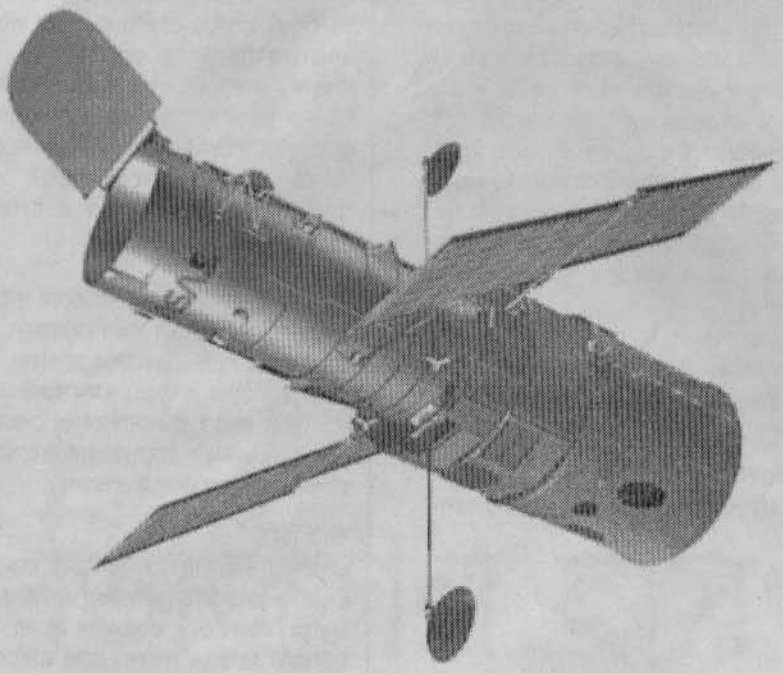

হাবল টেলিস্কোপ

বিদায়ের ঘণ্টা বাজছে

হাসিব রেজা

বিশাল আকাশের পানে তাকালে মেঘের যে রাশি দেখা যায় তার ওপারে রয়েছে রহস্যের আঁধারে ঘেরা মহাকাশ। একটু একটু করে এই মহাকাশের রহস্য ধরা পড়ছে পৃথিবীর মানুষের কাছে। এর পিছনে একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অবদানের পাশাপাশি রয়েছে যান্ত্রিকতার ছোঁয়া। এছাড়া মহাকাশের বিভিন্ন রহস্য উদঘাটনের জন্য বিভিন্ন টেলিস্কোপ কিংবা স্যাটেলাইট আর্থ স্টেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এদের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হাবল টেলিস্কোপ।

সর্বপ্রথম এ বিষয়ে ধারণা দেন ১৯৪৬ সালে আমেরিকার মহাকাশবিজ্ঞানী লিম্যান স্পিৎসার। তিনি ধারণা করেছিলেন এর ফলে সৌরজগত বা মহাকাশের জানা-অজানা বিভিন্ন বিষয় খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে এবং জানা যাবে অনেক অজানা তথ্য। এধারণাকে কাজে লাগিয়ে অনেক সাধনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে তৈরি করা হয় হাবল টেলিস্কোপ এবং তৎকালীন আমেরিকার বিখ্যাত মহাকাশবিজ্ঞানী এডউইন হাবলের নামে এর নামকরণ করা হয়। হাবল টেলিস্কোপের মোট ওজন ১১ টন এবং লম্বা ১৩ মিটার। এর আয়ুষ্কাল ধরা হয়েছিল ১৫ বছর। অর্থাৎ ২০০৫ সালের শেষ অবধি তা কার্যকরী থাকবে বলে ধারণা করা হয়।

হাবল টেলিস্কোপের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ সালে। স্পেসশিপ ডিসকভারি হাবলকে তার কক্ষপথে পৌঁছে দিয়ে আসে। সেই থেকে শুরু হলো হাবলের যাত্রা। কক্ষপথে পৌছানোর পর হাবল টেলিস্কোপ তার কাজ শুরু করে। হাবল পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৭৫ মাইল উর্ধ্বে অবস্থানরত এবং এটি প্রতি ৯৫ মিনিটে একবার করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। প্রথমদিকে হাবলের পাঠানো বিভিন্ন ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কেননা প্রায় প্রতিটি ছবিই ছিল বেশ ঝাপসা; অস্পষ্ট। এগুলো দেখে কোনো তথ্যই বের করতে পারছিলেন না বিজ্ঞানীরা। পরবর্তীতে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য বিশেষজ্ঞরা এবং প্রকৌশলীদের একটি দল পাঠানো হয়। দেখা গেছে মূল স্কেপ (আয়না) এ সমস্যা ছিল। যাবতীয় সমস্যা সমাধানের পর আরম্ভ হয় চমক। হাবল পাঠাতে শুরু করল একের পর এক মহাকাশের খুঁটিনাটি বিষয়ের ছবি। এবারের প্রতিটি ছবিই ছিল চমৎকার এবং নিখুঁত। এর সাথেই শুরু হলো মহাকাশের বিভিন্ন বিষয়ের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন। এর আগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণ করতে হতো অনুমান করে কিংবা অংক কষে। যার যথার্থতা বিচার করা ছিল সত্যিকার অর্থেই কষ্টকর ব্যাপার। আর তখন বিভিন্ন তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, ধূলিকণা, পৃষ্ঠ, উপকরণ এসব দেখা ছিল অকল্পনীয় বিষয়। কালভার্ট এর মতে- হাবল টেলিস্কোপ একটি জাতীয় সম্পদ এবং চমৎকার প্রযুক্তি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি আরও বলেন, "হাবল টেলিস্কোপের পাঠানো অসাধারণ সব ছবি ও প্রামাণপত্র মহাকাশকে যেন আমাদের

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, খুব সম্ভবত মহাকাশ রহস্যের দুয়ার খুলে দেয়ার অমর নায়ক হাবল টেলিস্কোপকে বিদায় জানানো হবে। নাসা এবং আমেরিকান কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বিভিন্ন ভূমিকায় সেরকম আভাস পাওয়া গেছে। এ বিষয় নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। এমনকি কিছুটা বিতর্ক হয়েছে স্বয়ং মার্কিন কংগ্রেসে।

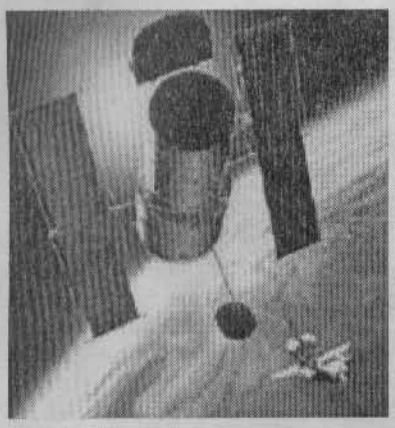

সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এর পাঠানো গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র বা সৌরজগতের বিভিন্ন ছবি মহাকাশ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের সীমাকে সুদূর প্রসারিত করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

এ স্যাটেলাইটভিত্তিক টেলিস্কোপ মহাকাশ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন রহস্যের সমাধান দিয়েছে এবং খুলে দিয়েছে বিভিন্ন সম্ভাবনার দুয়ার; এ বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত নেই। এর জন্য হাবলের প্রতি কৃতজ্ঞতা পুরো বিশ্ববাসীর।" মহাকাশের মাঝে ব্লাকহোল রয়েছে বলে ডেভিড হকিংস যে দাবি করেছিলেন তার ভিত্তিপ্রস্তর অর্থাৎ তথ্য প্রমাণ হাবলই সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেছিল। এছাড়াও ছায়াপথের বয়স নির্ধারণ কিংবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তারকারাজির জন্মের ইতিহাস নির্ণয়ে হাবলের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। হাবলের ছবি হাতে পাওয়ার পরে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হন মহাবিশ্বে মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে এন্টি গ্রাভিটি-এর কোন শক্তি কাজ করছে। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, খুব সম্ভবত মহাকাশ রহস্যের দুয়ার খুলে দেয়ার অমর নায়ক হাবল টেলিস্কোপকে বিদায় জানানো হবে।

নাসা এবং আমেরিকান কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বিভিন্ন ভূমিকায় সেরকম আভাস পাওয়া গেছে। এ বিষয় নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। এমনকি কিছুটা বির্তক হয়েছে স্বয়ং মার্কিন কংগ্রেসে। প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারে নির্মিত হাবল টেলিস্কোপের আয়ু বাড়ানোর অনীহার মূল কারণ এর মেরামত ব্যয়। হাবলকে মেরামতের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় ব্যয় হয়েছিল ৩৮ কোটি ডলার। গত ১৫ বছরে এর আরও নানা আনুষঙ্গিক ব্যয়সহ সর্বমোট খরচ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার। অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে নাসার অন্যান্য প্রকল্পেও কিছু আর্থিক সমস্যা হচ্ছে বলে জানা গেছে। হাবলের ভবিষ্যৎ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে প্রধান শেরউড বোলাট এর মতে- "হাবলকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে নাসাকে অন্যান্য প্রকল্প থেকে অর্থ এনে এক্ষেত্রে যোগান দিতে হবে। এমন পরিস্থিতি চললে তা সমস্যার সৃষ্টি করবে।"

হাবলকে মেরামত এবং আধুনিকায়ন করার জন্য মোট চারবার মিশন পাঠানো হয়েছিল। প্রথমবার পাঠানো হয় ১৯৯১ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯৯৩ সালে, তৃতীয়বার ১৯৯৭ সালে এবং চতুর্থবার এর পাঁচ বছর পর ২০০২ সালে। প্রতি মিশনের মাধ্যমে হাবল টেলিস্কোপ-এ ব্যাটারি, ক্যামেরা, সেনসর, জারাসকৌপ প্রভৃতি পুনঃস্থাপন করা হয়েছিল। যদিও এ বছরের শেষ দিকে কিংবা সামনের বছরের শুরুর দিকে অ্যাস্ট্রোনট পাঠিয়ে হাবল টেলিস্কোপ মেরামতের কথা। কিন্তু সে বিষয়ে এখন আর সম্ভাবনা নেই। নাসা জানিয়ে দিয়েছে তাদের ২০০৬ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে হাবল টেলিস্কোপ মেরামত খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি। এর সাথে শামিল হয়েছে স্বয়ং আমেরিকান সরকারের বুশ প্রশাসন। কংগ্রেসে এ বিষয়ে বাজেট বরাদ্দে তাদের অনাগ্রহের কথা তারা জানিয়ে দিয়েছে। বছরে দেড়শ কোটি ডলার ব্যয় করার পিছনে তারা কোন যুক্তি দেখছেন না। বাজেট উদ্বৃত্তের এদেশটিতে বর্তমান সময়ে বাজেট ঘাটতির বিষয়টি বেশ লক্ষ্যণীয়। সেদিক থেকে হিসাব করে এ প্রকল্প মার্কিন সরকারের কাছে বাড়তি বলে মনে হয়েছে। আরেকটি অনীহার কারণ হলো অনেকেই হাবল টেলিস্কোপের মেরামতের বিষয়ে নভোচারীবাহী মিশন পাঠানোর বিষয়ে আগ্রহী নন।

এদিকে মার্কিন ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স জানিয়েছে, এবারের মেরামতের কাজ রোবট দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং নভোচারী পাঠাতে হবে। এছাড়া নভোচারী পাঠাতে স্বয়ং নাসাও আগ্রহী নয়। মূলত ২০০৩ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি মহাকাশযান কলম্বিয়া বিধ্বস্ত হয় এবং প্রাণ হারান নভোচারীগণ। সে বিষয়টি মাথায় রেখে নাসাসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই এ বিষয়ে ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না। অবশ্য পক্ষেও কেউ কেউ মতামত দিচ্ছেন। পদার্থবিদ লুইস ল্যান জেরোটির মতে, "যেহেতু হাবল টেলিস্কোপটি একটি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সম্পদ, সুতারং এর জন্য নভোচারীবাহী মহাকাশযান পাঠানো উচিত।" তার সাথে এ বিষয়ে আরো অনেকেই মতামত পোষণ করেছেন। তবে যেহেতু পুরানো হওয়ার সাথে সাথে হাবলের কার্যক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে তাই মেরামত করার পর কতটুকু সুফল পাওয়া যাবে তা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। অবশ্য কয়েক বছর আগে হাবল পর্যবেক্ষণ করতে চাওয়া নভোচারীগণ দাবি করেছেন, হাবলকে বাঁচিয়ে রাখতে। তবে তাদের কথা আদৌ রাখা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এদিকে হাবলের বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে এর যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা ফুরিয়ে আসছে।

বর্তমানের স্থাপিত হাবলের ব্যাটারি এবং জারাসকৌপ—এর কার্যকারিতা ধীরে ধীরে কমছে। এর কার্যকারিতা বহাল থাকলে স্থাপিত টেলিস্কোপটি মোটামুটি আর তিন বছর সচল থাকবে। এদিকে মার্কিন ন্যাশনাল এরোনটিকস অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা) আরেকটি প্রকল্প অত্যাধুনিক নতুন স্পেস অবজারভেটরি 'জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ' এটি ২০২১ সালের দিকে হাবল এর পরিবর্তে কাজ শুরু করবে। অনেকে চেয়েছিলেন অন্তত এতটুকু সময় হাবল বেঁচে থাকুক। কেননা গত বছরও হাবল আরেকটি আশ্চর্যজনক ছবি পাঠিয়েছে। সেটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সূচনালগ্নের কাছকাছি সময়ের। এ ছবিটি সবাইকে খুব চমকে দিয়েছে। অনেকে ধারণা করছেন ছবিটি বিগ ব্যাং-এর মাত্র ২০০ মিলিয়ন বছর দূরের। তবুও হাবলকে ঘিরে সংস্কারের নুতন কোন পরিকল্পনা হচ্ছে না। কেননা নাসা ২০১৩ সালের মধ্যে হাবলকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এজন্য সাত কোটি ডলার বাজেটের প্রস্তাব করা হয়েছে। হয়ত হাবল এর পরিণতি হবে স্কাইল্যাবের পরিণতির মতো। যেটিকে ১৯৭৯ সালে এশিয়া প্যাসিফিক মহাসাগরে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল। সর্বোপরি যেভাবেই হোক বিদায় নেবে মহাকাশ যাত্রার এ অমর নায়ক। তবুও হাবলকে মনে রাখবে অসংখ্য মহাকাশপ্রেমী। বাস্তবে না থাকলেও হৃদয়ে স্থান করে নেবে অমর হাবল টেলিস্কোপ।

নাসা ২০১৩ সালের মধ্যে হাবলকে সমুদ্রকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এর জন্য সাত কোটি ডলার বাজেটের প্রস্তাব করা হয়েছে। হয়ত হাবল-এর পরিণতি হবে স্কাইল্যাবের পরিণতির মতো। যেটিকে ১৯৭৯ সালে এশিয়া প্যাসিফিক মাহসাগরে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিলো। সেদিন বিদায় নেবে মহাকাশ যাত্রার এ অমর নায়ক।

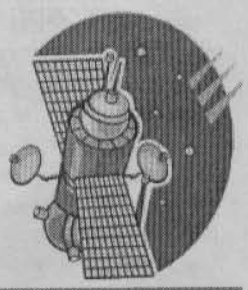

মিল্কিওয়ের গামারশ্মি বিস্ফোরণ

পীযুষ কান্তি বাড়ৈ

অসীম বিস্তৃত এই মহাবিশ্বে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে রহস্যময় সব দানবীয় বিস্ফোরণ। রহস্যময় এজন্যই যে, এই বিস্ফোরণগুলোর খুব কম সংখ্যকই মানুষের নজরে এসেছে এবং গুঁটি কয়েক সম্পর্কেই পাওয়া গেছে পর্যাপ্ত ধারণা। এরকমই এক মহাজাগতিক বিস্ফোরণের নাম গামারশ্মি বিস্ফোরণ। তীব্রতার বিচারে এর অবস্থান নির্ধারণ না করা গেলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে নিঃসন্দেহে বিভিষিকাময়। শুধু তাই নয়, গামারশ্মির বিস্ফোরণ মহাবিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের নিয়ামক। সম্প্রতি এ ধরনেরই একটি দানবীয় বিস্ফোরণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

বিখ্যাত চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি ও ক্যালিফোর্নিয়ার ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের 'পলোমার' টেলিস্কোপের মাধ্যমে অবহিত এই নেবুলাটির নাম দেয়া হয়েছে 'W49B'। পিপা আকৃতির এ নেবুলার চতুর্দিকে রয়েছে অবলোহিত রশ্মির ৪টি বলয় (Hoops)। যার একটির ব্যাস অন্তত ২৫ আলোকবর্ষ। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, বিস্ফোরণের কয়েক হাজার বছর পূর্বেই অতি উত্তপ্ত গ্যাসের চাপে বলয়গুলো সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কিভাবে সংঘঠিত হয় গামারশ্মির এ বিস্ফোরণ? বিজ্ঞানীদের মতে, কয়েক মিলিয়ন বছরের কাল পরিক্রমায় যখন কোনো বিশাল তারার নিউক্লিয়ার জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন ঘটে সুপার নোভা বিস্ফোরণ। যার ফলশ্রুতিতে তারার চারপাশে সৃষ্টি হয় প্রায় শূন্য গহ্বর। চুড়ান্তভাবে এ ফাঁপা গহ্বরই পরিণত হয় 'কলাপসার' জাতীয় ব্ল্যাকহোলে। এই ব্ল্যাকহোলের চতুর্দিকে দ্রুত আবর্তন করে অতি উত্তপ্ত ও চুম্বকায়িত গ্যাসের সুষম আবরণ। যার অধিকাংশই পরবর্তীতে হারিয়ে যায় ব্ল্যাকহোলের রহস্যময় গহ্বরে। কিন্তু গ্যাসের কিছু অংশ তীব্রবেগে নিক্ষিপ্ত হয় ঠিক উল্টো পথে। যার গতি প্রায় আলোর গতির সমান। এটাই গামারশ্মির বিস্ফোরণ। এ বিস্ফোরণ মূলত গামারশ্মির ফোটনের বিস্ফোরণ। এ ধরনের এক একটি ফোটনের শক্তি ১০০ কিলো ভোল্টেরও বেশি। বিস্ফোরণের স্থায়িত্বও বিস্ময়কর। তীব্র ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন গামারশ্মি বিস্ফোরণে সময় নেয় কয়েক মিলি সেকেন্ড থেকে সর্বোচ্চ কয়েক মিনিট পর্যন্ত। শুধু স্থায়িত্বেই নয়, উজ্জ্বলতায়ও এটা বিস্ময়কর। একটি আদর্শ সুপার নোভা থেকে শতশত গুণ বেশি উজ্জ্বলতায় বিস্ফোরিত হয় গামারশ্মি। আর আমাদের সূর্যের সাথে তুলনা করলে তা হবে এক মিলিয়ন ট্রিলিয়ন গুণ বেশি উজ্জ্বল।

কয়েক মিলিয়ন বছরের কাল পরিক্রমায় যখন কোনো বিশাল তারার নিউক্লিয়ার জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন ঘটে সুপার নোভা বিস্ফোরণ।

গামারশ্মির বিস্ফোরণ মহাবিশ্বে কোনো দৈব ঘটনা না হলেও, এবারের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাৎপর্যপূর্ণ। ঠিক যেন বাড়ির উঠানে বিস্ফোরণের মতোই। কারণ, শক্তিশালী গামারশ্মির এ বিস্ফোরণটি ঘটেছে আমাদেরই ছায়াপথ মিল্কিওয়েতে। তবে আজ থেকে অন্তত কয়েক হাজার বছর আগে। পৃথিবীর হিসাবে এ সময় তালগোল পাকানোর মতো হলেও, মহাবিশ্বের অঙ্কে নগণ্যই বটে! W49B নামক এই নেবুলার সৃষ্টি পৃথিবী থেকে ৩৫,০০০ আলোকবর্ষ দূরে, যা এ যাবৎ সনাক্তকৃত গামা বিস্ফোরণ তথা নেবুলাগুলোর মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম। এর আগে আবিষ্কৃত বিস্ফোরণগুলোর দূরত্ব ছিল অন্তত কয়েক বিলিয়ন আলোকবর্ষ। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞানী উইলিয়াম রিচ নতুন এ আবিষ্কারকে অভিহিত করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে। কারণ আমাদের নিকটতম এ বিস্ফোরণটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে সহায়ক হবে। মিল্কিওয়েতে ঘটে যাওয়া এ বিস্ফোরণ 'কলাপসার' (Collapsar) নামক বিশেষ ধরনের ব্ল্যাকহোল সৃষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত। যার ইঙ্গিত বিজ্ঞানীরা এক দশক আগেই দিয়েছিলেন। কিন্তু অনেক প্রশ্নের উত্তরই ছিল অজানা।

W49B আবিষ্কারের পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, কলাপসার জাতীয় ব্ল্যাকহোল সৃষ্টি করতে সক্ষম বিশাল আকৃতির তারকাগুলো কেবল ঘন মহাজাগতিক গ্যাসীয় ধূলায় গঠিত হয়। কিন্তু W49B থেকে প্রাপ্ত নতুন তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে কলাপসারের বিস্ফোরণ নিম্ন ঘনত্বের গ্যাসেই ঘটে থাকে। তাছাড়া সাধারণ সুপারনোভা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তারার বহিঃস্তরের গ্যাসেই সজোরে নিক্ষিপ্ত হয়।

অথচ কলাপসারগুলোর ক্ষেত্রে তারার কেন্দ্রীয় অংশের লোহা ও নিকেল উত্তপ্ত গ্যাসের সাথে তীব্র বেগে বাইরের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে, W49B এর কেন্দ্রীয় অংশ থেকে তার অক্ষ বরাবর প্রচণ্ড গতিতে এক্স-রশ্মি নির্গত হচ্ছে, যা আয়রন ও নিকেলের ঘনীভূত আয়ন থেকে সৃষ্ট। এরই প্রেক্ষিতে নাসার জেট প্রপালসন ল্যাবরেটরির জ্যোতির্বিজ্ঞানী জনাথন কোহেন W49B কে উল্লেখ করেছেন, কলাপসারের সাথে সম্পর্কিত 'প্রধান প্রার্থী' হিসেবে। তার ভাষায়, "A prime,candidate for being the remnent of a gamma-rang burst involving a Black Hole Collapsary". কোহেন মনে করেন, পিপা সদৃশ এ নেবুলা বা গামারশ্মির বিস্ফোরণ কলাপসার তত্ত্বের সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করবে।

সিডিএমএ

মোবাইল টেকনোলজির নতুন অধ্যায়

রেজা আহমেদ

সিডিএমএ পদ্ধতির সেটগুলো সাধারণত দীর্ঘস্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দেয় এবং ব্যাটারিগুলোর চার্জ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়। কেননা এক্ষেত্রে পাওয়ার কন্ট্রোলিংয়ের মাধ্যমে সিস্টেম এবং সেটের পাওয়ার মনিটরিং করা হয়।

টেলিযোগাযোগ কমিউনিকেশন এর ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন প্রচণ্ড জনপ্রিয় মাধ্যম। অনেকে মোবাইল ফোনের জনপ্রিয়তার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন এর তারহীন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাকে। যে কারণে দেশের যে কোন স্থানে নির্দিষ্ট কাভারেজের মধ্যে যে কেউ পারেন অন্য প্রান্তে যে কারও সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ রাখতে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তৎকালীন Bell Laboratory নামক প্রতিষ্ঠান থেকে মোবাইল ফোনের প্রস্তাবনা রাখা হয় কিন্তু প্রযুক্তিগতসহ সংশ্লিষ্ট নানাবিধ কারণে তখন তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৮০ সালে সেলুলার মোবাইল ফোন সাধারণের আওতায় আসে। আমাদের দেশে মোবাইল প্রযুক্তি সাধারণের কাছে আসতে সমর্থ হয় ১৯৯৪ সালে। দেশীয় মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো মূলত দুটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। প্রথমত GSM (Global System for Mobile) প্রযুক্তি এবং দ্বিতীয়ত CDMA (Code Divison Multiple Access) প্রযুক্তি। এ সংখ্যায় CDMA টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তি আলোকপাত করা হলো।

সিডিএমএ (CDMA) বা কোড ডিভিশন মাল্টিপল এক্সেস প্রযুক্তির প্রবর্তন হয় মূলত ১৯৮৯ সালে। আমাদের দেশে এ প্রযুক্তি আসে ১৯৯৪ সালে। প্যাসিফিক টেলিকম নামে একটি মোবাইল কোম্পানি এ প্রযুক্তি চালু করে। অবশ্য তাদের প্রথম প্রযুক্তি ছিল এএমপিএস (AMPS) বা অ্যাডভান্সড মোবাইল ফোন সার্ভিস (Advanced Mobile Phone Service) প্রথম দিকে উচ্চমূল্য এবং স্বল্প কাভারেজের কারণে মোবাইল প্রযুক্তি আমাদের দেশে ততটা জনপ্রিয় হতে না পারলেও পরবর্তীতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কাভারেজ বৃদ্ধি, মূল্য হ্রাস এবং আনুষঙ্গিক নানা সুবিধার কারণে তা দ্রুত প্রসার লাভ করে।

এ প্রযুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে কতকগুলো ছোট ছোট এলাকা বা সেল (Cell) এ ভাগ করা হয়। এসব এলাকাগুলোর প্রত্যেকটিতে থাকে রেডিও বেইজ স্টেশন (Base Station) এসব সেলগুলোকে কয়েকটি গ্রুপ ক্লাস্টার (Group Cluster)-এ একত্রিক করা হয় এবং প্রত্যেকটি ক্লাস্টারের জন্য প্রাপ্ত চ্যানেলগুলোকে ভাগ করা হয় যাতে এগুলো নিয়মিত প্যাটার্নে ব্যবহার করা যায়। প্রত্যেকটি ক্লাস্টারের জন্য সেলের গ্রুপগুলোর মধ্যে একই ধরনের (Matching) সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা হয় যাতে দুটোর মাঝে ইন্টারফেয়ার না হয়। সাধারণত এসব বেসস্টেশনের রেডিওগুলোকে ৪,৭,১২ ও ২১টি সেলে বিভক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে ক্লাস্টারে সেলের সংখ্যা কম হলে চ্যানেল বাড়ানো যায়। ফলে তথ্যবহন শক্তি বা সামর্থ্য (Information Caring) বৃদ্ধি পায়। তবে ক্লাস্টার সেল কম হলে ইন্টারফেয়ারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এ CDMA প্রযুক্তির মাধ্যমে বহুসংখ্যক গ্রাহক সাধারণ রেডিও শেয়ার করতে পারে এবং যে কোনো ব্যবহারকারী এই চ্যানেল এক্সেস করতে পারেন। মূলত এ থেকে মাল্টিপল এক্সেসের

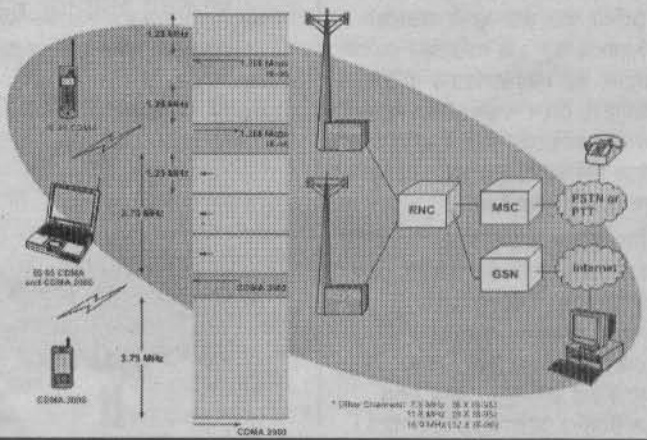

বিভিন্ন ক্রসকানেকশন, জ্যাম, অবাঞ্ছিত কথাবার্তা সিডিএমএ টেকনোলজি যথেষ্ট দক্ষতার সাথে প্রতিহত করে। এছাড়া এতে কল কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। কেননা সিডিএমএ টেকনোলজি 'সফট হ্যান্ড অফ' পদ্ধতিতে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে কল আদান প্রদান করে।

উৎপত্তি। এ পদ্ধতিতে গ্রাহকের সব ইনফরমেশন একই সময়ে এবং একই ফ্রিকোয়েন্সিতে ট্রান্সমিট করা হয়। সিডিএমএ আইডিয়াল টলারেটিং ইন্টারফিয়ারেন্স (Ideal Tolerating Interference) ব্যবহার করে যা ডাইরেক্ট সিকোয়েন্স স্প্রেড স্পেকট্রাম (Direct Sequence Spread Spectrum) কোড ব্যবহার করে। সিডিএমএ পদ্ধতি টিডিএমএ (TDMA = Time Divison Multiple Access) থেকে আলাদা। এটি এনালগ TDMA প্রযুক্তির চাইতে অনেক বেশি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন। এক্ষেত্রে পাওয়ার কনজামশনের মাত্রা টিডিএমএ সিস্টেমের মাত্রা ১০ ভাগ। সিডিএমএ প্রযুক্তিতে বিভিন্ন ফিজিক্যাল লেয়ার ব্যবহার করে একই ফ্রিকোয়েন্সিকে বিভিন্ন সেল (Cell)-এ ভাগ করা যায় এখানে প্রত্যেকটি সেল একই সময়ে অভিন্ন ফিকোয়েন্সি (Frequency) ব্যবহার করে থাকে। টিডিএমএ প্রযুক্তিতে একজন গ্রাহক সম্পূর্ণ কথা বলার পর অপর প্রান্তের গ্রাহক কথা বলতে পারেন। একসঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয় কিন্তু সিডিএমএ পদ্ধতিতে তা সম্ভব।

মাদক

জীবন থেকে
জীবন কেড়ে নেয়।

জীবন একটাই
তাই সুস্থ্য সুন্দর জীবনের জন্য
মাদককে না বলুন।

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

সাধারণত তিনপ্রকার সিডিএমএ (CDMA) পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত 1S-95 2G (Second Generation), এটি মূলত (800-900 MHz ব্যান্ডে কাজ করে। দ্বিতীয়ত JTC STd-008, যা (1.900 MH_Zএর PSc ব্যান্ডে কাজ করে এবং সর্বশেষ WCDMA এবং CDMA-2000 এর সম্মিলিত IMT-2000 প্রযুক্তি। বর্তমানে সিডিএমএ-তে 2G এবং 3G উভয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। 2G CDMA স্ট্যান্ডার্ডকে বলা হয় CDMA One এবং WCDMA; তবে CDMA 2000 এর দুটো দিক রয়েছে। প্রথমত CDMA 2000 1x এবং দ্বিতীয়ত CDMA 2000 1x EV।

সিডিএমএ (CDMA) সুবিধার নানাদিক : সিডিএমএ প্রযুক্তিগত সুবিধার সবচেয়ে বড় দিক হলো চমৎকার ভয়েস কোয়ালিটি। এ পদ্ধতিতে কথা বলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ কানে আসে না। কাজেই কথাবার্তা দুপ্রান্তেই নিখুঁতভাবে শোনা যায়। বিভিন্ন ক্রসকানেকশন, জ্যাম, অবাঞ্ছিত কথাবার্তা সিডিএমএ টেকনোলজি যথেষ্ট দক্ষতার সাথে প্রতিহত করে। এছাড়া এতে কল কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে কেননা সিডিএমএ টেকনোলজি 'সফট হ্যান্ড অফ' পদ্ধতিতে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে কল আদান প্রদান করে। প্রযুক্তির ডিজাইন করা হয়েছে 8.8 ট্রিলিয়ন কোডের সাহায্যে, এটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে এনকোডকৃত। ফলে গ্রাহকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। কেননা এক্ষেত্রে কল রেকর্ড বা ক্রসকানেকশনের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। সিডিএমএ পদ্ধতির সেটগুলো সাধারণত দীর্ঘস্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দেয় এবং ব্যাটারিগুলোর চার্জ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়। কেননা এক্ষেত্রে পাওয়ার কন্ট্রোলিংয়ের মাধ্যমে সিস্টেম এবং সেটের পাওয়ার মনিটরিং করা হয়। ফলে ব্যাটারির চার্জ কম প্রয়োজন পড়ে। সিডিএম টেকনোলজির আরো কিছু সুবিধার মধ্যে রয়েছে মাল্টিমিডিয়া মেসেজিং সার্ভিস (এমএমএস),ভিডিও কনফারেন্সিং লাইফ ইভেন্টস, রিয়েল টাইম মাল্টিমিডিয়া (ফোন, টিভি), মাল্টিমিডিয়া প্লেয়ার, ইন্টারনেটে ওয়েবব্রাউজিং, চ্যাটিং এবং গেমস খেলা প্রভৃতি। এছাড়া এ টেকনোলজির আরেকটি বড় সুবিধা হলো এটি যে কোনো মোবাইল টেকনোলজির চাইতে অনেক বেশি এলাকা বা দূরত্ব কাভারেজ করতে পারে। কলার আইডি (Caller ID) ব্যবহার করার ফলে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত কলের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে মোবাইল কমিউনিকেশন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সিডিএমএ প্রযুক্তি সর্বপ্রথম চালু হলেও তা ততটা জনপ্রিয় হয়নি কেননা এক্ষেত্রে সেটটি পাল্টানো যেত না। ক্রয়কৃত সেটে কম্পিউটারাইজডভাবে নম্বরটি পাঞ্চ করে দেয়া হতো ফলে সীমকার্ডের (লাইন) প্রয়োজন হতো না। তবে সম্প্রতি রিমুভেবল আইডেন্টিফিকেশন মডিয়ুল বা রিমকার্ড চালু হয়েছে। এটি কেবল রিমভিত্তিক সিডিএমএ সেটে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া মোবাইলের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সমস্যা কলরেট। পার্শ্ববর্তী দেশে যেখানে কলরেট মিনিটে ১-২ টাকার বেশি হয় না। সেখানে এদেশে মিনিটে এখনও ৬-৭ টাকা কলরেট বর্তমানে রয়েছে। সুতরাং প্রযুক্তিগতভাবে কলরেট কমানো প্রয়োজন। তাহলেই কেবল সাধারণের পক্ষে প্রযুক্তিগত আধুনিকায়নের এ বিষয়টির সাথে তাল মেলানো সম্ভব হবে নতুবা নয়।

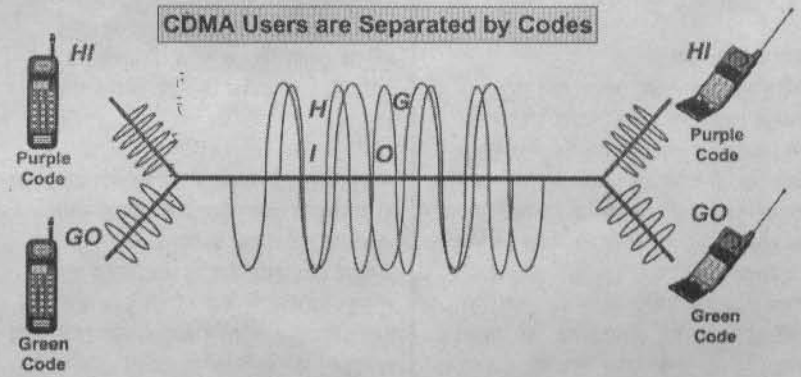

মহাকাশ যুদ্ধ

এ কে এম মনির হোসেন

পনেরো এবং ষোলো শ শতাব্দীতে ইউরোপের দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে। এরপর খুঁজে পাওয়া গেল নতুন পৃথিবী- আমেরিকাকে। ইউরোপের দেশগুলোর ক্ষমতা কমে গেল। সাথে সাথে শুরু হলো নতুন প্রতিযোগিতা। একে অপরকে শায়েস্তা করার জন্য খুঁজতে লাগল নতুন সব কলাকৌশল। ভূমিতে যখন আর কোনো নতুন কৌশলের খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন এসব দেশগুলো তাকাল আকাশের দিকে। একে অপরের দিকে তাক করল বিধ্বংসী সব মিসাইল, যাদের বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রিত হয় আকাশ থেকে। মহাকাশে কার কত ক্ষমতা এর উপর নির্ভর করছে যুদ্ধে কে সেরা।

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ হচ্ছে প্রথম যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেছে পৃথিবীর চারদিকে চক্কর দেয়া উপগ্রহগুলো। এটা ছিল আসল পরীক্ষা যার জন্য আমেরিকাকে খরচ করতে হয়েছে দু শ বিলিয়ন ডলার। ১৯৬০ সালের দিকে আমেরিকা প্রথমবারের মতো পৃথিবীর কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করে গোয়েন্দা উপগ্রহ। বর্তমানে পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরছে আমেরিকার অনেকগুলো উপগ্রহ।
এর মধ্যে আছে : ১. কেএইচ-১১ উপগ্রহ, যার কাজ হচ্ছে শত্রু ভাবাপন্ন দেশগুলোর সীমান্তের ভিতর মাটির উপর যা কিছু আছে তার ছবি তুলে নেয়া। ছবিগুলো দেখলে মনে হবে খুব কাছ থেকে তোলা হয়েছে। এমনকি টেলিফোনে মানুষের গোপন কথাবার্তাও এটা শুনতে পারবে। ২. লেকরোজ উপগ্রহ, যেটা শত্রুপক্ষের রাডার ইমেজ তৈরি করে। ৩. প্রোজেক্ট হোয়াইট ক্লাউড নামের একটা মহাকাশযান, যেটা শত্রুপক্ষের জাহাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। ৪. অতি গোপনীয় জাম্পসুট উপগ্রহ, যেটার কাজ শত্রুপক্ষের ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সমিশনের উপর নজর রাখা।

এসব উপগ্রহের ক্ষমতা বোঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। মনে করুন বাড়ির ছাদে বসে আপনি খবরের কাগজ পড়ছেন। কেএইচ-১১ উপগ্রহের ক্যামেরা খবরের কাগজের হেডলাইনের ছবি পর্যন্ত তুলতে পারবে। তাহলে ব্যাপারটা একবার চিন্তা করে দেখুন!
এছাড়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং যোগাযোগের জন্য আছে অনেকগুলো উপগ্রহ। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে কোয়ালিশন বাহিনী ইরাকের বিরুদ্ধে মোট ষাটটি উপগ্রহের সাহায্য নেয়। ইতিহাসে এই প্রথম কোনো দেশের বিরুদ্ধে এতগুলো উপগ্রহ একসাথে ব্যবহার করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধে এর সংখ্যা কত, সে হিসাব এখনো সাধারণ মানুষ জানে না।

চতুর্থ মাত্রা

সাধারণ যুদ্ধে মহাকাশ চতুর্থ মাত্রা যোগ করেছে- এরকম মন্তব্য করেছেন বিখ্যাত সব সমরবিদরা। এর ফলে যুদ্ধ এখন নতুনভাবে হচ্ছে। মানুষ মারা যাচ্ছে কম। কারণ শত্রুপক্ষের সবকিছুই আকাশ থেকে নিখুঁতভাবে আগে থেকে দেখা যাচ্ছে। ফলে টার্গেট করা যাচ্ছে শুধুমাত্র সামরিক ঘাঁটিগুলোকে। স্কাড মিসাইল এগিয়ে আসছে, এটা মানুষ আগে থেকেই জানতে পারছে। ফলে মানুষজন পালিয়ে জীবন রক্ষা করতে পারছে। কিন্তু আগে এটা সম্ভব ছিল না।

উপগ্রহের মাধ্যমে সমরবিদরা এখন জানতে পারছেন মরুভূমির কোন অংশটাতে ট্যাঙ্ক

ভূমিতে যখন আর কোনো নতুন কৌশলের খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন এসব দেশগুলো তাকাল আকাশের দিকে। একে অপরের দিকে তাক করল বিধ্বংসী সব মিসাইল, যাদের বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রিত হয় আকাশ থেকে।

চলতে পারবে এবং কোন অংশে পারবে না। সাগরের গভীরতা কত, হেলিকপ্টার নামবে কোথায়, এসব তথ্য এখন তাদের হাতের মুঠোয়। আর এসব তথ্য পাঠাচ্ছে মহাকাশের উপগ্রহগুলো। এর ফলে উন্নত দেশগুলো কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তারা মহাকাশের উপগ্রহগুলোর উপর নির্ভর করবে সবচেয়ে বেশি। মহাকাশে কার ক্ষমতা কতটুকু এর উপর নির্ভর করবে কে পৃথিবীকে শাসন করবে। মহাকাশে আমেরিকার আধিপত্য বেশি, তাই সে এখন পৃথিবীর অধিকর্তা। কে তাকে থামাবে?

মহাকাশের মালিক কে? এই প্রশ্নে পৃথিবীর দেশগুলোর মাঝে শুরু হয়েছে নতুন ঠাণ্ডা যুদ্ধের। মহাকাশ যুদ্ধে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর দাবি একটাই: মহাকাশের মালিক পৃথিবীর সবাই। এককভাবে কেউ এর মালিক হতে পারবে না। তারা আরও দাবি জানাচ্ছে, মহাকাশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জাতিসংঘকে দেয়া হোক। কিন্তু কে কার কথা শোনে। শান্তি এবং যুদ্ধ এ দুই উদ্দেশ্যেই মহাকাশ দখলের লড়াই চলছে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

কার উদ্দেশ্য শান্তির আর কার উদ্দেশ্য খারাপ

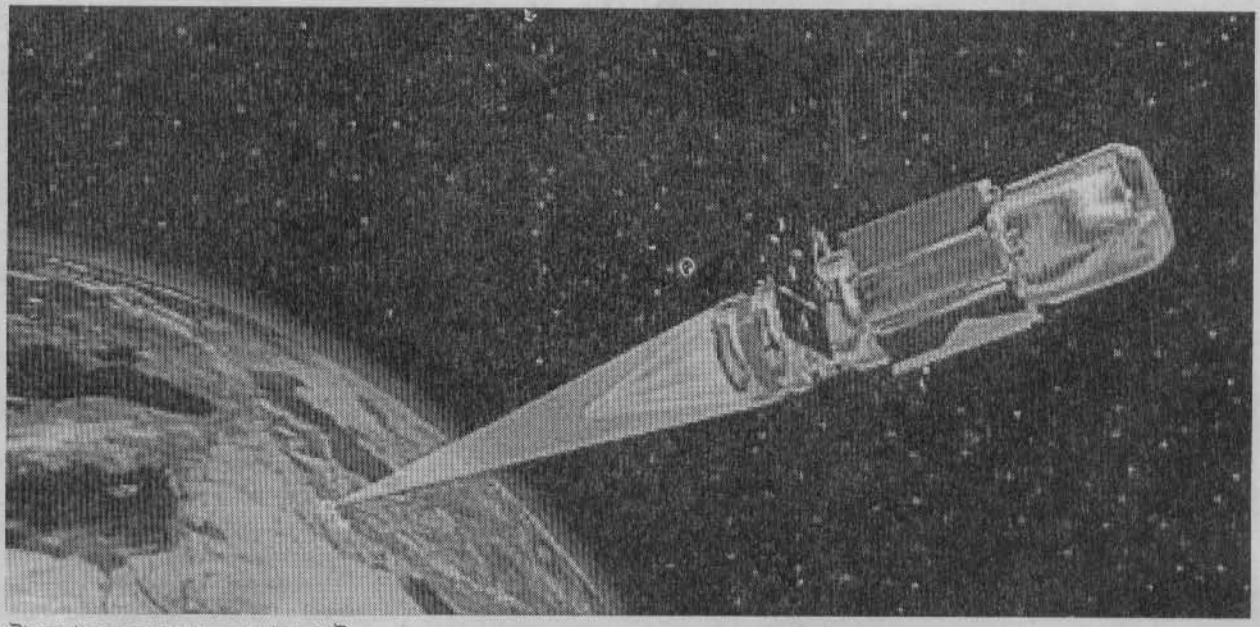

এটা বোঝা সহজ নয়। ১৯৮৭ সালে মোট ৮৫০টি মিসাইল ছোঁড়া হয়েছিল। এর ভিতর আমেরিকা এবং তৎকালিন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছুঁড়েছিল ৭০০টি। পৃথিবীর বাকি দেশগুলো ছুঁড়েছিল ১০০-১৫০টি। এগুলো ছিল পরীক্ষামূলক। কিন্তু ১৯৮৯ সালে হিসাবটা উল্টে গেছে। এ সময় মিসাইল ছোঁড়া হয়েছিল প্রায় ১৭০০টি। আমেরিকা ও রাশিয়া বাদে অন্যান্য দেশ ছুঁড়েছিল মোট ১০০০টি মিসাইল। এসব মিসাইল নিয়ন্ত্রণ করা হয় উপগ্রহের মাধ্যমে।

আমেরিকা এবং রাশিয়া বাদে যেসব দেশ মিসাইল টেকনোলজিতে এগিয়ে গেছে তাদের ভিতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, ইয়েমেন, লিবিয়া, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, ইজরাইল, সিরিয়া এবং চীন। ইয়েমেন, সিরিয়া এবং লিবিয়ার আছে ফ্রগ-৭ নামের মিসাইল যার ক্ষমতা ৭০ মাইল এবং এটা ১০০০ পাউন্ড এর ওয়ারহেড বহন করতে পারে।

১৯৮৯ সালে ইন্ডিয়া অগ্নি নামে যে মিসাইলটি উৎক্ষেপণ করে তার ক্ষমতা ছিল ২,৫০০ মাইল এবং ২০০০ পাউন্ড ওয়ারহেড বহন করতে পারে। ফলে ইন্ডিয়া যে কোনো মুহূর্তে শুধু পাকিস্তান কেন, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং চীনে আঘাত হানতে পারবে। আর পাকিস্তান? সে থেমে থাকবে কেন? সেও তার সাধ্যমতো এগিয়ে যাচ্ছে মিসাইল টেকনোলজিতে।

ইরান, ইজরাইল এবং আরো অনেকে

মিসাইল টেকনোলজি এত সহজ হয়ে পড়েছে যে, অনেক দেশ নিজেদের আর নিরাপদ মনে করছে না। এসব দেশ নিজেরা মিসাইল বানাতে অক্ষম। তাই তারা অন্য দেশ থেকে এসব মিসাইল কেনার উদ্যোগ নিয়েছে। সেই সাথে উপগ্রহেরও মালিক হতে চাচ্ছে।

মিসাইলের হাত থেকে বাঁচার জন্য ইউরোপের দেশগুলো আমেরিকার উপর নির্ভর করতে চাচ্ছে না। তারা নিজেরাই এই ক্ষমতা অর্জন করতে চাইছে। এটার জন্য প্রয়োজন পুরোপুরি একটা স্যাটেলাইট সিস্টেমের মালিক হওয়া। আরব আমিরাতের মতো ছোট দেশও এখন গোয়েন্দা উপগ্রহের মালিক হতে চাইছে। বিক্রেতাও পাওয়া গেছে। আমেরিকা এটা খারাপ চোখে দেখছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আমিরাতকে এই গোয়েন্দা উপগ্রহ যোগান দিতে চাইছে আমেরিকারই এক কোম্পানি!

ইরান নিজেরাই তৈরি করেছে উন্নতমানের মিসাইল যা সরাসরি ইজরাইলকে আক্রমণ করতে পারবে। ইজরাইল এটা ঠেকানোর জন্য হাজার চেষ্টা করেও পারেনি। তাই সে এখন উপগ্রহের দিকে নজর দিয়েছে। কারণ ইরান যদি মিসাইল ছোঁড়ে তাহলে অন্তত আগে থেকে যেন সেটা জানা যায়।

মহাকাশ নিয়ে যখন সবাই এত ব্যস্ত, তখন ১৯৮৭ সালে জি-৭ এর দেশগুলো একটা চুক্তিপত্র তৈরি করে তাতে স্বাক্ষর করে। তারা একমত হয় যে, অনুন্নত দেশগুলোর কাছে তারা মিসাইল টেকনোলজি বিক্রি করবে না। তবে আসল কথা হচ্ছে এ চুক্তির পর মিসাইল টেকনোলজি আরো অনেক দেশের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে।

মহাকাশের উপগ্রহগুলো নিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়া এতই বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল যে, আমেরিকা ঘোষণা দিয়েছিল রাশিয়া যদি তার কোনো উপগ্রহ ধ্বংস করে, তাহলে সেটা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। রাশিয়াও একই ঘোষণা দিয়েছিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে মহাকাশে চলছিল আরেক ঠাণ্ডা যুদ্ধ।

অবশেষে দুই দেশই মাথা ঠাণ্ডা করে হিসাব করল। তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিল ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। শেষমেশ চুক্তি হলো; তারা কেউ কারো উপগ্রহের দিকে নজর দিবে না। এটা এখনো অটুট আছে।

মহাকাশের মালিক কে? এই প্রশ্নে পৃথিবীর দেশগুলোর মাঝে শুরু হয়েছে নতুন ঠাণ্ডা যুদ্ধের। মহাকাশ যুদ্ধে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর দাবি একটাই; মহাকাশের মালিক পৃথিবীর সবাই। এককভাবে কেউ এর মালিক হতে পারবে না।

অ্যান্টিম্যাটার এবং একটি হীরা

আসিফ আনোয়ার

পৃথিবী সৃষ্টির সময় যে প্রক্রিয়ায় পদার্থ সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক তার বিপরীত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে একই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছিল অ্যান্টিম্যাটার।

পৃথিবীর সবচাইতে দামি পদার্থ কোনটি? প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলে সবাই একবাক্যে উত্তর দেবেন ডায়মন্ড বা হীরা। আপাতদৃষ্টিতে তাই। কারণ আমাদের চেনা জগতে হীরাই সবচাইতে দামি। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর অন্যরকম হতে বাধ্য। তাদের কাছে হীরার চাইতেও আরো দামি কিছু পদার্থ আছে। তবে একবাক্যে যে পদার্থটিকে সবচাইতে দামি বলা হয়, সেটি হচ্ছে অ্যান্টিম্যাটার বা প্রতিপদার্থ।

পদার্থ বলতে আমরা কি বুঝি? বিজ্ঞান বইতে এটি একটি কমন প্রশ্ন। যার আকার আছে, আয়তন আছে এবং যা স্থান দখল করে, তাকেই আমরা পদার্থ বলে চিহ্নিত করে থাকি। যদি তাই হয়, তাহলে অ্যান্টিম্যাটারের সংজ্ঞাটা কি হবে? 'যার আকার নেই, আয়তন নেই কিংবা যেটি স্থান দখল করে না, তাকেই অ্যান্টিম্যাটার বলা হয়'— এটি কি বলা যাবে? না, এর সংজ্ঞাটা ঠিক এভাবে খুঁজলে হবে না। এর সংজ্ঞা খুঁজতে হবে অন্য জায়গায়। বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবী সৃষ্টির সময় যে প্রক্রিয়ায় পদার্থ সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক তার বিপরীত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে একই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছিল অ্যান্টিম্যাটার। যেহেতু ম্যাটার-অ্যান্টিম্যাটারের সহাবস্থান সম্ভব নয়, তাই অ্যান্টিম্যাটারকে বিলুপ্ত হতে হয়েছিল। এবং সেটা এক সেকেন্ডের কয়েক কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে। পদার্থবিদ্যার যেসব সূত্র এই পৃথিবী ও চেনা মহাবিশ্বে কার্যকর, অ্যান্টিম্যাটারের বৈশিষ্ট্য ঠিক তার বিপরীত। ফলে পৃথিবীতে ও মহাবিশ্বে কোনো অ্যান্টিম্যাটার নেই। অবশ্য বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে গবেষণাগারে অ্যান্টিম্যাটার তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের গবেষণা কাজের জন্য।

এই অ্যান্টিম্যাটার তৈরির এক গবেষক ছিলেন জুয়ান হোং। মূল প্রক্রিয়াতে তিনি না থাকলেও তিনি যে বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন, তাতে কিছুদিনের মধ্যেই তাকে অ্যান্টিম্যাটার তৈরির মূল কারখানাতে ঢুকতে দেয়া হতো নিশ্চিত। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে পড়াশুনার দিক বদল করলেন তিনি। অ্যান্টিম্যাটারের বদলে উৎসাহ দেখাতে লাগলেন ডায়মন্ড বা হীরাতে। তার যুক্তি, দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের মানুষরা কখনো অ্যান্টিম্যাটার নিয়ে কাজ করতে পারবে না। এমনকি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ জানবেই না অ্যান্টিম্যাটার নামে কিছু একটি আছে। বিষয়টি বুঝতে পেরে আমি এর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। আগ্রহ জন্মে হীরাতে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষের আরাধ্য বিষয় এটি। আমারও। ফলে হীরা নিয়ে গবেষণা কাজ করছে এমন দলের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তাদের কাজে ঢুকে পড়ি।

এ লেখাটি মূলত হীরাকে ঘিরেই রচিত। তার আগে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হলো এই কারণে যে, মানুষটি অ্যান্টিম্যাটার সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর ছিল একসময়, তিনিই দিক বদলে আস্তে আস্তে চলে আসেন হীরার জগতে। এবং এসেই কিছুদিনের মধ্যে আবিষ্কার করলেন, চীনারাই প্রথম হীরা ব্যবহার করে এবং তারাই হীরার আধুনিক গঠন বা রূপদান করে।

তাই শুধু হোং-এর কারণে এখানে অ্যান্টিম্যাটারের কথা বলা হলো। তা না হলে পুরো লেখাতে অ্যান্টিম্যাটারের আর কোনো প্রসঙ্গই নেই। এক বিষয়ে ওস্তাদ হয়ে যাওয়ার পর অন্য বিষয়ে কাজ করার আগ্রহ দেখানো এবং কাজ করতে গিয়েই সফল হয়ে যাওয়া এমন উদাহরণ বিরল।

পৃথিবীতে কোন দেশে প্রথম হীরা পাওয়া যায়? কোন দেশে প্রথম হীরার উৎপাদন শুরু হয়? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর এখনো বিতর্কিত। শুধু হীরার ক্ষেত্রেই নয়, সব দামি পাথরের ক্ষেত্রেও এ কথাটি সত্য। কারণ প্রতিটি দেশই চায় তাদের দেশের নাম জুড়ে দিতে। যেজন্য এ প্রশ্নগুলোর কোনো সর্বজনস্বীকৃত উত্তর পাওয়া যায় না। তবে গবেষকদের গবেষণার দরুণ প্রশ্নগুলোর কিছু সম্ভাব্য উত্তর মিলছে। যেমন, গবেষকরা মনে করেন, দক্ষিণ আফ্রিকাতেই মানুষ প্রথম হীরা আবিষ্কার করে। কিন্তু চীনারা প্রথম হীরার উৎপাদন শুরু করে।

এ দুই উত্তরের মধ্যে একটি ফারাক রয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যদি প্রথম হীরে আবিষ্কৃত হয়, তাহলে চীনে কিভাবে উৎপাদন শুরু হয়? হীরা আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথেই তো দক্ষিণ আফ্রিকায় উৎপাদন শুরু হওয়ার কথা। গবেষকরা এ যুক্তির উত্তরে বলছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরা প্রথম পাওয়া গেলেও সেখানে তক্ষুনি এর উৎপাদন শুরু হয়নি কারণ সেই সময়ের সেখানকার আদিবাসীরা হয় হীরার মূল্য সম্পর্কে অবগত ছিল না, কিংবা হীরা উৎপাদনের পদ্ধতি তাদের জানা ছিল না। গবেষকরা এপর্যন্ত যতগুলো পুরাতন হীরা আবিষ্কার করেছেন, সেগুলোর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার হীরাই সবচাইতে পুরানো। অন্যদিকে চীনে প্রথম হীরা উৎপাদিত হয়, সেই ধারণার পক্ষে গবেষকরা যেসব যুক্তি দেখাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে– একই সময়ের একই আকৃতির কয়েকটি হীরা যদি একই এলাকায় একসাথে পাওয়া যায়, তাহলে ধরে নেয়া যায় সেই সময়ে সেই হীরাগুলো সেখানকার কোনো খনি থেকে আহরিত হয়েছিল। চীনে পুরানো আমলের বেশ কিছু হীরা উদ্ধার হওয়ার পর তাদের এই ধারণা আরো জোরালো হয়েছে। এছাড়া আরো কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার পর তাদের কাছে মনে হয়েছে চীনারাই প্রথম হীরা উৎপাদন শুরু করেছে।

তাদের এ ধারণা যে সঠিক তা প্রমাণিত হয়েছে সাম্প্রতিক আরেকটি আবিষ্কারে। জোয়ান হোং-এর কথা তো আগেই বলা হয়েছে। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ পিটার লু এবং তার সহকর্মীরা এমন একটি হীরা আবিষ্কার করেছেন যার বয়স কম করে হলেও চার হাজার পাঁচশ বছর। হীরা সম্পর্কিত এ গবেষণায় এই দুজন ব্যক্তি ছাড়াও আরো বেশ কিছু খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও গবেষক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ দল মিলে এই পুরো প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন।

তাদের আবিষ্কৃত হীরাটিকে পরে পরীক্ষাগারে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। এক্স-রে পরীক্ষার সাহায্যে যেমন এর বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে তেমনি এক্স-রে পরীক্ষার নির্ভুলতা মাপতে নেয়া হয়েছে মাইক্রোপ্রোব অ্যানালাইসিসের সাহায্যও। তবে ড. লু বলেছেন, কোনো পরীক্ষাই আপনাকে ১০০ ভাগ নির্ভুল ফলাফল দিতে সক্ষম নয়। কিছুটা অনিশ্চয়তা সব পরীক্ষায় থেকেই যায়।

অন্যদিকে একদল গবেষক মনে করেন, ফ্যাশন কিংবা অলংকার হিসেবে ভারতীয়রা প্রথম হীরা ব্যবহার শুরু করে। মহাকাব্য মহাভারতের কিছু কাহিনীতেও নাকি হীরকের কথা বলা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে হীরা আবিষ্কার, চীনে উৎপাদন শুরু হলেও ব্যবহারের দিক থেকে ভারত এই দু দেশের চাইতে এগিয়ে রয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে কি তখন ভারতের সঙ্গে চীনের হীরা বেচাকেনা চলতো?

তবে এই হীরাটি চীনে পাওয়া গেলেও হীরাটির ব্যবহারকারী চীনের কোনো অধিবাসী কি-না তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। যেহেতু হীরাটি পাওয়া গেছে চীন ও ভারত সীমান্তে, তাই আবিষ্কারকদের একদল মনে করছে, হীরাটির প্রথম ব্যবহারকারী হচ্ছে ভারত। অন্যদিকে আরেক দলের মতে, হীরাটির গঠনশৈলী ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে মিলছে না। চীন ও ভারতের সীমান্তে পাওয়া গেলেই যে হীরাটি ভারতের হয়ে যাবে এর কোনো যুক্তি নেই। তবে অ্যান্টিম্যাটার নিয়ে গবেষণাকারী হোং বলছেন ভিন্ন কথা। তার মতে, হীরাটি যে সীমান্তে পাওয়া গেছে সেখানে এক সময় বর্তমান ভারত ও চীন উভয় দেশের অধিবাসীরা বাস করতো। তাই কোন দেশের নাগরিক সেটি কিংবা সেটির স্টাইল প্রথম ব্যবহার করেছে, সেটি নির্ধারণ করা খুব জরুরি কিছু নয়। আমাদের দেখতে হবে, এর সঙ্গে কোন এলাকার তখনকার নাগরিক জীবনের সংস্পর্শ ছিল। সেটি বের করা না গেলে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে যতই হীরাটিকে মূল্যবান মনে করি না কেন, হীরাটির প্রকৃত মূল্য কখনোই বের করা যাবে না। আর প্রকৃত মূল্য বের করা না গেলে বোধহয় আমার দ্বারা অ্যান্টিম্যাটার নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব হবে না।

হোং কেনো অ্যান্টিম্যাটারের জগৎ ছেড়ে হীরার জগতে চলে আসলেন, তার কারণ কিন্তু ওই কথাতেই নিহিত। অ্যান্টিম্যাটার গবেষণায় প্রচুর খরচ। তাই এ খরচ চালাতে তারা এখন হীরাটির প্রকৃত মূল্য বের করতে হবে। আর প্রকৃত মূল্য বের করতে জানা দরকার হীরাটি কোন এলাকার।

ভারত ও চীন চাইলে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারে। সঠিক ইতিহাস বের করার মাধ্যমে সৃষ্টি করতে পারে একটি নতুন দিগন্তের। এরকম একটি প্রাচীন হীরার ইতিহাস বের করা এবং এর মালিকানা লাভ করার অর্থই হচ্ছে নিজ দেশের ঐতিহ্য কত পুরানো তার প্রমাণ দেয়া। জানার অপেক্ষায় রইলাম কার ইতিহাস পুরানো। ভারতের না চীনের।

মহাকাব্য মহাভারতের কিছু কাহিনীতেও নাকি হীরকের কথা বলা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে হীরা আবিষ্কার, চীনে উৎপাদন শুরু হলেও ব্যবহারের দিক থেকে ভারত এই দু দেশের চাইতে এগিয়ে রয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে কি তখন ভারতের সঙ্গে চীনের হীরা বেচাকেনা চলতো?

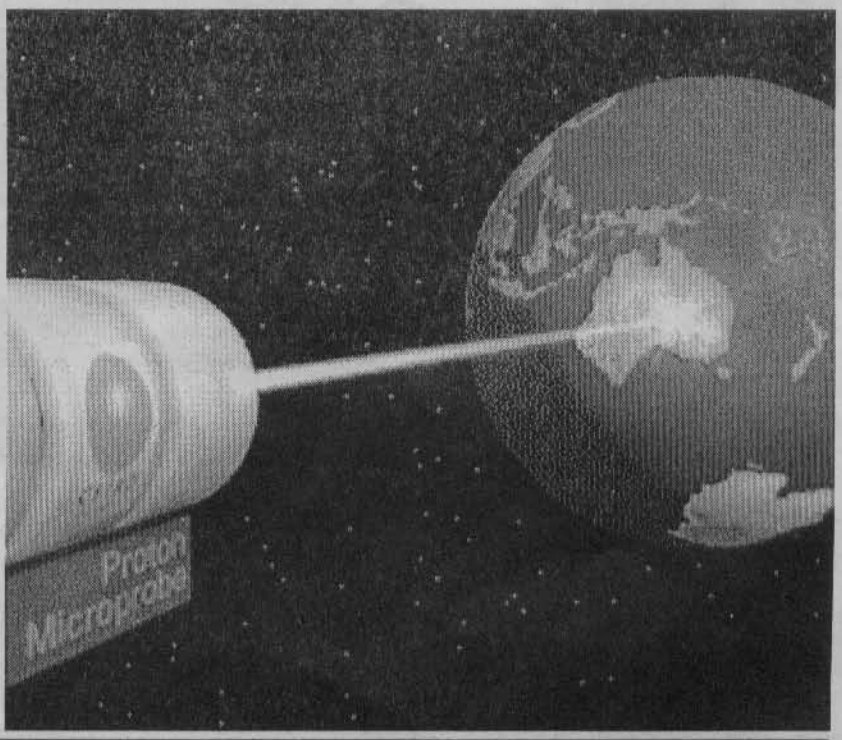

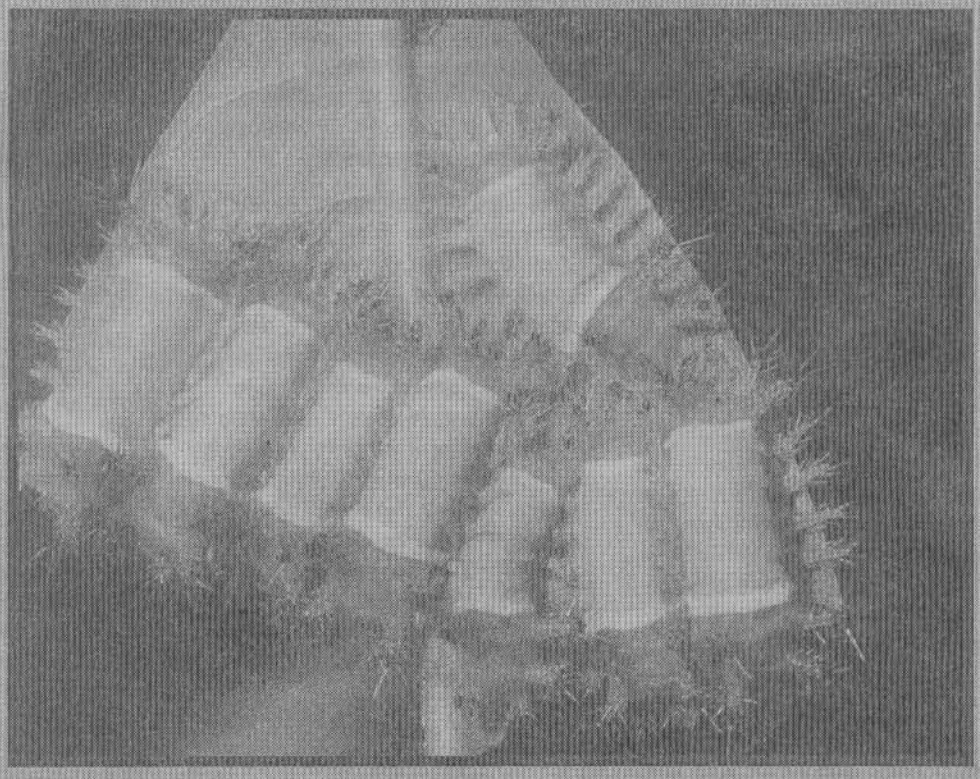

বিষাক্ত শুঁয়াপোকা

শেখ আনোয়ার

অস্ট্রেলিয়ায় বাহারি এক ধরনের শুঁয়াপোকা রয়েছে। এগুলো অ্যাটলাস মথ ক্যাটারপিলার নামে পরিচিত। গায়ের রঙ কলাপাতার মতো হালকা সবুজ। এদের জ্বলজ্বলে রঙটা দেখে টুপ করে হাতে তুলে নিতে ইচ্ছে হবে। দেখলে মনে হবে এর মতো নিরীহ সুন্দর প্রাণী পৃথিবীতে নেই। তুলতুলে সবুজ প্লাস্টিকের খেলনার মতো এ পোকার বাইরের দিক যতটা সুন্দর ভিতরটা তেমনি গরলে পরিপূর্ণ। এদের শরীরে রয়েছে ভয়ঙ্কর বিষ। কোনো মানুষের গায়ে এই শুঁয়াপোকা লাগলে জ্বালা ধরে, চুলকায়; ঘা হয়। যদি কেউ এই শুঁয়াপোকার হুল খায় তাহলেই হয়েছে! অমনি জ্বালার চোটে তাল জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়ে যাবে।

কোনো মানুষের গায়ে এই শুঁয়াপোকা লাগলে জ্বালা ধরে, চুলকায়; ঘা হয়। যদি কেউ এই শুঁয়াপোকার হুল খায় তাহলেই হয়েছে! অমনি জ্বালার চোটে তাল জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়ে যাবে।

বিষাক্ত উদ্ভিদের পাতার রস খেয়েই ওদের এই বিষাক্ত শরীর গড়ে উঠেছে। কোনো বড় পাখি যদি একবার এই সবুজ শুঁয়াপোকাকে ঠোঁটে তোলে, দ্বিতীয়বার কখনো এ ভুলটি সে করবে না। যে পাখি জানে না এই শুয়োপোকার ত্বকে মারাত্মক বিষ রয়েছে, সে অবলিলায় হামলা চালায় তার ওপর। এতে কখনো কখনো গুরুতর আহত হয় শুঁয়াপোকা। অপরদিকে পাখিটির চরম ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। বিষের প্রচণ্ড জ্বালা এবং মারাত্মক প্রতিক্রিয়া থেকে যদি পাখিটি কোনোমতে পার পেয়েও যায়, বাকি জীবনে আর নাম নেবে না শুঁয়াপোকার। কোনো প্রাণী যদি লোভনীয় খাবার হিসেবে মুখে তোলে, বিকট গন্ধে সঙ্গে সঙ্গে উগলে দিতে বাধ্য হবে।

কেপক নামে এক ধরনের তুলা জাতীয় উদ্ভিদের পাতা খেয়ে থাকে এরা। আর এই পাতা থেকেই তারা পায় শত্রু খেদানো দুর্গন্ধ। মাদাগাস্কারসহ আফ্রিকার আরো কয়েকটি দ্বীপে দেখতে পাওয়া যায় এই পোকা। এদের জ্বলজ্বলে সবুজ রঙের চেহারা দেখলেই পাখিরা সতর্ক হয়ে যায়। আর নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বিচরণ করে অন্যান্য প্রাণীরা। গায়ের রঙ পারিপার্শিক পরিবেশের সাথে মিলে যাওয়ায় শিকারি প্রাণীর কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এরা সহজেই ছদ্মবেশ নিতে পারে। আত্মগোপন করতে পারে সহজেই।

সূত্র : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক।

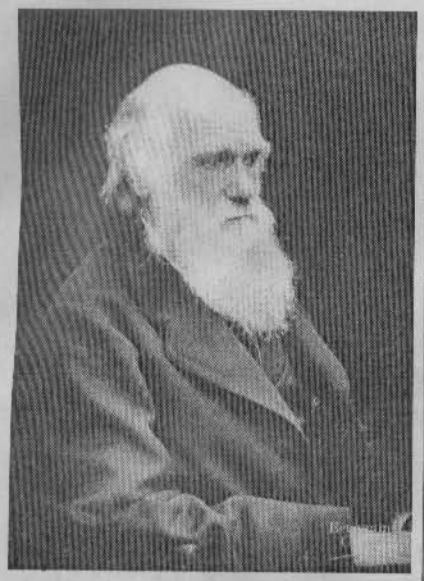

এ ক জ ন সা হ সী বি জ্ঞা নী

ডারউইন

পারভীন সুলতানা

আমাদের পূর্বপুরুষ যে বানর ছিল, তা তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়।" কোনো ছোট ছেলে বা মেয়ের বাদরামি বা দুষ্টুমি দেখে এ ধরনের মন্তব্য প্রায়শঃ আমরা করে থাকি। শুধু ছোটদের নয় বড়দের বিষয়েও এ ধরনের মন্তব্য করা হয় নিছক কৌতুকের বশে। মানুষের পূর্ব পুরুষ যে বানর ছিল এ তথ্যের আবিষ্কারক কে? প্রশ্নটির উত্তর অনেকেরই জানা। ডারউইন। পূর্ব নাম চার্লস ডারউইন। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ছিল চার্লস ডারউইনের ১৯৬তম জন্ম বার্ষিকী। চার্লস ডারউইনের পিতামহ এরামাস ডারউইন ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, কবি, আবিষ্কারক এবং চিকিৎসক। এরামাসের এক ছেলে চার্লস তার মতো চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মর্গে কাজ করতে গিয়ে নিজের হাত কেটে ফেলে এবং ইনফেকশন হয়ে মারা যান।

এরামাসের কনিষ্ঠ পুত্র রবার্ট নিজে যেমন বড় ভাই চার্লসের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন তেমন তার ছেলে চার্লস যার নাম প্রয়াত ভাইয়ের নাম অনুযায়ী রেখেছিলেন তাকেও চিকিৎসক বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চার্লস চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নকালে প্রথম দিন লাশ কাটতে গিয়ে অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসেন।

এরপর চার্লস বেরিয়ে যান ভ্রমণে। সে যুগে ভ্রমণ অর্থ হচ্ছে জাহাজে চড়ে অজানার উদ্দেশ্যে বা নির্দিষ্ট গন্তব্যে রওনা দেয়া। চার্লসের সঙ্গী ছিলেন ক্যাপ্টেন রবার্ট ফিজরয়ের। ডারউইন ছিলেন এক ধর্মভীরু তরুণ আর ফিজরয়ে ছিলেন ধর্ম বিষয়ে কিছুটা উদাস। প্রায়শঃ ধর্ম নিয়ে ডারউইন ও ফিজরয়ের তর্কবিতর্ক চলতো। চার্লসের বাবা ভেবেছিলেন সমুদ্র ভ্রমণ থেকে ডারউইন একজন ভালো যাজক হয়ে ফিরে আসবেন। ডারউইনের এই ভ্রমণ শুধু তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়নি, পুরো জীববিজ্ঞানে এনে দেয় অভাবনীয় পরিবর্তন। তবে এর সঙ্গে ডারউইনের স্বাস্থ্যেও চিরস্থায়ী ক্ষতির সৃষ্টি হয়। ভ্রমণকালে একটা বিষধর পোকার কামড়ে ডারউইনের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মৃত্যু পরবর্তীতে তার মৃত্যুর জন্য এ ঘটনাকেই দায়ী করা হয়। বিগেল ভয়েজ নামে এই সমুদ্রযাত্রা ডারউইনকে এনে দেয় যশ ও খ্যাতি। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'অরিজিন অব স্পেসিস' এই সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত।

ডারউইনের কথা ভাবলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইয়া লম্বা দাঁড়িওয়ালা বৃদ্ধের চেহারা। ডারউইন যখন বিগেল ভয়েজে যান তখন তার উচ্চতা ছিল পাঁচ ফিট সাড়ে এগারো ইঞ্চি। তার ওজন ছিল ১৪৮ পাউন্ড। পরবর্তীতে হয়তো কিছুটা মেদ জমে ছিল। তার ছবি দেখে তাই মনে হয়।

ছোটবেলায় ডারউইন ছিলেন অসম্ভব দুরন্ত। যার ফলে যত দোষ নন্দ ঘোষের মতো বাড়িতে যা কিছু হারায় সব ডারউইনের উপর চাপানো হতো। পাড়ার গাছগুলোতে কোনো ফল পাকতে পারত না ডারউইনের কারণে। মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বালক ডারউইন দোকানে গেলে, আসার পর হ্যাটের নিচে দেখা যেত এটা ওটা, যা নাকি ডারউইন বিনামূল্যে নিয়ে আসতো। তবে যুবক বয়সে ডারউইন ছিলেন কিছুটা আলসে প্রকৃতির। স্কুলে তেমন ভালো ছিলেন না। তবে ডারউইন ছোটবেলা থেকেই ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। তার মা সুমানা তাকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে ফুলের রঙ পাল্টিয়ে দেয়া যায়। খুব অল্প বয়সে গাছের বিভিন্নতার বিষয়ে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তার বাবার ছিল একটা চমৎকার বাগান। তা চার্লসকে আকর্ষণ করতো প্রবলভাবে। বালক বয়সে ডারউইন পোকা, পয়সা, স্ট্যাম্প ইত্যাদি সংগ্রহ করতেন।

ডারউইনের সবচেয়ে প্রিয় বই ছিল 'ওয়ান্ডার অব দ্য ওয়ার্ল্ড'। এ বই থেকে ডারউইন নতুন নতুন এলাকা আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা পান। ডারউইনের বয়স যখন ১৩ বছর তখন বড় ভাইসহ বাড়ির বাগানে একটি রসায়ন পরীক্ষাগার তৈরি করেন। স্কুলের ছেলেরা তাকে ঠাট্টা করে বলতো 'গ্যাস ডারউইন'। স্কুলের হেড মাস্টার ডারউইনকে ভর্ৎসনা দেন সময় নষ্ট করার জন্য। আর ডারউইনের বোন তো ভয়ে অস্থির ছিলেন, কবে যে পরীক্ষাগার থেকে গ্যাস বিস্ফোরণ হয়ে বাড়িটা উড়ে যায়। তবে পরীক্ষাগারটি ডারউইনের পরবর্তী জীবনে খুব কাজে এসেছিল।

১৮৫৯ সালে ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিস' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। সে সময় বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ডারউইনের এ বইটি প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব ইতিহাসে উজ্জ্বল স্থান পায়। তবে তৎকালীন ধর্মীয় নেতারা এটি গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ বাইবেল ও কোরআনের তত্ত্ব অনুযায়ী বাবা আদম ও মা হাওয়া হচ্ছেন আমাদের পূর্ব পুরুষ। ডারউইন বিভিন্ন পরীক্ষা ও গবেষণা করে দেখিয়েছেন বানর APE হচ্ছে মানুষের পূর্ব পুরুষ।

ডারউইন ১৮৩১ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় ডারউইন বিলুপ্ত প্রাণীদের ফসিল পান যেগুলোর সঙ্গে আধুনিক প্রজাতির মিল রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরে গালাপাগোস দ্বীপে দক্ষিণ আমেরিকার মতো বহু ধরনের গাছ ও প্রাণীর সন্ধান পান। লন্ডনে ফিরে ডারউইন তার সংগৃহীত প্রজাতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। তার গবেষণা লব্ধ বিষয়গুলো হচ্ছে

১. বিবর্তন হয়েছিল
২. বিবর্তন হয়েছিল ধীরে ধীরে
৩. বিবর্তনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া ছিল প্রাকৃতিক বাছাই বা ন্যাচারাল সিলেকশন এবং
৪. লাখ লাখ স্পিসিস এখনও যাদের অস্তিত্ব রয়েছে তারা একটা একক মূল জীবন থেকে উদ্ভূত।

ডারউইন যে যুগে তার 'অরিজিন অব স্পিসিস' লিখেন সে যুগে ধর্মীয় গুরুদের আধিপত্য ছিল প্রবল। তা সত্ত্বেও কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের বহির্ভূত নয়, একেবারে উল্টো তত্ত্ব দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন কত বড় সাহসী বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি।

যুবক বয়সে ডারউইন ছিলেন কিছুটা আলসে প্রকৃতির। স্কুলে তেমন ভালো ছিলেন না। তবে ডারউইন ছোটবেলা থেকেই ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। তার মা সুমানা তাকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে ফুলের রঙ পাল্টিয়ে দেয়া যায়। খুব অল্প বয়সে গাছের বিভিন্নতার বিষয়ে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

মহাজাগতিক ক্ষুধা

সরোয়ার হোসেন

জীবনে কবে, কখন, কোথায় সে পেট ভরে খেতে পেরেছিল, এটা তার মনে নেই। অন্ধকারাচ্ছন্ন এক কানাগলিতে সে হাঁটছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে ডাস্টবিনে কারো ফেলে যাওয়া খাবার পড়ে আছে কিনা। কারণ তার প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে। শরীরের প্রতিটি কোষ যেন তাকে এ কথাটা জানাচ্ছে। কিছু একটা তাকে এ মুহূর্তে খেতে হবে। আর এটা করতে না পারলে, কি যে হবে সেটা সে নিজেও জানে না। হয়তো মানুষ কিংবা অমানুষ যাকেই সামনে পাবে তাকেই খাদ্য হিসেবে মনে করবে।

যে লোকটার কথা এতক্ষণ বলা হলো তার নাম অলি। হয়তো আগে-পিছে আরো কিছু ছিল, কিন্তু সেসব তার আর মনে নেই। তার বয়স চল্লিশ। প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল হচ্ছে অলি। চল্লিশটা বছর তার টিকে থাকার কথা নয়। অথচ কোনো না কোনোভাবে সে টিকে আছে। পুরানো জিনিসপত্র সংগ্রহ করে সে বিক্রি করত একসময়। সে ব্যবসায় লাটে উঠেছে। এর আগে যে কাজ করত, সব জায়গাতেই সে বিফল হয়েছে।

তার জন্ম হয়েছিল এক বস্তিতে। বুদ্ধি হওয়ার আগেই তাকে ত্যাগ করে বাবা-মা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তারপর তার চোখের সামনে ভালো কিছু পড়েনি। পরবর্তীতে সে মানুষ হয়েছিল এক এতিমখানায়। সেই এতিমখানায়ও সে কোনোদিন পেট ভরে কিছু খেতে পারেনি। লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। তারপরও সে বর্তমানে টিকে আছে। এটা হয়তো একটা গবেষণার বিষয় হতে পারত। কিন্তু এরকম কত মানুষই তো অলির মতো জন্ম নেয় এবং মারাও যায়। যেহেতু আজও এ অলি মরেনি, তাই তার বর্তমানের অবস্থার দিকে মনোযোগ দেয়া যাক।

আগেই বলা হয়েছিল, তার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। এখন সে ডাস্টবিনে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে সে কিছুই পায়নি। ক্ষুধাটা পেট থেকে মাথায় চলে এসেছে। এমন সময় তার মনে হলো ডাস্টবিনের এক কোণায় একটা বাদাম জাতীয় কি যেন পড়ে আছে। সেটার কাছে চলে গেল এবং হাত দিয়ে জিনিসটা তুলল। বাদামটা বেশ বড়, অনেকটা নারকেলের মতো। এটা কোন জাতীয় বাদাম! সে চিনতে পারল না। তাতে তার কোনো দুঃখ নেই। এটা যে খাওয়া যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাদামটা বেশ শক্ত। দাঁত দিয়ে সেটা ভাঙা যাবে না। এবং সত্য কথা বলতে কি কোনো উপায়েই বাদামটা ভাঙা গেল না। অলির মনটা খারাপ হয়ে গেল। শেষমেষ শেষ ভরসা হিসেবে দাঁত ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল সে। তবে তার শরীরের মতো তার দাঁতের অবস্থাও বেশ শোচনীয়। বড় করে হা করে বাদাম দু সারি দাঁতের মাঝখানে বসাল। কামড় দিতে যাবে এমন সময় ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। পুরো বাদামটা পিছলে তার গলা দিয়ে

ক্ষুধাটা পেট থেকে মাথায় চলে এসেছে। এমন সময় তার মনে হলো ডাস্টবিনের এক কোণায় একটা বাদাম জাতীয় কি যেন পড়ে আছে। সেটার কাছে চলে গেল এবং হাত দিয়ে জিনিসটা তুলল। বাদামটা বেশ বড়, অনেকটা নারকেলের মতো। এটা কোন জাতীয় বাদাম! সে চিনতে পারল না। তাতে তার কোনো দুঃখ নেই। এটা যে খাওয়া যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পাকস্থলীতে চলে গেল! ব্যাপরটা কিভাবে ঘটল সেটা অলি বুঝতে পারল না। তবে সে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছে স্বাভাবিকভাবেই।

এরপর ঘটল আরেক আশ্চর্য কাণ্ড। পেটে কিছু একটা পড়েছে, এতে সাময়িকভাবে হলেও তার ক্ষুধাটা কমার কথা থাকলেও ঘটল উল্টোটা। তার ক্ষুধা আগের চেয়েও বেড়ে গেল।
কানাগলিতে কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটা উপলব্ধি করে সে সেখান থেকে বের হয়ে মূল রাস্তায় চলে এলো। তার সামনে একটা দামি রেস্তরাঁ। পকেটে ফুটো পয়সাও নেই তার। তারপরও সে সেখানে ঢুকল। 'আগে পেট ভরে খেয়ে নেই, তারপর ভাবা যাবে।' ভাবল সে। বড়জোড় কপালে মার জুটবে, এর বেশি কিছু তো হবে না।
তাই অলি রেস্তরাঁয় ঢুকল। যা যা খেতে ইচ্ছা করল, সবই অর্ডার দিয়ে বসল। আগেই বলেছিলাম তার ক্ষুধাটা মাথায় ছিল। তারপর আজব বাদামটা তার পেটে ঢোকার পর ক্ষুধাটা যে কোন পর্যায় আছে, সেটা অলি জানে না। তবে এটা জানে ক্ষুধার আক্রমণে তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এখন খাওয়া দরকার। পরেরটা পরে চিন্তা করা যাবে।

প্রথমে সে ফুল প্লেট বিরানি খেল। তারপর আরেক প্লেট। সাথে বোরহানী আর সালাদ তো আছেই। এসব খাওয়ার পর তার মনে হলো পেটটা খালিই রয়ে গেল। পোলাও আর মুরগির রোস্ট খেয়েও অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না। তারপর মোগলাই পরোটা খেল দুটো। শক্ত খাবার আর খেল না। তরল খাবারের দিকে এবার মনোযোগ দিল। মুরগির সুপ খেল! কোক খেল! চা খেল। খেতে তার ভালোই লাগছে। তবে কাজ হচ্ছে না। হতচ্ছাড়া পেটটা কিছুতেই ভরছে না। সে একজন সামান্য মানুষ, আর বসে বসে এতক্ষণ অমানুষের মতো খেল।

অলির দিকে অনেকক্ষণ ধরেই তাকিয়ে ছিলেন হোটেলের ম্যানেজার। রুমাল দিয়ে মাথার ঘাম মুছলেন বেশ কয়েকবার। ব্যাপারটা কি? তার সামনে কি কোনো মানুষরূপী রাক্ষস বসে আছে? তার কৌতূহলের সীমা ছাড়িয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিলেন, এর শেষ দেখবেন তিনি। ব্যাটা কত খেতে পারে, সেটা তিনি দেখেই ছাড়বেন।

ম্যানেজার অলির সামনে এলেন। অলি তখন খাওয়ায় ব্যস্ত। তার সামনে কে এল বা গেল সেটা দেখার সময় এখন তার নেই।
ম্যানেজার প্রথমে কাশলেন। তারপর বললেন, 'আমাদের খাবার কেমন লাগছে?'

একমুখ খাবার নিয়ে অলি তাকাল ম্যানেজারের দিকে। তারপর ভাবল তার শূন্য পকেটটার কথা। কোনোমতে খাবারটা ভিতরে পাঠিয়ে দিল সে। তারপর বলল, 'খাবার সম্পর্কে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তবে, জিনিসটা হলো, আমার পেট ভরছে না। যতই খাচ্ছি ততই মনে হচ্ছে কিছুই যেন খাচ্ছি না।'
'বলেন কি? ' ম্যানেজার যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'এত খাওয়ার পরও আপনার পেট ভরেনি? আশ্চর্যের কথা! সেই সাথে হোটেলের মান-ইজ্জতের প্রশ্ন। ঠিক আছে আপনি যত পারেন, খেতে থাকেন। আপনি খালি পেটে বের হতে পারবেন না।'
'কিন্তু,' অলি লজ্জায় আসল কথাটা বলতে পারল না।

'বিলের কথা ভাবছেন তো? ওটা নিয়ে আপনার কোনো চিন্তা নেই। মনে করুন আপনি আমাদের মেহমান। তাই যত পারেন, খান। দেখি আপনার পেট ভরে কি না!'

'সত্যি বলছেন তো?' অলি যেন স্বপ্ন দেখছে।
'হ্যাঁ, সত্যি বলছি। মন ভরে খান। যাওয়ার সময় শুধু বলে যাবেন যে আপনার পেট ভরেছে। তাতেই আমরা খুশি হব।'
অলি খুব খুশি হলো। 'তাহলে সবকিছু ডাবল করে দিতে বলুন।'

ম্যানেজার তাই করলেন। সবকিছু ডাবল করে আসতে লাগল। অলিও তার খাওয়ার গতি দ্বিগুণ করে দিল।
কিন্তু অলির পেট ভরল না। এটা শুনে ম্যানেজার সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

পেটে কিছু একটা পড়েছে, এতে সাময়িকভাবে হলেও তার ক্ষুধাটা কমার কথা থাকলেও ঘটল উল্টোটা। তার ক্ষুধা আগের চেয়েও বেড়ে গেল।

তার সন্দেহ হতে লাগল অলি আসলে কোনো মানুষ নয়। হয় জ্বিন, না হয় ফেরেশতা। এমন কিছু একটা জানাজানি হয়ে গেলে তার চাকরি চলে যাবে। সবচেয়ে বড়কথা হোটেলের বদনাম হয়ে যাবে।

তাহলে এখন তিনি কি করতে পারেন?
ইতোমধ্যে লোকজন আসতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর তিনি একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকলেন। তাকে পাঠিয়ে দিলেন হাসপাতালে।
হাসপাতালের বিল যা হয়, সেটাও তিনি দিতে রাজি হলেন। আসলে অলির কাছ থেকে তিনি মুক্তি চান।
পরের দিন অলির ব্যাপারটা খবরের কাগজে ছবিসহ ছাপা হলো।

জোল্টো খবরের কাগজটা হাত থেকে নামাল। 'মনে হচ্ছে আমাদের লোককে পেয়ে গেছি,' বলল জোল্টো।
'আমি আগে থেকেই জানতাম জিনিসটা ডাস্টবিনে আর পড়ে নেই,' বলল জোল্টোর সাথি পুজিম। পুজিম আসলে জোল্টোর স্ত্রী। তারা এই পৃথিবীর মানুষ নয়। তাদের দেখতে পুরোপুরি না হলেও অনেকটা মানুষের মতো। খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে, ওরা আসলে পৃথিবীর মানুষ নয়।
'জিনিসটা কিভাবে উদ্ধার করা যায়?' বলল জোল্টো। 'এমনভাবে যাতে কারো কোনো সন্দেহ না হয়?' সত্যি কথা বলতে কি, আমার মাথায় কোনো বুদ্ধি আসছে না', বলল পুজিন। তার চোখের রঙ এখন হলুদ। কিছুক্ষণ আগে সেটা ছিল সাদা।
'কিছু একটা বুদ্ধি তো বের করতেই হবে। ডাক্তারের কাছে সে এখন। তার এক্স-রে হবে। অপারেশনও হতে পারে। ফলে সব ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। এত বড় ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'
'তোমার কথাই ঠিক', একমত প্রকাশ করল পুজিন কিন্তু কোনো সাজেশন দিতে পারল না।
'এ পৃথিবীর মানুষরা বাদাম মাঝে মাঝে দাঁত দিয়ে ভেঙে খায়। লোকটা এটা করতে গিয়ে ট্রান্সপোর্টার এর আসল সুইচে কামড় দিয়েছিল। তাই সেটা পাকস্থলীতে গিয়ে জমা হয়েছে। আর যা খাচ্ছে, সেটা চলে যাচ্ছে আমাদের গ্রহে। তাই যে করেই হোক, ট্রান্সপোর্টারটা আমাদের ফেরত আনতে হবে।' জোল্টো সাপের মতো লম্বা জিব্‌হা দিয়ে ঠোঁট চাটলো।
এরপর দুজনের কেউ কথা বলল না। ট্রান্সপোর্টারটা উদ্ধার করতে হবে, এ চিন্তায় দুজনই প্রায় কাহিল হয়ে পড়েছে।

হাসপাতালের বারান্দা দিয়ে হাঁটছে ওরা দুজন। দুজনের পরণেই ডাক্তারের পোশাক। একজন মহিলা আরেকজন পুরুষ। কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যাবে না যে ওরা মানুষ নয়।
'আমার ধারণা ঠিক', বলল জোল্টো। 'ওরা ওকে অপারেশন করার তালে আছে। মনে হচ্ছে বাদামের খোঁজ পেয়েছে ওরা।'
'জোর করে ওদের আমরা থামাতে পারি,' বলল পুজিন। 'কিন্তু মারামারি আমি পছন্দ করি না।'
'সেটা আমি জানি,' বলল জোল্টো। 'যা ঘটে গেছে সেটা পরিষ্কার। সে যেসব জিনিস খেয়েছে, সেসব সে পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের গ্রহে। তার পাঠানো খাবারগুলো পরীক্ষা করে আমাদের বিজ্ঞানীরা যা জানার জেনে গেছে। কিন্তু আমাদের কাছে পাঠানো খাবারগুলো আমাদের কাছে আসেনি। সে হজম করেছে। কিন্তু তাতে তার ক্ষুধা মেটার কথা নয়। তাছাড়া আমরা কোনো বার্তা পাঠাতে পারিনি। খাবার যা আছে তা দিয়ে আমাদের বেশিদিন চলবে না। তাছাড়া এভাবে চলতে থাকলে লোকটাও বাঁচবে না। লোকটার জন্যও আমার খারাপ লাগছে।'
'লোকটার সম্পর্কে না ভাবলেও চলবে,' বলল

পুজিন। 'আমাদের অবস্থাও ভালো নয়, সেটাও ভাবা দরকার।'
'হ্যাঁ, মোটকথা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টারটা উদ্ধার করাটাই এখন আমাদের প্রধান কাজ।' হাঁটতে হাঁটতে বলল জোল্টো।

কয়েকজন নার্স তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কোনোকিছু সন্দেহ করল না।
'তোমার কাছে স্প্রেটা আছে যেটা দিয়ে মানুষ সাময়িকভাবে ঘুম পাড়ানো যায়?' প্রশ্ন করল জোল্টো।
'হ্যাঁ, আছে। এ গ্রহের মানুষদের আমার একদম পছন্দ নয়। তাই সেটা সব সময় হাতের কাছেই রাখি। এখনো সেটা আছে। তবে এটা জিজ্ঞেস করার মানে কি?'
'দেখলে না, নার্সগুলো চলে গেল। ভিতরে হয়তো একজন ডাক্তার আছে। তাকে অজ্ঞান করতে পারলেই তো লোকটাকে নিয়ে আমরা পালাতে পারব।'
'তোমার কথাই ঠিক।' বলে স্প্রেটা বের করল পুজিন।
তারা দু'জন প্রবেশ করল অপারেশন থিয়েটারে। সেখানে টেবিলে শুয়ে গোঙাচ্ছে লোকটা। তার পাশে একজন ডাক্তার। পুজিন আর দেরি করল না। স্প্রেটা টিপে দিল। একরাশ হলুদ কুয়াশা ডাক্তারের নাকে-মুখে আঁছড়ে পড়ল। সেকেন্ডের মধ্যেই ডাক্তার জ্ঞান হারিয়ে ফ্লোরে পড়ে গেল।

অলি মুখ হা করে এসব দেখছিল আর কাতরাচ্ছিল। পুজিন অলির হা করা মুখেই একটা ট্যাবলেট ছেড়ে দিল। তারপর বলল, 'ব্যথা কমে যাবে। তোমার আর কোনো কষ্ট হবে না। ক্ষুধাও লাগবে না।'
'তাই নাকি? আর ক্ষুধা লাগবে না?' অলির যেন কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে সাথে সাথে তার ক্ষুধা কমে গেল। ব্যথা চলে গেল। তার সারা শরীরে একটা অসম্ভব ভালো লাগার অনুভূতি।
'তোমরা কারা?' কিছুক্ষণ পর প্রশ্নটা করল অলি।
'বর্তমানে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। তবে এ মুহূর্তে আমরা তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তোমাকে আমরা এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি,' বলল জোল্টো। 'উঠে বসো। সময় খুব কম। ওরা যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে। তাহলে তোমারও বিপদ। আমাদেরও বিপদ।'
অলি শোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর তারা মিশে গেল হাসপাতালের অসংখ্য মানুষের মাঝে।
সম্পূর্ণ আরেক জায়গায় ঘুমিয়ে আছে অলি। জায়গাটা খুব গোপন। চারদিক চুপচাপ। কথা বলছে শুধু দু'জন। জোল্টো আর পুজিন।
'আমি সব ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দিয়েছি। তারা আমাদের জন্য খাবার পাঠানোর অন্য ব্যবস্থা করছে,' বলল জোল্টো। 'এখন আমরা নিজেরাই অপারেশন করে জিনিসটা বের করতে পারি।'
'তবে আমার কিছু কথা ছিল।' বলল পুজিন।
'বলে ফেল।'
'ট্রান্সপোর্টারটা ওর পেট থেকে বের করে আনলে আবার সমস্যা দেখা দিতে পারে। জিনিসটা ছোট। ওটা আমাদের সাথে রাখার নিয়মও নেই। ওটার কাজ হলো নিজে থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস পছন্দ করে আমাদের গ্রহে পাঠিয়ে দেয়। তাই ওটা আবার আমরা হারিয়ে ফেলতে পারি। তার চেয়ে লোকটার পেটেই জিনিসটা থাকুক। সেটাই ভালো। লোকটা আমাদের চোখে চোখে থাকবে। আর যেভাবে মেশিনটা ওর পেটে আটকে আছে, সেটা অনির্দিষ্টকালের জন্যও থাকতে পারে।

'তারপর একটা ট্রান্সপোর্টার ওর পাকস্থলীতে তাক করে রাখলাম। আমাদের জন্য যা পাঠানো হবে, সেটা তো আসবে সংকুচিত অবস্থায়। সেটা বের করে আসল অবস্থায় নিয়ে গিয়ে পাঠিয়ে দিলাম আমাদের আরেক কলোনিতে যেখানে এর প্রয়োজন হবে।'
'যদি তার পাকস্থলী নড়চড়া করে?' প্রশ্ন করল জোল্টো।
'সেটারও একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আর লোকটা যাতে পরিশ্রম না করে, তার জন্য আমরা হালকা কাজ দিব, যেমন পড়াশুনা করা ইত্যাদি। তাকে এমন সব খাবার দেয়া হবে, যা সে জীবনে কল্পনাও করতে পারেনি। সাথে সে টেবলেটটা দিব যাতে লোকটা সেসব খাবার উপভোগ করতে পারে। খাওয়ার পর যেন তার আর ক্ষুধা না লাগে। ক্ষুধা লাগলে আবার তাকে খাবার দেয়া হবে। লোকটা ছোটবেলা থেকে ঠিকমতো খেতে পায় না। তাই এ প্রস্তাবে নিশ্চয় রাজি হবে। তুমি কি বলো?'
'তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না।' খুশি হলো জোল্টো। 'দেখা যাক এতে কাজ হয় কিনা?'

এরপর থেকে অলির শুরু হলো নতুন জীবন। অতীতের কষ্টের স্মৃতি তার মুছে গেল। জীবনে সে খুঁজে পেল আনন্দ। এরকম ভালো লাগার অনুভূতি এর আগে তার কখনো হয়নি।

তাকে কাজ করার জন্য ঘর থেকে বের হতে হয় না। খাবারের চিন্তা করতে হয় না। তার পছন্দের খাবার সে এখন বিনা কষ্টে খেতে পারছে। কোথা থেকে খাবারগুলো আসছে, এটাও জানে অলি। তার দু'জন বন্ধু যারা তাকে হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করেছিল, তারাই তাকে খাবার এনে দেয়। সবচেয়ে বড় কথা সে খাবারগুলো খুব আনন্দ নিয়ে খায়। রাক্ষুসে ক্ষুধা তার আর নেই। সে এখন একজন সাধারণ মানুষ হয়েও অসাধারণ। কারণ তাকে তেমন কাজ করতে হয় না। অথচ খাবার খাচ্ছে রাজার হালে। এটা কয়জনের কপালে জোটে?

সময় পার হলো। তার ওজন বাড়ল। মাংসপেশী তৈরি হলো। পুরানো দাঁতগুলো পড়ে গিয়ে আবার নতুন করে গজাল। নিজের এ উন্নতি দেখে সে নিজেই অবাক হলো। তবে এ নিয়ে ভাবল না।

অনেক বছর পার হলো। সে পৃথিবীর সেরা সেরা সব বই পড়ে শেষ করে ফেলেছে। বই পড়তে যখন তার আর ভালো লাগল না, তখন থেকে সে লিখতে লাগল। একসময় সে লেখক হিসেবেও নাম করল। এখন মাঝে মাঝে সে বাইরে যায়। ঘুরতে; ইন্টারভিউ দিতে; মাছ ধরতে; কিংবা নতুন বই বের হলে অটোগ্রাফ দিতে। এসব কিছুই তার খুব ভালো লাগে। সে যখন বাইরে যায়, তখন জোল্টো আর পুজিন কড়া নজর রাখে অলির ওপর। অলি এটা বুঝতে পারে না।

তারপর কাটল আরো অনেক বছর। ঠিক একশ বছর পরে মারা গেল অলি।
অজানা দুই গ্রহের মাঝেখানে সে ছিল একটা ট্রান্সপোর্টার হিসেবে—এ সত্য সে জেনে যেতে পারেনি।

অজানা দুই গ্রহের মাঝেখানে সে ছিল একটা ট্রান্সপোর্টার। এ সত্য সে জেনে যেতে পারেনি। তবে জোল্টো আর পুজিন তাকে একদিনের জন্যও ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করতে দেয়নি।

তবে জোল্টো আর পুজিন তাকে একদিনের জন্যও ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করতে দেয়নি। আর একজন মানুষ যা চায় তার প্রায় সবকিছুই অলিকে ওরা দিয়েছিল। একজন অমর লেখক হিসেবে অলি এখন অমর। এটা তো ওদেরই দান।

তাই জোল্টো আর পুজিন যে অন্যায় করেছে অলিকে নিয়ে, তার জন্য তাদের আমরা কোনো দোষ দিতে পারি না। পারি কি?

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৪ • সংখ্যা ৪৪ • আগস্ট ২০০৫

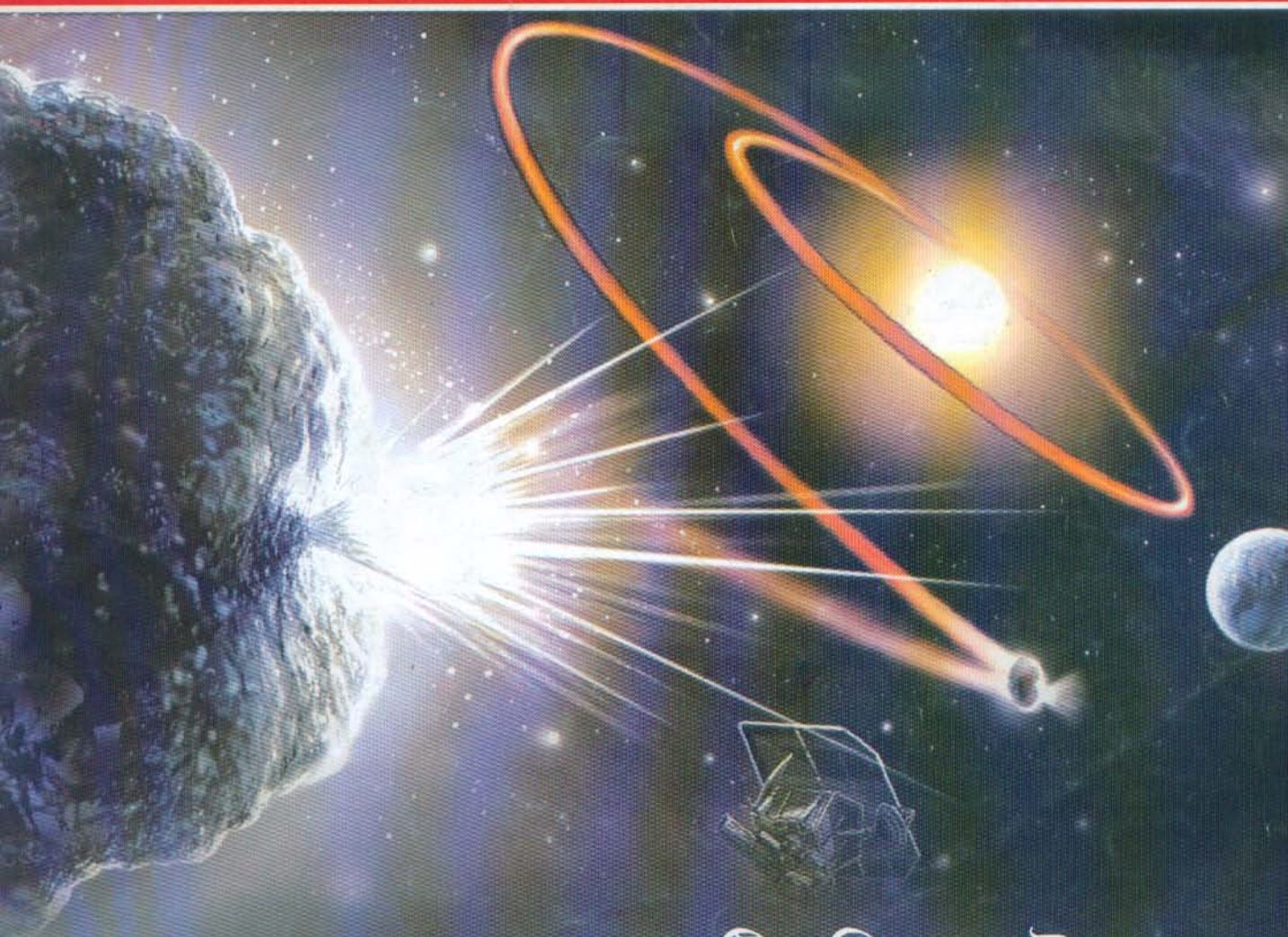

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেবে

ডিপ ইমপ্যাক্ট

মহাকাশের আশ্চর্য ধূমকেতু | পরমস্থান বলে কিছু নেই | এন্টার্কটিকা: বিচিত্র এক মহাদেশ
কম্পিউটার মেরিডিয়ান ডায়াগনস্টিক | ডাইনোসরের পাখি হয়ে উঠার গল্প
প্রজাপতির খামার | পানির নিচে পাওয়ার স্টেশন

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৪
সংখ্যা ৪৪
আগস্ট ২০০৫

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-কম্পিউটার-স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ম্যাগাজিন

এ সংখ্যার সূচি

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেবে
ডিপ ইমপ্যাক্ট
—আসিফ আনোয়ার ৮

বিচিত্র এক মহাদেশ
১১ এন্টার্কটিকা
—হাসিব রেজা রনি

ডাইনোসরের পাখি হয়ে ওঠার গল্প
১৪ —ফরিদুর রহমান পান্থ

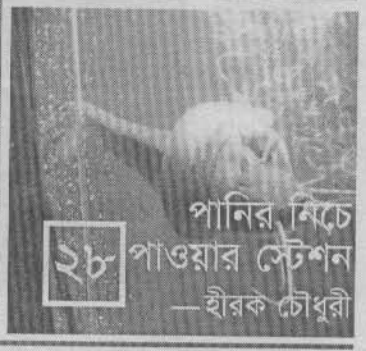

পানির নিচে
২৮ পাওয়ার স্টেশন
—হীরক চৌধুরী

অন্যান্য রচনা

টেলিপোর্টেশন সত্যিই কি সম্ভব
–শান্তা মারিয়া /৬
কম্পিউটার মেরিডিয়ান ডায়াগনস্টিক
–হাসিব রেজা /১৭
পরম স্থান বলে কিছু নেই
–আসিফ /২০
কম্পিউটার শিশুদের জন্য কতটা জরুরি
–শেখ আনোয়ার /২২
প্রজাপতির খামার
–রেজাউল করিম/২৭
শেষ হচ্ছে সিলিকন চিপের যুগ
–মনীষা /৩০
মহাকাশের আশ্চর্য ধূমকেতু
–মোহাম্মদ সায়েম আলী /৩২
প্রযুক্তির নবদিগন্ত ওয়াইম্যাক্স
–নুসরাত রহমান /৩৪
কিয়োটো প্রটোকল : কাগজে উপেক্ষিত বাস্তবতা
–গৌতম রায় /৩৭
বৈদ্যুতিক সমস্যামুক্ত রাখুন আপনার পিসি
–মোঃ গোলাম মোস্তফা /৪০

নিয়মিত বিভাগ

৩ চিঠিপত্র
৪ বিজ্ঞান বিশ্বের নতুন খবর
২৪ বিজ্ঞান প্রজন্ম
পাঠক বিচিত্রা ৪২
মজারু ১৬
বিজ্ঞান কুইজ ৪৭
বিতর্ক ৩৬
মজার হবি ইলেক্ট্রনিক্স ৪৬
সায়েন্স ফিকশন : জ্যোৎস্না ৪৪

সম্পাদক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক
আতাউর রহমান কাবুল

সহযোগী সম্পাদক
এস এম মুকুল

সহকারী সম্পাদক
সরোয়ার হোসেন
গৌতম রায়

অতিথি লেখক
মাসুদ কামাল
ড. অরূপ রতন চৌধুরী
ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল

নিয়মিত লেখক
আসিফ, রেহানা পারভীন রুমা
পারভীন সুলতানা, শান্তা মারিয়া
ফারহানা মিলি, হিটলার এ হালিম
মাহবুব আনোয়ার শুভ, শফি ইসলাম
মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাদাত শাহরিয়ার
এ কে এম মুনির হোসেন
আনোয়ারুল হক খান

সার্কুলেশন
আমিনুল ইসলাম সোহাগ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫০৯৫
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৭১৭৫০৯৫

বিপণন
৩৭/১, বাংলাবাজার
দ্বিতীয় তলা, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫০৫৪, ০১৭১-১২০৭০১

মূল্য : পনের টাকা

প্রফেসর'স প্রকাশন, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত।

ই-মেইল : editor_sworld@yahoo.com

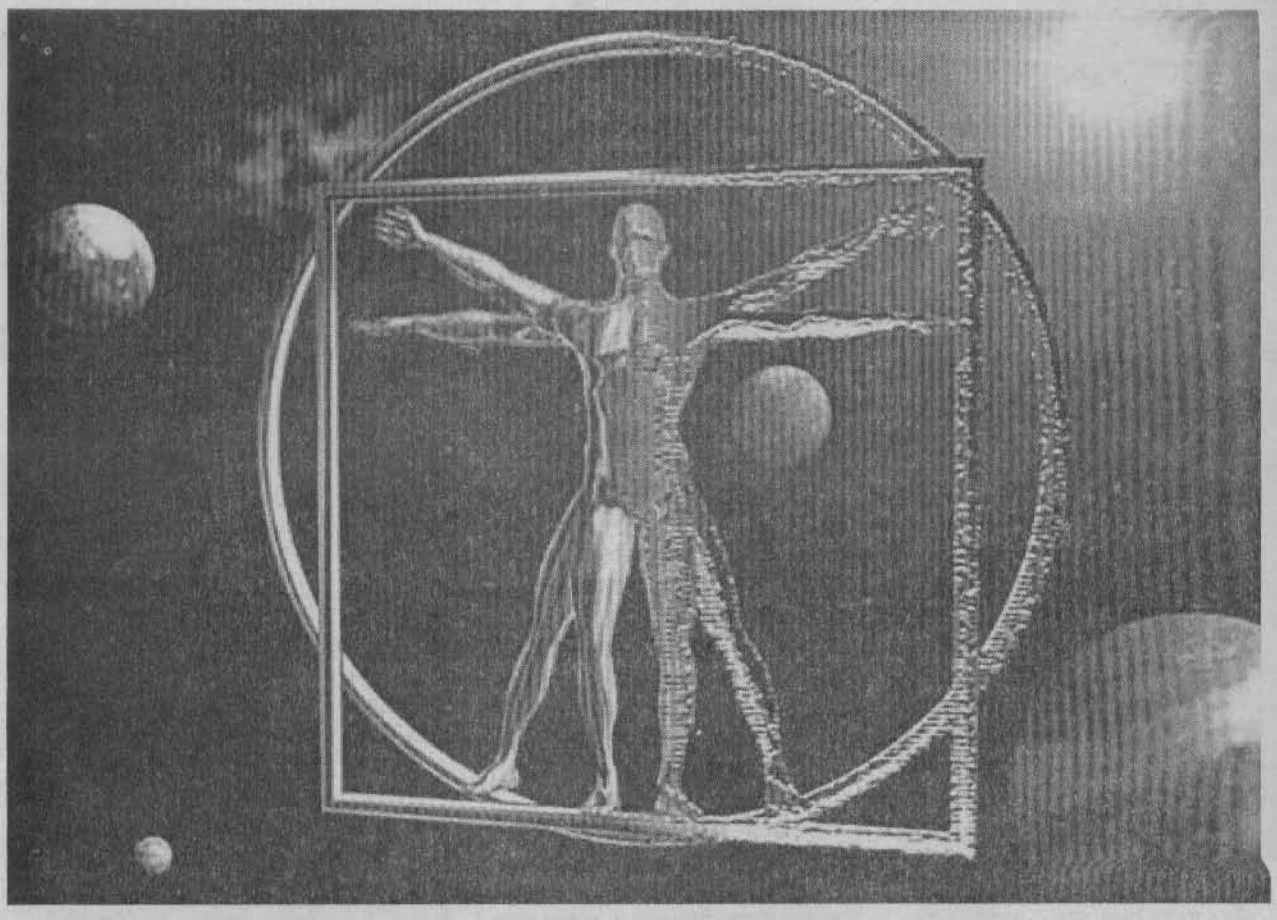

টেলিপোর্টেশন সত্যিই কি সম্ভব

শান্তা মারিয়া

দেহকে পদার্থ থেকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে আলোর গতিতে এক স্থান হতে অন্য স্থানে পৌঁছে যাওয়া এবং তারপর আবার দেহের আগের রূপ ফিরে পাওয়াই টেলিপোর্টেশন।

বিংশ শতাব্দীতে মানুষ বেশকিছু স্বপ্ন দেখেছিল। যেমন— টাইম ট্রাভেল বা সময় পরিভ্রমণ, গ্রহান্তরে বসতি স্থাপন, হিট অ্যামপ্লিফিকেশন ইত্যাদি। এসব স্বপ্নেরই অন্যতম হলো টেলিপোর্টেশন। বিশ শতকের স্বপ্নের বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে একুশ শতক।

টেলিপোর্টেশন অর্থ এক জায়গা থেকে মুহূর্তে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া অর্থাৎ দেহকে পদার্থ থেকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে আলোর গতিতে অন্য স্থানে পৌঁছে যাওয়া এবং তারপর আবার দেহের আগের রূপ ফিরে পাওয়া। বহুযুগ ধরেই বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন হয়ে আছে টেলিপোর্টেশন।

এইচ জি ওয়েলস এর বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন দ্য ফ্লাই এর কথা মনে পড়বে অনেক পাঠকেরই। সে কাহিনীতে টেলিপোর্টেশন প্রক্রিয়া চলার সময়ই একটি মাছির সাথে দেহের অংশ বিশেষ পাল্টে যায় নায়কের। হ্যাঁ, এইচ জি ওয়েলস গল্পস্থলে টেলিপোর্টেশনের অসুবিধার দিকটিই তুলে ধরেছিলেন এবং হয়তোবা এর প্রায়োগিক অবাস্তবতার বিষয়টিও বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানীদের। জনপ্রিয় টিভি সিরিজ স্টার ট্রেকের কথা হয়তো মনে আছে অনেক টিভি দর্শকের। সেখানে টেলিপোর্টেশনের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজে পৌঁছে যাওয়ার দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

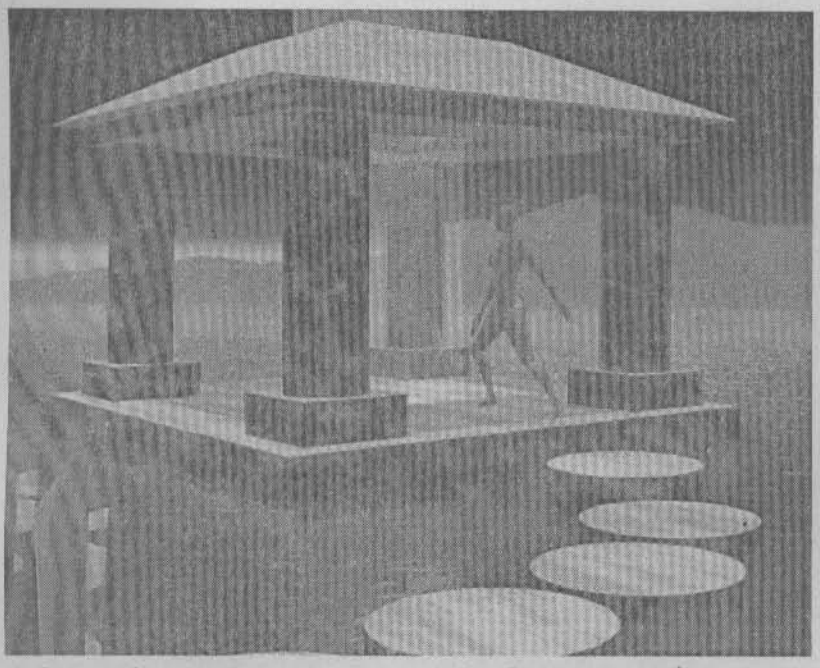

টেলিপোর্টেশনের সাহায্যে আপনার একটি ইমেজ পাঠিয়ে দিন নিউইয়র্কে। সে আপনার হয়ে যাবতীয় সেমিনারে অংশ নেবে, কথা বলবে, সিদ্ধান্ত নেবে। অন্য একটি ইমেজ পাঠান ব্যাঙ্ককে। ব্যাঙ্ককে আপনার যাবতীয় ব্যবসায়িক কাজ সামাল দেবে যান্ত্রিক রেপ্লিকা। এদিকে ঢাকায় আপনি নিশ্চিন্ত মনে জরুরি কাজ সারলেন।

কিন্তু টেলিপোর্টেশন কি বাস্তবে সম্ভব? দুঃসাহসী কয়েকজন বিজ্ঞানী বলছেন যে, টেলিপোর্টেশন সম্ভব। তবে পুরোপুরি নয়, আংশিকভাবে। অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবেন আপনি নন, আপনার অবিকল যান্ত্রিক প্রতিরূপ। সেথ গোল্ড স্টেইন এবং টড মাওরি হলেন দুই কম্পিউটার বিজ্ঞানী। তারা চেষ্টা করছেন মানুষের ভিডিও ইমেজ থেকে বুদ্ধিমান রেপ্লিকা বা যান্ত্রিক প্রতিরূপ তৈরি করার। তাত্ত্বিক ভিত্তি মোটামুটি এরকম— আপনাকে দাঁড়াতে হবে একটি যন্ত্রের সামনে। যন্ত্রটি সাথে সাথে আপনাকে স্ক্যান করবে। অর্থাৎ আপনার উচ্চতা, ওজন, শারীরিক গঠন, চেহারা ইত্যাদি তো পর্যবেক্ষণ করবেই, সেই সাথে আপনার মস্তিষ্কে রক্ষিত স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যও স্ক্যান করে নেবে। এবার ইন্টারনেটের মাধ্যমে এসব সংগৃহীত তথ্য এবং ভিডিও ইমেজ পাঠানো হবে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে। সেখানেও রয়েছে অন্য ধরনের একটি যন্ত্র। এ যন্ত্র আপনার ভিডিও ইমেজ এবং যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক তথ্য ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করবে আপনার যান্ত্রিক প্রতিরূপ। এটি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হবে একটি নতুন ধরনের পদার্থ।

স্বয়ং ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিজেকে চালিত করতে সক্ষম ন্যানো কম্পিউটারগুলো গুচ্ছবদ্ধ হতে পারে এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এরাই গঠন করবে যান্ত্রিক প্রতিরূপ। এ ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ক্লেট্রোনিকস। এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলোর নাম দেয়া হয়েছে ক্লেট্রোনিক অ্যাটম বা ক্যাটমস।

এসব ক্যাটমস একত্রিত হয়ে নিমেষে মানুষ বা যে কোনো বস্তুর আকৃতি ধারণ করতে পারবে। ধরুন এ মুহূর্তে আপনাকে নিউইয়র্কে যেতে হবে কোনো জরুরি ব্যবসায়িক কাজে। অন্যদিকে ব্যাঙ্ককেও আপনার উপস্থিতি দারুণ জরুরি। অথচ বিশেষ কোনো কারণে আপনি ঢাকা ছেড়ে যেতে পারছেন না। নো চিন্তা, উপায় আছে আপনার হাতেই।

টেলিপোর্টেশনের সাহায্যে আপনার একটি ইমেজ পাঠিয়ে দিন নিউইয়র্কে। সে আপনার হয়ে যাবতীয় সেমিনারে অংশ নেবে, কথা বলবে, সিদ্ধান্ত নেবে। অন্য একটি ইমেজ পাঠান ব্যাঙ্ককে। ব্যাঙ্ককে আপনার যাবতীয় ব্যবসায়িক কাজ সামাল দেবে যান্ত্রিক রেপ্লিকা। এদিকে ঢাকায় আপনি নিশ্চিন্ত মনে জরুরি কাজ সারলেন।

বিজ্ঞানীরা তত্ত্বটি দিয়েছেন ভালোই। কিন্তু বাস্তবে তারা ততদূর যেতে পারেননি। তবে ক্লেট্রোনিকস এর হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন তারা। আর ইতোমধ্যেই সে কাজে কিছুটা এগিয়েও গেছেন তারা। এ কাজে অর্থ যোগাচ্ছে কম্পিউটার চিপ তৈরির ক্ষেত্রে পৃথিবীর বৃহত্তম কোম্পানি ইনটেল। মাত্র তিন বছর আগে ক্লেট্রোনিকস সংক্রান্ত চিন্তার সূত্রপাত ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় কম্পিউটার বিষয়ক একটি কনফারেন্সে সেথ গোল্ড স্টেইনের সাথে টড মাওরির প্রথম পরিচয় হয়। পিটার্সবার্গের মেলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী গোল্ড স্টেইন ন্যানো কম্পিউটিংয়ের নতুনত্বের দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। গোল্ড স্টেইন এবং মাওরির নতুন প্রজেক্ট সম্পর্কে ইনটেল এর রোবোটিকস বিশেষজ্ঞ জেসন ক্যাম্পবেলের প্রাথমিক ধারণা ছিল, এটি সায়েন্স ফিকশন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর তার মনে হয়েছে আগামী বিশ বছরের মধ্যে একে বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব।

এ প্রজেক্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ফ্লেক্সিবল রোবট তৈরির কাজ ইতোমধ্যেই অনেক এগিয়ে গেছে। সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিমরফিক রোবটিকস ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী উই মিন শেন এবং তার সহকর্মীবৃন্দ উদ্ভাবন করেছেন ফ্লেক্সিবল রোবট তৈরির উপাদান।

এ উপাদানকে ইচ্ছামতো আকৃতি দেয়া সম্ভব। এ উপাদানে তৈরি রোবট প্রয়োজন অনুসারে ছোট পাইপের মধ্য দিয়ে সাপের মতো যেতে পারবে। কিংবা দেয়ালের মতো চৌকোনা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারবে। 'টার্মিনেটর টু' ছবির খল নায়ক রোবটের মতো যে কোনো সময় যে কোনো আকৃতি ধারণ করতে পারবে এ রোবট। প্রয়োজনে সে একটি বল কিংবা একটি সুই হয়ে যেতে পারবে। এ ফ্লেক্সিবল রোবট তৈরির জন্য নাসা ২৮ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। টেলিপোর্টেশনের ফলে যে যান্ত্রিক প্রতিরূপ তৈরি হবে তাই এমনও ফ্লেক্সিবল রোবট হবে।

তা না হয় হলো, কিন্তু টেলিপোর্টেশনের জন্য যে ক্যাটমসের কথা বলা হচ্ছে এরও রয়েছে নানা সমস্যা। ক্যাটমসরা এনার্জি পাবে কোথা থেকে? এটি হচ্ছে এমন একটি সমস্যা যা বিজ্ঞানীদের সমাধান করতে হবে। একটি সম্ভাব্য উত্তর হলো এমন একটি ইলেক্ট্রিক্যাল গ্রিডের ব্যবস্থা করতে হবে, যা কেটমসদের শক্তি যোগাবে। গোল্ড স্টেইন আগামী বছরেই দ্বিমাত্রিক ক্যাটমস তৈরিতে সফল হলে তিনি ত্রিমাত্রিক ক্যাটমস তৈরি করবেন।

সমস্যা আরও আছে। ক্যাটমস দ্বারা তৈরি প্রতিরূপ যে মূল ব্যক্তির অনুরূপ আচরণই করবে এমন নিশ্চয়তা কি দেয়া সম্ভব? মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন হল্যান্ড এ প্রশ্নটি নিয়ে ভাবছেন। তিনি কম্পিউটার সিস্টেমের আচরণ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তার ক্যাটমসের আচরণ যে মানুষের অনুরূপ হবে এমন ভাবাই বাতুলতা; তা সে যতই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কপি করুক না কেন। যা হোক ক্লেট্রোনিকসের গবেষণা যদি সফল হয় তাহলে জীবনযাত্রার চেহারায় আমূল পরিবর্তন আসবে তা বলাই বাহুল্য।

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেবে

ডিপ ইমপ্যাক্ট

আসিফ আনোয়ার

খবরটা পড়ে অনেকেই বেশ মজা পেয়েছেন। রাশিয়ার এক জ্যোতিষি নাসার বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। তিনি বলেছেন, মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার মহাকাশযান ডিপ ইমপ্যাক্ট থেকে ছোঁড়া নভোখেয়াটি টেম্পল ওয়ান ধূমকেতুতে আঘাত হানার পর তাদের জ্যোতিষিচর্চায় সমস্যা হচ্ছে। মামলা করার পাশাপাশি তিনি পৃথিবীবাসীকে সতর্কও করে দিয়েছেন।

ধূমকেতুতে আঘাত হানায় সেটির কক্ষপথ বিচ্যুত হয়েছে কিছুটা এবং একদিন তা পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়তে পারে। সব মিলিয়ে তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এটাই– পৃথিবীবাসী নিজের ধ্বংসের জন্য নিজেরাই উঠেপড়ে লেগেছে এবং এ কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে নাসা।

সবাই অবশ্য এ জ্যোতিষির মতো নিরাশাবাদী নন। বিজ্ঞানীরা যারা নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে এ অভিযানের রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন এবং ধাপে ধাপে কাজটি সম্পন্ন করেছেন, তারা তো বটেই, সৌরজগৎ গঠনের সময় পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ কি অবস্থায় ছিল তা জানতে যারা আগ্রহী, তারাও গভীর বিস্ময় ও আগ্রহ

ধূমকেতুতে আঘাত হানার পর যে ধূলিকণা ও অন্যান্য পদার্থ ছিটকে বেরিয়ে আসবে, সেগুলোর বয়স হবে সাড়ে চারশ কোটি বছরেরও বেশি। অর্থাৎ সৌরজগৎ গঠনের সমবয়সী।

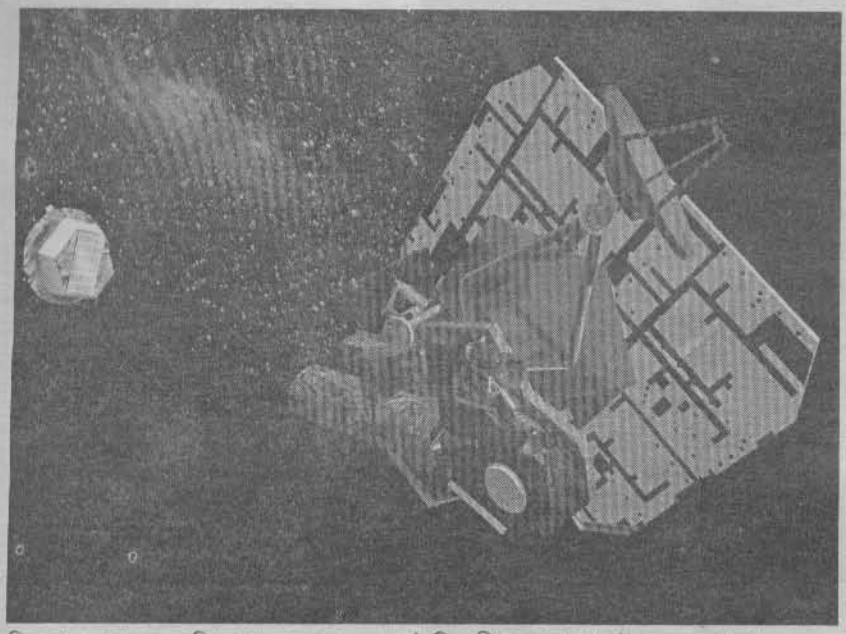

পৃথিবী থেকে আট কোটি ৩০ লাখ মাইল দূরের এ ধূমকেতুতে আঘাত হানার পর সেখানে প্রচণ্ড আলোর দ্যুতির সৃষ্টি হয়। ৩৭০ কিলোগ্রাম ওজনের ছোটখাটো ফ্রিজের আকারের নভোখেয়াটি টেম্পল ওয়ানে আঘাত হানার মুহূর্তেই সৃষ্টি হয় বিশাল এক স্টেডিয়াম আকারের গর্তের।

নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন কিংবা শুনেছেন এ অভিযানের বৃত্তান্ত। বিজ্ঞানীরা আগেই বলেছিলেন, এ অভিযানের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, সৌরজগৎ গঠনের ঠিক আগে পরিবেশের অবস্থা কি ছিল, সেটি জানতেই তারা এ অভিযান পরিচালনা করছেন। এ ধূমকেতুটি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা, সৌরজগৎগঠিত হওয়ার পর থেকে এর উপাদানগুলো পাল্টায়নি। তাই ধূমকেতুতে আঘাত হানার পর যে ধূলিকণা ও অন্যান্য পদার্থ ছিটকে বেরিয়ে আসবে, সেগুলোর বয়স হবে সাড়ে চারশ কোটি বছরেরও বেশি। অর্থাৎ সৌরজগৎ গঠনের সমবয়সী। ফলে এটি সম্পর্কে জানা গেলে সৌরজগতের আদি অবস্থা সম্পর্কেও জানা যাবে। আর সেটি জানতে পারলেই অনেক রহস্যের কিংবা অজানা প্রশ্নের উত্তর মিলবে তাদের।

এছাড়া অন্য একটি উদ্দেশ্যও ছিল তাদের। অনেকে মনে করেন, পৃথিবী গঠনে ধূমকেতুর ভূমিকা অনেক। নির্দিষ্ট করে বললে বলা যায়, পৃথিবী গঠনে সূর্যের পরই ধূমকেতুর ভূমিকা। কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেন, পৃথিবীতে পানি এসেছে আসলে ধূমকেতু থেকেই। পৃথিবী সৃষ্টির সময় প্রচুর ধূমকেতু একের পর এক আঘাত হানে। এ আঘাতের সময় ধূমকেতুর শরীরে জমে-থাকা বরফ পৃথিবীতে জমা হয়ে আস্তে আস্তে সৃষ্টি করে পানি। অর্থাৎ পৃথিবীর জীবজগৎ যে পানির ওপর নির্ভরশীল সে পানি পৃথিবীর নিজস্ব সম্পদ নয়। বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কেও বিস্তারিত জানতে চান। এ অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্যও সেটি।

পৃথিবী থেকে আট কোটি ৩০ লাখ মাইল দূরের এ ধূমকেতুতে আঘাত হানার পর সেখানে প্রচণ্ড আলোর দ্যুতির সৃষ্টি হয়। ৩৭০ কিলোগ্রাম ওজনের ছোটখাটো ফ্রিজের আকারের নভোখেয়াটি টেম্পল ওয়ানে আঘাত হানার মুহূর্তেই সৃষ্টি হয় বিশাল এক স্টেডিয়াম আকারের গর্তের। গর্তের আকার সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই যেরকম ধারণা করেছিলেন, সেটির আকার মোটামুটি সেরকমই হয়েছে। অর্থাৎ যতটুকু গতিবেগে বিজ্ঞানীরা আঘাত হানতে চেয়েছিলেন, কোনো সমস্যা ছাড়াই সে কাজটি করা গেছে। এ সংঘর্ষে নভোখেয়াটি ধ্বংস হলেও মহাকাশযান ডিপ ইমপ্যাক্টের কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং পূর্ব প্রস্তুতি অনুযায়ী এটি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষ পরবর্তী ছবি তুলে তা পৃথিবীতে পাঠায়।

আঘাত হানার পরপরই প্রকল্প পরিচালক রিক গ্র্যামিয়ের সাংবাদিকদের তার প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন, "এটা অভূতপূর্ব একটি ঘটনা। সাংঘাতিক ঘটনা। ধূমকেতু থেকে গর্ত সৃষ্টি হওয়ার সময় সেখান থেকে আবর্জনা বের হয়ে সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত হয়ে ঠিক অগ্নিচ্ছটার মতো মনে হচ্ছিল। আমাদের বিজ্ঞানীদের জন্য এটি একটি দুর্লভ মুহূর্ত। আমরা এখন এর বিভিন্ন ছবি তোলার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করে আশা করি আপনাদের একটি সিদ্ধান্ত জানাতে পারবো।" তিনি আরো বলেন, "তারা আশা করছেন সংঘর্ষের সময় সেখানে ঠিক কি কি ঘটেছে সেগুলো সম্পর্কে তারা বিস্তারিত জানতে পারবেন ছবিগুলো বিশ্লেষণ করার পর এবং এ ছবিগুলো থেকেই তারা ধূমকেতুর গঠন সম্পর্কেও জানতে পারবেন। বিশেষ করে নভোখেয়ার আঘাতে ধূমকেতুর গায়ে যে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, সেটি বিশ্লেষণ করে জানা যাবে এটার উপরিভাগ কতটুকু শক্ত পদার্থ দিয়ে গঠিত।

আঘাতের সময় থেকেই নিরবিচ্ছিন্নভাবে ছবি তুলেছে মহাকাশযান ডিপ ইমপ্যাক্ট। সে ছবির কিছু কিছু বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন বিজ্ঞানীরা। তবে বিশ্লেষণের আগেই শুধু ছবি দেখেই উৎসাহ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান মুলার্ডস সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী ড. অ্যান্ড্রু কোটস বলেন, "আমি উৎসাহিত এ কারণে যে, এর আগে এত পরিষ্কার ছবি আর দেখা যায়নি। এটি নিঃসন্দেহে ছবির সঠিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে।" তিনি জানালেন, "এই ধূমকেতুর গঠন এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে একটি গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হলো মাত্র। এই একটি মাত্র অভিযান থেকেই বেশি কিছু আশা করা উচিত নয়।" প্রাথমিক অবস্থায় পাওয়া কিছু ছবি থেকে ধূমকেতুর উপরিভাগের পদার্থ নিয়েই বেশি গবেষণা করা হলেও পরবর্তী সময়ে তারা আরো গভীরে যাবেন। ধূমকেতুটির উপরিভাগে কি কি পদার্থ আছে তা জানার পর তারা মধ্যবর্তী স্তরের পদার্থ এবং সবশেষে সম্ভব হলে একেবারে ভিতরের পদার্থ সম্পর্কেও গবেষণা চালাবেন। এজন্য লা পালমায় অবস্থিত স্যার আইজ্যাক নিউটন টেলিস্কোপ থেকে পুরো ঘটনার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত একটি বৃটিশ টেলিস্কোপ থেকেও অনবরত এ ঘটনার ওপর নজর রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

আপাতত এ পরীক্ষাগুলো চালানো হলেও কিছুদিন পর থেকে বিজ্ঞানীরা নতুন আরেকটি পরীক্ষা চালাবেন এর ওপর। না, নতুন করে কোনো আঘাত হানা হবে না সেখানে। আগেই বলা হয়েছে, পৃথিবী সৃষ্টির সময় মুহূর্মুহু ধূমকেতু আঘাত হেনেছে পৃথিবীতে। এতসব আঘাতের ফলই আজকের এই পৃথিবী। এই যে ধূমকেতুতে আঘাত হানা হলো, কয়েক বছর পর এর কি প্রতিক্রিয়া হবে, সেটা জানার জন্যও বিজ্ঞানীরা সমানভাবে উৎসুক।

ডিপ ইমপ্যাক্ট থেকে পাঠানো ছবি বিশ্লেষণের কাজ শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। তবে ছবি বিশ্লেষণ করে এর ফলাফল প্রকাশ করতে কতদিন লাগবে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে পারেননি কেউই। কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস এ কাজে লেগে যেতে পারে বলে বিজ্ঞানী-রা জানিয়েছেন। তবে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ শুরু করেন বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি। যার নামে আকাশের একটি ধূমকেতুর নামকরণ করা হয়েছে হ্যালির ধূমকেতু । এ ধূমকেতু তাদের কাছেও ছিল নোংরা বরফের চাঁই বিশেষ।

আশাবাদী, এ ছবি বিশ্লেষণ করতে তাদের স্বাভাবিকের চাইতে বেশি সময় লাগবে না। কারণ এত উজ্জ্বল ছবি এর আগে পাওয়া যায়নি। এ ছবিগুলোতে বিভিন্ন বস্তু ও ধূলিকণার অবস্থান এত স্পষ্ট যে, সেগুলো বিশ্লেষণ করতে তাদের খুব বেশি কষ্ট নাও করতে হতে পারে। গিলগামেশের উপাখ্যানটিই বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো গল্প। সুমেরীয় সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার পর ১২টি কাদার তৈরি প্লেটে এ গল্প পাওয়া যায়। রাজা উডুকর কিছু অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী নিয়ে এ গল্প রচিত। খ্রিস্টপূর্ব ২৭৫০ থেকে ২৫০০ অব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে এ গল্প লিখা হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

সেই গল্পে বলা আছে ধূমকেতুর কথাও, যা কিনা একসাথে আগুন, সালফার এবং বন্যা নিয়ে আসে পৃথিবীতে। আর ধূমকেতুর আগমন তো যে সে আগমন নয়, মনে হয় সবকিছু ছারখার করে দিতে আসছে। তাই আদি সুমেরীয়রা আকাশে অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির মাঝেও খুব সহজেই ধূমকেতুকে আলাদা করে চিনতে পারতো। ভয় করতো ধূমকেতুকে। তাদের কাছে ধূমকেতু ছিল স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আসা মেসেজ। সুমেরীয়দের কাছে ধূমকেতু সৃষ্টিকর্তার মেসেজ হলেও সত্যিকার অর্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ শুরু করেন বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি, যার নাম অনুসারে আকাশের একটি ধূমকেতুর নামকরণ করা হয়েছে হ্যালির ধূমকেতু। এ ধূমকেতু তাদের কাছেও ছিল নোংরা বরফের চাঁই বিশেষ। ধূমকেতু সম্পর্কে পৃথিবীর অনেক মানুষেরই দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণা খুব একটা স্বচ্ছ নয়। ডিপ ইমপ্যাক্ট মিশনের মাধ্যমে আসা ছবিগুলো বিশ্লেষণের পর পৃথিবীর মানুষের ধূমকেতু সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিই পাল্টে যাবে বলে দাবি করছেন কয়েক বিজ্ঞানী। তৈরি হবে বিজ্ঞানমনস্ক একটি দৃষ্টিভঙ্গি। ডিপ ইমপ্যাক্টের সত্যিকারের সাফল্য বলতে তারা এটাকেই মনে করছেন।

ডিপ ইমপ্যাক্ট এবং টেম্পল ওয়ান সম্পর্কে কিছু তথ্য

- এ বছরের ১২ জানুয়ারি ডিপ ইমপ্যাক্ট উৎক্ষেপণ করা হয়। এটা ১৭৩ দিনে ৪৩১ মিলিয়ন কিলোমিটার পরিভ্রমণ করে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নেয়। গড় গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় এক লাখ তিন হাজার ৮০৬ কিলোমিটার।
- ডিপ ইমপ্যাক্ট থেকে ছোঁড়া নভোখেয়াটি ঘণ্টায় ৩৭ হাজার ১০০ কিলোমিটার বেগে টেম্পল ওয়ানকে আঘাত করে।
- নভোখেয়াটির আকৃতি ছিল অনেকটা ফ্রিজ আকৃতির বুলেটের মতো।
- আঘাত হানার সময় পৃথিবী থেকে ধূমকেতুটির দূরত্ব ছিল ১৩৪ মিলিয়ন কিলোমিটার।
- নভোখেয়াটি যেখানে আঘাত হানে সেখান থেকে ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের দূরত্ব ছিল প্রায় ৫০০ কিলোমিটার। আঘাতের ১৪ মিনিট পর নিউক্লিয়াসটি সে অবস্থানে আসে।
- ধূমকেতুটি গ্যাস, আবর্জনা এবং বরফ দিয়ে গঠিত। আঘাতের ফলে প্রথমে গ্যাস, পরে আবর্জনা এবং সবশেষে বরফ ছিটকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে।
- বিস্তারিত জানতে http://www.nasa.gov/deepimpact এ ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন।

ধূমকেতুতে সফল আঘাত হানার পর আনন্দে উল্লাসিত নাসার কর্মীবৃন্দ এবং আঘাতপ্রাপ্ত ধূমকেতুর দৃশ্য

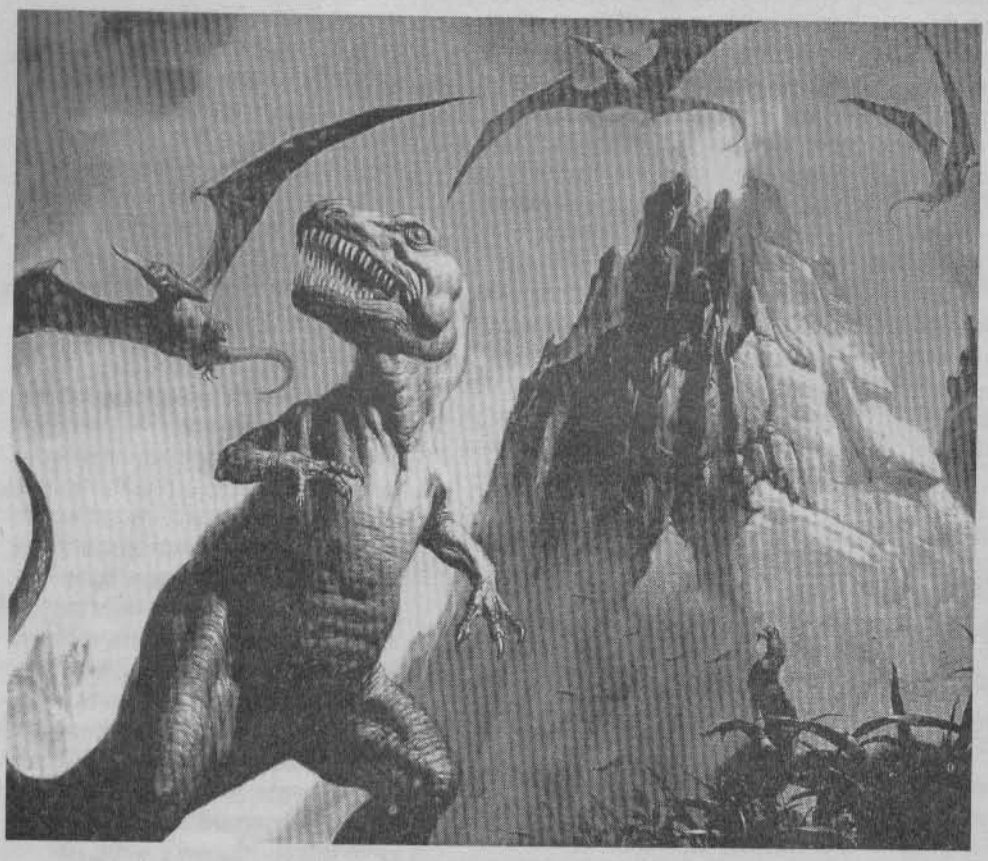

ডাইনোসরের
পাখি হয়ে ওঠার গল্প

ফরিদুর রহমান পান্থ

বৃহদাকৃতির প্রাণী ডাইনোসর। কি কারণে তারা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হলো তা জানা যায়নি, বলতে গেলে বিষয়টি এখনো বিস্ময়ের। তবে জানার চেষ্টা চলছে। কেমন ছিল তাদের চরিত্র, কিভাবে তারা মারা পড়ল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণাও চলছে সার্বক্ষণিক। ডাইনোসর নিয়ে এ গবেষণায় বেরিয়ে আসছে রহস্যময় সব তথ্য।

গবেষকরা কখনও জানাচ্ছেন, ডাইনোসরেরা শুধু মাংসভোজীই ছিল না, কোনো কোনো ডাইনোসর ছিল তৃণভোজীও। আবার কেউ কেউ জানাচ্ছেন ডাইনোসরগুলো মারা পড়েছিল মহাজাগতিক কোনো কারণে। সাম্প্রতিক পাওয়া এক তথ্যের ভিত্তিতে জিবাশ্মবিদগণ বলেছেন, আমরা যাদের পাখি বলে চিনি অতিতাকার ডাইনোসর গুলোই ছিল তাদের পূর্ব পুরুষ! এমন তথ্য কোনো জীবাশ্মবিদ না দিয়ে কোনো সাধারণ মানুষ দিলে, কি ভাবতেন তাকে? পাগল ছাড়া আর কিছুই না! এখনই চোখ কপালে তুলবেন না, আঁতকে ওঠার জন্য আরো তথ্য পাবেন আপনি। কেননা, অধিকাংশ জীবাশ্মবিদই বিনাবাক্যে একমত হয়েছেন বিষয়টির সাথে! কেন? কারণ, সম্প্রতি প্রাপ্ত একটি ডাইনোসরের অস্থিতে পাওয়া গেছে পাখির ডানার মতো কিছু একটার অস্তিত্ব। গবেষকরা ওই ডাইনোসরকে পাখির পূর্বপুরুষ বলার সাহস দেখাচ্ছেন সম্প্রতি প্রাপ্ত ওই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই।

পক্ষে ও বিপক্ষে

গবেষকদের বিপক্ষে যে মতামত নেই তাও কিন্তু নয়। আমার আপনার মতো অনেক জীবাশ্মবিদেরও ধারণা সাম্প্রতিককালে ডাইনোসর গবেষকদের মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। তারা এটা কোনো মতেই মানতে নারাজ যে, শুকুন-ঈগলরা ডাইনোসরের বংশধর। উল্টো চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন বিপক্ষ মতধারী গবেষকগণ। তাদের প্রশ্ন, তবে কি ওই অতিকাকার ডাইনোসরগুলো ভেষজ ওষুধ

সম্প্রতি প্রাপ্ত একটি ডাইনোসরের অস্থিতে পাওয়া গেছে পাখির ডানার মতো কিছু একটার অস্তিত্ব। গবেষকরা ওই ডাইনোসরকে পাখির পূর্বপুরুষ বলার সাহস দেখাচ্ছেন সম্প্রতি প্রাপ্ত ওই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই।

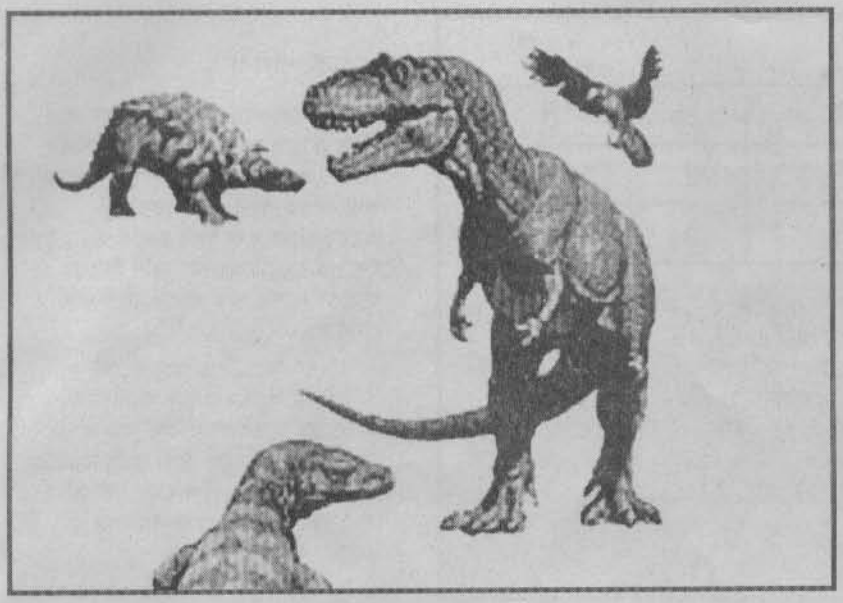

সেবনের কারণে ছোট হয়ে পাখিতে রূপ নিল! সাম্প্রতিককালে গবেষকরা অগ্রজ গবেষকদের খুব বেশি ঘাটাচ্ছেন না। শুধু বলছেন, বিবর্তনবাদ মানলে উত্তরটি এককথাতেই সেরে ফেলা সম্ভব, কালের বিবর্তন। এর অর্থ কালের বিবর্তনেই ছোট হয়ে এসেছে ডাইনোসরগুলো। কাজি পেয়ারা সময়ের সাথে সাথে যেভাবে ছোট হয়ে আসে, ঠিক তেমনি করে। হতেও পারে। বিবর্তনবাদ মানলে উত্তর ফেলে দেয়া যাচ্ছে না সহজে। তাই বলে ছোট হতে হতে অতিকাকার ডাইনোসরগুলো রূপ নিল পাখিতে! অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ইত্যাদি বিশেষণগুলো ব্যবহার করতে ছাড়েননি কোনো কোনো জীবাশ্মবিদ।

ডাইনোসরের পাখি হয়ে ওঠার গল্প

বিপক্ষবাদী ওই গবেষকদের কথা কানে না নিয়ে নতুনরা বলছেন, ডাইনোসরের কোনো কোনো প্রজাতির ওড়ার জন্য ডানা ছিল, কখনও কখনও ওই ডানা ছোট হওয়ায় তারা উড়তে না পারলেও বাতাসে সাঁতার কাটার মতো করে চলতে পারতো ঠিকই। তবে শুধু কালের বিবর্তন বলেই হাল ছেড়ে দিচ্ছেন না তারা। আর তাই সহজে স্বীকার করছেন, কিভাবে অতিকাকার ডাইনোসরগুলো পাখিতে পরিণত হলো সে বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত নই। তাই বলে এটা ভেবে বসলে ভুল করবেন যে কোনো প্রমাণ ছাড়া তারা হুট করেই ডাইনোসরগুলোকে পাখির পূর্বপুরুষ বলে বসেছে। সম্প্রতি পাওয়া একটি ডাইনোসরের ফসিলের অস্থিতে পাখির ডানার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। ওই গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্যাট্রিক ওকনোর। তারা দেখিয়েছেন, মাংসভোজী ডাইনোসরগুলো বাতাসে সাঁতার কাটার মতো করে উড়ে বেড়াত। কেননা ওই ডাইনোসরগুলো দু পা দিয়ে যেমন মাটিতে হেঁটে বেড়াতে পারত তেমনি করে পাখির পালকের মতো বাকি পা দুটো দিয়ে বাতাসে সাঁতার কাটার ক্ষমতাও ছিল তাদের। এতে করে ডাইনোসরগুলোর চলার গতি দ্রুত হতো। ঠিক যেমন করে ডানার সাহায্যে পাখি উড়ে বেড়ায়!

তবে ডাইনোসরের এই পাখি হয়ে ওঠার গল্প কিন্তু নতুন নয়। প্রায় তিন দশক ধরে গবেষকরা এ বিষয়ে গবেষণা করছেন। সাইনোসোরোপটারক্স নামের ডাইনোসরের ওপর গবেষণায় বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল। অন্য একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, প্রাপ্ত বয়স্ক টি-রেক্সের গায়ে আঁশের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। তা থেকে বিষয়টা খুব সহজেই অনুমেয় যে তরুণ টি-রেক্সের শরীরে পাখনার মতো কিছু একটার অস্তিত্ব ছিল।

আবার কিছুদিন আগে জীবাশ্মবিদরাও একটি বিষয়ে একতম হতে পেরেছিলেন যে, ডাইনোসরগুলো ছিল শীতল রক্তের, সরীসৃপদের মতো। যাদের ছিল সাধারণ মানের হৃদযন্ত্র, যা কম পরিমাণে অক্সিজেন রক্তে সরবরাহ করতে পারতো। কিন্তু আধুনিক কালের গবেষণায় কম্পিউটার সংযুক্ত হওয়ার পরে ডাইনোসরের ফসিল পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ডাইনোসরের হৃদযন্ত্রটি মোটেও সাধারণ মানের ছিল না বরং সেটি ছিল ৪টি অংশে বিভক্ত, অনেকটা মানুষ ও পাখির মতো। এ বছরের প্রথমদিকে আরও একটি গবেষণায় প্রমাণিত হয় টি-রেক্স এর রক্তনালী ছিল উটপাখির মতো। আবার কিছু কিছু ডাইনোসরের দেহে বায়ুগহ্বরও পাওয়া গেছে। ওকনোর আর তার সহযোগীরাও এমন একটি প্রমাণ পেয়েছেন। তারা ডাইনোসরের অস্থিতে বায়ু-এর গহ্বরের সন্ধান পেয়েছেন।

ওকনোর এর সহযোগী ক্লেসেন্স বলেছেন, "মাংসাসী ডাইনোসরগুলো (যেমন—টি-রেক্স) এর সাথে আধুনিক পাখিদের অনেক মিল পেয়েছি আমরা। আবার কোনো কোনো গবেষক বলেন, "ডাইনোসররা কখনও কখনও কুমিরের মতো আচরণ করতো!" অনেকে বলেছেন, "কোনো কোনো ডাইনোসরের বিশুদ্ধ বাতাস সেবনের পদ্ধতিও নাকি পাখিদের মতোই। গবেষকরা আরো জানাচ্ছেন, সব তথ্যপ্রমাণ ডাইনোসরকে মূলত উষ্ণ রক্তের প্রাণীতে পরিণত করেছে। ফলে দেহের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার মাধ্যমেই তারা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। অন্যদিকে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরা সাধারণত শিতল রক্তের হয়ে থাকে।

শেষ কথা

ডাইনোসর নিয়ে এত এত তথ্যের ভিড়ে কোনটিকে আপনি সত্য বলে ধরে নিবেন? আপাতত সর্বশেষ পাওয়া তথ্যটি জেনে রাখুন। আর সেই তথ্য হলো, আপনি যে পাখিগুলোকে আকাশে ফুরুত করে উড়ে যেতে দেখেন তারা অতিকাকার ওই ডাইনোসরেরই জাতভাই! ডাইনোসররাই তাদের পূর্বপুরুষ। অন্তত ওকনোর আর তার সাথীদের গবেষণা বলছে তেমনটিই। ডাইনোসরকে এতদিন আমরা কুমিরের মতো কিছু একটা মনে করে আসলেও তারা আসলে ছিল পাখির মতোই। তবে তিনি এটাও বলেছেন, "তার মানে এই নয়, গবেষণা ডাইনোসরগুলোকে উষ্ণ রক্তের প্রাণী হিসেবে প্রমাণ করেছে। তবে ওকনোর যাই বলুন না কেন বিতর্ক থাকছেই। নতুন গবেষণার বিপরীতে থাকা গবেষকরা যেমন বলছেন, দু একটা বায়ুগহ্বর পেয়ে যেমন প্রমাণ করা যাবে না ওরা পাখি ছিল, তেমনি সরীসৃপের মতো শীতল রক্তের প্রমাণ করতেও প্রমাণ দেখাতে হবে তাদের। আর যদি ওই অতিকাকার প্রাণীগুলোকে কোনোভাবেই ক্ষুদ্র ওই পাখির সাথে মেলাতে না পারেন তবে কষ্ট করে বিখ্যাত চিত্র পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গের 'জুরাসিক পার্ক' ছবিটি দেখে নিন। হয়তো মিল খুঁজে পেতেও পারেন!

আধুনিক কালের গবেষণায় কম্পিউটার সংযুক্ত হওয়ার পরে ডাইনোসরের ফসিল পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ডাইনোসরের হৃদযন্ত্রটি মোটেও সাধারণ মানের ছিল না বরং সেটি ছিল ৪টি অংশে বিভক্ত, অনেকটা মানুষ ও পাখির মতো।

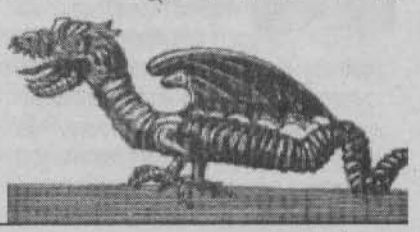

অঙ্কের মজার খেলা

আপনাদেরকে অঙ্কের একটি মজার খেলা দেখাব। আপনারা মনযোগ দিয়ে পাশের ছকটির প্রতি লক্ষ করুন। উক্ত ছকটি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ছকটির ওপর থেকে নিচের দিকের সংখ্যাগুলোকে যোগ করলে যোগফল ১৫ হবে। অর্থাৎ ওপর থেকে নিচের দিকে ১ম সারি, ২য় সারি এবং ৩য় সারির যোগফল একই হবে। যেমন ১ম সারি ২ + ৭ + ৬ = ১৫, ২য় সারি ৯ + ৫ + ১ = ১৫ এবং ৩য় সারি ৪ + ৩ + ৮ = ১৫। আবার ছকটির পাশাপাশি সংখ্যাগুলোর যোগফলও ১৫ হবে। অর্থাৎ পাশাপাশি ১ম সারি, ২য় সারি এবং ৩য় সারি যোগফল একই আসবে। যেমন—১ম সারি ২ + ৯ + ৪ = ১৫, ২য় সারি ৭ + ৫ + ৩ = ১৫ এবং ৩য় সারি ৬ + ১ + ৮ = ১৫। আবার কৌণিকভাবে সংখ্যাগুলো যোগ করলেও যোগফল হবে ১৫। যেমন— ৪ + ৫ + ৬ = ১৫ এবং ২ + ৫ + ৮ = ১৫। দেখলেন তো কি মজা! তাই না?

২	৯	৪
৭	৫	৩
৬	১	৮

মোহাম্মদ ফয়জুল ইসলাম (ফজলু)
তা'মিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা।

দুর্যোগের আগাম সংকেত দেয় পশুপাখি

কোনো এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে থেকেই বুঝতে পারে ঐ এলাকার পশুপাখি। পশুপাখিরা কবরের আযাব সম্পর্কে ও ওয়াকিবহাল —এমন কথা হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে। গেল বছরের ২৬ ডিসেম্বর বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ঘটে যায় মহা অঘটন। সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় কোটি-কোটি মানুষ। দেখা গেছে সুনামির পূর্বেই ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলোর পশুরা অস্থির আচরণ শুরু করে এবং পাখিরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। বিজ্ঞানীরা পশুপাখি নিয়ে গবেষণায় নেমেছেন। তারা আশাবাদী, তাদের আচরণ থেকে আগাম সঙ্কেত পেয়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। বিজ্ঞানীরা এমন ফলাফল আশা করছেন যেন পশুপাখির আচরণ নিশ্চিত করে শীঘ্রই দুর্যোগ আসছে।

সংগ্রহে : সাজ্জাদ সরকার সাজু।

কিভাবে নির্ধারিত হয় সময়

সময়ের প্রধান দুটি একক হলো দিন ও বছর, পৃথিবীর ঘূর্ণনের ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবী তার নিজ অক্ষের ওপর একবার ঘুরলে পূর্ণ হয় এক সৌরদিন। আর পৃথিবী সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরলে পূর্ণ হয় এক সৌর বছর। সাধারণত, দিনের দৈর্ঘ্যের তারতম্য ঘটে। এর একটি কারণ হলো পৃথিবীর গতি। তবে প্রতিটি সৌরদিনই নির্দিষ্ট ২৪ ঘন্টা থেকে কিছুটা বেশি বা কম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দিনের গড় দৈর্ঘ্য ধরা হয়। বিভিন্ন স্থানের সঠিক সময় নির্ধারণের জন্য পৃথিবীকে বিভিন্ন বৃত্তাংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বৃত্তাংশের জন্য সময় পরিবর্তন হয় ১ ঘন্টা। ইংল্যান্ডের গ্রিনউইচ শহরকে পৃথিবীর কাল্পনিক মূল অক্ষরেখা হিসেবে ধরে নিয়ে এর মান দেয়া হয়েছে ০(শূন্য)। এখান থেকে গণনা শুরু হয়। বিশ্বের সব ঘড়ির সময়ই গ্রিনউইচ সময় অনুসারে নির্ধারিত হয়। গ্রিনউইচ মানমন্দিরের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সূর্য বা নির্দিষ্ট কোনো তারার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে ঘড়ির সময় নির্ধারণ করেন।

সংগ্রহ : মোঃ লুৎফর রহমান সরকার।

বিজ্ঞানীদের নিয়ে বিজ্ঞান বহির্ভূত কিছু কথা

স্যার আইজ্যাক নিউটন

তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন। অথচ তিনি বাল্যকালে ছিলেন একেবারে এক মূর্খ ছেলে অর্থাৎ ব্যাড বয়। তিনি পড়তেন লন্ডনের স্কিলিংটনের একটি প্রাইমারি স্কুলে। ক্লাশের লাস্টবয় নিউটনকে মূর্খ হাবভাবের জন্য স্কুলের শিক্ষকরা একবাক্যে রায় দিয়েছিলেন, "এ ছেলের মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছুই নেই।" অথচ তিনি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারসহ নানা আবিষ্কারের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন জগৎজুড়ে।

টাইকো ব্রাহী

বিখ্যাত সুইডিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহী (Tycho Brahe) প্রথম জীবনে ছিলেন একজন মুষ্টিযোদ্ধা। ১৫৫৬ সালে একবার এক খেলায় অংশ নিয়ে তিনি তার নাকটি হারান। ফলশ্রুতিতে, পরবর্তী বাকি জীবন তাকে একটি সোনার তৈরি নকল নাক ব্যবহার করতে হয়েছিল।

সংগ্রহে : মোঃ সামসুজ্জোহা।

অবাক পৃথিবী

উত্তর গোলার্ধের বাতাস খুব ঘন আর ঠাণ্ডা বলে দু ব্যক্তি এক মাইল দূরে থেকেও স্বাভাবিক কণ্ঠে পরস্পরের সাথে কথা বলতে পারে এবং একজন আরেকজনের কথা স্পষ্ট শুনতে পায়। কম ঘনত্বের বাতাস অপেক্ষা বেশি ঘনত্বের বাতাসে শব্দের গতি অনেক বেশি বলে এমন হয়।

ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া আর ওয়েস্ট ইন্ডিজে আমেকারপাস অ্যানাকারডিয়াম নামক একপ্রকার গাছ জন্মের যে গাছের ফলের রস স্থায়ী কালি হিসেবে প্রিন্টিং প্রেসগুলোতে ব্যবহার করা হয়। এটা শুকনো কাপড় ও আসবাবপত্র রং করতেও ব্যবহৃত হয়।

কে ভালো বন্ধু বা নিকটজন হতে পারে শুধু শারীরিক গন্ধ থেকেই বুঝে ফেলতে পারে কুকুর, বিড়াল এবং অন্য অনেক প্রাণী। মজার ব্যাপার হলো এক গবেষণায় দেখা গেছে মানুষও একজন আরেকজনের নিশ্বাসের গন্ধ নিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

এ পৃথিবীর সমস্ত আয়তনকে ৭ ভাগ করলে তার ৫ ভাগই হবে পানি এবং উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হলো, পৃথিবীর সমস্ত ভূখণ্ড মিলিতভাবে প্রশান্ত মহাসাগর অপেক্ষা ছোট।

পৃথিবীর ৫৩ শতাংশ বন ঘিরে আছে মাত্র ৮টি দেশ। দেশগুলো হলো আমেরিকা, চীন, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, রাশিয়া, জাপান এবং জার্মানি।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখিটির নাম অস্ট্রিচ। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হলেও সত্য যে, অস্ট্রিচ দৌড়াতে পারে প্রায় ৮০ কিমি বেগে এবং তারা যে কোনো শত্রুকে অতিক্রম করতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার 'হরনেট-১৬০' নামক একপ্রকার বিমান বানানো হয়েছে। বিমানটা বেশ হালকা। ওজন মাত্র ৯০ কেজি।

প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী নিউজিল্যান্ড অধিবাসী এডমন্ড হিলারি পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে পা রেখেছিলেন। তিনি এভারেস্ট বিজয় করেন ১৯৫৩ সালে আর দক্ষিণ মেরুতে যান ১৯৫৮ সালে।

পৃথিবীতে ফল হিসেবে সবচেয়ে বেশি চাষ হয় আপেলের। এর পরের স্থান নাশপতির।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, একজন স্বাভাবিক মানুষের দিনে খাবার লাগে প্রায় ১ কেজি, পানি লাগে প্রায় ১.৫ কেজি, কিন্তু বাতাস লাগে ১২ কেজিরও বেশি। কারো কারো ক্ষেত্রে লাগে ২৫ কেজি পর্যন্ত।

পরম স্থান বলে কিছু নেই

আসিফ

পরম স্থান বলে কিছু নেই সেখানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে স্থান সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টেছে। নিউটন পদার্থবিজ্ঞানের ধারণায় এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পরে আইনস্টাইন স্থান ও কাল উভয়েরই পুরানো ছক পাল্টে দিলেন। সেই সুদীর্ঘ ইতিহাস কয়েক ছত্রে তুলে ধরা হলো। সমুদ্র তরঙ্গের ওঠানামা আংশিকভাবে জোয়ার ভাটারই নামান্তর। পৃথিবী থেকে চাঁদ অনেক দূরে, সূর্য আরো দূরে। কিন্তু পৃথিবীতে তাদের মহাকর্ষীয় টান খুবই বাস্তব ও লক্ষণীয় মাত্রার। সমুদ্রের বেলাভূমি আমাদের মহাশূন্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রায় একই আকার-আকৃতির বালুকণা যা যুগ যুগ ধরে বড় বড় শিলা হতে আঘাত, ঘর্ষণ, এবং ক্ষয়ের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। এ প্রক্রিয়া দূরবর্তী চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষীয় টানে সমুদ্রের ঢেউ এবং রোদ, বৃষ্টি ও বায়ুপ্রবাহের ভিতর দিয়ে পরিচালিত হয়। এ বেলাভূমি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সময়ের কথা। এ পৃথিবী হলো মানবপ্রজাতির তুলনায় খুবই প্রাচীন। পরিষ্কার নক্ষত্রখোঁচিত রাতে খালি চোখে আমরা যে পরিমাণ নক্ষত্র আকাশে দেখতে পাই তার চেয়ে অধিক পরিমাণ বালুকণা এক হাতের মুঠিতে ধরে, যা প্রায় ১০ হাজার পরিমাণ। কিন্তু নক্ষত্রের এ সংখ্যা, যা আমরা রাতের আকাশে দেখতে পাই তা হলো ঐ মহাকাশে যত নক্ষত্র আছে তারই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। যে নক্ষত্রগুলো আমরা রাতের আকাশে দেখি তা হলো সবচেয়ে কাছাকাছি নক্ষত্রগুলোর কেবলমাত্র একটা ভাসাভাসা হিসাব। কিন্তু মহাবিশ্বে এত পরিমাণ নক্ষত্র আছে যা আমাদের পরিমাপের বাইরে। এই পৃথিবী নামক গ্রহের সমস্ত বেলাভূমিতে যে সংখ্যক বালুকণা আছে তার চেয়েও বেশি নক্ষত্র আছে এ মহাবিশ্বে। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে সেকেন্ডে ১৬ মাইল বেগে। আর এই সূর্য মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মধ্য দিয়ে ছুটে চলে সেকেন্ডে ৪২ মাইল বেগে। এই বেগে মিল্কিওয়েকে একবার ঘুরে আসতে সূর্যের সময় লাগে প্রায় ২৫ কোটি বছর। আমরা যদি আন্তঃগ্যালাক্সীয় অবস্থান হতে তাকাই তাহলে দেখবো অগণিত বিবর্ণ, খড়ের আঁটির মতো আলোর লতানো অঙ্গ যা সাগরের ফেনার মতোই ভাসমান। এগুলো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মতোই গ্যালাক্সি তবে এর কিছু হলো নিঃসঙ্গ পথিক এবং বেশিরভাগই দলবেঁধে মহাজাগতিক তমসার মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে। আমাদের মিল্কিওয়েও দলবেঁধে চলা গ্যালাক্সি। এ দলের নাম স্থানীয় দল বা লোকাল গ্রুপ, সদস্য সংখ্যা ২০টি। প্রায় ২০ লক্ষ আলোকবর্ষের ব্যাপ্তি নিয়ে তার অবস্থান। এ মহাবিশ্বের সবকিছুই গতিশীল। আকাশের দিকে তাকালে বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের যে বিন্যাস বা ছবি আমরা লক্ষ করি তা হাজার হাজার বছর ধরে একইরকম থাকে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছরের অপেক্ষা নিয়ে আমরা যদি তাকিয়ে থাকতাম দেখা যেত নক্ষত্রপুঞ্জের এই প্যাটার্ন বা ছবিগুলো পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, দেখা যেত এক নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্র পুরানো দলকে ত্যাগ করে কিভাবে নতুন কোনো নক্ষত্রপুঞ্জের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে। হয়তো হঠাৎ দেখার সুযোগ হয়ে যেত একটি যুগ্ম নক্ষত্র ব্যবস্থা হতে একটি নক্ষত্র তার মহাকর্ষীয় বন্ধনের মায়া কাটিয়ে সাথীকে ছেড়ে প্রচণ্ড কাক্ষিক বেগে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে যেন মহাজাগতিক গুলতিতে ছোঁড়া এক বিশাল পাথর খণ্ড। অথবা আমরা যদি আরও সময় যেমন কোটি কোটি বছর অপেক্ষা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারতাম তাহলে দেখতাম এ নক্ষত্রগুলো কেমন করে জন্মায়, কেমন করে তাদের বিকাশ ঘটে, আবার মরে যায়, তারপর আবার পুরানোর বদলে নতুন নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে।

অ্যারিস্টোটল বলেছিলেন, বস্তুজগতের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো স্থিতি। এগুলো গতিপ্রাপ্ত হয় শুধুমাত্র কোনো বল বা ঘাত বা ধাক্কার কারণে। এর ফলেই হালকা বস্তু আস্তে এবং ভারী বস্তু দ্রুত পতিত হবে। অ্যারিস্টোটলীয় ঐতিহ্য বলে, বিশুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে প্রকৃতির নিয়মকে আবিষ্কার করা সম্ভব। এর জন্য কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই। গ্যালিলিও-র আগ পর্যন্ত কেউ মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি যে, উপর থেকে একটি মুরগির পালক ও একটি ভারী লোহার পিণ্ড একসাথে ফেলে দিলে কি ঘটে। গ্যালিলিও এ ধরনের একটা পরীক্ষা করেছিলেন। তবে পিসার হেলানো স্তম্ভ থেকে যে কাজটি করেছিলেন সে সংক্রান্ত যে গল্প শোনা যায় তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্যালিলিও তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এটা বুঝেছিলেন যে বাতাসের বাধাহীন কোনো স্থানে যদি পরীক্ষাটি করা যায় তাহলে হালকা বস্তু বা পালক ও একটি ভারী বস্তু বা লোহা পতনের হার একই হবে যা তিনি তার পড়ন্ত বস্তুর সূত্রগুলোতে বর্ণনা করেছেন।

অ্যারিস্টোটল

গ্যালিলিও তার পড়ন্ত বস্তুর সূত্রকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, "বায়ুশূন্য স্থানে প্রত্যেক বস্তুই সমান ত্বরণে বেগ বৃদ্ধি করে। এ থেকে বোঝা যায় যে কোনো একটি বলের প্রভাবে শুধু বস্তুর গতিই শুরু হয় না বরং অবিচ্ছিন্নভাবে বস্তুপিণ্ডের দ্রুতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যেমন– প্রথম সেকেন্ডে ৩২ ফুট গেলে দ্বিতীয় সেকেন্ডে যাবে ৬৪ ফুট, তৃতীয় সেকেন্ডে ৯৬ ফুট অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ড ৩২ ফুট করে বেগ বাড়বে বা ত্বরণ হবে ৩২ ফুট। যদিও আগে লোকে ধারণা করেছে যে, বলের কাজ শুধু গতির শুরু করা এবং নির্দিষ্ট দ্রুতিতে সরলরৈখিক পথে গমন করানো। গ্যালিলিও এবং অন্য ইতালীয়দের পরীক্ষা থেকে নিউটন বস্তুর গতিপ্রকৃতির ধরন সম্বন্ধে কয়েকটি ধারণা নিয়েছিলেন এবং গ্যালিলিওর গতি সংক্রান্ত সূত্রগুলোকে বিচার বিবেচনা করে নিউটন তার গতি সম্বন্ধীয় সূত্রগুলোকে প্রকাশ করেন ১৬৮৭ সালে প্রকাশিত 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থে। নিউটনের প্রথম সূত্র হলো কোনো বস্তুর ওপর বলের লব্ধি শূন্য হলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সরলপথে চলতেই থাকবে। অর্থাৎ বল প্রয়োগ না করা হলে বস্তু সরলপথে চলতেই থাকবে। দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বল যদি ক্রিয়া করে বস্তুর গতির পরিবর্তন ঘটাতে থাকে, এই দ্রুতির পরিবর্তনের হার অথবা ত্বরণ প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক অর্থাৎ বল যদি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় তাহলে বস্তুর ত্বরণও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। নিউটনের তৃতীয় সূত্রটি হলো প্রত্যেক বস্তুরই একটি সমান বা বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে.....।

গ্যালিলিও

অ্যারিস্টোটল, গ্যালিলিও ও নিউটনের মধ্যে পার্থক্য হলো যে অ্যারিস্টোটল বস্তুপিণ্ডগুলোর স্থিতি অবস্থাই পছন্দ করবে যদি তার ওপর ঘাত বা বল প্রয়োগ না করা হয় এবং পৃথিবীকে স্থির ধরে নিয়েছিলেন যদিও আয়োনীয়রা এর চেয়ে অনেক বেশি ভালো চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু নিউটনের ধারণা থেকে বোঝা যায় স্থিতির কোনো অনন্য মান নেই। যদি স্টেশনে স্থির অবস্থায় পাশাপাশি দাঁড়ানো দুটি ট্রেনের একটি সমবেগে গতিশীল হয় তাহলে গতিপ্রাপ্তির প্রাথমিক ধাক্কা বা ত্বরণটুকু ছাড়া বোঝার উপায় নেই কোন ট্রেনটি সমবেগে গতিশীল। শুধু এটুকু বলা সম্ভব একটির সাপেক্ষে আর একটি কত মাইল বা কিলোমিটার বেগে গতিশীল। একটিকে অন্যটির সাপেক্ষ গতিশীল বলা যেতে পারে আবার স্থিতিশীলও বলা যেতে পারে। কেননা উভয় পরিস্থিতি নিউটনের ধারণাগুলো মেনে চলছে।

যদি আমরা তৃতীয় কোনো অবস্থানের সাহায্য না নেই তাহলে কোনোভাবেই ট্রেনের ভিতর থেকে বলা সম্ভব নয় ট্রেনের গতিশীলতার কথা। এক্ষেত্রে আমরা কোন ট্রেনটি স্থির তা বুঝতে পারি পৃথিবীর সাপেক্ষে। আমাদের সমস্যা হলো আমরা পৃথিবীকে স্থির ধরে নিই এবং তার সাপেক্ষে সবগুলো বেগকে বিবেচনা করি। সূর্যের তুলনায় পৃথিবীর ঘূর্ণন বেগকে আমরা যদি না ধরি তাহলে বলবিদ্যার এমন কোন পরীক্ষা নেই যা দিয়ে নিশ্চিতভাবে বোঝা সম্ভব ট্রেনটি চলছে, না পৃথিবী চলছে। কারণ উভয় কাঠামোতে একটি আপেল বা ঢিল ওপরে ছুঁড়ে মারলে স্বাভাবিকভাবে নিচে এসে পড়ে। সবচেয়ে ভালো হয় বিষয়টি যদি দূর মহাশূন্যে গিয়ে ভাবি। আমরা যদি দূর মহাশূন্যে মহাকাশযানের মাধ্যমে ঘণ্টায় ৫ হাজার মাইল বেগে চলি এবং সে সময় আরেকটি মহাকাশযান ঘণ্টায় ১০ হাজার মাইল বেগে ছুটে আসে আমরা কি বুঝতে পারবো সেটা ১০হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছে যদি চারপাশে আর কিছু না থাকে। কারণ আমরা পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে সবসময় কোনো যানবহনের গতিবেগ পরিমাপ করি ভূপৃষ্ঠের সাপেক্ষে। আমরা শুধু বলতে পারবো আমাদের মহাকাশযানের সাপেক্ষে অন্যটি ৫ হাজার মাইল বেগে অতিক্রম করে যাচ্ছে। আর ঐ মহাকাশযানের যাত্রীরা ভাববে আমরা স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। অথচ আমরা তো ৫ হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছি পৃথিবীর সাপেক্ষে। দুটোর মধ্যে আপেক্ষিক বেগ ছাড়া আর কিছু মূলত বলা সম্ভব নয়।

যেহেতু মহাজগতে একটির সাপেক্ষে আর একটি ছুটে চলেছে, ফলে একটি পরম স্থির কোনোকিছু পাওয়া অসম্ভব। এমন একটি স্থির প্রসঙ্গ কাঠামো পাওয়া সম্ভব নয় যার সাপেক্ষে আমরা পরিমাপ করে সমস্ত বস্তুজগতে পরম গতি বের করে ফেলতে পারবো। আসলে নিউটন তত্ত্ব পরম স্থানের সমাধি রচনা করেছিলেন। যদিও তিনি স্বস্তি পেতে চেয়েছিলেন পরমস্থানে। তিনি বললেন পৃথিবী সাপেক্ষে ট্রেনটি ১০০ কিলোমিটার বেগে চললে বলতে পারি পৃথিবীর সাপেক্ষে ট্রেনটি গতিশীল এবং পৃথিবী স্থির, আবার এও বলতে পারি ট্রেনটি স্থির কিন্তু পৃথিবী ট্রেন সাপেক্ষে ১০০ কিলোমিটার বেগে গতিশীল কারণ ট্রেনের মধ্যেও পৃথিবীর মতো প্রকৃতির নিয়মগুলো একইভাবে প্রযোজ্য। স্থির স্টেশনের মেঝের মতোই ওখানে একটি টেনিস বল বার বার ট্রেনের মেঝেতে ড্রপ খেয়ে উপরে উঠবে তবে ট্রেনের মেঝেতে পর পর দুবার ড্রপ খাওয়াকে রেল লাইনে দাঁড়ানো পর্যবেক্ষকের কাছে দেখাবে প্রায় ২৭ মিটার ব্যবধানে ড্রপগুলো খাচ্ছে। সুতরাং এটা থেকে বলা যায় একটা ঘটনার অবস্থান এক এক জনের কাছে এক এক রকম হবে। ফলে পরম স্থান অর্থহীন। কোনো বস্তুর গতি ও অবস্থার বর্ণনার জন্য

নিউটন

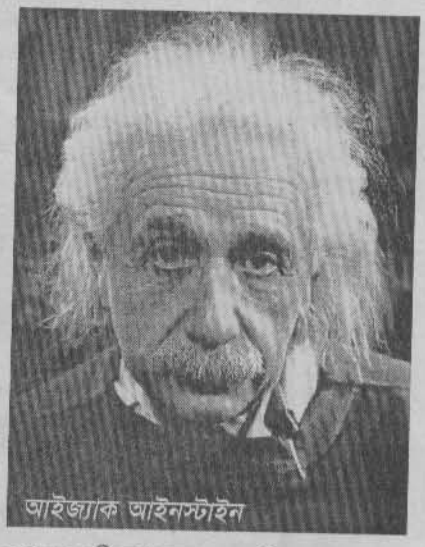
আইজ্যাক আইনস্টাইন

দরকার একজন দর্শকের, আর প্রয়োজন একটি কাঠামো যার তুলনায় বস্তুর দৈহিক (Spatial) অবস্থান নির্দেশ করা যাবে। যেহেতু আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ ত্রিমাত্রিক; দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা, অতএব দর্শক যে কোনো বস্তুর অবস্থান জানার জন্য তিনটি অক্ষ ব্যবহার করবেন। অক্ষ তিনটি হলো কার্তেশীয় পদ্ধতিতে পরস্পরের সমকোণে অবস্থিত তিনটি পরস্পরচ্ছেদী সরলরেখা। এই সরলরেখাগুলো হতে কোনো বস্তুর দূরত্ব নির্ণয়ের মাধ্যমে অবস্থান ঠিক করা হয়।

উদাহরণ হিসেবে ঘরের একটি কোণের কথা উল্লেখ করা যায়। ঘরের মধ্যে কোন বস্তুর অবস্থানের বর্ণনা দিতে হলে কোণকে ঘিরে সমকৌণিকভাবে যে তিনটি দেয়াল উঠে গেছে তাদের প্রত্যেকের চেয়ে বিন্দুটির দূরত্বের কথা না বললে বর্ণনা সম্পূর্ণ হবে না। ধরি একটি দেয়াল থেকে দূরত্ব ৮ ফুট, আর একটি দেয়াল থেকে ৬ ফুট এবং ৩য় দেয়াল অর্থাৎ মেঝে থেকে ৩ ফুট দূরত্বে আছে তাহলে বিন্দুটির দূরত্ব নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা সম্ভব। যদি মেঝে ছাড়া কোণসংলগ্ন বাকি দেয়ালগুলো থেকে দূরত্বগুলো দেয়া না হয় তাহলে মেঝে থেকে ৩ ফুট উঁচুতে যে কোনো জায়গায় বস্তুটির অবস্থান হতে পারে, আবার একটি দেয়াল থেকেও যদি দূরত্বের কথা বলা না হয় তাহলেও মেঝে থেকে ৩ ফুট উঁচুতে ঘরের বিপরীত দেওয়াল বরাবর সরলরেখার যে কোনো অবস্থানে বস্তুটার দূরত্ব হতে পারে। অতএব ত্রিমাত্রিক জগতে বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করার জন্য তিনটি দূরত্বই গুরুত্বপূর্ণ। দূরত্ব তিনটিকে বস্তুর স্থানাংক (৮,৬,৩) বলা হয়।

যদি কাঠামোতে নিউটনের প্রথম গতিসূত্র 'বস্তুর ওপর কোনো প্রযুক্ত বল না হলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সমবেগে সরল রৈখিক পথে চলবে' প্রযোজ্য হয় তাহলে কাঠামোটিকে জড় কাঠামো বলে। এই জড় কাঠামোর সাপেক্ষে সমবেগে গতিশীল আর যে কোনো সংখ্যক ট্রেন অথবা অন্যকিছুকে জড়কাঠামো বলা যায়। দুটো জড় কাঠামোর মধ্যে সম্পর্কের সমীকরণকে গ্যালিলিওর রূপান্তর সমীকরণ বলে। এ সমীকরণ অনুসারে বা নিউটনের ধারণা অনুযায়ী সময় জড় কাঠামোর ওপর নির্ভর করে না, সময় পরম এবং দুটি দৈর্ঘ্য মাপার দণ্ড স্থির অবস্থায় যে দৈর্ঘ্যের হয় গতিশীল অবস্থাতেও তারা একই দৈর্ঘ্যের হবে। দুটি ভিন্ন বেগে গতিশীল ট্রেনের মধ্যে সময়ের প্রবাহের কোনো পার্থক্য নেই পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের ঘড়ির সাথে। তেমনি দৈর্ঘ্য মাপার দণ্ডেরও কোনো পরিবর্তন নেই। অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে পরম স্থানের ধারণাগুলো ত্যাগ করলেও পরম সময় রয়ে এবং এটা পরিত্যাগ করতে আরো ৩শ বছর সময় লেগে যাবে। আইনস্টাইন এসে বললেন, আমরা যে ধরে নিই সময় প্রবাহের জড় কাঠামো নিরেপেক্ষ সত্ত্বা তা ঠিক নয়, অর্থাৎ কাঠামোর গতির সাথে সময় প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, গতির সাপেক্ষ দূরত্ব বা দৈর্ঘ্যের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে। পরস্পরের সাপেক্ষে দুটো গতিশীল ট্রেনের ভিতর একটার সাপেক্ষে আর একটার সময় প্রবাহ এক নয়, তা ট্রেনের আপেক্ষিক বেগের ওপর নির্ভর করে এবং স্থান ও কালের আলাদা আলাদা কোনো অর্থ হয় না, দুটি মিলেই একটি অর্থ হয় অর্থাৎ 'স্থান-কাল' রূপান্তরিত হলো একটি শব্দে।

লেখক : বিজ্ঞানবক্তা, ডিসকাশন প্রজেক্ট

পানির নিচে পাওয়ার স্টেশন

হীরক চৌধুরী

বৈদ্যুতিক মাছের শরীরে একটা করে পাওয়ার স্টেশন আছে যেখান থেকে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ। এ বিদ্যুতের ক্ষমতা অনেক, ছোটখাটো প্রাণীর মৃত্যু নিশ্চিত হয় এর খপ্পরে পড়লে। বর্তমানে অনেক রকম বৈদ্যুতিক মাছ পাওয়া গেছে। একেক জনের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা একেক রকম।

আড়াই হাজার বছর আগে মিশরের মানুষ বিদ্যুতের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানত। নীল নদের পাশে সোক্কারা নামক জায়গায় একটা কবরে ইলেক্ট্রিক ক্যাট ফিশের মূর্তি পাওয়া গেছে। ইউরোপে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেন গ্রিক দার্শনিক মিলেটাস। দুটি বাদামি পাথর একে অপরের সাথে ঘোষলে একপ্রকার শক্তি পাওয়া যায় যা কিছু বস্তুকে আকর্ষণ করে এবং কিছু বস্তুকে বিকর্ষণ করে। এটা ছিল দার্শনিক মিলেটাসের পর্যবেক্ষণ।

কিন্তু তার আবিষ্কার দুই হাজার বছর ধরে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। ১৬০০ সালে উইলিয়াম গিলবার্ট ইলেক্ট্রিসিটি নিয়ে একটা বই লেখেন যাতে তিনি বিদ্যুৎ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনিই প্রথম ইলেক্ট্রন থেকে ইলেক্ট্রিসিটি শব্দটি ব্যবহার করেন। এরপর মানুষ বিদ্যুৎ সম্পর্কে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কারণ মানুষ তখনও বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারত না।

এরপর ইতালির গ্যালভানি একদিন গেলেন কসাই এর দোকানে। কিনলেন ব্যাঙের পা, যা ইতালির মানুষরা খুব আগ্রহ নিয়ে খেত। গ্যালভানি ছিলেন লিউগি গ্যালভানির স্ত্রী। তারপর কিভাবে তিনি বিদ্যুতের সন্ধান পেয়েছিলেন সেটা অবশ্য আমরা অনেকেই জানি।

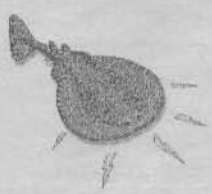

ইলেক্ট্রিসিটির আবিষ্কার এবং এর ব্যবহার পুরোপুরি জানতে মানুষের সময় লেগেছিল প্রায় আড়াই হাজার বছর। ইউরোপের ডাক্তাররা রোগীর রোগ সারাতে বিদ্যুতের ব্যবহার জানত; যদিও তারা বিদ্যুৎ সম্পর্কে কিছুই জানত না। বিশেষ কয়েক প্রকার সামুদ্রিক মাছে পাওয়া যেত বিদ্যুৎ। রোমান সাম্রাজ্যের অনেক চিকিৎসক এ বিদ্যুৎ প্রয়োগ করতেন রোগীদের ওপর।

ভূমধ্যসাগরসহ অন্যান্য সাগরে 'টরপেডো রে' ছাড়া আরো কিছু বৈদ্যুতিক মাছ পাওয়া যায়, যাদের আচার-আচরণ খুবই অদ্ভুত। এসব মাছের অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে রোমানরা খুব ভালোভাবে জানত। 'টরপেডো রে' কখনও মাছ শিকার করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। বরং এর আশেপাশে যেসব ছোট মাছ ঘোরাফেরা করে, তারাই কোনো এক রহস্যময় কারণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এরপর 'টরপেডো রে' তার শিকার নিয়ে চলে যায়।

এ রহস্যময় কারণ সম্পর্কে রোমানদের ব্যাখ্যা ছিল অনেকটা এরকম : 'টরপেডো রে' সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক মাছ যখন তাদের আশেপাশে অন্যান্য মাছদের ঘুরতে দেখে, তখন তারা পানিতে একপ্রকার বিষ ছেড়ে দেয়। এ বিষ মানুষের জন্যও ক্ষতিকর। তবে সেটা মারাত্মক নয়। রোমান চিকিৎসকরা আরো মনে করতেন যে, এসব মাছের বিষে একপ্রকার পদার্থ আছে যা অসুখ সারাতে সাহায্য করে। দুই হাজার বছর আগে বৈদ্যুতিক মাছ সম্পর্কে মানুষদের ধারণা ছিল অনেকটা এরকম। এজন্য তারা বৈদ্যুতিক মাছদের ধরে জারে বন্দি করে রাখতেন।

তবে বর্তমানে এ ব্যাখ্যা চলে না। কারণ বৈদ্যুতিক মাছ সম্পর্কে আমরা এখন অনেক কিছুই জানি। বৈদ্যুতিক মাছের শরীরে একটা করে পাওয়ার স্টেশন আছে যেখান থেকে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ। এ বিদ্যুতের ক্ষমতা অনেক, ছোটখাটো প্রাণীর মৃত্যু নিশ্চিত হয় এর খপ্পরে পড়লে। বর্তমানে অনেক রকম বৈদ্যুতিক মাছ পাওয়া গেছে। একেক জনের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা একেক রকম।

ইলেক্ট্রিক ইলের কথা আমাদের অনেকেরই জানা। এটা শুধুমাত্র রাতের বেলায় শিকার খুঁজতে বের হয়। এর ইলেক্ট্রিক শকের ক্ষমতা এতই যে বড় প্রাণীও ঘায়েল হয়ে যায়। আর ছোটখাটো প্রাণী! তারা মারা পড়ে সাথে সাথে। দক্ষিণ আমেরিকার নদনদীতে এবং খালবিলে এই বিপজ্জনক মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আর যে নদীতে এ মাছ থাকে, সাধারণত সেখানে কেউ নামতে যায় না। ইলেক্ট্রিক ইলের আকার ১.৫ থেকে ২ মিটার হয়ে থাকে। এর ওজন ১৫ থেকে ২০ কিলোগ্রাম। তাহলে ইলেক্ট্রিক ইলকে সহজেই ছোটখাটো একটা পাওয়ার স্টেশন বলা যায়।

এই পাওয়ার স্টেশনের কে কতটুকু বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে তার একটা হিসাব নেয়া যাক। আফ্রিকার ইলেক্ট্রিক ক্যাট ফিশ, আমেরিকার ইল মাছ এবং টরপেডো রে এর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা সাংঘাতিক। ক্যাট ফিশ এর বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪০০ ভোল্ট আর ইল মাছের হচ্ছে ৬০০ ভোল্ট! আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি, তার পরিমাণ হচ্ছে ১২৭ থেকে ২২০ ভোল্ট। আবার ইল মাছ যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে সেটা দিয়ে একহাজার ওয়াটের বাল্ব জ্বালানো যায়। এ থেকে পানির নিচে মাছদের শরীরে প্রকৃতি যে পাওয়ার স্টেশন দিয়েছে, সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। মানুষের অনেক অনেক আগে থেকে মাছরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছে, কথাটা মানতে কষ্ট হলেও ব্যাপারটা সত্য। আবার ইল মাছ যে উচ্চ-ক্ষমতার ভোল্টেজের বিদ্যুৎ তৈরি করে, সেটা সে বাধ্য হয়ে করে। আমরা জানি পানিতে বিদ্যুৎ খুব দ্রুত চলাচল করতে পারে না। তাই লো ভোল্টেজের বিদ্যুৎ ইল মাছের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দেখা দেয়। কারণ ইল মাছ থাকে নদী বা পুকুরের পানিতে। টরপেডো রে হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ। সমুদ্রের পানিতে বিদ্যুৎ খুব দ্রুত চলাচল করতে পারে। এ কারণে টরপেডো রে শুধুমাত্র ৬০ ভোল্টের বিদ্যুৎ তৈরি করে নিজ কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

নিজেদের অস্তিত্বের জন্যই বৈদ্যুতিক মাছরা নিজেদের শরীরে তৈরি করেছে পাওয়ার স্টেশন। এর জন্য তারা ব্যবহার করেছে মাংসপেশী, নার্ভ অ্যান্ডিং এবং অ্যান্ড প্লেট। এরা মিলিতভাবে তৈরি করেছে ইলেক্ট্রিক অর্গান। এদের ওজন মাছের পুরো শরীরের তিনভাগের একভাগ। আবার ক্যাট-ফিশের বেলায় তার পুরো শরীরটাই কাজ করে ইলেক্ট্রিক অর্গান হিসেবে। ইলেক্ট্রিক অর্গান এর গঠন খুব জটিল। এর কার্যপ্রণালিও আরো জটিল। তাই এ অর্গানকে কন্ট্রোল করার জন্য মাছের ব্রেনে আছে একটা বিশেষ কমান্ড ইউনিট। এ কমান্ড ইউনিট ঠিক করে দেয় কখন এবং কতটুকু বিদ্যুৎ তৈরি করতে হবে।

ইল মাছ, টরপেডো রে এবং ক্যাট ফিশ ছাড়া কি আর কোনো মাছ নেই যাদের শরীরের ভিতরে আছে জীবন্ত পাওয়ার হাউস? বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৩০০ রকম মাছের সন্ধান পেয়েছেন যারা ০.২ থেকে ২ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে। বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভেবেছিলেন যে, বৈদ্যুতিক মাছের সব সদস্যই বেঁচে থাকে ছোটখাটো প্রাণী মেরে। কিন্তু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের পর তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। বৈদ্যুতিক মাছের অনেকেই আসলে নিরীহ প্রাণী। এরা চুপচাপ থাকতেই পছন্দ করে।

নিজেদের অস্তিত্বের জন্যই বৈদ্যুতিক মাছরা নিজেদের শরীরে তৈরি করেছে পাওয়ার স্টেশন। এর জন্য তারা ব্যবহার করেছে মাংসপেশী, নার্ভ অ্যান্ডিং এবং অ্যান্ড প্লেট। এরা মিলিতভাবে তৈরি করেছে ইলেক্ট্রিক অর্গান। এদের ওজন মাছের পুরো শরীরের তিনভাগের একভাগ।

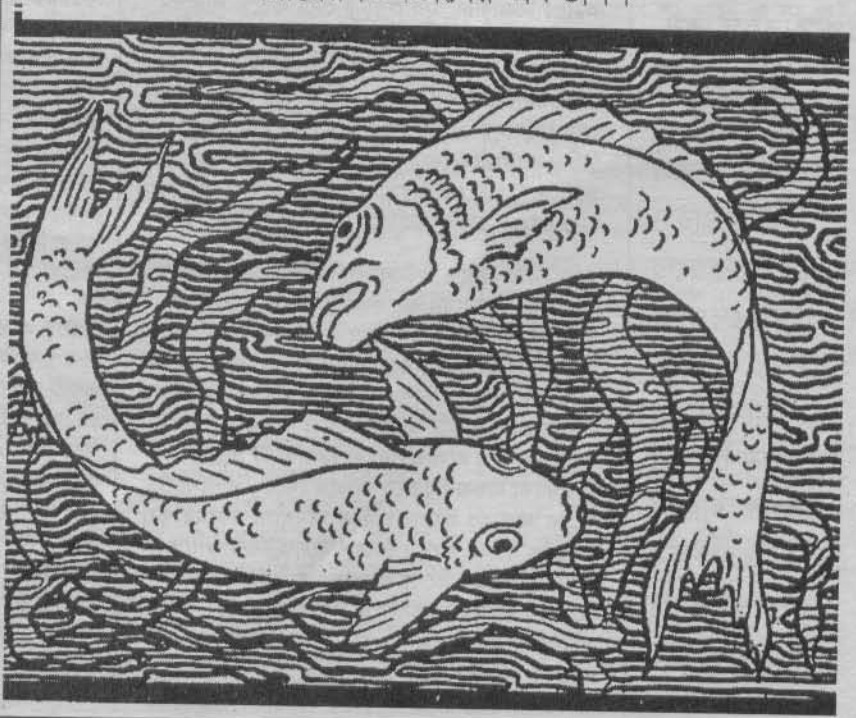

শেষ হচ্ছে সিলিকন চিপের যুগ

মনীষা

আজকের পৃথিবীর এই অভাবনীয় উন্নতির পিছনে সিলিকন চিপভিত্তিক যন্ত্র এবং উপকরণের অবদান অনেক। বিশেষ করে কম্পিউটিং জগতে লজিক ভিত্তিক সব যন্ত্রই এখন সিলিকন চিপভিত্তিক। জীবনকে আরো সহজ ও গতিময় করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রের আকারও দিন দিন বেশ ছোট হচ্ছে। এর পিছনেও সিলিকনের অবদান বেশি। কিন্তু যেহেতু প্রতিটি উপাদান কিংবা উপকরণেরই একটি চূড়ান্ত কার্যসীমা থাকে, তাই সিলিকন চিপসমৃদ্ধ যন্ত্রের আকার বিজ্ঞানীরা আর কতটুকু ছোট করতে পারবেন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বেশ কয়েক বছর আগেই। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বর্তমানের সিলিকন চিপ টেকনোলজির যুগের যন্ত্রের আকার ছোট করার প্রক্রিয়া আর বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আর বিভিন্ন প্রয়োজনে যেহেতু যন্ত্রের আকার ছোট করতেই হবে, তাই মানুষের উচিত হবে সিলিকন চিপ বাদ দিয়ে অন্য কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মনযোগ দেয়া।

কম্পিউটার জগতে হিউলেট-প্যাকার্ড একটি পরিচিত নাম। এর প্রিন্টারের জনপ্রিয়তাই সবচেয়ে বেশি। এ হিউলেট-প্যাকার্ডের একটি গবেষণা গ্রুপ বেশ কিছুদিন আগে দাবি করেছিল, তারা ট্রানজিস্টরের বদলে লজিক ও অন্যান্য প্রোগ্রামভিত্তিক বিভিন্ন যন্ত্রে কাজ করতে পারবে এমন একটি আণবিক-স্কেল ডিভাইস উদ্ভাবন করেছে। তারা বলেছিলেন, এ ডিভাইসটি যন্ত্রের গতিময়তা অকল্পনীয়ভাবে বাড়িয়ে দেবে। পাশাপাশি যন্ত্রের আকারও আগের চাইতে অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষুদ্র করে তৈরি করা যাবে। যেহেতু ইলেকট্রনিক্স জগতে এখনো সিলিকন চিপের জয়জয়কার, তাই তারা এ আণবিক-স্কেল ডিভাইসটিকে সিলিকন চিপের পরিবর্তেই ব্যবহার করতে চান। অর্থাৎ যন্ত্রে যেসব জায়গায় সিলিকন চিপ ব্যবহৃত হয়, ঠিক সেসব জায়গায়ই তারা এ আণবিক-স্কেল ডিভাইস প্রতিস্থাপিত করতে চান। তারা দেখতে ও দেখাতে চান, আগামীতে সিলিকন চিপের বদলে তাদের তৈরি ডিভাইসই ইলেকট্রনিক্স জগতে রাজত্ব করবে।

যন্ত্রে যেসব জায়গায় সিলিকন চিপ ব্যবহৃত হয়, ঠিক সেসব জায়গায়ই তারা এ আণবিক-স্কেল ডিভাইস প্রতিস্থাপিত করতে চান। তারা দেখতে ও দেখাতে চান, আগামীতে সিলিকন চিপের বদলে তাদের তৈরি ডিভাইসই ইলেকট্রনিক্স জগতে রাজত্ব করবে।

ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক হিউলেট-প্যাকার্ড ল্যাবের কোয়ান্টাম ফিজিক্সের তিন বিজ্ঞানীর এ আবিষ্কারের কথা মাস চারেক আগে দি জার্নাল অব অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে প্রকাশিত হয়। এ ডিভাইসটিকে কিভাবে কাজে লাগানো হবে সে ব্যাপারে তারা সেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন, অন্য যে কোনো যন্ত্রেও এ ডিভাইস ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু এর কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো ফলাফল বের করতে চাইলে এমন যন্ত্রে সেটিকে প্রতিস্থাপিত করতে হবে যেখানে লজিক বা যুক্তি মেনে কাজ করা হয় বেশি। যেমন— কম্পিউটার। আধুনিক কম্পিউটারে যেসব সিলিকন চিপসমৃদ্ধ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, ডিভাইসটি সেখানে চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে এবং আরো নিখুঁত ও গতিশীলভাবে কাজ করবে বলে তাদের বিশ্বাস।

তাদের এ কাজটি নিঃসন্দেহে চমৎকার এবং ওই লেখা প্রকাশ হওয়ার পরপরই তাদের তৈরি ডিভাইস দিয়ে একটি কম্পিউটার তৈরির প্রচেষ্টা চালানো হয়। সম্প্রতি সে কম্পিউটার তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সিলিকন চিপসমৃদ্ধ কম্পিউটারের চেয়ে এ আণবিক-স্কেল ডিভাইসের কম্পিউটার অবিশ্বাস্য রকমের ভালো এবং দ্রুত কাজ দিচ্ছে। এর কাজ দেখে ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের মিট্রে করপোরেশন ইন ম্যাকলিনের ন্যানোসিস্টেম স্পেশালিস্ট এবং বিজ্ঞানী জেমস সি. এলেনভোজেন মন্তব্য করেছেন, 'আমরা সম্ভবত সিলিকন যুগকে পিছনে ফেলে নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। এ আণবিক-স্কেল ডিভাইসটিই হবে নতুন যুগের সাথে যোগাযোগ করার

প্রাথমিক যোগসূত্র এবং এ উদ্ভাবন পৃথিবীবাসীকে নতুন টেকনোলজির যুগে প্রবেশ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলো। ডিভাইসটিতে পরীক্ষা চালানোর সময় দেখা গেছে, বর্তমান সময়ের স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি মেইনটেইন করার যে সূচকগুলো থাকে, ডিভাইসটি প্রতিটি সূচকেই স্ট্যান্ডার্ড মান অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ স্ট্যান্ডার্ড প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে। ফলে সেসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের নতুন কিছু স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করতে হয়েছে। বলা যায়, বিশ বছর পর যে স্ট্যান্ডার্ডে কম্পিউটার কাজ করবে, সেই স্ট্যান্ডার্ডেই ডিভাইসটিকে যাচাই করা হয়েছে।

ডিভাইসের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, এতে একটি তার অন্য দুটি তারের সাথে আড়াআড়ি অবস্থায় থাকে এবং সংযোগ অংশটি একটি জংশনের ন্যায় কাজ করে। পরমাণু চলাচলের জন্য এ অংশে যেভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই পরমাণুর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং বিজ্ঞানীদের তৈরি করা কিছু পরিবর্তিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী পরমাণু এবং পরমাণুগুচ্ছকে বারবার একই দিকে চলাচল করানো সম্ভব হয়েছে।

পরমাণু নিয়ে এ ধরনের গবেষণা, বিশেষ করে সিলিকন চিপের বদলে আণবিক-স্কেল ডিভাইস দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরির গবেষণা মূলত শুরু হয় ১৯৯০-এর শেষের দিকে। কিন্তু সে সময় পারমাণবিক চুল্লি এবং আরো কিছু ধ্বংসাত্মক যন্ত্রপাতি থাকায় অনেকে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। এদিকে এ ডিভাইসকে কিভাবে সিলিকন চিপের জায়গায় প্রতিস্থাপন করা যাবে, সে সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য কোনো তাত্ত্বিক মডেল না থাকায় বিতর্কও জমে ওঠে। মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স সিস্টেমে আণবিক-স্কেলভিত্তিক ডিভাইস তৈরির বিষয়টি সেজন্য যতটা না আবিষ্কারের, তার চেয়ে বেশি তর্কের বিষয়ে পরিণত হয়।

ডিভাইস তৈরি হলো বটে, তাই বলে এটি দ্বারা এখনই কোনো যন্ত্র তৈরি করা যাবে না। কারণ একটি ডিভাইস তৈরি করতেই বিজ্ঞানীদের যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা দিয়ে বেশ কয়েকটি সুপার কম্পিউটার তৈরি করা যায়। ডিভাইস উদ্ভাবনকারী হিউলেট-প্যাকার্ডের তিন বিজ্ঞানী ফিলিপ জে কুয়েকেস, ডানকান আর স্টুয়ার্ট এবং আর. স্ট্যানলি উইলিয়ামস মনে করছেন, সিলিকন চিপের বদলে আণবিক-স্কেল ডিভাইসসমৃদ্ধ চিপ বাজারে আসতে আরো বছর দশকের বেশি সময় লাগবে। অবশ্য তখন যেসব যন্ত্র বাজারে আসবে, সেগুলোর দাম হবে তখনকার বাজারদরের তুলনায় অনেক বেশি। স্বাভাবিক বাজারদরে এ ডিভাইসের যন্ত্র পেতে মানুষকে অন্তত বিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। তবে এ সময়ের মধ্যে তারা চেষ্টা করবেন ডিভাইসটির যাবতীয় উন্নতি করতে এবং প্রয়োজনে এ ধরনের আরো কিছু মডেল যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে। এমনকি কম্পিউটার ছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্রে এ ডিভাইস ব্যবহার করা যায় কি-না, বিজ্ঞানীরা সেটা নিয়েও গবেষণা করবেন।

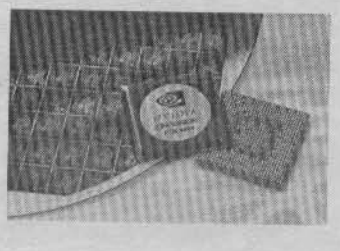

সিলিকন চিপের একটা বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এখন সর্বনিম্ন আকারের চিপ বানানো। এর চেয়ে ছোট চিপ বানানো খুবই কষ্টকর। হয়তো পাঁচ বছর পর এ চিপ এত ক্ষুদ্র হবে যে মানুষের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তার চেয়ে ছোট চিপ তৈরি করা যাবে না।

বর্তমানে সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে উন্নত যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন যন্ত্র তৈরি করা হয়, সেখানে মোটামুটি ৯০ ন্যানোমিটার দৈর্ঘ্যের চিপ ব্যবহৃত হয়। এ আকৃতি একটি চুলের প্রস্থের এক হাজার ভাগের এক ভাগের সমান। অর্থাৎ প্রায় ১০০০টি ট্রানজিস্টর পাশাপাশি রাখলে যে প্রস্থ হবে, সেই প্রস্থের সিলিকন চিপসমৃদ্ধ যন্ত্র উন্নত প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃত। আণবিক-স্কেল ডিভাইস সেটির তুলনায় এতটাই ক্ষুদ্র যে বিজ্ঞানীরা এর ব্যবহারিক উদাহরণই দিতে পারেননি। উদাহরণ দিতে গেলে এখানে অঙ্কের সাহায্য নিতে হবে, যা হয়তো অনেকেরই বোধগম্য হবে না।

হিউলেট-প্যাকার্ডের বিজ্ঞানীদের মতে, সিলিকন চিপের একটা বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এখন সর্বনিম্ন আকারের চিপ বানানো। এর চেয়ে ছোট চিপ বানানো খুবই কষ্টকর। হয়তো পাঁচ বছর পর এ চিপ এত ক্ষুদ্র হবে যে মানুষের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তার চেয়েও ছোট চিপ তৈরি করা যাবে না। এ চিন্তা থেকেই তারা আণবিক-স্কেল ডিভাইস বানাতে উদ্যোগী হন, যা হয়তো আগামী দিনে সুপার কম্পিউটারের ক্ষমতা ল্যাপটপ কিংবা মোবাইল ফোনেই এনে দিবে। বিজ্ঞানীরা তাপ ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কিছু উদাহরণ দিয়ে বলেন, এখন কোনো যন্ত্রে যখন আমরা তাপগতিবিদ্যার সূত্র কিংবা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্রগুলো প্রয়োগ করে কিছু করতে যাই, তখন সিলিকন চিপ খুব অসুবিধা সৃষ্টি করে। কারণ এর ক্ষমতা সীমিত। তাই আমরা এমন একটি প্রযুক্তি খুঁজছিলাম যা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্রগুলোর সাথে চমৎকারভাবে মানিয়ে যাবে। তবে তারা এটাও স্বীকার করেন, যেহেতু তাদের নতুন ডিভাইসটি একটি হাইব্রিড ডিভাইস, তাই কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ যন্ত্রের প্রতিটি ডিভাইস প্রতিস্থাপন করার মতো পদ্ধতি তারা এখনো খুঁজে পাননি। তবে যেসব ঘড়ি এখন সিলিকন চিপের মাধ্যমে চলছে, সেগুলোকেই তারা প্রথম আণবিক-স্কেল ডিভাইসে রূপান্তরিত করতে চান।

হিউলেট-প্যাকার্ডের বিজ্ঞানীরা এ চিপ আবিষ্কারের সাথে সাথে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজও সম্পন্ন করে রেখেছেন। সেটি হলো, তারা চিপের মধ্যকার জংশনে তড়িৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার সুইচও আলাদা করে তৈরি করেছেন। ছোটখাটো হলেও এটি খুবই দুরূহ একটি কাজ। বলা যায়, এ সুইচ তৈরি করেই এ বিজ্ঞানীরা পরবর্তী বিজ্ঞানীদের কাজ অনেকটাই এগিয়ে রাখলেন। পরবর্তী সময়ের বিজ্ঞানীদের এ ব্যাপারে নতুন করে মাথা ঘামাতে হবে না।

হিউলেট-প্যাকার্ডের বিজ্ঞানীরা এটাও বলছেন, এ জংশনের মধ্য দিয়ে যে কাজটি তারা করতে চেয়েছিলেন, সেই ডাটা প্রবাহ ঘুরিয়ে দেয়ার গতি এখনও অনেক ধীর। এমনকি আমরা যেসব মডেমের মাধ্যমে নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হই, সেসব মডেমের গতির তুলনায়ও এটি অনেক ধীর। ব্রডব্যান্ড কিংবা সাবমেরিন ক্যাবলের গতির সাথে তো তুলনাই করা যাবে না। তবে তারা আশা করেন, এ সমস্যা দূর করতে খুব বেশি সময় লাগবে না। ভবিষ্যতে এর ডাটাপ্রবাহ অনেক বেশি, এমনকি সাবমেরিন কেবলের চেয়ে ট্রিলিয়নগুণও বাড়ানো সম্ভব।

অন্যদিকে লস অ্যাঞ্জেলসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার রসায়নবিদ জেমস আর হেথ এই আবিষ্কারের আরেকটি কাজকেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। ডিভাইসের মধ্যে যে বিভিন্ন তারের জংশন বা সংযোগস্থল রাখা হয়েছে, সেটি জেনেই তিনি উৎফুল্ল। তার ধারণা, এ ধরনের এক একটি জংশন একটি ডিভাইসের কার্যক্ষমতা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে তিনি তার ল্যাবরেটরিতে এক বর্গ সেন্টিমিটারের মধ্যে এক ট্রিলিয়ন তারের ক্রসবার জংশন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা কিনা সিলিকন চিপ প্রযুক্তিতে এখনও একটি রেকর্ড। হিউলেট-প্যাকার্ডের বিজ্ঞানীরা যখন এ জংশন তৈরির ঘোষণা দেয় তখন পৃথিবীর আরো ৫৫টি ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানীরা এ ধরনের জংশন তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

প্রযুক্তির নবদিগন্ত
ওয়াইম্যাক্স

> ওয়াইফাই প্রযুক্তি লাইসেন্সবিহীন রেডিও স্পেকট্রিম পদ্ধতি ব্যবহার করে। এ প্রযুক্তির সুবিধা ছিল এর মাধ্যমে কম খরচে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল।

নুসরাত রহমান

বর্তমান বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটছে দ্রুতগতিতে। একের পর এক প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছে প্রতিনিয়ত। বেশ কিছু হারিয়ে যাচ্ছে কিংবা কিছু কিছু অকার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। আবার কোনো কোনোটির উন্নত সংস্করণ বের হচ্ছে কিছু সময় পরেই। তবে এদের মাঝে এমন কিছু প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছে যা প্রযুক্তিগত দিক থেকে নতুন দিগন্তের সূচনা করছে। যুগান্তকারী এর একটি প্রযুক্তির নাম ওয়াইম্যাক্স। এ প্রযুক্তিটিকে অনেকে মেট্রোপলিটন ওয়্যারলেস প্রযুক্তি নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। মূলত ওয়াইফাই প্রযুক্তির উত্তরসূরী হিসেবে ভাবা হচ্ছে ওয়াইম্যাক্সকে। যখন ওয়াইফাই প্রযুক্তিটির প্রচলন ঘটে তখন এর ব্যবহার শুরু হয়েছিল প্রায় সর্বক্ষেত্রে। অফিস, আদালত, বিভিন্ন প্রদর্শনী নেটমিটিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে ওয়াইফাই প্রযুক্তি বেশ দ্রুত প্রসার লাভ করে। অনেকেই ভেবেছিলেন এ প্রযুক্তিটির প্রসার ঘটবে হয়তো দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু পুরোপুরি জনপ্রিয় কিংবা পরিসর বৃদ্ধির আগেই আবির্ভাব ঘটল ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তির। অনেকেই ধারণা করছেন অচিরেই ওয়াইফাই-এর তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসবে ওয়াইম্যাক্স। তবে ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি অনেকটা ওয়াইফাই এর গঠনবৈশিষ্ট্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। ওয়াইফাই প্রযুক্তি লাইসেন্সবিহীন রেডিও স্পেকট্রিম পদ্ধতি ব্যবহার করে। এ প্রযুক্তির সুবিধা ছিল এর মাধ্যমে কম খরচে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল। তবে ওয়াইম্যাক্স এ সুবিধা বৃহৎ আকারে প্রদান করে থাকে। যেসব এলাকায় ব্রডব্যান্ড বা ফাইবার অপটিক সম্ভব নয় সেসব জায়গায় ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি খুবই কার্যকরী। এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারলেস প্রযুক্তি যা দ্রুত ও বেশি দূরত্বে ব্রডব্রান্ড ইন্টারনেট সংযোগ দিতে পারে। মূলত এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন—সাধারণভাবে ওয়াইফাই স্বাভাবিক অবস্থায় ১০০ ফুট দূরত্বে ডাটা সিগন্যাল বা ইন্টারনেট কনটেন্টকে ট্রান্সমিট করতে পারে। অপরদিকে ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় ডাটা সিগন্যাল বা ইন্টারনেট কনটেন্টকে ৩০ মাইল বা ৫০ মাইল থেকে ৫৫ কিমি দূরত্বে ট্রান্সমিট করতে পারে। ওয়াইম্যাক্স বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টার অপারাবেলিটি অব মাইক্রোওয়েভ অ্যাক্সেস-এর অনুমোদন পাওয়া

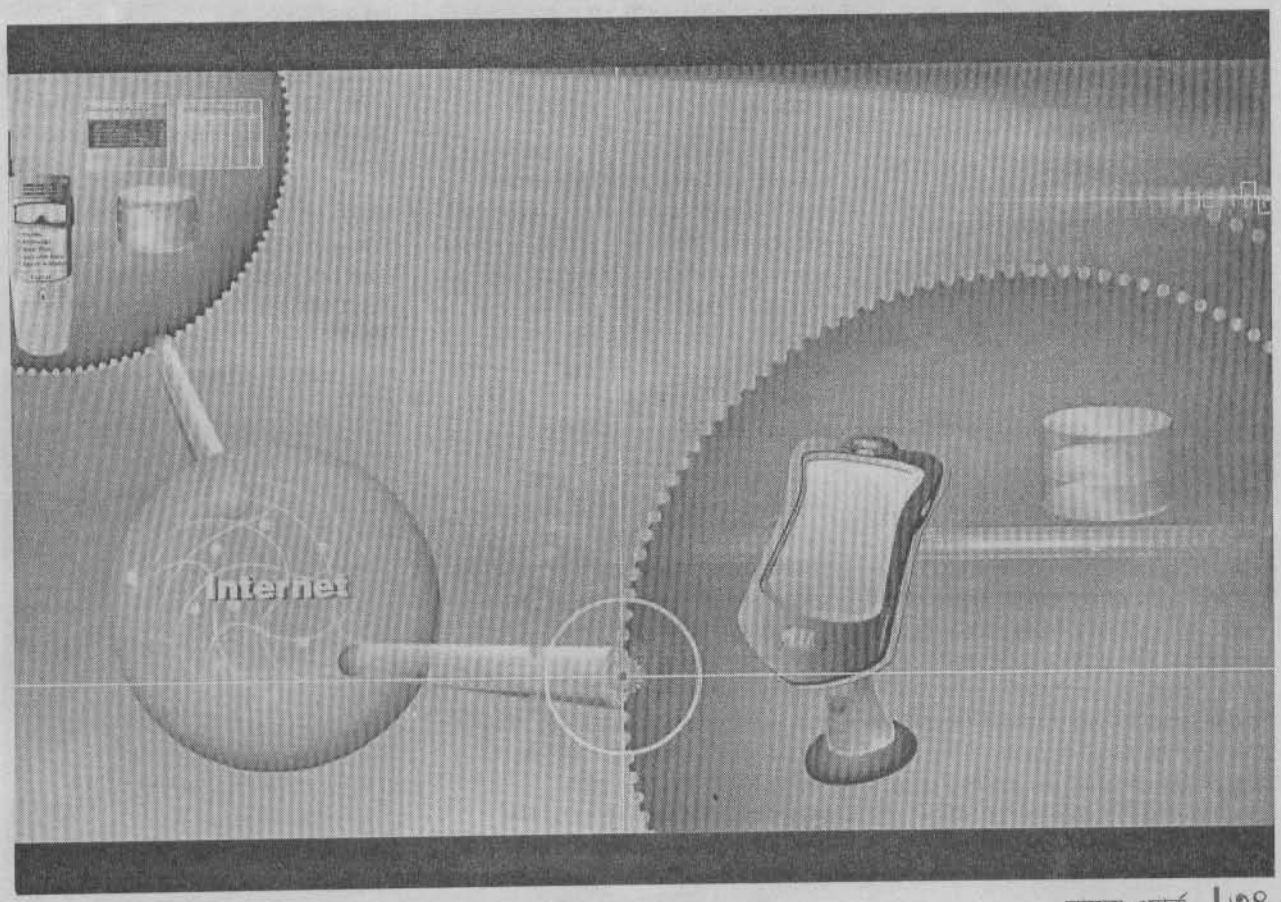

ওয়াইম্যাক্স এর একটি চমকপ্রদ তথ্য হলো এটি সেকেন্ডে ৭৫ মেগাবাইট গতিতে ডাটা আদান-প্রদান করতে সক্ষম। ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি নিয়ে এখনও কাজ চলছে। ইন্টেলের সাথে যৌথভাবে নোকিয়া এবং অ্যালকাটেলের গবেষণা চলছে। আশা করা হচ্ছে এ বছরই যুগান্তকারী সম্ভাবনা নিয়ে ওয়াইম্যাক্সের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়বে আরও ব্যাপক হারে।

যায় ২০০৩ সালের মার্চ মাসে। এ সময় ওয়াইম্যাক্স আইইইই (IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers) এর অনুমোদন লাভ করে। এ স্বীকৃতি পেতে ওয়াইম্যাক্স ৮০২.১৬ স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলির স্পেসিফিকেশন ফিক্সড পয়েন্ট ওয়্যার্লেস সার্ভিস অপারেট করে ২.১১ মেগাহার্জ গতিতে।

ওয়াইম্যাক্স এর একটি চমকপ্রদ তথ্য হলো এটি সেকেন্ডে ৭৫ মেগাবাইট গতিতে ডাটা আদান-প্রদান করতে সক্ষম। ওয়াইম্যাক্স-এর মোট তিনটি আর্কিটেকচার রয়েছে। প্রথমত পয়েন্ট টু পয়েন্ট আর্কিটেকচার। এটি মূলত যেসব এলাকায় ফাইবার অপটিক এখনও ব্যবহৃত হয়নি সেসব এলাকায় ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয়টি হলো পয়েন্ট টু মাল্টিপয়েন্ট। তৃতীয়টি হলো পয়েন্ট টু মাল্টিপয়েন্টসহ পার্শ্ববর্তী ম্যাস নেটওয়ার্ক। ওয়্যার্লেস প্রযুক্তিতে ওয়্যার্ড কাঠামোর কারণে যে সমস্যা বিদ্যমান সে সমস্যা সমাধানে এ প্রযুক্তি দুটো স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। একটি হলো মেট্রো-ফিক্সড পয়েন্ট ওয়্যারলেস স্ট্যান্ডার্ড এবং দ্বিতীয়টি ওয়্যার্লেস ডাটা সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড ৮০২.২০ থ্রিজি। যা মূলত মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য প্রস্তুতকৃত। অবশ্য এক্ষেত্রে মোবাইল ফোন অপারেটররা এন্টেনা ব্যবহার করে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করতে পারবে। এটি গ্রাহকদের বাড়তি সুবিধাও প্রদান করে থাকে। ওয়াইম্যাক্স সার্ভিসের মাধ্যমে খুব সহজেই বিভিন্ন ফোনকল সার্ভিস যুক্ত করা যায়। কোনো ইউজার জায়গা বা ঠিকানা পরিবর্তন করলে তেমন বাড়তি কোনো অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র ওয়াইম্যাক্সকে সেখানে নিয়ে সেট করলেই পুনরায় এটি কাজ করতে শুরু করবে। ওয়াইম্যাক্স সার্ভিসে বৃষ্টি বা ঝড়ো আবহাওয়ায় সংযোগে তেমন কোনো বাধা বা সমস্যার সৃষ্টি হয় না। প্রায়ক্ষেত্রে বড় শহরগুলোতে তারের ব্যবহার বেশ সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ওয়াইম্যাক্স ব্যবহার করলে তা পুরো শহরগুলোই তারহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা বা বিনাতারের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন দুর্যোগের সময় উদ্ধারকর্মী বা নিরাপত্তা কর্মীরা দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় মোবাইল সার্ভিস ব্যবহার করতে পারে না। কেননা প্রায়ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে মোবাইলফোন নেটওয়ার্ক। তবে এক্ষেত্রে যদি তা ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তির হয় তবে উদ্ধারকর্মীরা নির্বিঘ্নে মোবাইল ফোন কিংবা ল্যাপটপে বসে কাজ করতে পারবেন।

ওয়াইফাই সুবিধার চেয়ে ওয়াইম্যাক্সে আরেকটি বাড়তি সুবিধা হলো ওয়াইফাই সাধারণত ল্যান দ্বারা সংযুক্ত থাকে কিন্তু ওয়াইম্যাক্স সংযুক্ত থাকে ওয়্যারলেস ম্যান (W Man) দ্বারা। এর ফলে যাতায়াত, রেল, গাড়ি, বাড়ি যে কোনো স্থানে বসেই ওয়াইম্যাক্স ব্যবহার করা যায়। সেক্ষেত্রে ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি আশেপাশে কিংবা পাশাপাশি বিল্ডিংগুলোর মাঝে সীমাবদ্ধ। বর্তমান বিশ্বে ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি চিকিৎসাসেবা খাতেও ব্যবহৃত হচ্ছে। ডাক্তারগণ এখন যে কোনো জায়গায় বসেই হাসপাতালের যে কোনো স্থানে অবস্থানরত রোগীর যাবতীয় সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন। এসব সুবিধার মাঝেও ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তিতে কিছুটা অসুবিধা রয়েছে। এ সমস্যার মূলে রয়েছে ওয়াইম্যাক্স ডিভাইসগুলোর উচ্চমূল্য। এতে যে মডেম ব্যবহার করা হয় সেগুলোর উচ্চমূল্যই প্রযুক্তিটির প্রসারে বড় বাধা।

এছাড়াও আরেকটি বিষয় হলো এ প্রযুক্তির আশেপাশে সমজাতীয় অন্যান্য প্রযুক্তি কাজ করতে পারে না। যেহেতু একই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে এসব ওয়্যারলেস ডিভাইসের সিগন্যাল অবিরাম বিচরণ করতে থাকে। ফলে এক ডিভাইসের সিগন্যাল অপর ডিভাইসের সাথে ধাক্কা লেগে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তবে সংশ্লিষ্টরা এ সমস্যা অচিরেই দূর হবে বলে জানিয়েছেন।

ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি নিয়ে এখনও কাজ চলছে। ইন্টেলের সাথে যৌথভাবে নোকিয়া এবং অ্যালকাটেলের গবেষণা চলছে। আশা করা হচ্ছে এ বছরই যুগান্তকারী সম্ভাবনা নিয়ে ওয়াইম্যাক্সের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়বে আরও ব্যাপক হারে। আমেরিকার দুটি বৃহৎ কোম্পানি ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার শুরু করেছে। আমাদের দেশে বছর পাঁচেক আগে এ প্রযুক্তি আসলেও নানাবিধ সমস্যার কারণে তা এখনও তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

তবে আশা করা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান এবং মূল্য সংক্রান্ত সমস্যা পরিহার হলে এটি আমাদের দেশেও ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়বে এবং সূচনা হবে তথ্যপ্রযুক্তিখাতে এক নতুন দিগন্তের।

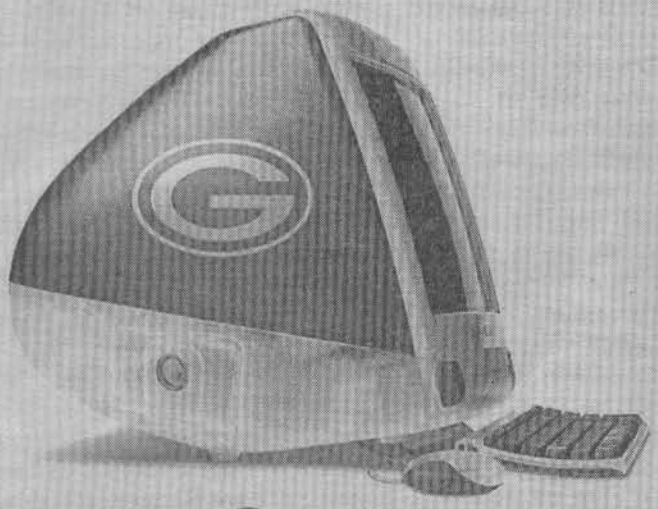

অনেক সময় পাওয়ার সাপ্লাই সংক্রান্ত জটিলতার কারণে আপনার পিসিটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনকি আপনার কম্পিউটারের সমস্ত ডাটাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নিশ্চয়ই আপনি চান এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে। তাহলে এ ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আগেই আপনার উচিত হবে ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

বৈদ্যুতিক সমস্যামুক্ত রাখুন আপনার পিসি

মোঃ গোলাম মোস্তফা

প্রতিনিয়ত আমরা যারা কম্পিউটার ব্যবহার করি তারা প্রায়ই কোনো না কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই। এসব সমস্যার কোনো একটি আবার বৈদ্যুতিক গোলোযোগের কারণে সৃষ্টি হয়। তাই পিসিকে প্লাগের সাথে সংযোগ দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবেন না। বরং জেনে নিন বৈদ্যুতিক গোলোযোগের কোনো সমস্যা আছে কিনা? অনেক সময় পাওয়ার সাপ্লাই সংক্রান্ত জটিলতার কারণে আপনার পিসিটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনকি আপনার কম্পিউটারের সমস্ত ডাটাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নিশ্চয়ই আপনি চান এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে। তাহলে এ ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আগেই আপনার উচিত হবে ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারে সতর্ক থাকা। এ ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকের জানতে হবে পিসিতে কিভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

এসি বা অলটারনেটিং কারেন্ট এবং ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্ট-এর মধ্যে কি পার্থক্য তা আমরা অনেকেই জানি। ইলেকট্রিক্যাল সকেট থেকে যে কারেন্ট পাওয়া যায় সেটি হলো এসি। আর ব্যাটারি থেকে যে কারেন্ট পাওয়া যায় সেটি হলো ডিসি। কিছু কিছু ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির জন্য ডিসি ব্যবহার করা সুবিধাজনক। যেমন : ইলেকট্রনিক সার্কিট। কম্পিউটারে যে পাওয়ার সাপ্লাই থাকে তা এসি ইলেকট্রিসিটিকে ডিসিতে পরিবর্তন করে। তাহলে কেন আমরা সরাসরি ডিসি ব্যবহার করিনে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ইলেকট্রনের গতিবিধি। ইলেকট্রন যখন কোনো তারের মধ্য দিয়ে একটি অণু থেকে অন্য অণুতে স্থানান্তরিত হয় তখন শক্তির প্রয়োজন হয়। এভাবে কিছু শক্তি তারের প্রান্তে এসে জমা হয়, যা দিয়ে আলোর ঔজ্জ্বল্য, মনিটরে আলোর তীব্রতা, ট্রানজিস্টার অফ-অন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজগুলো করা সম্ভব হয়। আবার সার্কিট যদি তুলনামূলকভাবে ছোট হয় তাহলে ইলেকট্রন একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু এতে এর কর্মক্ষমতা খুব একটা কমে যায় না।

আবার কোনো একটি বড় সার্কিটের ভিতরের একপ্রান্ত থেকে যদি ইলেকট্রন পাঠানো হয় তাহলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়ার ব্যয় হতে পারে। যদি কোনো তারের দু প্রান্ত অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে ইলেকট্রন চালনা করা হয়, তাহলে ইলেকট্রনগুলো খুব অল্প জায়গার মধ্যে গায়ে গায়ে লেগে সামনে পিছনে ছুটোছুটি করতে থাকে; সাগরের ঢেউ যেমন করে তীরে এসে আঘাত করে ঠিক তেমনি।

কোনো তারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহিত করলে এসি এর সাহায্যে ভোল্টের খুব দ্রুত পজেটিভ থেকে নেগেটিভ অথবা নেগেটিভ থেকে পজেটিভ পরিবর্তিত হতে পারে। বড় বর্তনীতে পাওয়ার ট্রান্সপোর্টের জন্য এসি কারেন্টের প্রয়োজন হয়।

একের পর এক বৈদ্যুতিক প্রবাহের দিক পাল্টানো একটি ঘটনা। এর আরেকটি কারণ হচ্ছে ভোল্টেজ। এটি ইলেকট্রনকে একটি তারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানোর সময় বল প্রয়োগ করে। আমাদের দেশের ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই হচ্ছে ২২০ ভোল্ট এসি কারেন্ট। এর অর্থ হচ্ছে ভোল্টেজ পজেটিভ ২২০ ভোল্ট থেকে নেগেটিভ ২২০ ভোল্টের দিকে যায়। তৃতীয় যে বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার তা হচ্ছে কতটুকু ইলেকট্রিসিটি সচরাচর ব্যবহার করা হয়। এই ইলেকট্রিসিটিকে অ্যাম্পিয়ার দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এটি ইলকট্রন প্রবাহের হার কত তা নির্দেশ করে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট ভোল্টেজে একটি তারের মধ্য দিয়ে যতবেশি ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে ততবেশি কাজ সম্পন্ন হবে।

অধিক পরিমাণ পাওয়ার

আমাদের দেশে সাধারণত ইলেকট্রিসিটি ২২০ ভোল্ট এবং ৫০ হার্জ ওয়েব ফর্মের হয়; তবে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। অধিকাংশ ব্যবহারকারীরই ক্ষণস্থায়ী পাওয়ারের খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। অনেক সময় দেখা যায় ভোল্টেজ খুব অল্প সময়ের জন্য কমে যায়। আবার ভোল্টেজ হাজার হাজার গুণ বৃদ্ধিও পায়। বেশির ভাগ সময়েই দেখা যায় বজ্রপাতের সময় এটা ঘটে। এর প্রতিকারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয় না বলেই এক্সট্রা ভোল্টেজ অনেক সেনসেটিভ কম্পোনেন্টের ভিতরে প্রবেশ করার ফলে যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়।

এসব যন্ত্রপাতি যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সোর্স এবং আপনার ইলেকট্রনিক্স-এর মাঝে একটি সার্চ প্রোটেক্টর বসানো। এটি সক অ্যাবজরভার হিসেবে কাজ করে এবং অতিরিক্ত ভোল্টেজ নিয়ে সামনের দিকে এগোনোর আগেই তা দূর করে। সার্চ প্রোটেক্টর অনেক রকম ডিজাইনের হতে পারে। এটি কমবেশি দামি ডিভাইস যেমন-Metal oxide Varistors-এর ওপর নির্ভর করে। অতিরিক্ত ভোল্টেজ ধারণ করার ক্ষেত্রে এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। প্রায়ই দেখা যায় এর ধারণক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং অবশেষে এর আর সার্চ প্রোটেকশনের ক্ষমতা থাকে না। আবার দামি ডিভাইসগুলো অন্যান্য কম্পোনেন্ট ব্যবহার করে। যেমন—Gas Discharge Capacitors ক্ষণস্থায়ী পাওয়ার ধারণ করে। এর ক্ষমতা কখনও শেষ হয় না।

ভোল্টেজ স্পাইক

শুধু বজ্রপাতের কারণে নয়, আরও অনেক কারণে ইলেকট্রিসিটি স্বাভাবিক আচরণ নাও করতে পারে। একই ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল সার্ভিসের জন্য অন্য ডিভাইসের মাধ্যমে ভোল্টেজ ওঠানামা করতে পারে। আপনার যদি ইলেকট্রিক্যাল লোড সমৃদ্ধ কোনো বড় যন্ত্রপাতি থাকে (যেমন : এয়ার কনডিশনার বা রিফ্রেজারেটর অথবা লিফট) যাতে অফ-অন করার ব্যবস্থা থাকে সে ডিভাইটি অফ বা বন্ধ করার সময় ভোল্টেজ বাউন্স করতে পারে। যদিও এক্ষেত্রে ভোল্টেজ বজ্রপাতের মতো তত বেশি বৃদ্ধি পায় না। তথাপি এটা আপনার ডিভাইসের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হতে পারে। এছাড়াও এটি অন্যান্য ডিভাইসের অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দের সৃষ্টি করতে পারে। ৫০ হার্জের চেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ কখনও কখনও প্রিন্টারের মটরের মতো মেকানিক্যাল ডিভাইস এবং ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জামের ক্ষতি করতে পারে। এসব অসুবিধা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সহজ উপায় হচ্ছে আপনার বাড়িঘর বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মূল যে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা বা মেইন ডিসট্রিবিউশন বোর্ড। ওখান থেকে একটি আলাদা ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থেকে মেইন'স লাইন টানুন এবং সেই লাইনটিকে বিশেষভাবে কম্পিউটার এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বরাদ্ধ করুন।

বিঘ্নিত পাওয়ার

বর্তমানে আমাদের দেশে একটি বড় সমস্যা হচ্ছে পাওয়ার বা বিদ্যুৎ না থাকা। লোড শেডিং আজকাল আমাদের নিত্যদিনের সাথী। প্রায়ই দেখা যায় ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই সিস্টেম নষ্ট হয়ে গিয়ে কিংবা ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিলে অথবা রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের কাজের সুবিধার জন্য ঘরের বিদ্যুৎ একেবারেই কিংবা কয়েক ঘন্টার জন্য চলে যেতে পারে। হঠাৎ করে পাওয়ার কমে গেলে আপনার কম্পিউটারের সমস্ত ডাটা নষ্ট হয়ে

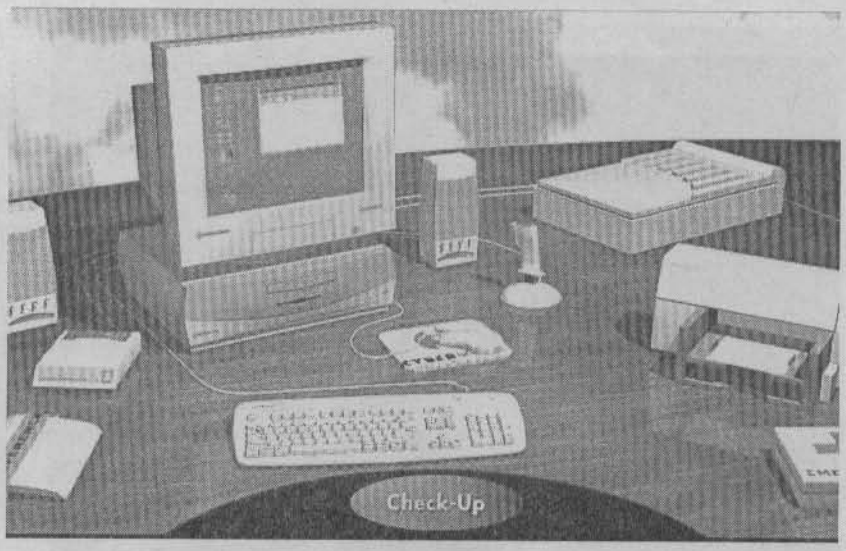

মাটির সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি সার্কিটের ব্যবস্থা করাই সবচেয়ে ভালো। ঘরের দেয়ালের সকেটে তিনটি ছিদ্র থাকার অর্থ এই নয় যে, তা ঠিকমতো আর্থিং করা আছে।

যেতে পারে। এমনকি হার্ডওয়্যারও পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এসব সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার সহজ উপায় আপনার যন্ত্রপাতি এবং ইলেকট্রিক্যাল সোর্সের মধ্যে একটি বাড়তি পাওয়ার সাপ্লাই স্থাপন করা। এই বাড়তি পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে আইপিএস বা ইউপিএস। এতে স্টোরেজ ব্যাটারি এবং সার্কিট থাকে। এ সার্কিটের কাজ হচ্ছে আপনার কম্পিউটারের প্রয়োজনানুযায়ী ব্যাটারি ডিসিকে এসিতে পরিবর্তন করা। এছাড়াও মনিটরিং সার্কিট ইনকামিং বা আগত ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার সাপ্লাই কতটুকু লোড নিতে পারবে তা সাধারণত ভোল্ট অ্যাম্পিয়ারের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষমতা এর গায়ে উল্লেখ করা থাকবে। আপনি আপনার ডিভাইসের প্রয়োজন অনুযায়ী বা তার চেয়ে অধিক ক্ষমতার ইউপিএস নিয়ে দীর্ঘক্ষণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারবেন।

খুব অল্প পরিমাণ পাওয়ার

প্রত্যেক স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার সাপ্লাইয়েরই Voltage-regulation-এর সামর্থ থাকে। যা খুব অল্প ভোল্টেজকেই সঠিক জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে। যে পরিমাণ ভোল্টেজ সাপ্লাই করা হবে তা যদি কমে যায় তাহলে তার পাওয়ার নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যায় এবং তখন ব্যাটারি থেকে পাওয়ার নেয়া হয়।

স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার সাপ্লাইকে ভোল্ট অ্যাম্পটার্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর থেকে এটি কতটুকু ভার বহন করতে পারে তা বিস্তৃত জানা যায়। এ ডিভাইসগুলোর পিছনের প্লেটে কি পরিমাণ পাওয়ার লোড করা যেতে পারে তা উল্লেখ করা থাকে। ব্যাটারি ব্যাকআপ, ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ, সার্চ দমন প্রভৃতি কাজ স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে হতে পারে।

একটি আলাদা সার্কিটের মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারটিতে কানেকশন দেয়া যে খুব ভালো ব্যবস্থা তা আগেই বলা হয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে আপনি নির্ভেজাল বিদ্যুৎ পেতে পারেন। এছাড়াও এর অন্যান্য সুবিধা আছে । আপনার যে ডিভাইসটি এই সার্কিটের সাথে প্লাগ করা আছে তার লোড কত তা জানতে পারেন। যার ফলে আপনি ওভার লোডিং সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারেন। সার্কিট ব্রেকার অথবা ফিউজের কারণে এটা সম্ভবপর হয়।

মাটির সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি সার্কিটের ব্যবস্থা করাই সবচেয়ে ভালো। ঘরের দেয়ালের সকেটে তিনটি ছিদ্র থাকার অর্থ এই নয় যে, তা ঠিকমতো আর্থিং করা আছে। অনেক সময়ই দেখা যায় মাটির সাথে তৃতীয় তারের কোনো সংযোগ নেই। অবশ্যই এটি নিশ্চিত হয়ে নিবেন। বিশেষ করে পুরানো দিনের বাড়িগুলোতে এ ধরনের সমস্যা প্রায়ই দেখা দিতে পারে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের মেইন'স ব্যবস্থার কারণে আরও বড়সড় বিপত্তি দেখা দিতে পারে। কারণ অনেক সময়ই সার্কিটগুলো দেওয়ালে বসানো থাকে না, ফলে এ সার্কিটের ভিতর দিয়েই সংস্পর্শে থাকা অন্যান্য যন্ত্রে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হতে পারে। এর ফলে যন্ত্রের মালিক দারুণ শক্ খাবেন অথবা বড়সড় কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যাবে যন্ত্রটির।

সেজন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত, সার্কিট ব্রেকার নামের স্বল্পমূল্যের একটি যন্ত্র ব্যবহার করে দেয়ালের সকেট কতটুকু নিরাপদ ও কার্যক্ষম তা পরীক্ষা করে নেয়া।

প্রাণের সূচনা আর্কিওন মহাকালে

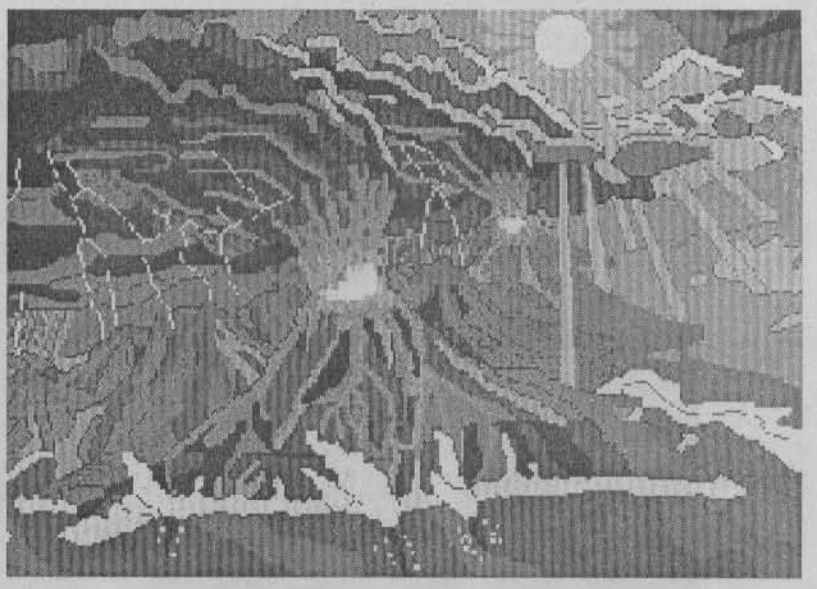

উনবিংশ শতাব্দীতে ভূতত্ত্ববিদদের গবেষণার সবচেয়ে বড় ফসল ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জি। ১৮৩০ সালে সর্বপ্রথম ইতালীয় বিজ্ঞানী জিউভানি এভদুইনা এ ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জি প্রণয়ন করেন। শিলার বড় ধরনের পরিবর্তন ভূস্তরগুলোর মধ্যকার সুস্পষ্ট পার্থক্য, প্রাপ্ত জীবাশ্মের সুস্পষ্ট পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করেই এ কালপঞ্জি প্রণয়ন করা হয়েছিল। উল্লিখিত পরিবর্তনের সাপেক্ষে ধারাবাহিকভাবে আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং নামকরণ করা হয়েছে। এ ভাগগুলো হলো যথাক্রমে– মহাকাল (Eon), মহাযুগ (Era), যুগ (period) ও কল্পযুগ (Epoch)। ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জিতে মহাকালকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো- আর্কিওন (Archeon) মহাকাল, প্রোটারোজয়িক মহাকাল এবং ফেনারোজয়িক মহাকাল। ধারণা করা হয় ৪৫০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর জন্ম। তাই ৪৫০ কোটি বছর পূর্বে অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে ২৫০ কোটি বছরের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালটা হচ্ছে আর্কিওন মহাকাল। গ্রিনল্যান্ডের প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন শিলার বয়স ধরা হয়েছে ৩৮০ কোটি বছর। অর্থাৎ এটা আর্কিওন মহাকালের সময়কার। আর সবচেয়ে প্রাচীন স্ট্রোমাটোলাইটগুলো পাওয়া গেছে ৩৫০ কোটি বছরের পুরাতন শিলায়। ভূতত্ত্ববিদ প্রফেসর জে উইলিয়াম স্কফ অস্ট্রেলিয়ার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় একটি ভূস্তরে ৩৫০ কোটি বছর পূর্বের পাঁচটি মাইক্রোফাইল জীবের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন।

বিজ্ঞান সাময়িকী নেচার (Nature)- এর তথ্যমতে দক্ষিণ-পশ্চিম গ্রিনল্যান্ডের আকিনিয়া দ্বীপের শিলাস্তর বিশ্লেষণ করে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলেছেন ৩৮৫ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে। বিভিন্ন মতবাদ, গবেষণার ফল এবং প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এ কথা বলা যায় যে, পৃথিবী গঠিত হওয়ার ১০০ কোটি বছরের মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের নানা পরিবর্তন সাপেক্ষে উন্নতি ঘটে এবং বৃষ্টিপাতের সূত্রপাত হয়। আর বৃষ্টিপাতের দরুন আস্তে আস্তে নদী, হ্রদ, সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি সৃষ্টি হতে থাকে। সম্ভবত প্রিবায়োটিক (Prebiotic) বিক্রিয়া অর্থাৎ কোনো জীবন্ত বস্তুকণার প্রতিনিধিত্ব ব্যতিরেকেই সম্পাদিত রাসায়নিক বিক্রিয়া পানির সংস্পর্শে ঘটার কারণেই আস্তে আস্তে জীবনের মৌলিক ভিত্তি (Base), প্রোটিন, লিপিড, নিউক্লিয়াস এসিড ইত্যাদি উৎপন্ন হয়েছিল এবং এসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে আস্তে আস্তে আধুনিক ব্যাকটেরিয়া থেকে সরল বিশেষ ধরনের কোষ, যা নিজের প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে পারে তার উদ্ভব ঘটেছিল। কারণ পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে অনেকটা আদি পরিবেশিক অবস্থায় নানা ধরনের গ্যাস, পানি ও রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে এতে শক্তি হিসেবে ইলেক্ট্রিক ডিসচার্জ ও অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ প্রয়োগ করে প্রথমে এ ধরনের সরল অণু, পরবর্তীতে জটিল অণু সৃষ্টি এবং এসবের প্রতিরূপ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এভাবেই কোষ তৈরি করা সম্ভবপর। অনেকের মতে, এমোনিয়া বা মিথেন আদিকালে পৃথিবীতে হয়তো ছিল না তবে এসব গ্যাস থাকা নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও এটা নিশ্চিত যে, প্রাচীন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কোনো অক্সিজেন ছিল না। সবচেয়ে প্রাচীনকালের প্রাণের অস্তিত্ব বহন করে স্ট্রোমেটোলাইটের ফসিল। আর এ স্ট্রোমোটোলাইটগুলো সায়ানো ব্যাকটেরিয়া (Syanobacteria) বা নীলাভ সবুজ শৈবাল (Blue Green Algae) দ্বারা নির্মিত এক ধরনের আঠালো আবরণের ভূস্তর। বর্তমানেও এসব অণুজীব (Micro-organism) এর সহায়তায় অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলীয় স্ট্রোম্যাটোলাইটের গঠন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রথমদিকে সব ধরনের প্রাণ বা সরল এককোষী প্রাণী অক্সিজেন ছাড়াই সরাসরি মহাজাগতিক রশ্মি থেকে শক্তি সংগ্রহ করে বেঁচে থাকত। এসব অণুজীব প্রাণের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আস্তে আস্তে বিবর্তিত হয়ে অণুজীব সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন নির্গমণ করা শুরু করে এবং পরে শ্বসন, রেচন ইত্যাদি প্রক্রিয়া আস্তে আস্তে আন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবে সরল এককোষী প্রাণী থেকে জটিল এককোষী প্রাণীর উদ্ভব হয়, এবং এর থেকে মাইটোসিস ও মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বহুকোষী প্রাণীর উদ্ভব ঘটে যাদের বিবর্তনের ফসল আজকের মানুষ। তাই বিভিন্ন প্রমাণাদি সাপেক্ষে এ কথা বলা যায় যে, আজ থেকে ৩৫০ কোটি বছরেরও পূর্বে আর্কিওন মহাযুগে প্রাণের সূচনা ঘটেছিল।

পীযূষ কান্তি বাড়ৈ
কারিতাস অফিস, সাতক্ষীরা।

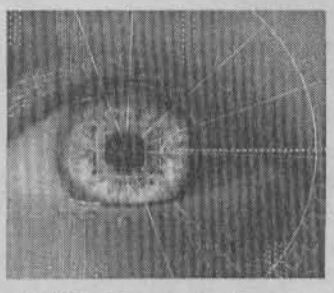

বায়োনিক চোখ
দৃষ্টিহীনদের আশার আলো

প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান এগিয়ে চলছে তার বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার নিয়ে। অন্ধ লোকদের আশার আলো হিসেবে এক ধরনের চোখ আবিষ্কার করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানী বাল্টিমোরের জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিসলিন ডেগনিলি। যার নাম বায়োনিক চোখ।

কম্পিউটার চিপসের সাহায্যে তৈরি দৃষ্টিহীন ব্যক্তির চোখের পিছনের দিকে এ চোখ বসানো হয় এবং এর সাথে যুক্ত করা হবে ক্ষুদ্রাকৃতির একটি ভিডিও ক্যামেরা। এ ক্যামেরাটি বসানো থাকবে চোখে ব্যবহৃত একটি গ্লাসের সাথে। ক্ষুদ্রাকৃতির এ ভিডিও ক্যামেরাটি কোনো বস্তু থেকে তার ছবি প্রেরণ করবে কম্পিউটার চিপসে। আর ঐ জায়গা থেকে ছবিটি পাঠানো হবে মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক তখন সনাক্ত করবে ক্যামেরাটি কি দেখছে। একটি স্বাভাবিক চোখের কাজকর্মের অনুরূপ হচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতির এ ভিডিও ক্যামেরার কাজ। মার্কিন বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ সাধনায় এ অসাধ্য সাধন হয়েছে। পাশাপাশি বিজ্ঞান আরো অনেক দূর এগিয়ে গেছে। একদিন হয়তোবা অন্য কেউ বায়োনিক কিডনি অথবা রক্ত আবিষ্কার করে বসবেন।

শামীম আহমদ, *সিলেট।*

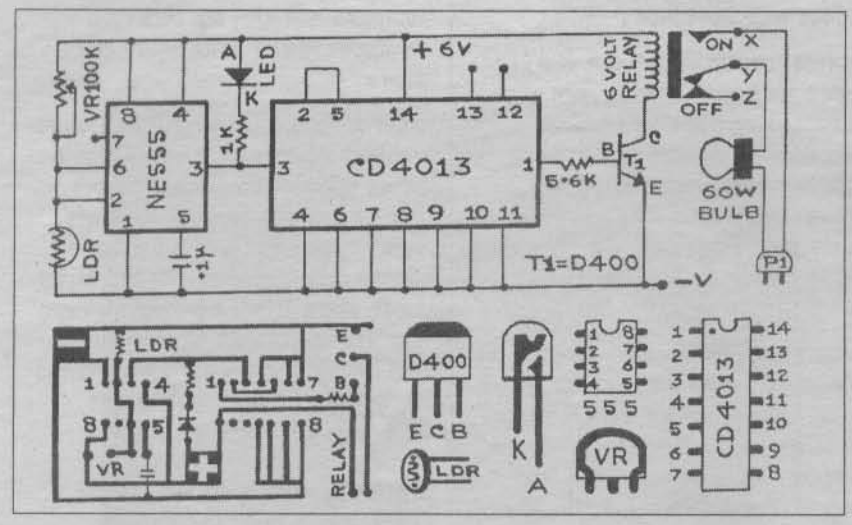

রিমোট কন্ট্রোল

শওকত-উল-ইসলাম

অর্থাৎ রিমোট কন্ট্রোল শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ। যা দিয়ে দূর থেকে কোনো ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক্স বা মেকানিক্যাল যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

রিমোট (REMOTE) শব্দের অর্থ দূরবর্তী এবং কন্ট্রোল (CONTROL) শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ রিমোট কন্ট্রোল শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ। যা দিয়ে দূর থেকে কোনো ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক্স বা মেকানিক্যাল যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে এটা করা সম্ভব।

১. তরঙ্গের মাধ্যমে অর্থাৎ ইথার তরঙ্গ;
২. শব্দের মাধ্যমে অর্থাৎ আল্ট্রাসনিক এবং
৩. আলোর মাধ্যমে অর্থাৎ ইনফ্রা-রেড রে।

নবীন হবিস্টদের জন্য এবারে যে রিমোট কন্ট্রোল সার্কিট নিয়ে আলোচনা করবো তা আলোর মাধ্যমে কার্যকর। তবে, এ আলো কিন্তু ইনফ্রারেড-এর নয়; সাধারণ টর্চের আলো। আজকের সার্কিটটি আলো নির্ভর বিধায় একে লাইট সেনসেটিভ রিমোট কন্ট্রোল বলা যায়।

আলোচ্য সার্কিটের LDR (লাইট ডিপেনডেন্ট রেজিস্টার) এর ওপর দূর থেকে টর্চের আলো ফেলে যে কোনো যন্ত্রকে; যেমন : লাইট, টিভি, ফ্রিজ, ভিসিআর, ভিসিপি, ক্যাসেট প্লেয়ার ইত্যাদি ON বা OFF করা যাবে। নিয়মটা হলো LDR এর দিকে নির্দিষ্ট করে একবার টর্চের আলো জ্বালিয়ে নিভিয়ে দিলে ON হবে এবং পরের বার টর্চের আলো জ্বালিয়ে নিভিয়ে দিলে OFF হবে। এভাবে RELAY-এর মাধ্যমে যে কোনো যন্ত্রকে ON/OFF করা যাবে।

সার্কিটের প্রধান দু'টি অংশ। প্রথম অংশে আছে একটি LDR এবং একটি NE555 টাইমার আইসি। দ্বিতীয় অংশে আছে একটি DUAL DATA TYPE FLiP-FLOP আইসি CD4013 যার একটি F.F কে এখানে সার্কিটে কাজে লাগানো হয়েছে। CD4013 এর পরিবর্তে BU4013B বা MN4013B ইত্যাদি আইসি ব্যবহার করা যাবে। সার্কিটের দুটি আইসিকে সরাসরি ঝালাই না করে আগে IC BASE ঝালাই করে পরে IC কে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে, নতুবা সমস্যা হতে পারে। NE555 আইসিকে সার্কিটে SCHMITT TRIGGER-এর মতো ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে, LDR-এর ওপর দূর থেকে ফেলা টর্চের আলোর PULSE কে ইলেকট্রিক্যাল পালস্-এ পরিণত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে দু'টি জিনিস মনে রাখতে হবে। (ক) সাধারণভাবে 555 আইসির 2 এবং 6 নম্বর পিনের ভোল্টেজ 2/3 এর ওপরে রাখতে হবে। এটা করা যাবে VR100K ভেরিঅ্যাবল রেজিস্টারকে ঘুরিয়ে ভোল্ট কমবেশি করে। এই ঘুরানোটা সঠিক অবস্থায় সার্কিটের LED (লাইট এমেটিং ডায়োড) বাল্বটি জ্বলবে। (খ) VR100K কে এমনভাবে ঘুরিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, যাতে LDR-এর ওপর দূর থেকে টর্চের আলো ফেলার সাথে সাথে 555 আইসির 2 এবং 6 নম্বর পিনের ভোল্টেজ 1/3-এর নিচে চলে যায়। এক্ষেত্রে LRD কে ফাঁপা অস্বচ্ছ ছোট কাগজের বা প্লাস্টিকের নলের মধ্যে বসাতে হবে। যাতে চারপাশ থেকে আলো এসে এর কাজে বাঁধা সৃষ্টি না করে এবং LDRটি অন্ধকারে থাকে। এ সার্কিটে সেই ধরনের LDR ব্যবহার করতে হবে, আলো পড়লে যার মান বা রোধ বা রেজিস্ট্যান্স কমে যায়। সার্কিটের দ্বিতীয় অংশের CD4013 আইসির 1 নং পিনের সাথে একটি রিলে ড্রাইভার ট্রানজিস্টার ব্যবহার করে ডাটা টাইপটির ব্যবহার করে ডাটা টাইপটির কমপ্লেমেন্টারি আউটপুটকে ডাটা ইনপুটে ফিডব্যাক করায় প্রত্যেক ক্লক পালস্-এর সাথে এর আউটপুট পরিবর্তন হবে। ফলে, প্রথম পালস্ যদি হাই থেকে লো হয় তবে, দ্বিতীয় পালস্ লো থেকে আবার হাই হবে। প্রথম অংশের LDR -এর ইলেকট্রিক্যাল পালসটি (যা দূর থেকে ফেলা টর্চের আলোর সংকেতের সাহায্যে তৈরি) এই F.F টিকে ক্লক করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে, টর্চের আলো প্রথমবার জ্বালিয়ে নেভালে যদি F.F টির আউটপুট লো থেকে হাই হয় এবং RELAY টি OFF থেকে ON হয়, পরের বার টর্চটি জ্বালিয়ে নেভালে আবার হাই থেকে লো হবে এবং RELAY টি ON থেকে OFF হবে।

নবীন হবিস্টদের মধ্যে যারা রিলে (RELAY) নিয়ে কাজ করেননি এবং এ সম্পর্কে তেমন জানেন না-তাদের জন্য সংক্ষেপে কিছু জানাচ্ছি। রিলে হচ্ছে এমন এক ধরনের সুইচ,যা বিদ্যুৎ শক্তিকে চৌম্বক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তার কন্ট্রাক পয়েন্ট বা সুইচকে অন বা অফ করে। রিলের ভিতরে একটি লোহার দণ্ডের ওপর অসংখ্য প্যাঁচ দিয়ে সুপার এনামেল তার দিয়ে কয়েল তৈরি করা হয়। এই কায়েলের দু প্রান্তে DC বিদ্যুৎ দিলে লোহার দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হয়। এবং তখন তা একটি বা দু'টি পাতলা মেটাল পাতকে টান দেয়। ফলে রিলের কন্ট্রাক পয়েন্ট অন হয়। আবার যখন রিলের কয়েলের দু প্রান্তে কোনো বিদ্যুৎ থাকে না তখন কয়েলের ভিতরের লোহার দণ্ডটি তার চৌম্বকত্ব হারায়। ফলে, রিলের কন্ট্রাক পয়েন্ট বা সুইচটি অন থেকে অফ হয়। আজকের এই আলোচ্য সার্কিটে 6V-এর রিলে ব্যবহৃত হয়েছে। এর কয়েলের দু প্রান্ত সার্কিট এর পজিটিভ 6V-এ এবং ট্রানজিস্টর D400-এর কালেকটর (C)এর সাথে যুক্ত। D400-এর পরিবর্তে C828 বা C1684 ব্যবহার করা যাবে। সার্কিট চলাকালে রিলেটির কয়েল যখন বিদ্যুৎপ্রাপ্ত হবে তখন এর কন্ট্রাক পয়েন্ট বা সুইচটি অন হয়ে সার্কিটের X (এক্স) এবং Y (ওয়াই) পয়েন্ট দুটি যুক্ত করে দেবে। ফলে 60W বাল্বটি জ্বলে উঠবে। এক্ষেত্রে প্লাগ P1 কে AC220V-এ দিয়ে রাখতে হবে। আর 60W বাল্বের স্থানে টিভি বা ফ্রিজ বা ভিসিআর বা ক্যাসেট প্লেয়ার সংযুক্ত করে অনুরূপভাবে অন বা অফ সুবিধা পাওয়া যাবে।

চালু হলো প্রজেক্ট বা ইলেক্ট্রনিক্স বিষয়ক বিভাগ 'মজার হবি ইলেক্ট্রনিক্স'। বিভাগটি কেমন লাগছে লিখে জানান। সার্কিট বা প্রজেক্ট সম্পর্কিত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে পাঠকগণ লেখকের সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শ ও সহযোগিতা নিতে পারেন। মোবাইল: ০১৭২-০৮০১২৮।

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৪ • সংখ্যা ৪৫ • সেপ্টেম্বর ২০০৫

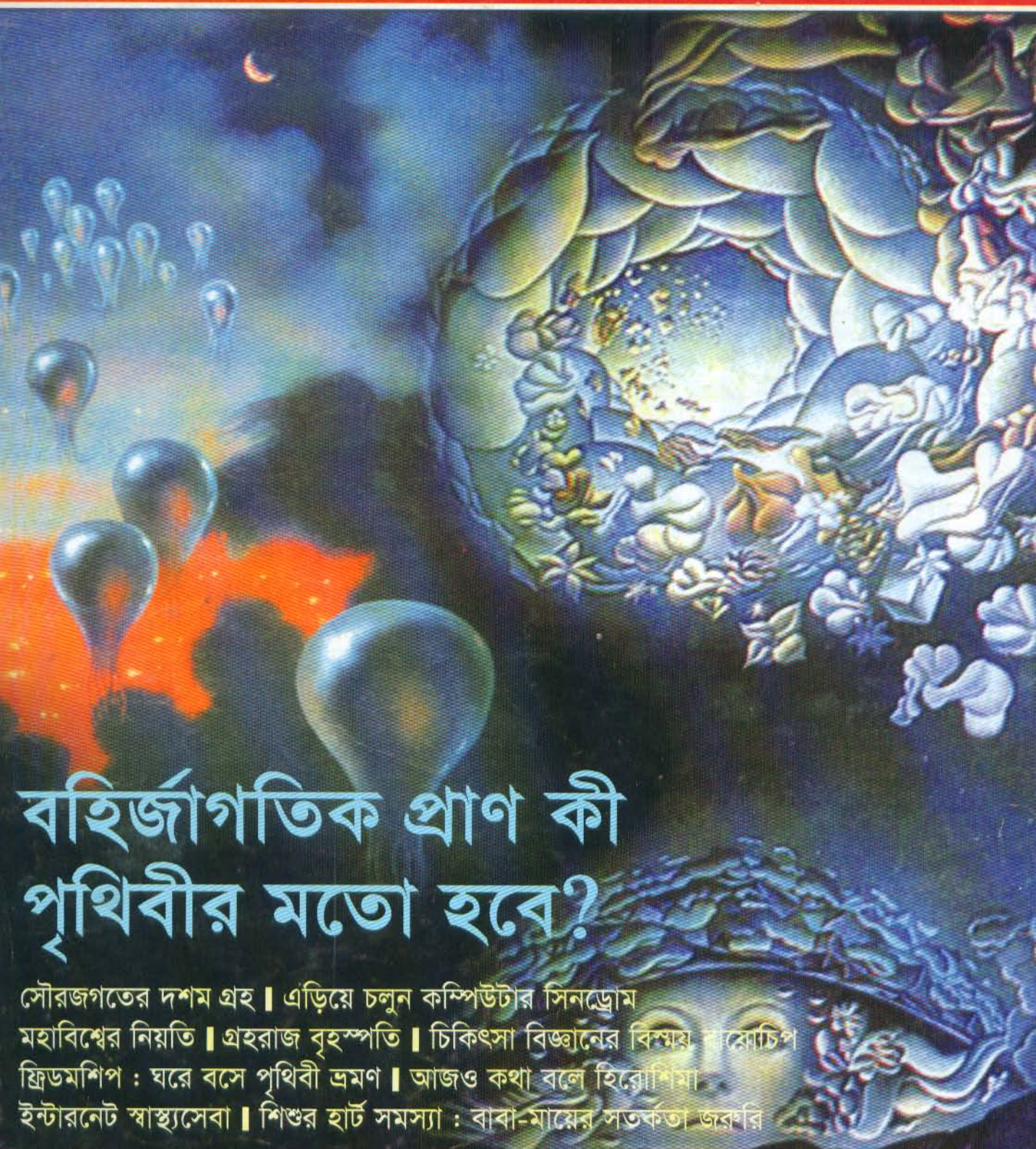

বহির্জাগতিক প্রাণ কী পৃথিবীর মতো হবে?

সৌরজগতের দশম গ্রহ | এড়িয়ে চলুন কম্পিউটার সিনড্রোম
মহাবিশ্বের নিয়তি | গ্রহরাজ বৃহস্পতি | চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিস্ময় নানোচিপ
ফ্রিডমশিপ : ঘরে বসে পৃথিবী ভ্রমণ | আজও কথা বলে হিরোশিমা
ইন্টারনেট স্বাস্থ্যসেবা | শিশুর হার্ট সমস্যা : বাবা-মায়ের সতর্কতা জরুরি

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৪
সংখ্যা ৪৫
সেপ্টেম্বর ২০০৫

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-কম্পিউটার-স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ম্যাগাজিন

এ সংখ্যার সূচি

বহির্জাগতিক প্রাণ কী পৃথিবীর মতো হবে!
—আসিফ ৭

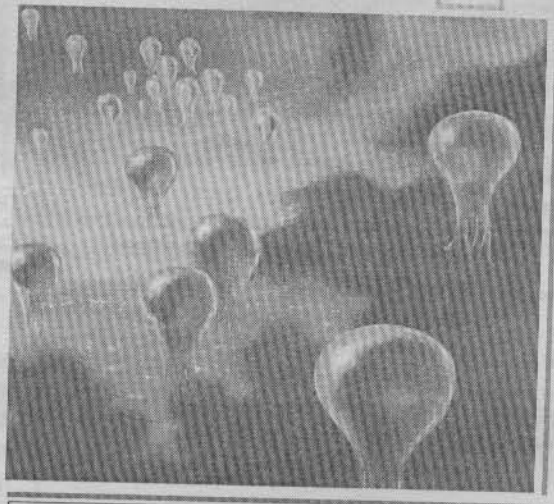

এড়িয়ে চলুন কম্পিউটার সিনড্রোম
— গৌতম রায় ১১

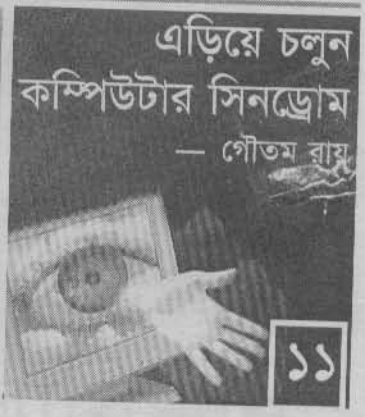

চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিস্ময় নিয়ে আসছে বায়োচিপ
— শেখ আনোয়ার ৩৭

অন্যান্য রচনা

চালের জিন মানচিত্র আবিষ্কার
–অতন্দ্র রহমান /৩

ডিসকভারি : নাসার নভো মিশন নাটক মঞ্চায়িত
–ফরিদুর রহমান পান্থ /১৪

ব্লু-রে নতুন ডিভিডি ফরম্যাট
–নুসরাত রহমান /১৬

ফ্রিডমশিপ : ঘরে বসেই পৃথিবী ভ্রমণ
–শামীম আহমদ /১৭

জিপিআরএস : প্রযুক্তির নতুন সম্ভাবনা
–হাসিব রেজা রনি /২০

বিদায় জ্যাক কিলবি
–রেজা আহম্মেদ/২৩

কাঁকড়ার জীবনসাথি বাছাইয়ের জটিল খেলা
–সুলতানা পারভীন /২৭

আজও কথা বলে হিরোশিমা
–সানিয়া জিহা /২৮

মহাবিশ্বের নিয়তি
–হীরক চৌধুরী /৩০

শিশুর হার্টে সমস্যা : বাবা মায়ের সাবধানতা জরুরি
–আসিফ আনোয়ার /৩২

সৌরজগতের দশম গ্রহ
–এবিএম সাইফুল ইসলাম/৩৪

ইন্টারনেটে স্বাস্থ্যসেবা
– মোঃ গোলাম মোস্তফা/৪০

পশুরাজ
–সাদাত শাহরিয়ার/৪৬

নিয়মিত বিভাগ

২ চিঠিপত্র
৪ বিজ্ঞান বিশ্বের নতুন খবর
২৪ বিজ্ঞান প্রজন্ম
৪২ বিজ্ঞান বিচিত্রা
৪৭ সায়েন্স নলেজ
৪৮ বিজ্ঞান কুইজ
৩৬ বিতর্ক
৪৫ রিভিউ
৪৩ সায়েন্স ফিকশন : কেউ কথা রাখেনি

সম্পাদক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক
আতাউর রহমান কাবুল

সহযোগী সম্পাদক
এস এম মুকুল

সহকারী সম্পাদক
সরোয়ার হোসেন
গৌতম রায়

অতিথি লেখক
মাসুদ কামাল
ড. অরূপ রতন চৌধুরী
ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল

নিয়মিত লেখক
আসিফ, রেহানা পারভীন রুমা
পারভীন সুলতানা, শান্তা মারিয়া
ফারহানা মিলি, হিটলার এ হালিম
মাহবুব আনোয়ার শুভ, শফি ইসলাম
মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাদাত শাহরিয়ার
এ কে এম মুনির হোসেন
আনোয়ারুল হক খান

সার্কুলেশন
আমিনুল ইসলাম সোহাগ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫০৯৫
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৭১৭৫০৯৫

বিপণন
৩৭/১, বাংলাবাজার
দ্বিতীয় তলা, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫০৫৪, ০১৭১-১২০৭০১

মূল্য : পনের টাকা

প্রফেসর'স প্রকাশন, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত।

ই-মেইল : editor_sworld@yahoo.com

বহির্জাগতিক প্রাণ কী পৃথিবীর মতো হবে!

আসিফ

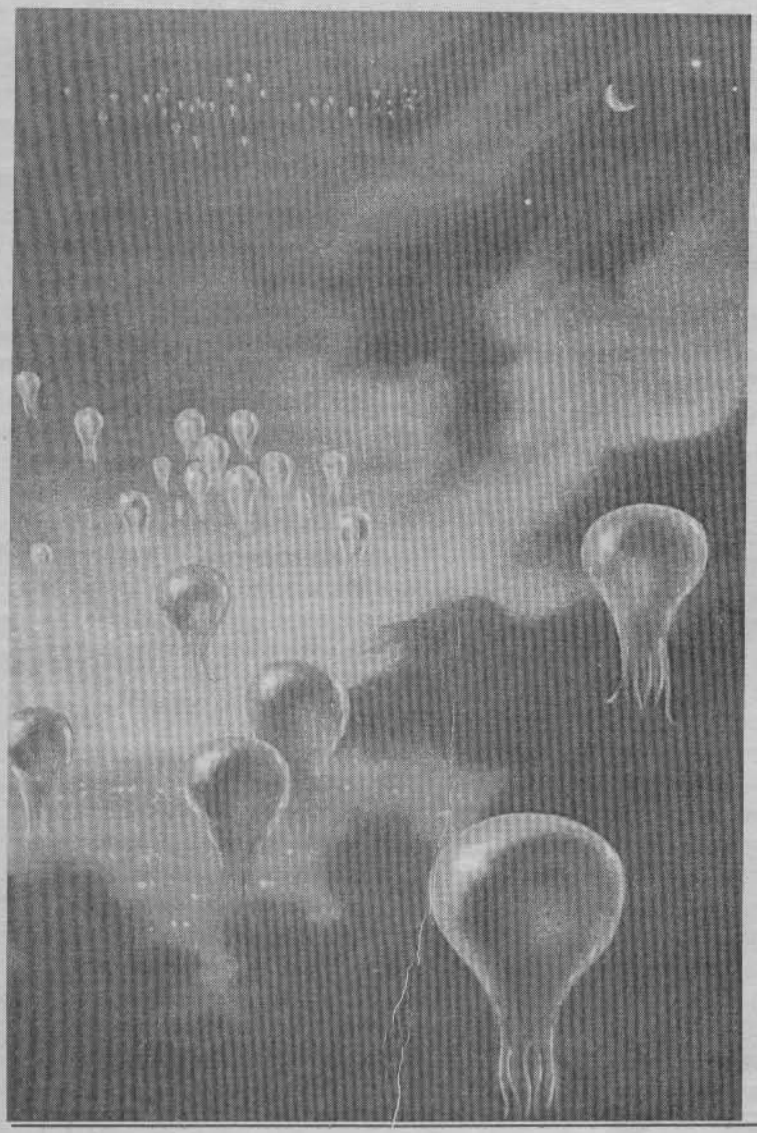

প্রাণের উৎপত্তি

আমাদের মানুষকে একটা গাছ হতে অনেক ভিন্ন দেখায়। সন্দেহ ছাড়াই বলা যায় গাছ অপেক্ষা আমরা ভিন্নভাবে জগৎকে উপলব্ধি করি। কিন্তু আমরা যদি গভীরে প্রবেশ করি, প্রাণের আণবিক ভিত্তিতে (Molecular Heart), তাহলে আমরা দেখবো গাছগুলো ও আমরা মূল উপাদানগতভাবে অভিন্ন। আমরা উভয়ই বংশগতির জন্য নিউক্লিক এসিড ব্যবহার করি; উভয়ই প্রোটিনকে এনজাইম হিসেবে আমাদের কোষ রসায়নকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করি। খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমরা উভয়েই যথাযথভাবে একই সংকেত গ্রন্থ ব্যবহার করি, নিউক্লিক এসিডের তথ্য প্রোটিনের তথ্যে রূপান্তরের জন্য এবং কার্যকর ক্ষমতা-সম্পন্ন আমাদের গ্রহে যত ধরনের প্রাণ আছে তারা সবাই এই কাজ করে*। আণবিক পর্যায়ের ঐক্যের ব্যাখ্যা থেকে এ কথা বলা যায় যে আমরা, আমাদের সবাই— গাছ, মানুষ, অ্যাংলার মাছ, রুটির ছত্রাক ও জলের শেওলা প্রাণ উৎপত্তির একটি একক এবং সাধারণ অবস্থা হতে বংশধর হিসেবে উদ্ভব ঘটেছে পৃথিবী নামক গ্রহের প্রাগৈতিহাসিক যুগে। কিন্তু কিভাবে জটিল অণুগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল?

***পাদটিকা :** এ পৃথিবীর সকল জীবের সকল অংশেরই জেনেটিক কোড অভিন্ন প্রতীয়মান হয়নি। কম করে হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে জানা যায় যে ডিএনএ তথ্য থেকে প্রোটিন তথ্যে প্রতিলিপি তৈরির কাজে মাইটোকন্ড্রিয়াতে ভিন্ন ধরনের সংকেত ব্যবহৃত হয়, যা ওই একই কোষে বিদ্যমান নিউক্লিয়াসের জিন কর্তৃক ব্যবহৃত সংকেত থেকে ভিন্নতর। এ বিষয়টি মাইটোকন্ড্রিয়া ও নিউক্লিয়াসের জেনেটিক কোডের সুদীর্ঘকালের ব্যবধানের প্রতি ইঙ্গিত করে এবং এটি এই ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ যে মাইটোকন্ড্রিয়া শতকোটি বছর আগে স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে কোষের সাথে শান্তিপূর্ণ মিথোজীবী সম্পর্কের ভিতর (Symbiotic Relationship) অবস্থান করছিল। ঘটনাচক্রে মিথোজীবীতার (Symbiosis) এই উন্নতি ও জটিল-সুক্ষ্ম ক্রিয়াকাণ্ডই হলো একটি উত্তর বিবর্তনের ওই ঘটনাক্রমটি সম্পর্কে যে এককোষী জীবের উৎপত্তি ও ক্যাম্ব্রিয়ান

বিস্ফোরণে বহুকোষী জীবের বিস্তারের মধ্যকার সময়ে চলছিল।}

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গবেষণাগারে, অন্যান্য জিনিষের মধ্যে, প্রাকজীবীয় (Prebiological) জৈব রসায়নের ওপর প্রাণসূরের কিছু নোট বা মূল উপাদান তৈরির জন্য কার্ল সাগান কাজ করেছেন। তিনি আদিম পৃথিবীর গ্যাসীয় উপাদান— হাইড্রোজেন, পানি, অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড একত্রে মিশিয়ে স্ফুলিঙ্গ দেন। ঘটনাক্রমে, বর্তমানে সবগুলো উপাদান বৃহস্পতিতেও বিদ্যমান, এমনকি মহাবিশ্বের সর্বত্র। বজ্রপাতের অনুরূপ স্ফুলিঙ্গ-

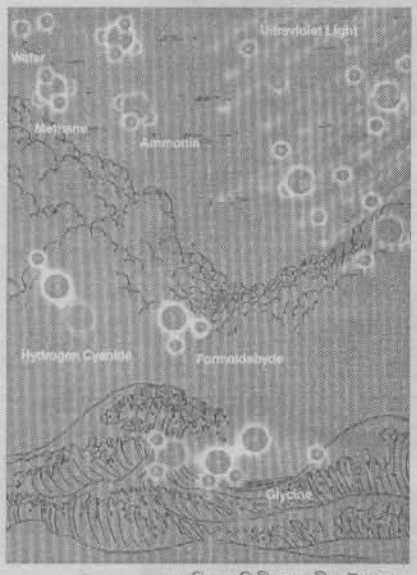

আদিম পৃথিবীর গ্যাসীয় উপাদান

যা প্রাচীন পৃথিবীতে এবং এখনকার বৃহস্পতিতেও বর্তমান। বিক্রিয়ার পাত্রটি স্বচ্ছ। প্রথমে নেয়া গ্যাসগুলোও রঙহীন অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে অদৃশ্য ছিল। কিন্তু ১০ মিনিট বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেয়ার পর দেখি একটা অদ্ভুত বাদামি বর্ণকণা (Pigment) কাচের জারের চারপার্শে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। পাত্রের ভিতরটা আস্তে আস্তে মোটা বাদামি আলকাতরা বা টার-এর আবরণে অস্বচ্ছ হয়ে গেল। যদি প্রাচীন সূর্যের মতো অতিবেগুনি রশ্মিও মিশ্রিত গ্যাসের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করা হতো তাহলে মোটামুটি একই ফল পাওয়া যেত। টার হলো জটিল জৈব-অণুর খুবই সমৃদ্ধ সমাবেশ, যেখানে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডের উপাদানগুলো অন্তভুক্ত থাকে। বোঝা গেল জীবনের উপাদানগুলো খুব সহজেই তৈরি হতে পারে।

এ ধরনের গবেষণা প্রথম করেছিলেন স্ট্যানলি মিলার ১৯৫০ এর দশকের প্রথম দিকে, তখন তিনি ছিলেন রসায়নবিদ হ্যারল্ড উরের গ্রাজুয়েট ছাত্র। উরে দৃঢ় মতামত দিয়েছিলেন যে, আদিম পৃথিবী হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু এক সময় এই হাইড্রোজেন পৃথিবী থেকে মহাশূন্যে চলে গেছে, কিন্তু অতিভর সম্পন্ন বৃহস্পতি থেকে হাইড্রোজেন বের হয়ে যেতে পারেনি; এবং পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল হাইড্রোজেন উধাও হওয়ার আগে। উরে পরামর্শ দিয়েছিলেন গ্যাসগুলোকে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দাও, তারপর কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিল — এ ধরনের পরীক্ষায় কি কি তৈরি হওয়ার আশা করছেন তিনি? উত্তরে উত্তর দিয়েছিলেন "Beilstein"। "Beilstein" বৃহদায়তন বিশিষ্ট ২৮ খণ্ডের জার্মান সংক্ষিপ্ত সার, যেখানে রসায়নবিদদের জানা সমস্ত জৈব অণুর তালিকা আছে।

আদিম পৃথিবীতে শুধুমাত্র সহজলভ্য গ্যাসগুলো এবং প্রায় রাসায়নিক বন্ধনকে ভেঙে ফেলার সামর্থ্য সম্পন্ন যে কোনো শক্তির উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা উৎপন্ন করতে পারি প্রাণের মূল কাঠামোর উপাদানগুলো। কিন্তু আমাদের পাত্রে তৈরি হয় শুধুই প্রাণ সূরের স্বরগুলো (আওয়াজগুলো); প্রাণসূর নয়। আণবিক কাঠামোর উপাদানগুলোকে অবশ্যই একত্রে মিলতে হবে সঠিক অনুক্রমে। প্রাণ মানেই অ্যামিনো অ্যাসিড অপেক্ষা অধিক কিছু যা প্রোটিন তৈরি করতে পারে এবং নিউক্লিটাইড, যা নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করতে পারে। তবে কি যথাযথভাবে এই কাঠামো উপাদানগুলোর লম্বা-শৃঙ্খলের বিন্যাসের মধ্য দিয়ে পরীক্ষাগারে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। প্রোটিন সদৃশ অণুর বিন্যাসে আদিম পৃথিবীর পরিবেশে অ্যামিনো এসিড একত্রিত হয়েছে। তাদের কতোকগুলো ক্ষীণভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন এনজাইমগুলো করে। নিউক্লিটাইডগুলো একত্রিত হয় অল্প কয়েক ডজন একক সম্পন্ন লম্বা নিউক্লিক এসিডের স্ট্রান্ডের শৃঙ্খলে। সঠিক পারিপার্শ্বিক অবস্থায় টেস্টটিউবে খাট নিউক্লিক অ্যাসিড তাদের নিজেদের অভিন্ন কপি সংশ্লেষণ করতে পারে।

কেউ এ পর্যন্ত আদিম পৃথিবীর গ্যাস ও পানি এমনভাবে একত্রে মেশায়নি যাতে পরীক্ষার শেষে টেস্টটিউব থেকে কোনো কিছু হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বা এসেছিল। সবচেয়ে ছোট জীবন্ত বস্তু গঠিত হয় ১০ হাজারেরও কম পরমাণু দিয়ে, যা ভাইরোড নামে পরিচিত। তারা ফসল/ফলানো উদ্ভিদে বিভিন্ন রোগ ঘটায়। সম্ভবত খুবই সাম্প্রতিককালে সরল অপেক্ষা অধিক জটিল প্রাণবস্তু থেকে তাদের উদ্ভব ঘটেছে। বাস্তবিকই, যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই ভাবি না কেন, বর্তমানে এর চেয়েও একটি সরল প্রাণের কল্পনা করা কঠিন যদি সেটা জীবন্ত হয়। ভাইরোডস ভাইরাসের মতো নয়, এর আবার প্রোটিনের আবরণ আছে এবং সামগ্রিকভাবে নিউক্লিক এসিড দিয়ে গঠিত। এগুলো সরল রৈখিক অথবা আবদ্ধ বৃত্তাকার জ্যামিতিসম্পন্ন আরএনএ'র একটি একক স্ট্রান্ড এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। ভাইরোড খুবই ছোট হতে পারে কিন্তু তখনও হয়ে ওঠে সতেজ। কারণ এগুলো সর্বব্যাপী, চিরপরজীবী জীবাণু। ভাইরাসের মতো এগুলো খুব সরলভাবেই বেশ বড় আকৃতির একটি সুষ্ঠু কার্যকলাপ সম্পন্ন কোষের অণু পর্যায়ের কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করে এবং একে আরও অধিক কোষ তৈরির ফ্যাক্টরি থেকে ভাইরোড (Viroid) তৈরির ফ্যাক্টরিতে রূপান্তরিত করে।

জানা সবচেয়ে ছোট মুক্ত-জীবী প্রাণ হলো PPLO (Pleuropneumonia-like Organism) এবং অনুরূপ ছোট পশু। এগুলো প্রায় ২৫কোটি পরমাণু দিয়ে গঠিত। এ ধরনের প্রাণগুলো, আরো স্ব-নির্ভরশীল এবং ভাইরোইড ও ভাইরাসের চেয়ে অধিকতর জটিল। কিন্তু আজকের পৃথিবীর পরিবেশ সরল প্রাণ গঠনের জন্য খুব একটা উপযোগী নয়। আপনাকে একটি জীবন তৈরির জন্য কঠিন কাজ করতে হবে। আপনাকে সতর্ক হতে হবে অগ্রগামী জীবাণু (Predators) সম্পর্কে। আমাদের গ্রহের প্রথম দিককার ইতিহাসে, যেভাবেই হোক, সূর্যের আলোয় হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ আবহমণ্ডলে বিপুল পরিমাণ জৈব অণু উৎপন্ন হওয়ার সময়, অল্প হলেও খুবই সরল, অ-পরজীবী (Non Parasitic) প্রাণ উদ্ভবের একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। প্রথম জীবন্ত বস্তুগুলো হয়ে থাকতে পারে অনেকটা মুক্ত জীবন্ত ভাইরোডের মতো শুধুমাত্র অল্প কয়েকশত নিউকিটাইডের লম্বা একটি শৃঙ্খল। শূন্য (Scratch) হতে শুরু করে এ ধরনের জীব সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। জেনেটিক কোডের উৎপত্তির ধারণার সহযোগিতা নিয়ে প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কিছু বোঝা গেছে। যদিও আমরা এ ধরনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছি মাত্র ৬০ বছর ধরে। প্রকৃতি এদিক থেকে ৪০০ কোটি বছর এগিয়ে আছে। সবকিছুর বিচারে, আমাদের অগ্রগতি মন্দ নয়।

বহির্জাগতিকরা দেখতে কেমন হবে

বিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানী কার্ল সাগান বলেছেন, "সারাজীবন আমি বিস্মিত হয়েছি আর কোনো স্থানে প্রাণের সম্ভাবনা আছে কিনা ভেবে। আর থাকলে তারা দেখতে কেমন হবে? কি দিয়ে তৈরি হবে? আমাদের গ্রহের সমস্ত জীবকুল জৈব-অণু দ্বারা গঠিত- এগুলো এমন এক জটিল আণুবীক্ষনিক কাঠামো যার মধ্যে কার্বন অণুগুলো মূখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রাণ উৎপত্তির পূর্বে একটা সময় ছিল, যখন পৃথিবীটা অনুর্বর এবং সম্পূর্ণ বিরান ছিল। এখন আমাদের পৃথিবী প্রাণের বন্যায় ভাসছে। কিন্তু কিভাবে এটা হলো? কেমন করে প্রাণের অনুপস্থিতিতে কার্বনভিত্তিক জৈব অণুগুলো তৈরি হয়েছিল? কিভাবে প্রথম জীবন্ত বস্তুগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল? কেমন করে প্রাণ আমাদের (মানুষের) মতো জটিল কাঠামোয় পৌছালো, যে আমরা আমাদের নিজেদের রহস্য উন্মোচনে সচেষ্ট?

অগুন্তি অন্যান্য গ্রহ যেগুলো অন্যান্য সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, সেখানে কি প্রাণ আছে? বহির্জাগতিক প্রাণ, অস্তিত্ব যদি এর থাকে তবে তা কি পৃথিবীর মতো একই ধরনের জৈব অণুর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে? অন্য জগতের প্রাণ কি দেখতে খুব বেশি পৃথিবীর মতো? অথবা তারা হতবুদ্ধিকরভাবে ভিন্ন; অন্য পরিবেশের কাছে অন্য ধরনের অভিযোজন। আর কি কি সম্ভব? পৃথিবীতে প্রাণের প্রকৃতি এবং আর কোনো জায়গায় প্রাণ আছে কিনা তার অনুসন্ধান হলো একই প্রশ্নের দুটো দিক। তা হলো আমরা কে তার অনুসন্ধান।"

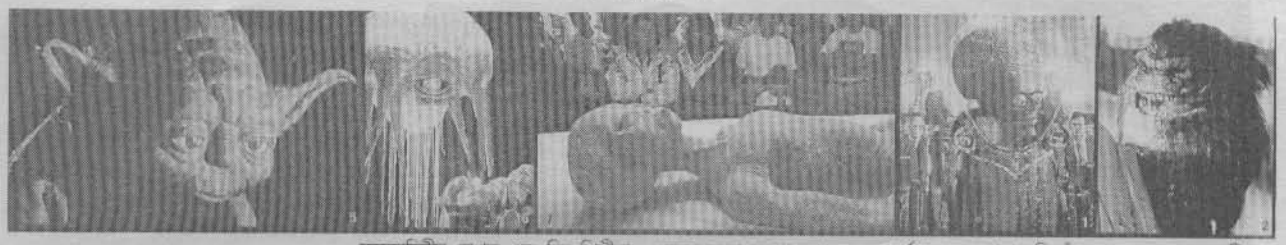

কল্পকাহিনীর লেখক এবং চিত্র শিল্পীরা-- অনেক সময় অনুমানের সাহায্যে বর্ণনা দেন অথবা ছবি আঁকেন অন্যজগতের প্রাণীদের

নক্ষত্রগুলোর মধ্যকার স্থানগুলো মহা অন্ধকারময়, সেখানে গ্যাসীয় মেঘ ও জৈব-বস্তু আছে। বেতার টেলিস্কোপের মাধ্যমে সেখানে কয়েক ডজন বিভিন্ন ধরনের জৈব অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এ-ধরনের জৈব অণুর প্রাচুর্য ইঙ্গিত দেয় যে প্রাণের উপাদান সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পর্যাপ্ত সময় দেয়া হলে সম্ভবত প্রাণের উৎপত্তি ও বিবর্তন হলো মহাজাগতিক অবশ্যম্ভাবিতা (Cosmic Inevitability)। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির শত শত কোটি গ্রহের কতকগুলোতে কখনোই প্রাণের উদ্ভব ঘটেনি। অন্যগুলোতে এটা ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু তা ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা প্রাণের সরল গঠন হতে খুব দূরে কখনও যেতে পারেনি। গ্রহজগতের অল্পকিছু অংশেই বুদ্ধিমত্তা ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে থাকতে পারে যারা হয়তো আমাদের থেকে এগিয়ে আছে।

প্রায়শ অনেকে মন্তব্য করে থাকেন যে অদ্ভুত যোগাযোগ ও সৌভাগ্যের সুবাদে এই পৃথিবী জীবনের জন্য পরিপূর্ণভাবে উপযোগী; মাঝারি তাপমাত্রা, তরল পানি, অক্সিজেন আবহমন্ডল ইত্যাদি। কিন্তু এটা আংশিকভাবে হলেও কার্যকারণের একটি বিভ্রান্তি। আমরা পৃথিবীবাসিরা সর্বত্তমভাবে পৃথিবীর পরিবেশের সাথে অভিযোজিত, কারণ এখানে আমরা জন্মেছিলাম, বড় হয়েছিলাম। ওই প্রাচীনতর প্রাণ কাঠামোগুলো যারা ভালোভাবে অভিযোজিত ছিল না তারা টিকে থাকতে পারেনি। ঐসব প্রাণীদের বংশধররূপে আমরা উদ্ভূত যারা ভালোভাবে টিকেছিল। এই প্রাণ যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ উদ্ভূত হতো তাহলে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় তা ঐ জগত বা গ্রহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতো।

পৃথিবীর সকল প্রাণীই ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত। আমাদের আছে একটি সাধারণ জীবরসায়ন ও একটি সাধারণ বিবর্তনীয় বংশগতি। ফলাফল হিসেবে বলা যায় আমাদের জীববিজ্ঞানীদের মারাত্মক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারা কাজ করেন জীববিজ্ঞানের শুধুমাত্র একটি ধরন নিয়ে, প্রাণসঙ্গীতের একটি নিঃসঙ্গ সুর (One lonely theme in music of life) নিয়ে।

হাজার হাজার আলোকবর্ষ বিস্তৃত এই ক্ষীণ রেশটি কি একমাত্র পরিপূর্ণ সুর? কিংবা এমন কি হতে পারে না যে শতকোটি কণ্ঠ অজস্র রাগ-রাগিনী ও সুরময় গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে কখনও সুরে কখনও বেসুর ঐকতানে জীবন সঙ্গীত গেয়ে যাচ্ছে গ্যালাক্সি থেকে গ্যালাক্সিতে? আদিম পৃথিবীতে সহজলভ্য গ্যাসগুলো ও রাসায়নিক বন্ধনকে ভেঙে ফেলতে পারে এমন যে কোনো শক্তির উৎসকে ব্যবহার করে আমরা উৎপন্ন করতে পারি প্রাণের মূল কাঠামোর উপাদানগুলো। কিন্তু আমাদের পাত্রে তৈরি হয় শুধুই প্রাণ সুরের স্বরগুলো; প্রাণসুর নয়। প্রাণ মানেই অ্যামিনো অ্যাসিড অপেক্ষা অধিক কিছু যা প্রোটিন তৈরি করতে পারে এবং নিউক্লিটাইড যা নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করতে পারে। তবে প্রথম দিককার গ্যাস ও শক্তির উৎসগুলো মহাবিশ্বের প্রায় সর্বত্র বিরাজমান। আমাদের পরীক্ষাগারের পাত্রে ঘটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যগুলোর মতোই আন্ত ঃনাক্রিক মহাশূন্যে জৈববস্তুগুলো উৎপাদন হওয়াটা একটা সাধারণ ব্যাপার এবং ইতোমধ্যে অ্যামিনো এসিড পাওয়া গেছে উল্কাপিণ্ডগুলোতে। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অন্য শতকোটি জগতে প্রায় একই ধরনের রসায়নের উদ্ভব ঘটে থাকবে। তাহলে বলা যায় প্রাণের অণুতে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলিত মহাবিশ্ব।

কিন্তু যদি অন্যান্য গ্রহের প্রাণও এখানকার প্রাণের মতো একই অণু রসায়নের উপর গড়ে ওঠে তাহলে এটা আশা করার কোনো কারণ নেই যে এগুলো আমাদের পরিচিত প্রাণের সদৃশ হবে। বিবেচনা করি পৃথিবীর বিশাল বৈচিত্র্যময় প্রাণিজগতের কথা, যারা প্রত্যেকে একই গ্রহে অবস্থান করে এবং অভিন্ন তাদের অণু জীববিজ্ঞান। যেসব প্রাণীদের কথা আমরা এখানে জানি সেগুলো থেকে ঐ অন্য গ্রহের পশুপাখী এবং শাক-শব্জিগুলো মূলগতভাবে ভিন্ন। হতে পারে সেখানেও একই ধরনের বিবর্তন কারণ সেখানেও নির্দিষ্ট একটি পরিবেশের প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র একটিই গ্রহণযোগ্য সমাধান থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গে বাইনোকুলার ভিশনের জন্য অনেকটা দুই চোখের কথা বলা যায়।

এগুলো থেকে আমরা বলতে পারি না একটা বহির্জাগতিক প্রাণীকে কেমন দেখাবে। আমরা ভীষণভাবে সীমাবদ্ধ সত্য দ্বারা তা হলো আমি জানি এক ধরনের প্রাণের কথা; পৃথিবীর প্রাণ। কেউ কেউ; বিশেষত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখক এবং চিত্রশিল্পীরা- অনেক সময় অনুমানের সাহায্যে বর্ণনা দেন অথবা ছবি আঁকেন অন্যজগতের প্রাণীরা কেমন দেখাতে পারে তার ওপর। কিন্তু বহির্জাগতিক প্রাণসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞরা বলেন, "ঐ ধরনের বহির্জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির বেশিরভাগগুলোই মনে হয় ইতোমধ্যে যেসব প্রাণ কাঠামোর কথা জানি তার ওপর খুব বেশি আস্থা রেখে তারা এ ধরনের প্রাণের কাঠামো তৈরি করেন। যে কোনো প্রাণের বিকাশ ঘটার জন্য একটা দীর্ঘ ধারার স্বতন্ত্র প্রায় অসম্ভব কিছু পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এটা মনে করা ঠিক না যে অন্য গ্রহের বা অন্যকোনো স্থানের প্রাণ দেখতে হবে অনেকটা সরিসৃপ অথবা একটা কীট-পতঙ্গ অথবা মানুষের মতো এমনকি সাথে

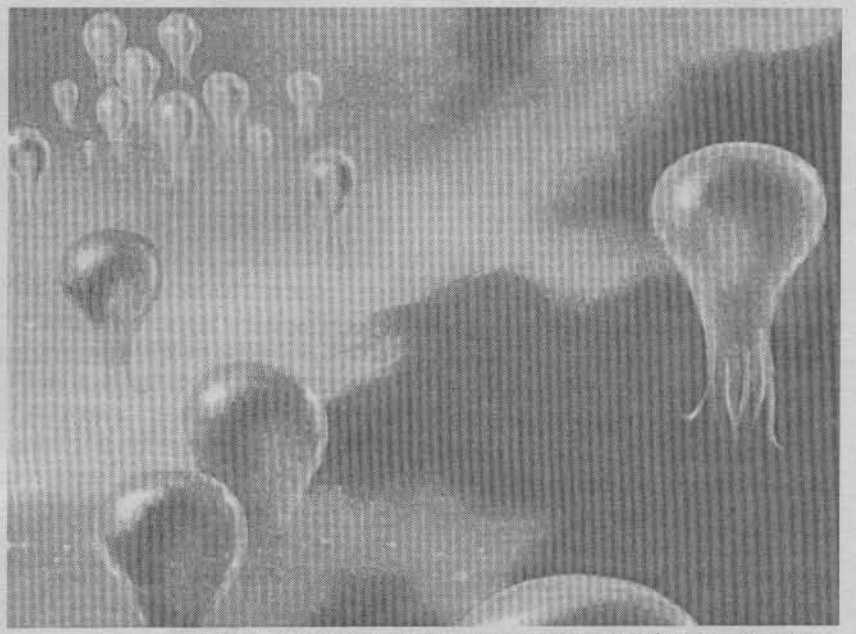

বৃহস্পতির মতো একটা বিশাল গ্যাসীয় গ্রহের আবহমণ্ডলর প্রাণ কাঠামো হতে পারে এরকম

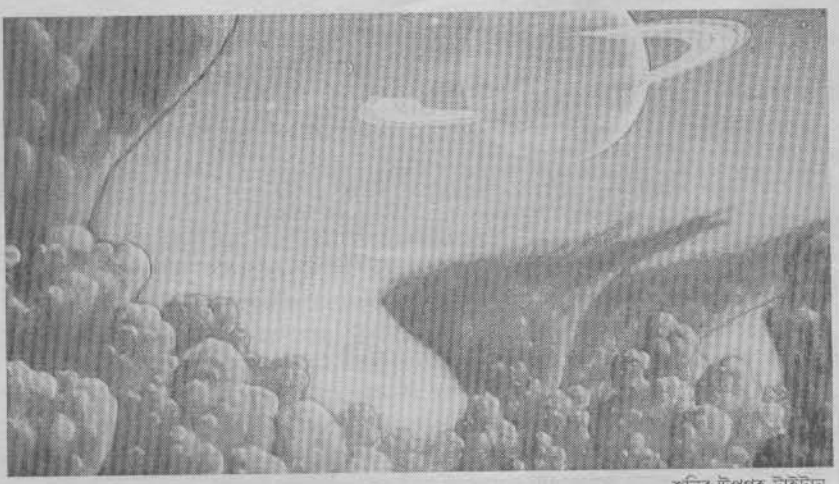

শনির উপগ্রহ টাইটান

থাকবে ক্ষুদ্র Cosmetic Adjustmens হিসেবে সবুজ চামড়া, বিন্দুবৎ কান, এবং এন্টিনা।" কিন্তু তারপরও যদি অনুমানের চেষ্টা করা হয় তাহলে এরকম বেশ ভিন একটা ধরনকে কল্পনা করা যায় :

বৃহস্পতি হল আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ। বৃহস্পতির মতো একটা বিশাল গ্যাসীয় গ্রহের আবহমণ্ডল হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন, পানি এবং অ্যামোনিয়াতে সমৃদ্ধ থাকে। এ ধরনের গ্রহে কোনো উপযুক্ত শক্ত পৃষ্ঠ নেই বরং একটি ঘনত্বসম্পন্ন, মেঘময় অবাহমণ্ডল আছে যার মধ্যে আকাশ হতে জৈব অণুগুলো পড়ছে অনেকটা আমাদের পরীক্ষাগারে উৎপন্ন জৈব অণুগুলোর মতো। যেভাবেই হোক এ ধরনের গ্রহে প্রাণের প্রতিকূলে চরিত্রগত বাধা আছে। এই আবহমণ্ডলটি খুবই ঝঞ্ঝাপূর্ণ (Turbulent) এবং গভীরে প্রচণ্ড উত্তপ্ত। একটা প্রাণিকে অবশ্যই নীচে পড়া ও ঝলসানো হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্ক হতে হবে। এ ধরনের খুবই ভিন্নরকম একটি গ্রহে প্রাণের বিকাশ যে প্রশ্নের বাইরে নয় এটা দেখানোর জন্য কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী ই.ই. স্লাপটার ও কার্ল সাগান একটা হিসাবে কষেছিলেন। অবশ্য এইভাবে নিখুঁত করে কিছু বলা সম্ভব নয় ঐ ধরনের জায়গায় প্রাণ কাঠামো কেমন হবে? আসলে তারা দেখাতে চাচ্ছিলেন রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকানুন মেনে এ ধরনের একটি গ্রহ বা জগতে প্রাণী অধ্যুষিত হওয়া সম্ভব হতে পারে।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে একটি জীবন্ত বস্তুকে টিকে থাকতে গেলে তাকে ঝলসানোর পূর্বে পুনরুৎপাদন করতে হবে এবং আশা করা যায় যে, পরিচলন প্রক্রিয়া তাদের বংশধরদের কিছু সংখ্যককে আবাহমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত উঁচু ও শীতলস্তরের দিকে নিয়ে যাবে। ঐ ধরনের প্রাণীগুলো খুব ছোট হতে পারে। আমরা তাদেরকে ডাকবো সিঙ্কার (Sinker) বলে। কিছু কিছু ফ্লোটারও (Floater) হতে পারে, এগুলোর বিশাল হাইড্রোজেন বেলুনগুলোর অভ্যন্তর থেকে হিলিয়াম ও অধিকতর ভারী গ্যাসগুলোকে বের করে দিয়ে হাইড্রোজেন ও হালকা গ্যাসগুলোকে ধরে রাখে; অথবা তারা একটা উত্তপ্ত বায়ুভরা বেলুনও হতে পারে যা তাদের আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা ব্যবহার করে প্লাবতাকে স্থির রাখে। যে খাদ্য এরা গ্রহণ করে তা থেকে অর্জিত তাপশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই কাজটি করে থাকে। পরিচিত পার্থিব বেলুনের মতোই, একটা ফ্লোটারকে যতই গভীরে নিয়ে যাওয়া হয় তার ওপর প্রযুক্ত আবহমণ্ডলের প্লবতা ততই বেড়ে যায় যা ফ্লোটারকে ঠেলে দেয় আবহমণ্ডলের আরও উঁচু, শীতলতর, নিরাপদ অঞ্চলের দিকে। একটি ফ্লোটার পূর্বের তৈরি জৈব অণুগুলোকে খায়, অথবা নিজেকে তৈরি করে সূর্যের আলো ও বায়ুমণ্ডল হতে; পৃথিবীর উদ্ভিদেরা যেভাবে শক্তি অর্জন করে। এভাবে একটা অবস্থা পর্যন্ত

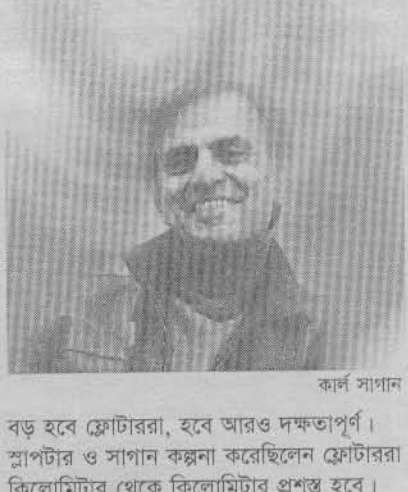

কার্ল সাগান

বড় হবে ফ্লোটাররা, হবে আরও দক্ষতাপূর্ণ। স্লাপটার ও সাগান কল্পনা করেছিলেন ফ্লোটাররা কিলোমিটার থেকে কিলোমিটার প্রশস্ত হবে। এত বড় যে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় তিমির চেয়েও বড়; শহরের আকার আকৃতির মতো।

ফ্লোটারগুলো নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে গ্যাসীয় পদার্থের দমকা আঘাতের সাথে; অনেকটা রামজেট অথবা রকেটের মতো। বিজ্ঞানীরা কল্পনা করেছিলেন তাদেরকে অলসভাবে বিচরণশীল প্রাণী হিসেবে, অন্তত চোখে দেখে তাই মনে হবে। তবে তাদের চামড়ায় থাকবে কিছু অভিযোজনক্ষম পরিবর্তনশীল বিন্যাস যা আসলে এক ধরনের ছদ্মবেশ, যা থেকে বোঝা যায় ফ্লোটারদেরও আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়। এ পরিবেশগত অবস্থায় পারস্পরিক পরিবেশগত উপযুক্ত বাস্তুস্থিতিস্থানের কারণে আরেক ধরনের প্রাণী কথা চিন্তা করা যায়। যেমন– হান্টার, এরা হলো দ্রুতগতিসম্পন্ন ও কৌশলী। হান্টাররা ফ্লোটারদের শরীরের জৈব অণুগুলো এবং তাদের জমা করে রাখা বিশুদ্ধ হাইড্রোজেনের জন্য তাদেরকে ধরে খাবে। স্বচালিত ফ্লোটারদের থেকেই প্রথম দিকের হান্টারদের বিকাশ ঘটে থাকতে পারে। সেখানে খুব বেশি হান্টাররা থাকতে পারে না, কারণ তারা যদি সমস্ত ফ্লোটারদের খেয়ে ফুরিয়ে ফেলে তাহলে খাদ্যের অভাবে তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র মেনে নেয় এই ধরনের প্রাণ কাঠামো (Life Form)। শিল্পক তাদেরকে বিভিন্ন গুণাদি ও সৌন্দর্য দ্বারা মনমুগ্ধকর করে তোলে। প্রকৃতি বাধ্য নয় এ ধরনের অনুমান অনুসরণ করতে। কিন্তু যদি শতকোটি প্রাণী অধ্যুষিত জগৎ থাকে এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে তাহলে সেখানে অন্তত কিছু সংখ্যক জগতে সিঙ্কার, ফ্লোটার, হান্টারদের মতো প্রাণীরা অধ্যুষিত হবে যা আমাদের কল্পনায় তৈরি হয়েছে পদার্থ ও রসায়নের নিয়ম মেনে। জীববিজ্ঞান হলো এ একটা বিজ্ঞান তা যত না পদার্থবিজ্ঞানের মতো তার চেয়ে বেশি ইতিহাসের মতো। বর্তমান বোঝার জন্য আমাদেরকে জানতে হবে অতীতকে এবং জানতে হবে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে। জীববিজ্ঞানে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তত্ত্ব নেই, যেমন নেই ইতিহাসে। কারণগুলো একই– উভয় বিষয় এখনও খুবই জটিল আমাদের কাছে। আমর আমাদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানি অন্যক্ষেত্রগুলো বোঝার দ্বারা।

কার্ল সাগান বলেন, "বহির্জাগতিক প্রাণে একটি ঘটনা– কোন বিষয় না তারা কি পর্যায়ের প্রাণ– জীববিজ্ঞানের দেখার দৃষ্টিভ সীমানা বাড়বে। প্রথমবারের মতো জীববিজ্ঞানীরা বুঝতে পারবে আর কি কি ধরনের প্রাণ কাঠামো সম্ভব। যখন আমরা ব বহির্জাগতিক প্রাণের অনুসন্ধান খুবই গুরুত্ব তখন এ কথা বোঝা না যে, আমরা নিশ্চয়ত দিচ্ছি বর্হিজাগতিক প্রাণের ব্যাপারে। আমর শুধু এ কথা বলতে চাচ্ছি, এই অনুসন্ধান মহামূল্যবান। পৃথিবীতে প্রাণের প্রকৃতি এবং আর কোনো জায়গায় প্রাণ আছে কিনা তার অনুসন্ধান হলো একই প্রশ্নের দুটো দিক। ত হলো 'আমরা কে' তার অনুসন্ধান, যা প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ করে আসছে। আমরা এ পর্যন্ত প্রাণের একটি সুর শুনেছি শুধুমাত্র এক ছোট্ট জগতে। কিন্তু অবশেষে আমরা শুনতে আরম্ভ করেছি মহাজাগতিক ঐক্যতানের অন্যান্য সুর (Other voices in the cosmi fugue)।

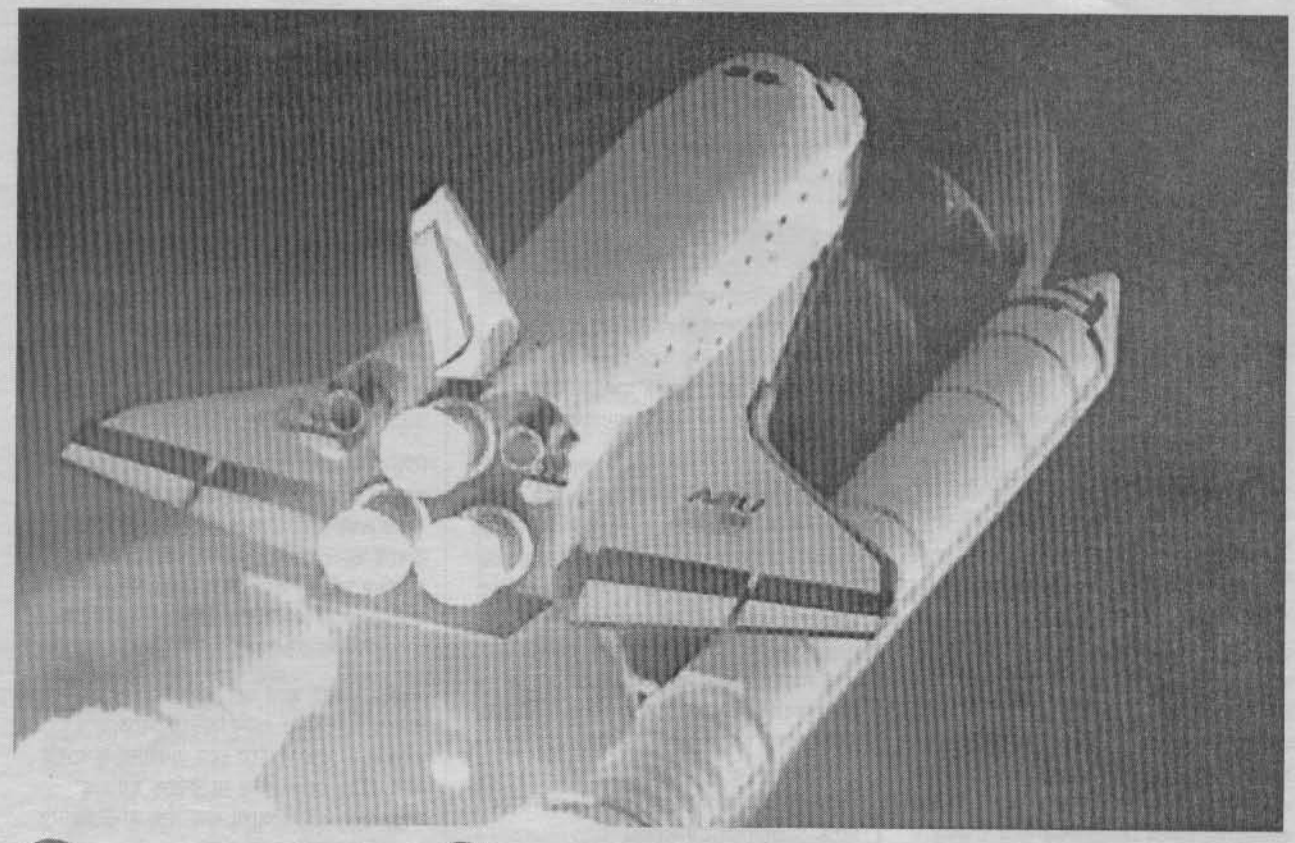

ডিসকভারি

নাসার নভো মিশন নাটক মঞ্চায়িত

ফরিদুর রহমান পান্থ

গবেষণা কাজ স্থগিত রেখে বেশ সময় নিয়ে আনন্দোৎসব করলেন মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার বিজ্ঞানী-গবেষকরা; নাচলেনও! কারণ এই মাত্র সব সংশয় আর দুশ্চিন্তা শেষ হয়েছে তাদের। সব ধরনের আশঙ্কামুক্ত হয়ে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছে তাদের নভোতরী ডিসকভারি। আর তাই চিৎকার চেচামেচিতে গরম করে তুললেন গবেষণা চত্বর।

যে নভোতরী কিনা একদিন আগেও ছিল দারুণ শঙ্কায়। পৃথিবী থেকে উড়ে যাওয়ার সময় ডানা থেকে দুটো টুকরো খসে পড়েছিল তার। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল আড়াই বছর আগে, মার্কিন নভোতরী কলাম্বিয়ার ক্ষেত্রে। সেবারও ডানা থেকে টুকরো খসেছিল। যার জের হিসেবে ফেরার পথে ধ্বংস হয়েছিল কলাম্বিয়া, নিহত হয়েছিলেন সাত নভোচারী। সে কারণে ডিসকভারি নিয়ে যারপরনাই শঙ্কায় ছিলেন মার্কিন গবেষকরা। তবে ইদানিং তারা শঙ্কামুক্ত। ফিরে পেয়েছেন সবেধন নীলমণি নভোতরী ডিসকভারি আর তাদের অভিজ্ঞ নভোচারীদের।

নাটকের শুরু

প্রথমত বেশ কবার প্রস্তুতি নিয়েও উড়তে পারেনি নাসার নভোতরী ডিসকভারি। এবারের মিশনটা বেশ ভোগাবে তা আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানীরা। তবুও হাল না ছেড়ে তারা শেষ পর্যন্ত উৎক্ষেপন কেন্দ্রে নিয়ে এলেন ডিসকভারিকে। এতদিন মুখিয়ে থাকা নভোচারীদের মুখে হাসি ফুটলেও কেমন যেন ফিকে দেখাচ্ছিল ওই হাসিকে। কারণ? তারা ততক্ষণে জেনে গিয়েছিলেন, যে নভোযানে তারা উঠছেন সেটি শতভাগ ফিট নয়। বেঁকে বসতে পারে যে কোনো সময়েই, ঝামেলায় ফেলতে পারে তাদের।

তবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের অসমাপ্ত কাজ করতে না যাওয়ার কোন বিকল্পও ছিল না তাদের। আর সে কারণেই ডিসকভারিতে উঠে বসেন তারা। মিশন কন্ট্রোল রুম থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে উড়ে যান কক্ষপথে। ওড়ার শুরুতেই ডানা থেকে এক দেড় ইঞ্চির দুটি ছোটখাট টুকরো খসে পড়তে দেখা গেল ডিসকভারির। দর্শকের মধ্যে কেউ খালি চোখে

যে নভোতরী কিনা একদিন আগেও ছিল দারুণ শঙ্কায়। পৃথিবী থেকে উড়ে যাওয়ার সময় ডানা থেকে দুটো টুকরো খসে পড়েছিল তার। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল আড়াই বছর আগে, মার্কিন নভোতরী কলাম্বিয়ার ক্ষেত্রে। সেবারও ডানা থেকে টুকরো খসেছিল। যার জের হিসেবে ফেরার পথে ধ্বংস হয়েছিল কলাম্বিয়া, নিহত হয়েছিলেন সাত নভোচারী। সে কারণে ডিসকভারি নিয়ে যারপরনাই শঙ্কায় ছিলেন মার্কিন গবেষকরা।

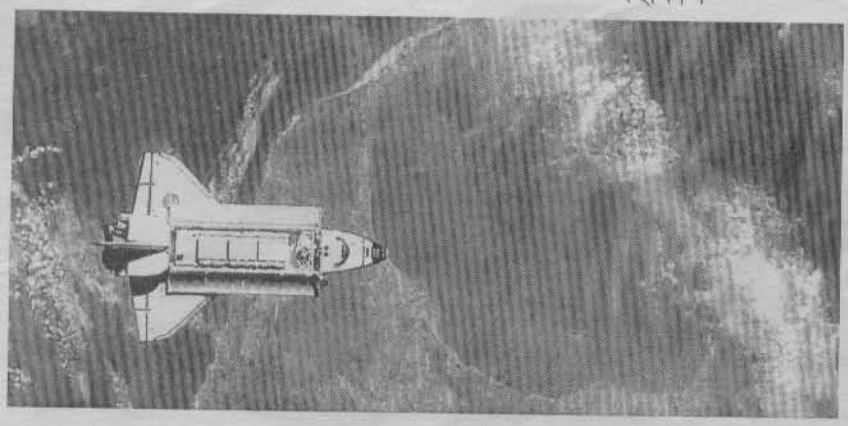

সংবাদটা শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠো না, ডিসকভারির ডানা থেকে দুটি টুকরো খসে পড়তে দেখা গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখ সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

বিষয়টি না ধরতে পারলেও নভোতরীর দিকে তাক করে থাকা শৎ খানেক শক্তিশালী ক্যামেরা ঠিকই ধরে ফেলে বিষয়টি। খবর ছড়িয়ে পড়ে, কলাম্বিয়ার মতো ডিসকভারিরও ডানার টুকরো খসেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন নাসার বিজ্ঞানী-গবেষকরা। অস্থির হয়ে ওঠেন নভোচারীদের আত্মীয়স্বজনরাও।

মিশন কন্ট্রোল থেকে নভোচারীদের জানিয়ে দেয়া হলো ঘটনাটি, "সংবাদটা শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠো না, ডিসকভারির ডানা থেকে দুটি টুকরো খসে পড়তে দেখা গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখ সব ঠিকঠাক আছে কিনা।" কন্ট্রোল থেকে মেসেজ পাওয়ার সাথে সাথে ডানার অংশে নেমে পড়েন নভোচারীরা। খুজে দেখেন ডানার সব কিছুই। সেখানে সত্যি সত্যি আতঙ্কিত হওয়ার কিছু না দেখে মিশন কন্ট্রোলকে জানিয়ে দেয়া হয়, তেমন কিছুই ঘটেনি।

কলাম্বিয়ার পর ডিসকভারি

২০০৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার নভোযান কলাম্বিয়া উৎক্ষেপণের দেড় মিনিটের মধ্যেই সামান্য এক টুকরো খসে অকেজো হয়েছিল একটি ডানা। হুবহু একই রকম ঘটনা ঘটেছে ডিসকভারির বেলাতেও। সেবার ওই ঘটনায় ফেরার পথে ধ্বংস হয়েছিল নভোযান কলাম্বিয়া, সাথে নিহত হয়েছিলেন সাত নভোচারীও। ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটুক নিশ্চিত করে তা চাইছিলেন না নাসার গবেষকরা। তারা অবশ্য বলেছিলেন, ওই ঘটনা দ্বিতীয় বার ঘটবে না, অন্তত ডিসকভারির বেলায় তো নয়ই।

আগে থেকে সতর্ক থাকায় ডানার অংশ খসে পড়ার পরে ডিসকভারির নভোচারীরা ডানার অংশে প্রবেশ করেন, নিশ্চিত হতে চেষ্টা করেন বিষয়টি। ডানার অংশে নামিয়ে দেয়া হয় রোবট। খোঁজা হয় লেজার রশ্মির মাধ্যমেও। সব দেখেশুনে ডিসকভারি জানায়, ভালোই আছি আমরা। বিপদের লক্ষণই নেই। তাতেও ভয় কাটেনি কন্ট্রোল রুমের গবেষকদের। কারণ এমনই একটি ছোট্ট টুকরো খসে পড়ার ঘটনায় ধ্বংস হয়েছিল কলাম্বিয়া!

ঐ দুর্ঘটনার পর আড়াই বছর কক্ষপথে যায়নি নাসার কোন নভোচারী। আর তাই এবারে একটু বেশিই সতর্ক তারা। তবে নভোচারীরা ঝামেলার কিছু না দেখলেও দুঃশ্চিন্তা শুরু হয়ে যায় গবেষকদের। কারণ ডিসকভারি নিয়ে পৃথিবীতে ঠিকঠিক ফিরে আসতে হলে নভোচারীদের সেটা মেরামত করেই ফিরতে হতো। নয়তো অপেক্ষা করতে হতো ব্যাকআপ টিমের জন্য। যার কোনাটিই সহজ ছিল না নাসার জন্য। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গিয়ে আগাগোড়া পরীক্ষা চলে ডিসকভারির। তাতে খারাপ কিছু না দেখে নভোচারীরা ডিসকভারিতে করেই ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবং শেষ পর্যন্ত ফিরেও আসেন।

শেষ দৃশ্য

তবে ফেরার পথেও কম নাটক হয়নি। দিনক্ষণ নির্ধারিত থাকলেও ওই দিন ফেরা হয়নি ডিসকভারির। এবারে অবশ্য কোন যান্ত্রিক গোলোযোগ নয়। সমস্যা ছিল প্রাকৃতিক। আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে নির্ধারিত স্থান ফ্লোরিডায় না নেমে ডিসকভারিকে নামতে হয় ক্যালিফোর্নিয়ায়। ৮ আগস্ট নামার কথা থাকলেও একদিন পর ৯ আগস্ট পৃথিবীর মাটি ছোঁয় নভোতরী, বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫টা ১২ মিনিটে। নভোচারীরা ফিরে আসেন সফলতার সাথেই এবং এখন তারা সকলে সুস্থই আছেন। দেখা হয়েছে পরিবার ও স্বজনদের সাথে।

বিকল্প স্থানে নামার বিষয়টি আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল নভোচারীদের, 'তোমরা আজ পৃথিবীতে নামছো, তবে ফ্লোরিডায় নয় ক্যালিফোর্নিয়ায়।' নভোতরী ডিসকভারি নামার জন্য ক্যালিফোর্নিয়াতে নেয়া হয়েছিল ব্যাপক নিরাপত্তা। ছিল অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশের গাড়ি। বিকল্প স্থানে অবতরণ করার জন্য নাসাকে গুণতে হয়েছে বাড়তি ১০০ কোটি ডলার! এদিকে ডিসকভারি সফলতার সাথে পৃথিবীতে ফেরার পর প্রাণ খুলে হাসতে পারছেন নাসার বিজ্ঞানী-গবেষকরা। উঁচু গলায় কথাও বলছেন, আমাদের জানাই ছিল ডিসকভারি ঠিকঠিক ফিরে আসবে। যদিও কদিন আগেই গলা শুকিয়ে এসেছিল তাদের। মিশনের ১৪ দিন তাদের নাওয়া-খাওয়াও অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল।

কল্পনা স্মৃতি

ওদিকে ডিসকভারি অবতরণ উপলক্ষে দিনভর (৯ আগস্ট) প্রার্থনা করে গেছে নিহত ভারতীয় নভোচারী কল্পনা চাওলার স্কুল কার্নালের ঠাকুর বল নিকেতন সিনিয়র সেকেন্ডারির ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের মিনতি ছিল, কল্পনা দিদির মতো আর কারও যেন অমন মৃত্যু না হয়। কল্পনা ২০০৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কলাম্বিয়া মিশনের নভোচারী ছিলেন। ঐ দুর্ঘটনায় নভোতরীর সাথে যে সাত নভোচারী নিহত হয়েছিলেন ভারতের কল্পনা চাওলা ছিলেন তাদের একজন। কল্পনার ওই স্কুলের সাথে নাসার বেশ যোগাযোগ রয়েছে। যোগাযোগটা করে দিয়েছিলেন কল্পনা নিজেই। প্রতিবছর নাসার ওই স্কুল থেকে দু-একজনকে আমন্ত্রণ জানায়। যারা নাকি বছরে মহাকাশ গবেষণায় খরচ করেন ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, তাদের এ অবস্থা মেনে নেয়া কঠিনই।

ডিসকভারির নভোচারীরা

জিপিআরএস

প্রযুক্তির নতুন সম্ভাবনা

হাসিব রেজা রনি

জিপিআরএস মূলত এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে রেডিও কাভারেজের জন্য তথ্য প্রেরণ বা গ্রহণ করা যায়। জিপিআরএস মূলত এমন একটি ইন্টারনেটভিত্তিক উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে মোবাইলের সাহায্যে নির্দিষ্ট (১০০ কিলোবাইট) পরিমাণ ডাটা বা তথ্যাবলি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রাহকদের মধ্যে আদান-প্রদান করা যায়।

বর্তমান দৈনন্দিন জীবনযাপনে অপরিহার্য, নিত্যব্যবহৃত সঙ্গী মোবাইল ফোন। যোগাযোগের মাধ্যম মোবাইল ফোন ছাড়া কারও এখন চলছে না। ক্রমাগত উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে মোবাইল ফোনে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা। তাই মোবাইল ফোন বা হাতের সেলুলার ফোনটি এখন আর শুধুমাত্র কথা বলার বস্তু নয় কিংবা বিলাসিতা নয়। কথা বলার সাথে সাথে আপনি হাতের ফোনটিতে গেমস খেলতে পারবেন (প্রয়োজনে নতুন গেম ডাউনলোড করে খেলতে পারবেন), মেসেজ পাঠাতে পারবেন, গান শুনতে পারবেন কিংবা শোনাতে পারবেন, ছবি দেখা, ছবি তোলা কিংবা টিভি দেখা (উন্নত বিশ্বে) সবই সম্ভব এতে। সাথে পাওয়া যাবে বিভিন্ন খবরাখবর; যেমন : পত্রিকা, রাশিফল, যানবাহনের সময়সূচি, সিনেমার খবর প্রভৃতি। এসব বিভিন্ন আনুসঙ্গিক সুবিধা নিশ্চিত করতে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর সাহায্যার্থে তারা ব্যবহার করছে নিত্যনতুন বিভিন্ন প্রযুক্তি। এর ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক আরেকটি প্রযুক্তি। এর নাম জিপিআরএস। যার পুরো ডেফিনেশন 'দ্য জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস' সংক্ষেপে যদি বলি তাহলে বলতে হয় এর মাধ্যমে আপনি বিশ্বের সাথে সার্বক্ষণিক যুক্ত হতে পারবেন। তাহলে আসুন জিপিআরএস সম্পর্কে কিছু জেনে নেয়া যাক :

জিপিআরএস : আলোচনার শুরুতেই যা আসতে পারে তা হলো, জিপিআরএস মূলত কি? মূলত মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর ভাষায় বলা হয় জিপিআরএস একটি ভ্যালু অ্যাডেড ননভয়েস সার্ভিস যা মোবাইল, টেলিফোন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ এবং প্রেরণ করে থাকে। তবে এখানে আরেকটি কথা বলা যেতে পারে জিপিআরএস কিন্তু গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিএসএস)

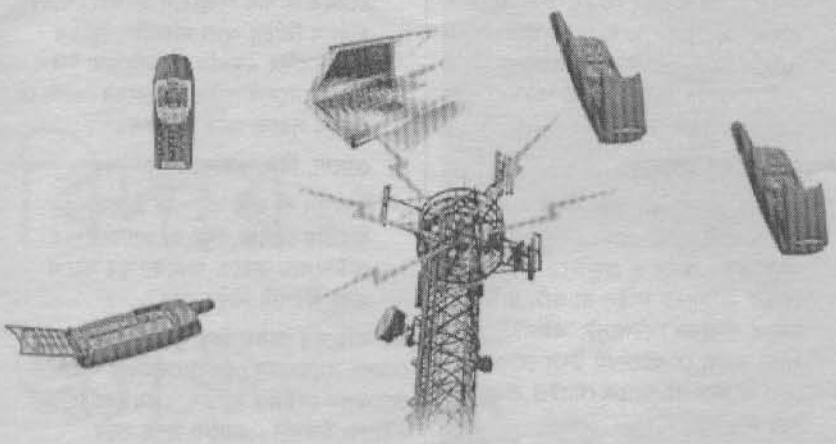

এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। জিপিআরএস মূলত এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে রেডিও কাভারেজের জন্য তথ্য প্রেরণ বা গ্রহণ করা যায়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে জিপিআরএস মূলত এমন একটি ইন্টারনেটভিত্তিক উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে মোবাইলের সাহায্যে নির্দিষ্ট (১০০ কিলোবাইট) পরিমাণ ডাটা বা তথ্যাবলি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রাহকদের মধ্যে আদান-প্রদান করা যায়।

আমাদের দেশে বর্তমানে জিএসএম প্রযুক্তির চলন বেশি। মোবাইল প্রোভাইডারদের এই সার্ভিসকে বলা হচ্ছে ২-জি সার্ভিস। তবে ২-জি এবং অত্যাধুনিক থ্রি-জি মোবাইলের মাঝামাঝির পর্যায়কে বলা যেতে পারে জিপিআর ক্ষেত্র। কেননা জিপিআরএস মোবাইল টেকনোলজি সার্ভিসকে সেকেন্ড জেনারেশন থেকে উন্নীত করে সেকেন্ড এবং থার্ড জেনারেশনের মাঝামাঝি পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। জিপিআরএস আগের মোবাইল সার্ভিস অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে আরও উন্নত করেছে। যেমন– আগে জিএসএম নেটওয়ার্কের সার্কিট সুইচড ডাটার গতি ছিল ৯.৬ কেবিপিএস; যা এখন অনেক বেড়ে গেছে। আর বিভিন্ন মেসেজের সীমাবদ্ধতা ছিল ১৬০ ক্যারেক্টার। যে কারণে অনেক সার্ভিস অ্যাপ্লিকেশন প্রেরণে কিংবা বোধগম্য হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতো। সে সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করা যাবে জিপিআরএস প্রযুক্তির মাধ্যমে। সাধারণ এসএমএস করে ডাটা ট্রান্সফার করা যায় তবে এক্ষেত্রে জিপিআরএস ব্যবহার করলে অন্তত দশগুণ বেশি দ্রুতগতিতে করা যাবে।

বর্তমানে এ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ গতি ১৭১.২ কিলোবিট/সেকেন্ড। অবশ্য এ গতি পেতে হলে এর আটটি টাইমস্লটের সবকটি একই সময়ে ব্যবহার করতে হবে। জিপিআরএস প্রযুক্তিতে হাতের মোবাইলটিকে মডেম হিসেবে ব্যবহার করে ইন্টারনেটে ব্রাউজ করা যাবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোনো ডায়াল আপ মডেমের প্রয়োজন হবে না। এ সুবিধা পাওয়ার জন্য স্রেফ মোবাইল থেকে নির্দিষ্ট নম্বরে সংযোগ নিলেই হবে। সেক্ষেত্রে ওই মোবাইল অপারেটরের নেটওয়ার্কভুক্ত যে কোনো এলাকার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা যাবে। এ ধরনের কানেকশনের জন্য জিপিআরএস ব্যবহারকারীদের 'অলওয়েজ ওয়েব কানেকটেড' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন নেটওয়ার্কের সার্ভিস অ্যাপ্লিকেশনের গতি বেড়ে যাবে, ঠিক তেমনি তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সার্কিট সুইচড ডাটা কিংবা এসএমএস সার্ভিসের চেয়ে খরচ অনেকটা কমে যাবে।

নেটওয়ার্ক সিস্টেম

মোবাইল ব্যবহারকারীরা সাধারণত রেডিও চ্যানেল ব্যবহার করে থাকেন। যেহেতু জিপিআরএস রেডিও সিস্টেম চ্যানেল বেইজড, সেহেতু দেখা যায় কয়েকজন জিপিআরএস গ্রাহক একই ব্যান্ডউইডথ্ শেয়ার করতে পারেন। অর্থাৎ যখন ব্যবহারকারীরা ডাটা গ্রহণ কিংবা প্রেরণ করেন তখন জিপিআরএস-এর রেডিও রিসোর্স ব্যবহৃত হয়। জিপিআরএস মূলত প্যাকেট বেইজড এয়ার ইন্টারফেস স্থাপন করে থাকে জিএসএম নেটওয়ার্কের ওপর। এর মাধ্যমে মোবাইল গ্রাহক প্যাকেট বেইজড ডাটা সার্ভিস ব্যবহার করতে পারেন। প্যাকেট ডাটার অন্যতম উদাহরণ হিসেবে ইন্টারনেটকে সাধারণত জিপিআরএস এর সার্কিট সুইচড নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার এবং প্যাকেট সুইচিং মিলে সেবার অপশন তৈরি করে ফেলে। জিপিআরএস প্রযুক্তিতে ডাটা বা তথ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে তথ্যগুলো অনেকগুলো ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে মূল কেন্দ্রে বা প্রোভাইডারের ক্ষেত্র হয়ে পুনরায় প্রাপকের কাছে পৌঁছে যায়। ইমেজ এলোমেলো অবস্থানে থাকলেও তা আসলে একই প্রতিচ্ছবির বিভিন্ন অংশ বা টুকরো। প্রাপকের কাছে পৌঁছে এসব ইমেজ পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে ফেলে। জিপিআরএস পদ্ধতি ব্যবহারকারীদের কাছে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হবে। কেননা এক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার আন্তরিকতা এবং দক্ষতা অনেকটা সংযুক্ত। যেহেতু জিপিআরএস-এর ক্ষেত্রে স্পেকট্রাম এফিশেন্সির সুবিধা পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক প্রোভাইডারদারকে ক্যাপাসিটির ব্যাপারে তেমন চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন পড়ে না। জিপিআরএস এর নিরাপত্তা বিষয়টি বেশ চমৎকার। কেননা মোবাইল কোম্পানিগুলোকে ২৪ ঘণ্টাই সেবা প্রদান করতে হয়। সুতরাং সে কারণে তাদের ইমারজেন্সি কিংবা সিকিউরিটি ইউনিট যথেষ্ট তৎপর থাকে। তাছাড়া মোবাইল কোম্পানিগুলোর রেডিও লিংক যথেষ্ট শক্তিশালী। এক্ষেত্রে ভাইরাস বা স্পার্ম দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। এ পদ্ধতির আরেকটি দিক হলো যেহেতু এতে কোনোপ্রকার পর্ণোগ্রাফি কিংবা অনৈতিক কাজের সুযোগ নেই, সেহেতু নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা আরো সুসংগঠিত। মোবাইল প্রোভাইডাররা সংযোগ দেয়ার আগে কিছু টার্মস এন্ড কন্ডিশন দিয়ে থাকে এবং এগুলো যথাযথভাবে মেনে চলতে হয়। সুতরাং হ্যাকিং বা ভাইরাস তৈরির সুযোগ থাকে না।

জিপিআরএস সুবিধা নিতে হলে যা যা প্রয়োজন

জিপিআরএস সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রথমত স্থানীয় মোবাইল অপারেটরদের জিপিআরএস সুবিধা ব্যবহার করা যাবে এমন স্টেশন বা টার্মিনাল থাকতে হবে।

জিপিআরএস প্রযুক্তিতে হাতের মোবাইলটিকে মডেম হিসেবে ব্যবহার করে ইন্টারনেটে ব্রাউজ করা যাবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোনো ডায়াল আপ মডেমের প্রয়োজন হবে না। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য স্রেফ মোবাইল থেকে নির্দিষ্ট নম্বরে সংযোগ নিলেই হবে।

ব্যবহারকারীদের অবশ্যই জিপিআরএস সুবিধা সম্বলিত সেট ব্যবহার করতে হবে।

ব্যবহারকারীদের অপারেটরের কাছ থেকে এ সংযোগ নিতে হবে।

দেশের মোবাইল অপারেটরদের ভালো মানের কাস্টমার সার্ভিস তৈরি করা প্রয়োজন যাতে গ্রাহকদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়।

গ্রাহক বা ব্যবহারকারীকে জিপিআরএস প্রযুক্তির কার্যকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হবে।

কম্পিউটারের ইন্টারনেট সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকলে ভালো হয়।

জিপিআরএস-এর সুবিধাসমূহ

১. **মোবাইলে ইন্টারনেট ব্রাউজিং**
জিপিআরএস সংযোগের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করা সম্ভব হবে। পূর্বের মোবাইলগুলোতে এটি তেমন সম্ভব হতো না। এছাড়া সার্কিট সুইচড ডাটার মাধ্যমে ব্রাউজ করা কষ্টকর ছিল। কেননা এটার গতি খুব কম এবং ডাটা সার্ভার থেকে ইউজারের কাছে পৌঁছাতে অনেক সময় প্রয়োজন হতো। এছাড়া শুধুমাত্র টেক্সট ব্যবহার করা গেলেও ইমেজ নিয়ে কাজ করা যেত না। কিন্তু জিপিআরএস প্রযুক্তি দিয়ে অনায়াসে ব্রাউজিং করা সম্ভব।

২. **কর্পোরেট ই-মেইল**
জিপিআরএস সুবিধার মাধ্যমে কর্পোরেট ই-মেইল সুবিধা পাওয়া যাবে। এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে স্বীয় অফিসের সবার সাথে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে লোকাল এরিয়ার নেটওয়ার্ক (ল্যান) ব্যবহৃত হয়। কর্পোরেট মেইলের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকে মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ, মাইক্রোসফট মেইল, আউটলুক, আউটলুক এক্সপ্রেস, লোটাস নোট, লোটাস সিসি মেইল প্রভৃতি। কর্পোরেট ই-মেইলের ক্ষেত্রে সাধারণ মেইলের চেয়ে জিপিআরএস ক্যাপাবল ডিভাইসের মাধ্যমে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়।

৩. **টেক্সটচুয়্যাল এবং ভিজ্যুয়াল ইনফরমেশন**
জিপিআরএস প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকরা বিভিন্ন ইনফরমেশন পাবেন। যেমন— বিমান সম্পর্কিত, যানবাহন, খেলাধুলা, নিউজ হেডলাইন, রাশিফল, ভালোবাসা, ট্রাফিক, শেয়ার মূল্য, আবহাওয়া প্রভৃতি। আগের এসএমএসগুলো ছিল ১৬০ ক্যারেক্টার। সেক্ষেত্রে অনেক ইনফরমেশন পরিপূর্ণভাবে পাঠানো সম্ভব হতো না। কিন্তু জিপিআরএস-এর কোয়ালিটেটিভ ইরমেশন চ্যাটিং-এর মাধ্যমে দেয়া সম্ভব। অবশ্য এজন্য ব্যবহারকারীর কাছে জিপিআরএস ক্যাপাবল ডিভাইস থাকতে হবে। এটা কেবল জিপিআরএস মাধ্যমেই সম্ভব। কেননা এসএমএস এর মাধ্যমে চ্যাটিং করা সম্ভব নয়।

৪. **স্টিল ইমেজ**
এ সংযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন স্টিল ইমেজ। যেমন : ফটোগ্রাফ বা ছবি, পোস্টকার্ড, গ্রেটিংস কার্ড, পোস্টার, প্রেজেন্টেশন, স্টাটিক ওয়েব পেইজ প্রভৃতি পাঠানো এবং গ্রহণ করা সম্ভব।

৫. **ডাটা/ফাইল ট্রান্সফার**
সাধারণ এসএমএস-এর ক্ষেত্রে সাধারণত যে সমস্যাটি হতো এক্ষেত্রে সে সমস্যাটি অনুপস্থিত। অর্থাৎ এ প্রযুক্তিতে আপনি যে কোনো আকারের ফাইল বা ডাটা ট্রান্সফার করতে পারবেন। টেলনেট, এইচটিটিপি, জাভা অথবা যে ধরনেরই উৎস হোক না কেন এ নিয়ে আপনাকে মোটেও ভাবতে হবে না।

৬. **গান বা রিংটোন ডাউনলোড**
জিপিআরএস প্রযুক্তিতে যে ধরনের গান বা থিম মোবাইলের রিংটোন হিসেবে ডাউনলোড করতে পারবেন আরও সুচারুরূপে এবং সুন্দরভাবে।

৭. **চ্যাটিং**
আমরা সাধারণত চ্যাটিং বলতে আলাপচারিতাকেই বুঝি। এটা একজন ব্যক্তির দ্বারা হতে পারে আবার ইন্টারনেট সাইটের মাধ্যমেও হতে পারে। এ প্রযুক্তির সাহায্যে যেমন নিশ্চিন্তে চ্যাটিং করা যায় আবার প্রয়োজনে চ্যাটিং গ্রুপ তৈরি করা যায়। এছাড়া চ্যাটিংকারীদের সংখ্যা, এমনকি আলোচনার বিষয়ও জানা সম্ভব এ প্রযুক্তির মাধ্যমে।

৮. **মুভিং ইমেজ**
এক্ষেত্রে আপনি ভিজ্যুয়াল ইনফরমেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশ মনিটরিং, ভিডিও কনফারেন্সিং এমনকি মাল্টিমিডিয়া টাইপ বিভিন্ন মেসেজ পাঠাতে পারবেন। সেটা যে কোনো দূরত্বে হোক না কেন।

৯. **লোগো, থিম, ওয়ালপেপার**
প্রয়োজন বা রুচি অনুসারে এ ধরনের যাবতীয় লোগো, থিম বা ওয়ালপেপার ডাউনলোড করতে পারবেন খুব সহজে এবং অবশ্যই নিখুঁতভাবে।

এর বাহিরেও আরও কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন– বায়োডাটা প্রেরণ, ভেহিকল পজিশনিং, লোকেশন বেইজড সার্ভিস, হোম কোচিং, উইম্পিং ইত্যাদি। এগুলো সবই সম্ভব জিপিআরএস প্রযুক্তির মাধ্যমে। আমাদের দেশে জিপিআরএস প্রযুক্তি এখনও সেভাবে পরিচিতি লাভ করেনি বা এর প্রচলন এখনও ব্যাপকভাবে হয়নি। সামান্য কিছু পরীক্ষামূলক সংযোগ দেয়া হচ্ছে। তবে উন্নত বিশ্বে জিপিআরএস অত্যন্ত পরিচিত প্রযুক্তি। অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, ইংল্যান্ড, জার্মান, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে অনেক আগেই এ প্রযুক্তি পৌঁছে গেছে। সুতরাং সেদিক থেকে আমরা পিছিয়ে আছে। তবে প্রযুক্তি প্রচলনের পাশাপাশি এ সুবিধা যাতে সবাই গ্রহণ করতে পারে এবং নাগালের মধ্যে থাকে সেদিকে প্রোভাইডারদের নজর দিতে হবে। এ প্রক্রিয়া সফল হলে তবেই প্রযুক্তিগত সফলতা আসবে। অন্যথায় নয়।

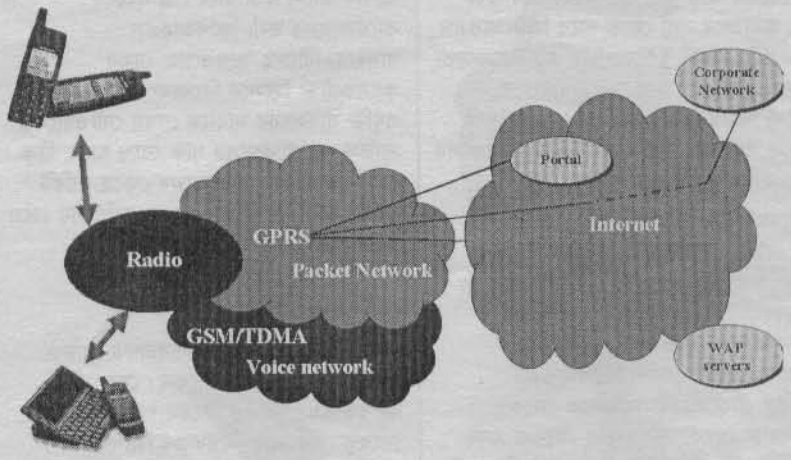

প্রয়োজন বা রুচি অনুসারে লোগো, থিম বা ওয়ালপেপার ডাউনলোড করতে পারবেন খুব সহজে এবং অবশ্যই নিখুঁতভাবে। এর বাহিরেও আরও কিছুটা সুবিধা রয়েছে। যেমন– বায়োডাটা প্রেরণ, ভেহিকল পজিশনিং, লোকেশন বেইজড সার্ভিস, হোম কোচিং, উইম্পিং ইত্যাদি। এগুলো সবই সম্ভব জিপিআরএস প্রযুক্তির মাধ্যমে।

আজও কথা বলে হিরোশিমা

সানিয়া জিহা

"বোমাটি হিরোশিমা শহরটাকে অকেজো করে দিয়েছে। এর ফলে মানুষ মারা গেছে অসংখ্য। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস বদলে গেছে চিরদিনের জন্য। রক্ষা পেয়েছে অনেক আমেরিকানের জীবন।" এটা ছিল তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের এমন এক বক্তব্য যেখানে তিনি একবারও দুঃখ প্রকাশ করেননি বোমাটি ফেলার জন্য।

আজ থেকে ঠিক ষাট বছর আগে জাপানের হিরোশিমা শহরে বিস্ফোরিত হয় প্রথম পারমাণবিক বোমা। ১৯৪৫ সালের ৫ আগস্ট বোমাটি প্লেন থেকে হিরোশিমার ওপর ফেলা হয়। এর ষোলো ঘন্টা পর, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হেরি ট্রুম্যান ঘোষণা করেন, "ঠিক ষোলো ঘন্টা আগে আমেরিকার একটা প্লেন জাপানের হিরোশিমার ওপর একটা বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটির ক্ষমতা ছিল ২০,০০০ টন টিএনটি- এর চেয়েও বেশি। এর আগে ব্রিটেনের **গ্রান্ড স্লাম** বোমাটি ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। বোমাটি হিরোশিমা শহরটাকে অকেজো করে দিয়েছে। এর ফলে মানুষ মারা গেছে অসংখ্য। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস বদলে গেছে চিরদিনের জন্য। রক্ষা পেয়েছে অনেক আমেরিকানের জীবন।" এটা ছিল তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের এমন এক বক্তব্য যেখানে তিনি একবারও দুঃখ প্রকাশ করেননি বোমাটি ফেলার জন্য।

বোমাটি সম্পর্কে আরো তথ্য হলো বোমা বহনকারী প্লেনটার নাম ছিল **ইনোলা গে**। বোমাটির নাম দেয়া হয়েছিল **লিটল বয়**। বিস্ফোরণের সাথে সাথে বা কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায় দেড় লক্ষ জাপানি। এর কয়েকদিন পর জাপান যুদ্ধে হার স্বীকার করে। তবে মজার ব্যাপার হলো- জাপান সম্রাট যুদ্ধে আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বোমা পড়ার আগে থেকেই। বোমা না ফেললেও জাপান যুদ্ধে হার স্বীকার করে নিত।

ইতিহাসবিদদের মতে যুদ্ধে জেতার জন্য আমেরিকা বোমা ব্যবহার করেনি। প্রথম বোমাটা ফেলা হয়েছিল নতুন বোমা হিসেবে বোমাটি কতটুকু মারাত্মক, সেটা প্রমাণ করার জন্য। আর দ্বিতীয় বোমাটি ফেলা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নসহ আমেরিকার শত্রুপক্ষকে ভয় দেখানোর জন্য; সাবধান, আমার কাছে পারমাণবিক বোমা আছে কিন্তু!

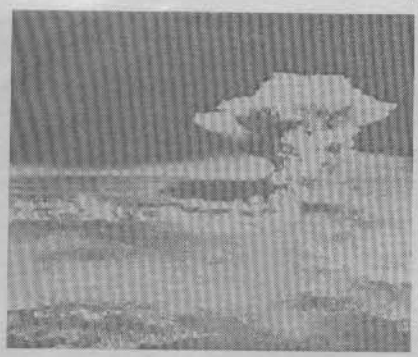

হিরোশিমাতে মানুষ মরেছে —এই শিক্ষাটা মানুষ নেয়নি। কিন্তু প্রয়োজনে যুদ্ধে জেতার জন্য পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা যায়—এ শিক্ষাটা আমেরিকা সারা পৃথিবীর দেশকে দিয়ে দিয়েছে। ফলে সে নিজেও নিজের নিরাপত্তা হারিয়েছে। কারণ আমেরিকার প্রধান শত্রু যারা তাদের অনেকের কাছেই পারমাণবিক বোমা আছে। আর যাদের সন্ত্রাসবাদী বলে প্রচার করা হচ্ছে তারা আজ সারা পৃথিবীতে খুঁজে বেড়াচ্ছে পারমাণবিক বোমা ।

তবে হ্যারি ট্রুম্যানের কথাই ঠিক হয়েছিল। পারমাণবিক বোমা পৃথিবীর ইতিহাস বদলে দিয়েছে চিরদিনের জন্য। পারমাণবিক বোমা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে দুটি নতুন নিয়ম চালু করেছিল। যে দেশের কাছে পারমাণবিক বোমা আছে, সে দেশ সবচেয়ে ক্ষমতাধর। আর শত্রুপক্ষ যখন পারমাণবিক বোমা তৈরি করে ফেলবে তখন পৃথিবীতে শুরু হবে নতুন অস্ত্র প্রতিযোগিতা ।

দুটি কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আমেরিকাই পৃথিবীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন তৈরি করে ফেলল নিজেদের পারমাণবিক বোমা। তারপর শুরু হলো প্রতিযোগিতা- কে কার চেয়ে বেশি মারাত্মক বোমা বানাতে পারে।

ষাট বছর আগে জাপানে ব্যবহার করা হয়েছিল দুটি পারমাণবিক বোমা। বর্তমানে পৃথিবীতে আছে প্রায় বিশ হাজারের মতো পারমাণবিক বোমা। এ বোমাগুলোর মালিক হচ্ছে নিউক্লিয়ার ক্লাবের পাঁচ সম্মানিত সদস্য- আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড। ক্লাবের বাইরে যারা আছে, তাদের বোমার কথা এখানে ধরা হয়নি।

সর্বশেষ সদস্য হচ্ছে ভারত এবং পাকিস্তান। ধারণা করা হচ্ছে উত্তর কোরিয়ারও এই বোমা আছে। ইসরাইলের কাছেও যে এটা আছে সেটা প্রমাণিত হয়ে গেছে ১৯৬৭ সালে যখন ইসরাইলে **ছয় দিনের যুদ্ধে** এই বোমা ব্যবহার করার জন্য তৈরি হচ্ছিল। আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য সেটা হয়নি। নিউক্লিয়ার ক্লাবের পাঁচ সম্মানিত সদস্য একটা নিয়ম চালু করেছিল ১৯৭০ সালে; তারা ছাড়া আর কেউ পারমাণবিক বোমা বানাতে পারবে না। ইন্টরন্যাশনাল অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সি এটা দেখবে। কিন্তু এ নিয়ম মানা হয়নি। তার প্রমাণ ভারত এবং পাকিস্তান। ইরান জ্বালানি খাতে পারমাণবিক শক্তি কাজে লাগাতে পারছে না। সবার সন্দেহ ব্যাটা বোমা বানানোর তালে আছে। আর এই অজুহাত দেখিয়ে তো আমেরিকা গোটা ইরাকই দখল করে নিয়েছে।

ধ্বংস কখনও কল্যাণ ডেকে আনে না—এটা ছিল হিরোশিমার শিক্ষা। এ শিক্ষা মানুষ গ্রহণ করেনি। ফলে অনেকে এর জন্য খেসারত দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে আমেরিকার সাথে তাল মিলিয়ে বোমা বানাতে গিয়ে এ কারণে সে ফতুরও হয়ে গেছে। ভারত আর পাকিস্তান যেখানে বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, তারাও বানিয়ে ফেলল পারমাণবিক বোমা। উত্তর কোরিয়াতে মানুষ ঠিকমতো খেতে পারছে না। অথচ সেখানকার রাজনীতিবিদরা বোমা বানানোর জন্য পাগল হয়ে গেছে। আসলে সোনা ও অর্থ যেমন মানুষকে টানে, ঠিক তেমনি পারমাণবিক বোমাও মানুষকে টানছে। অন্তত রাজনীতিবিদদের তো বটেই।

হিরোশিমাতে মানুষ মরেছে —এ শিক্ষাটা মানুষ নেয়নি। কিন্তু প্রয়োজনে যুদ্ধে জেতার জন্য পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা যায়—এ শিক্ষাটা আমেরিকা সারা পৃথিবীর দেশকে দিয়ে দিয়েছে। ফলে সে নিজেও নিজের নিরাপত্তা হারিয়েছে। কারণ আমেরিকার প্রধান শত্রু যারা তাদের অনেকের কাছেই পারমাণবিক বোমা আছে। আর যাদের সন্ত্রাসবাদী বলে প্রচার করা হচ্ছে তারা আজ সারা পৃথিবীতে খুঁজে বেড়াচ্ছে পারমাণবিক বোমা ।
হিরোশিমাতে বোমা ফেলে যুদ্ধে জিতে আমেরিকার তেমন লাভ হয়নি। কারণ বোমার একচেটিয়া কর্তৃত্ব তার হাতে আর নেই। সবচেয়ে ভালো হতো যদি বোমাটা বানানো না হতো। আইনস্টাইনসহ আরো অনেক বিজ্ঞানী এ দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের জয় হয়নি। বিজ্ঞানের কাঁধে চড়ে জিতে গেছে রাজনীতি।

ষাট বছর পর আজও হিরোশিমা ও নাগাশাকির মানুষজন তেজস্ক্রিয়তাজনিত রোগে ভুগছে। পারমাণবিক বোমার এই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখেও মানুষ ভুল করে যাচ্ছে। যাদের বোমা আছে তারা আরও শক্তিশালী বোমা বানাচ্ছে। আর যাদের নেই তারা পারমাণবিক বোমার মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে হিরোশিমা শহরে হাজার হাজার মানুষ শান্তির পক্ষে আর বোমার বিরুদ্ধে মিছিল করেছে। সারা পৃথিবীর মানুষকে ওরা মনে করিয়ে দিয়েছে পারমাণবিক বোমার ভয়াবহতার কথা। কিন্তু হিরোশিমা যতই কাঁদুক, যতই কথা বলুক, মানুষ চোখ-কান বন্ধ করে রেখেছে।

হিরোশিমার ষাট বছর পর মানুষ পুরো পৃথিবীকে সাত থেকে আটবার ধ্বংস করার মতো পারমাণবিক বোমা বানিয়ে ফেলেছে! এটাই কি ছিল হিরোশিমার শিক্ষা!

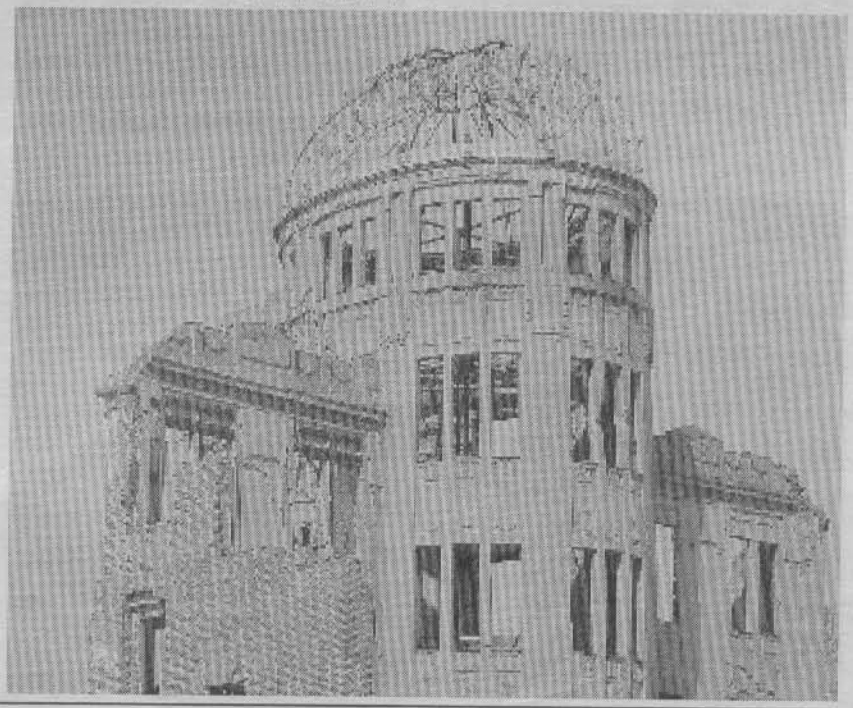

মহাবিশ্বের নিয়তি

হীরক চৌধুরী

মহাবিশ্ব কেন প্রসারিত হচ্ছে এবং সারা মহাবিশ্বে এত পদার্থ কেন ছড়িয়ে আছে, এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করে বিগ ব্যাং থিওরি। তাছাড়া পদার্থ প্রতিনিয়ত স্পেসটাইম (Spacetime) এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এ সংঘর্ষ যখন পুরো মহাবিশ্ব জুড়ে ঘটতে শুরু করেছে, তখন মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে, মহাবিশ্বের নিয়তি কি? শেষ পরিণতি কি হবে?

বিজ্ঞানের সবচেয়ে সহজ প্রশ্নগুলোর উত্তর হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন। মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে —এ প্রসারণ কি চিরকাল চলবে? পুরো মহাবিশ্বে পদার্থের পরিমাণ কত? প্রশ্নগুলো খুব সহজ। এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষ চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছে। অথচ এর উত্তর না জানলে, মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হবে অসমাপ্ত। যে প্রশ্নের উত্তর জানা নেই, তার উত্তর সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। করা যায় ভবিষ্যদ্বাণী। তবে সেটা হতে হবে যুক্তিসঙ্গত। বিজ্ঞানীরা সেটাই করার চেষ্টা করছেন।

অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ হচ্ছে একটা ভালো মডেল যা দিয়ে অনেককিছুই ব্যাখ্যা করা যায়। মহাবিশ্ব কেন প্রসারিত হচ্ছে এবং সারা মহাবিশ্বে এত পদার্থ কেন ছড়িয়ে আছে, এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করে বিগ ব্যাং থিওরি। তাছাড়া পদার্থ প্রতিনিয়ত স্পেসটাইম (Spacetime) এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এ সংঘর্ষ যখন পুরো মহাবিশ্ব জুড়ে ঘটতে শুরু করেছে, তখন মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে, মহাবিশ্বের নিয়তি কি? শেষ পরিণতি কি হবে?

একটা সহজ ঘটনার কথা বলা যাক। পৃথিবীর ভূমি থেকে একটা বস্তু উপরের দিকে ছুড়ে দেয়া হলো। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, বস্তুটা যত জোরে ছোড়া হবে তত জোরে উপরের দিকে উঠে যাবে। তারপর একসময় পড়তে থাকবে। আর বস্তুটা যদি প্রচণ্ড জোরে ছোড়া হয় তাহলে এটা পৃথিবীর অভিকর্ষ বল কাটিয়ে মহাশূন্যে চলে যাবে। সেখানে একবার গেলে সেটা আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। অনন্তকাল ধরে সেটা তার অর্জিত গতি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

এই সাধারণ ঘটনা দিয়ে বিগ ব্যাং থিওরিটা ব্যাখ্যা করা যায়। মহাবিস্ফোরণের সময় মহাবিস্ফোরণটা যদি প্রচণ্ড জোরে ঘটে থাকে, তাহলে পদার্থ এখনও সম্প্রসারিত হচ্ছে। এখানে পদার্থ বলতে গ্যালাক্সি বোঝানো হচ্ছে। আর বিস্ফোরণটা যদি তেমন জোরালো না হয়, তাহলে গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরের অভিকর্ষ বল দ্বারা পরস্পরকে টানাটানি করছে। এবং মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবী থেকে ছোড়া বস্তু যেমন পৃথিবীতে ফিরে আসে, ঠিক তেমনি, গ্যালাক্সিগুলো আবার বিগ ব্যাং এর দিকে ফিরে আসবে; ঘটবে আবার মহাবিস্ফোরণ।

কিন্তু ব্যাপারটা এরকম সহজ নয়। কারণ মানুষ এখন থিওরি অব রিলেটিভিটি এবং স্পেসটাইম এর প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক ভালো জানে। সম্প্রসারিত মহাবিশ্বে গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে— তার অর্থ এই নয় যে, তারা শূন্যতার ভিতর দিয়ে সামনের দিকে এগুচ্ছে। মনে করা যাক দুটি গ্যালাক্সি পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এখন আরেকটা ব্যাপার কল্পনা করা যাক— একটা রবার ব্যান্ডে দুটো

মহাবিশ্ব হয়তো একটা ওপেন সিস্টেম, যেখানে মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়ে চলছে অনন্তকালের জন্য, যেখানে নক্ষত্ররা প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে, যেখানে গ্যালাক্সিগুলো পালাচ্ছে অজানা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে।

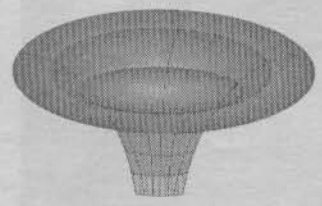

রঙের ফোটা আছে যারা পরস্পর থেকে দূরে আছে। রবার ব্যান্ডকে যদি দুই দিকে টানা হয়, তাহলে রবার ব্যান্ড প্রসারিত হবে, সেই সাথে রঙের ফোঁটা দুটিও পরস্পর আরও দূরে যাবে। কিন্তু কখনও তারা রবার ব্যান্ড থেকে বের হতে পারবে না। ঠিক একইভাবে বাস্তবে স্পেসটাইম হচ্ছে রবার ব্যান্ড আর রঙের ফোঁটা দুটি হচ্ছে গ্যালাক্সি। তাহলে গ্যালাক্সি দুটি স্পেসটাইম থেকে কখনও বের হতে পারবে না। তবে তারা পরস্পর থেকে দূরে অবশ্যই চলে যাবে।

এখন পুরো মহাবিশ্বকে একটা ফোলানো বেলুনের সাথে তুলনা করা যাক। আর অসংখ্য গ্যালাক্সিকে রঙের ফোঁটা দিয়ে আঁকা যাক। ফুঁ দিয়ে বেলুনটাকে আরও বেশি করে ফোলালে রঙের ফোঁটাগুলো আরও দূরে সরে যাবে, একইসাথে বেলুনটাও আগের চেয়ে বড় হবে। এভাবে সম্প্রসারিত মহাবিশ্বের একটা ছবি আঁকা যেতে পারে।

এরপরও ব্যাখ্যা করার আরও কিছু থেকে যায়। ব্ল্যাক হোলের কথা মনে আছে নিশ্চয়? তার কি হবে? বস্তু আলোর গতিতে ছুটলেও ব্ল্যাক হোল থেকে মুক্তি পায় না। এখন মহাবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কে আরও যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করার সুযোগ মিলল বিজ্ঞানীদের। মহাবিশ্ব যদি স্পেসটাইম হয়, আর সেটা যদি ব্ল্যাক হোলের খপ্পরে পড়ে বেঁকে যায়, তাহলে পুরো মহাবিশ্ব হচ্ছে একটা বদ্ধ মডেল বা ক্লোজড মডেল। আর একই সাথে বলতে হচ্ছে, পুরো মহাবিশ্বই হচ্ছে একটা ব্ল্যাক হোল যার কাছ থেকে কেউ মুক্তি পায় না। তার অর্থ বদ্ধ মহাবিশ্বে এক জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করলে আবার সেই জায়গায় ফিরে আসতে হবে।

বদ্ধ মহাবিশ্বের (Closed Universe) বিকল্প হচ্ছে খোলা মহাবিশ্ব (Open Universe) যা প্রতিনিয়ত প্রসারিত হচ্ছে। কোনটা সত্য হবে সেটা নির্ভর করছে মহাবিশ্বে কতটুকু পদার্থ আছে তার ওপর। কারণ পদার্থ স্পেসটাইমকে বাঁকা করে দেয়। আর মহাবিশ্বের পদার্থের পরিমাণ অনেক, তাহলে স্পেসটাইম বেশি বাঁকা হয়ে মহাবিশ্বকে ক্লোজ করে দেবে। ফলে সৃষ্টি হবে আরেকটা বিগ ব্যাং এর। তবে এখানে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা আরও সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে— পৃথিবীর একজায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে একই বরাবর চলতে থাকলে শুরুর জায়গায় আমরা আবার ফিরে আসতে বাধ্য। কারণ পৃথিবী হচ্ছে একটা ক্লোজ সিস্টেম, অর্থাৎ গোলাকার। তাই বিগ ব্যাং থেকে মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আর মহাবিশ্ব যদি ক্লোজ হয়, তাহলে মহাবিশ্ব আবার বিগ ব্যাং এর কাছে চলে আসবে।

আবার মহাবিস্ফোরণ। এবার ধ্বংস না সৃষ্টি হবে, এ সম্পর্কে কেউ সঠিকভাবে মুখ খুলতে পারছে না। সবকিছু শুরু হয়েছিল বিগ ব্যাং থেকে। তবে সেটাই কি প্রথম ঘটনা ছিল? নাকি অসংখ্য ঘটনার একটা পর্যায় ছিল সেটা? এমনও তো হতে পারে, অসংখ্য বিগ ব্যাং এর মাঝে আমাদেরটা ছিল অন্যতম। এর আগেও ঘটেছিল বিগ ব্যাং এবং পরেও ঘটবে আরও।

এ চিন্তায় যথেষ্ট আগ্রহ আছে বিজ্ঞানীদের। তাই তারা বের করতে চেষ্টা করছেন- মহাবিশ্ব আসলে খোলা নাকি বদ্ধ। তবে বিজ্ঞানীরা যেটা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছেন সেটা হলো— মহাবিশ্ব আসলে ক্লোজ এবং ওপেন— এ দুই সিস্টেমের একেবারে মাঝামাঝিতে অবস্থান করছে। মহাবিশ্ব হয়তো একটা ক্লোজ সিস্টেম যেখানে আছে ব্ল্যাক হোল। ফলে চলছে বিগ ব্যাং এর নিষ্ঠুর খেলা। অথবা মহাবিশ্ব হয়তো একটা ওপেন সিস্টেম, যেখানে মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়েই চলেছে অনন্তকালের জন্য, যেখানে নক্ষত্ররা প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে, যেখানে গ্যালাক্সিগুলো পালাচ্ছে অজানা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে।

সম্প্রসারিত মহাবিশ্ব কেন দুই সিস্টেমের মাঝখানে থাকবে? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। তবে আমাদের সামনে যা আছে তা দিয়েই আমাদের উত্তর খুঁজতে হবে। দুই সিস্টেমের মাঝে কোনটাতে মহাবিশ্ব আছে—এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের জানতে হবে মহাবিশ্বে কতটুকু পদার্থ আছে। তবে যেটা জানা সবচেয়ে জরুরি সেটা হলো— মোট পদার্থের ভর কতটুকু?

মহাবিশ্বের আকার সম্পর্কে মানুষের ধারণা, তার ভিতর যত পদার্থ আছে তার ভর বের করতে পারলে জানা যেত মহাবিশ্ব আসলে কোন অবস্থায় আছে; ক্লোজ নাকি ওপেন। ব্যাপারটা খুব সহজ একটা হিসাব। একটা নির্দিষ্ট গ্যালাক্সির মাঝে যত পদার্থ আছে সেটার ভর বের করতে পারলে, কাজটা অনেক সহজ হয়ে যেত। তারপর মহাবিশ্বে যতগুলো গ্যালাক্সি আছে তার একটা হিসাব বের করতে পারলে জানা যেত সমগ্র মহাবিশ্বে পদার্থের ঘনত্বের পরিমাণ।

মজার ব্যাপার হচ্ছে— বিজ্ঞানীরা পদার্থের ভর সম্পর্কে অনেককিছু জানেন। নক্ষত্রসমূহের ভর সম্পর্কেও তারা বেশ ভালোই জানেন। একটা গ্যালাক্সিতে পদার্থের ভর সম্পর্কেও তাদের ভালো জ্ঞান আছে, কারণ গ্যালাক্সির উজ্জ্বলতা দেখে সেটা বের করা যায়। তবে এত কিছু জানার পরও কেন জানি প্রশ্নের উত্তরটা পুরোপুরি জানা হয় না।

এক রহস্য উদ্ঘাটিত হলে হাজির হয় আরেক রহস্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে মহাবিশ্বের নিয়তি জানতে হলে মহাবিশ্বে মোট পদার্থের ভর জানাটা জরুরি। তবে একটা ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত— মহাবিশ্ব যে সিস্টেমেই অবস্থান করুক না কেন, মহাবিশ্ব আসলে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে মহাপ্রলয়ের দিকে। এ জ্ঞান সঠিক কিনা সেটাই এখন আসল প্রশ্ন। এর উত্তর খোঁজাই হচ্ছে মানুষের অন্তিম ইচ্ছা।

তথ্যসূত্র : John Gribbin : Spacewarps – Black holes, White holes, Quasars and the Universe.

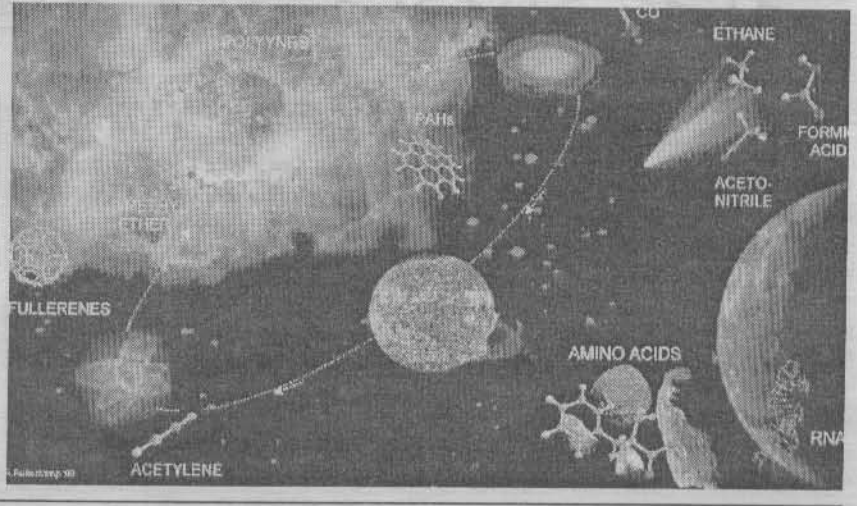

মহাশূন্যে প্রথম

■ প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ : স্পুটনিক-১
দেশ : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন
সময়কাল : ৪ অক্টোবর, ১৯৫৭ হতে ৪ জানুয়ারি ১৯৫৮।

■ মহাশূন্যে প্রথম প্রাণী : লাইকা নামে একটি কুকুর
মহাশূন্যযান : স্পুটনিক-২
দেশ : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন
সময়কাল : ৪ নভেম্বর ১৯৫৭।

■ মহাশূন্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম উপগ্রহ : এক্সপ্লোরার-১
সময়কাল : ৩১ জানুয়ারি ১৯৫৮

■ প্রথম মহাশূন্যযানের চন্দ্রে আঘাত : লুনিক-২
দেশ : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন,
সময়কাল -১২ এপ্রিল ১৯৫৯।

■ প্রথম মহাশূন্যচারী মানুষ : ইউরি আলেক্সিয়েভিচ গ্যাগারিন
দেশ : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন;
সময়কাল : ১২ এপ্রিল ১৯৬১।

■ প্রথম মার্কিন মহাশূন্যচারী : অ্যালানবি শেপার্ড
সময়কাল : ৫ মে ১৯৬১
মহাশূন্যযান : ফ্রিডম-৭।

■ প্রথম নারী মহাশূন্যচারী : ভ্যালিন্তিনা ভাদিমিরোভনা তেরেস্কোভা
দেশ : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন
সময়কাল : ১৬-১৯ জুন ১৯৬৩
মহাশূন্যযান : ভস্টক-৬

■ প্রথম মহাশূন্যচারীর মহাশূন্যে সন্তরণ : আলেক্সি লিওনভ
সময়কাল : ১৮ মার্চ ১৯৬৫
দেশ : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

■ প্রথম মার্কিন মহাশূন্যচারীর মহাশূন্যে সন্তরণ : অ্যাডওয়ার্ড হোয়াইট
সময়কাল: ৩ জুন ১৯৬৫।

■ প্রথম মনুষ্যবিহীন মহাশূন্যযানের নিরাপদে চন্দ্রে অবতরণ : লুনা-৯
দেশ : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন
সময়কাল : ৩১ জানুয়ারি ১৯৩৬।

■ প্রথম মহাশূন্যযানে চন্দ্র পরিভ্রমণ : লুনা-১০
দেশ : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন
সময়কাল : ১৯৬৬।

■ প্রথম মার্কিন মহিলা নভোচারী : স্যালি রাইড
সময়কাল : ১৮-২৪ জুন ১৯৮৩
মহাশূন্যযান : চ্যালেঞ্জার।

■ প্রথম মুসলমান নভোচারী : সৌদি শাহাজাদা সুলতান সালমান ইবন আব্দুল আজিজ
দেশ : যুক্তরাষ্ট্র; মহাশূন্যযান : ডিসকভারি
সময়কাল : ১৭-২৪ জুন, ১৯৮৫।

■ মহাশূন্যে প্রথম মহাশূন্যযান বদল : সয়ুজ-৪ এবং সয়ুজ-৫
দেশ: সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন

■ প্রথম কৃষ্ণাঙ্গের মহাশূন্যে ভ্রমণ : গুইয়ন ব্লু ফোর্ড
দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, সময়কাল : ৩০ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩
মহাশূন্যযান : চ্যালেঞ্জার।

■ চন্দ্রে অবতরণকারী প্রথম মানুষ : নীল আর্মস্ট্রং এবং এডউইন অলড্রিন, দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, সময়কাল : ২০ জুলাই ১৯৬৯।

■ মহাশূন্যে দু দেশের দুটো মহাশূন্যযানের প্রথম মিলন : সয়ুজ ১৯ এবং অ্যাপোলো-১৮
দেশ : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র, সময়কাল : ১৭ জুলাই ১৯৭৫।

■ প্রথম চন্দ্রে অবতরণকারী মনুষ্যবিহীন মহাশূন্যযান : অ্যাপোলো-১১
দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, সময়কাল : ২০ জুলাই ১৯৬৯, অবতরণকারীযান : ঈগল (লুনার মডিউল)

■ মহাশূন্যচারীসহ মহাশূন্যযানের প্রথম চন্দ্র পরিক্রমণ : অ্যাপোলো-৮
দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, সময়কাল : ১৯৬৮

■ চন্দ্র পরিক্রমণের পর প্রথম মহাশূন্যযানকে পৃথিবীতে আনয়ন : জোন্ড-৫, দেশ : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন

■ প্রথম মনুষ্যবিহীন মহাশূন্যযানের চন্দ্রে নিরাপদ অবতরণ এবং পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন : লুমা -১৬
দেশ : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন
সময়কাল : ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭০।

■ প্রথম মনুষ্যবিহীন মহাশূন্যযান চন্দ্রে পরীক্ষা চালায় : লুনোঘোদ-১
সময়কাল : ১৭ নভেম্বর ১৯৭০
মূলযান : লুনা-১৭, দেশ : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

■ জীবন রক্ষাকারী যোগসূত্র ছাড়া রেকর্ড সময় মহাশূন্যে প্রথম ভ্রমণ : ক্যাপ্টেন ব্রুক ম্যাক ক্যান্ডেলস এবং কর্নেল রবার্ট স্টুয়ার্ট।
দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, মহাশূন্যযান : চ্যালেঞ্জার
সময়কাল : ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
ভ্রমণের সময়কাল : ৫ ঘণ্টা।

■ মহাশূন্যে প্রথম বিয়ে :
বর রাশিয়ার নভোচারী ইউরি মালেনচেঙ্কো ও কনে মার্কিনী কন্যা ইয়েকাতেনিয়া দিমিত্রিয়েভা
সময়কাল : ১০ আগস্ট ২০০৩।

■ মহাশূন্যের প্রথম পর্যটক : ডেনিস টিটো।

□ এম, এম পারভেজ, *মিরপুর, ঢাকা।*

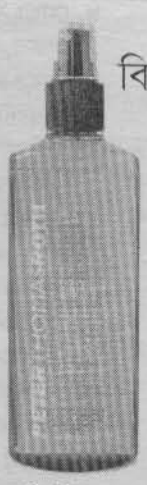

বিভিন্ন ধরনের অ্যালকোহল ও ব্যবহার

সাধারণভাবে আমরা অ্যালকোহল বলতে দেশীয় মদ কিংবা বিভিন্ন ধরনের পানীয়কে বুঝে থাকি। বস্তুত অ্যালকোহল বলতে কি শুধু মদকে বোঝায়। না, বিভিন্ন প্রকারের অ্যালকোহলের প্রস্তুত উপকারণ ও ব্যবহার নিম্নে দেয়া হলো।

পাওয়ার অ্যালকোহল : যেসব দেশে খুব কম পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত হয় সেসব দেশে ২০-৩০% অ্যালকোহল, পেট্রোল ও তৃতীয় বস্তু; যেমন- ইথার, বেনজিন প্রভৃতি মিশিয়ে যে জ্বালানি প্রস্তুত করা হয় তাকে পাওয়ার অ্যালকোহল বলে। মূলত শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বলে একে পাওয়ার অ্যালকোহল বলে। এটি মোটর গাড়ির জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।

রেকটিফাইট স্পিরিট : শোধিত অ্যালকোহলে সাধারণত ৯৫.৬% ইথাইল অ্যালকোহল ও ৪.৪% পানির সমস্ফুটন মিশ্রণকে রেকটিফাইড স্পিরিট বলে। এটি ডাক্তারী কাজে দ্রাবকরূপে ব্যবহৃত হয়।

নির্জল অ্যালকোহল : অনার্দ্র ইথাইল অ্যালকোহল অর্থাৎ ১০০% বিশুদ্ধ অ্যালকোহলকে নির্জল অ্যালকোহল বলা হয়। রেকটিফাইড স্পিরিট যে ৪.৪% পানি বিদ্যমান থাকে তা সাধারণ পাতনের সাহায্যে দূরীভূত করা যায় না। বেনজিনের সাথে রেকটিফাইড স্পিরিটের সমস্ফুটন প্রক্রিয়ায় নির্জল অ্যালকোহল তৈরি করা হয়। নির্জল অ্যালকোহলের স্ফুটনাঙ্ক ৭৮° সেন্টিগ্রেট।

মেথিলেটেড স্পিরিট : ইথাইল অ্যালকোহল মদ্যপানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সরকার তার ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করে থাকেন। শিল্প ও বাণিজ্যে শোধিত ইথাইল অ্যালকোহল শুল্কমুক্ত মেথিলেটেড স্পিরিট অর্থাৎ পানের অযোগ্যরূপে সরবরাহ করা হয়। ইথাইল অ্যালকোহল (১০%) এবং দুর্গন্ধযুক্ত পিরিডিন (০.৫%) প্রভৃতি মেশানো হয়; এরূপ মিশ্রিত অ্যালকোহলকে স্বভাবচ্যুত বা অসেবনীয় অ্যালকোহল বলা হয়। দুঃখজনক ব্যাপার হলেও চরম সত্য যে, এটি অসেবনীয় হলেও প্রতিবছর বহু শ্রমিক (কলকারখানার) এটি পান করে মারা যায়।

প্রুফ স্পিরিট : অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে প্রুফ কথাটি বলতে সাধারণত অ্যালকোহলের আয়তনিক শতকরা হিসাবের দ্বিগুণ বোঝায়। অর্থাৎ ৪৫% অ্যালকোহল মানে ৯০ প্রুফ। এ সংজ্ঞাটি অনেক আগে ইংরেজদের হুইস্কি পরীক্ষার পদ্ধতি থেকে নেয়া হয়। বারুদে হুইস্কি মিশালে আগুন ধরে। হুইস্কিতে বেশি পরিমাণে পানি থাকলে আগুন ধরবে না। কাজেই হুইস্কিতে বেশি পানি নেই, বারুদের জ্বলে ওঠাই তার প্রমাণ বা প্রুফ।

ইথাইল অ্যালকোহল : এটিই মূলত বিভিন্ন পানীয় মদ্য; যেমন বিয়ার, হুইস্কি, ব্রান্ডি প্রভৃতি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। গ্লুকোজের তরল পানির দ্রবণে 20^0C-25^0c তাপমাত্রায় ঈস্ট যোগ করলে ফারমেন্টিকরণ বা চোলাইকরণ ঘটে ইথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। নানা প্রকার বলকারক টনিক ও টিংচার প্রস্তুতিতেও সুগন্ধি দ্রব্যে এটি ব্যবহৃত হয়।

□ শাহাদাৎ হোসেন যুবরাজ (রাজু), *নোয়াখালী।*

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৪ • সংখ্যা ৪৬ • অক্টোবর ২০০৫

ভূত ভবিষ্যতের সময়যান

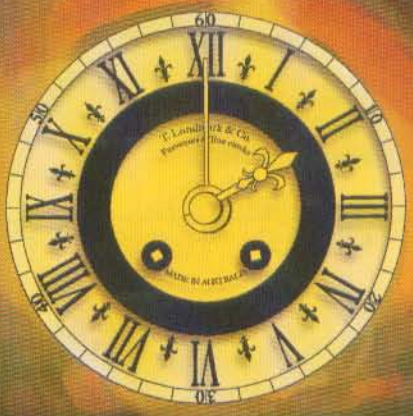

সমুদ্রের সন্ত্রাস হাঙ্গর ■ ভায়োলেন্স ও মানসিক রোগ ■ হ্যারিকেন ক্যাটরিনা
ভয়ঙ্কর আমাজান ■ পুরুষের শরীরেও জীবিত ভ্রূণ ■ আসছে ইলেক্ট্রনিক বোমা

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৪
সংখ্যা ৪৬
অক্টোবর ২০০৫

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-কম্পিউটার-স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ম্যাগাজিন

এ সংখ্যার সূচি

ভূত ভবিষ্যতের **সময়যান** ৬
—এস এম শামসুজ্জোহা

১৪ ভয়ঙ্কর আমাজান
— শেখ আনোয়ার

৩২ ভায়োলেন্স ও মানসিক রোগ
—আসিফ আনোয়ার

অন্যান্য রচনা

রোযায় স্বাস্থ্যসম্মত সেহরি ও ইফতার
–ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল /৮
টি-৯ প্রযুক্তি মোবাইল অভিধান
–এইচ রেজা /৯
ধূমপানে টিনএজারদের বিপদ বেশি
–গৌতম রায় /১০
অ্যান্ড্রোমিডা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী
–মোঃ জসীম উদ্দীন খান /১২
হ্যারিকেন ক্যাটরিনা
–নুসরাত রহমান /১৭
অনলাইন ফিল্টার কতটা জরুরি?
–রুহিয়া আখতার/২০
ডেঙ্গু থেকে সাবধান
–হারুন-অর-রশিদ সিদ্দিকী /২২
আসছে ইলেক্ট্রনিক বোমা
–হীরক চৌধুরী /২৭
হীরার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী
–মনীষা রায় /২৮
পুরুষের শরীরেও জীবন্ত ভ্রূণ!
–ফরিদুর রহমান পান্থ /৩০
অনলাইন প্রতারণা
–হাসিব হাসান/৩৪
এলজেইমার প্রতিরোধক বি-ভিটামিন ফোলেট
– প্রাণ কানাই রায় চৌধুরী/৩৭
মোবাইল কমার্স
–এ কে এম মনির হোসেন/৩৮
গ্রিন হাউজ প্রভাব এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ
– আসিফ/৪০
সমুদ্রের সন্ত্রাস হাঙর
–হাসিব রেজা রনি/৪২

নিয়মিত বিভাগ

৩ চিঠিপত্র
৪ বিজ্ঞান বিশ্বের নতুন খবর
২৪ বিজ্ঞান প্রজন্ম
বিতর্ক ৩৬
বিজ্ঞান কুইজ ৪৭
সায়েন্স ফিকশন : ভ্যাম্পায়ারের নক্ষত্রযাত্রা ৪৪

সম্পাদক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক
আতাউর রহমান কাবুল

সহযোগী সম্পাদক
এস এম মুকুল

সহকারী সম্পাদক
সরোয়ার হোসেন
গৌতম রায়

অতিথি লেখক
মাসুদ কামাল
ড. অরূপ রতন চৌধুরী
ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল

নিয়মিত লেখক
আসিফ, রেহানা পারভীন রুমা
পারভীন সুলতানা, শান্তা মারিয়া
ফারহানা মিলি, হিটলার এ হালিম
মাহবুব আনোয়ার শুভ, শফি ইসলাম
মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাদাত শাহরিয়ার
এ কে এম মুনির হোসেন
আনোয়ারুল হক খান

সার্কুলেশন
আমিনুল ইসলাম সোহাগ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫০৯৫
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৭১৭৫০৯৫

বিপণন
৩৭/১, বাংলাবাজার
দ্বিতীয় তলা, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫০৫৪, ০১৭১-১২০৭০১

মূল্য : পনের টাকা

প্রফেসর'স প্রকাশন, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত।

ই-মেইল : editor_sworld@yahoo.com

ভূত ভবিষ্যতের সময়যান

এস. এম. শামসুজ্জোহা

সময় সম্পর্কে আমাদের মূল ধারণা এসেছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব থেকে। আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বে আইনস্টাইন দেখান যে, দুটি ঘটনার মধ্যে যে বিরতি পর্যবেক্ষণ করা হয় সেটি পর্যবেক্ষকের গতির ওপর নির্ভরশীল। যদি দুজন পর্যবেক্ষক ভিন্নভাবে গতিশীল থাকেন, তাহলে দুটি ঘটনার মধ্যে বিদ্যমান বিরতিকে তারা দু রকম পর্যবেক্ষণ করবেন। এ ঘটনাটিকে অনেক সময় 'টুইন প্যারাডক্স' দিয়ে বোঝান হয়ে থাকে।

স্বপ্ন, চেষ্টা ও সাফল্য এ নিয়েই মানুষের জীবন। তাই কোনো স্বপ্নই হেলাফেলার নয়। সব স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মানুষ চেষ্টা করে আপ্রাণ। ফলে সফলও হয়। বিজ্ঞানের জগতে এর দৃষ্টান্ত অহরহই দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি মানুষের একটি স্বপ্ন 'টাইম মেশিন' বা 'সময়যান'। তাই টাইম মেশিন নিয়ে মানুষের ধ্যান-ধারণার শেষ নেই। ১৮৯৫ সালে এইচ. জি. ওয়েলসের 'টাইম মেশিন' প্রকাশিত হওয়ার পর ১০০ বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু সময় পরিভ্রমণ নিয়ে উত্তেজনা বোধ হয় একটুও কমেনি। গত কয়েক দশক ধরে সময় পরিভ্রমণকে খুব একটা সম্মানজনক দৃষ্টিতে দেখা হতো না। কিন্তু কয়েক বছর ধরে তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের কাছে বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যদিও মোটামুটিভাবে এ আকর্ষণটা অবসর সময় কাটানোর মতো ব্যাপার হলেও এর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকও রয়েছে। কার্যকারণ সম্পর্কে বলে বিজ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য রয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে হলেও যদি সময় পরিভ্রমণ সম্ভব হয় তাহলে কার্যকারণ সম্পর্ক আর প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে থাকবে না। সময় সম্পর্ক আমাদের মূল ধারণা এসেছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব থেকে। এর আগে সময়কে বিমূর্ত এবং সর্বজনীন একটি বিষয় বলে ধরে নেয়া হতো। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাই হোক না কেন সময় সবার জন্য একই রকম। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বে আইনস্টাইন দেখান যে, দুটি ঘটনার মধ্যে যে বিরতি পর্যবেক্ষণ করা হয় সেটি পর্যবেক্ষকের গতির ওপর নির্ভরশীল। যদি দুজন পর্যবেক্ষক ভিন্নভাবে গতিশীল থাকেন, তাহলে দুটি ঘটনার মধ্যে বিদ্যমান বিরতিকে তারা দু রকম পর্যবেক্ষণ করবেন। এ ঘটনাটিকে অনেক সময় 'টুইন প্যারাডক্স' দিয়ে বোঝান হয়ে থাকে। ধরা যাক, অ্যামি এবং জ্যামি যমজ ভাইবোন। অ্যামি রকেটে চেপে খুবই উচ্চ গতিতে কাছের কোনো তারা থেকে ঘুরে পৃথিবীতে এলো। সে সময়ে জ্যামি ঘরেই থাকলো। অ্যামির কাছে পুরো ভ্রমণটি মনে হবে ধরা যাক ১ বছরের সমান। কিন্তু যখন সে মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে পৃথিবীতে পদার্পণ করবে তখন দেখতে পাবে যে, পৃথিবীতে ১০ বছর পার হয়ে গেছে। তার চেয়ে তার ভাইয়ের বয়স তখন ৯ বছর বেশি। এ ঘটনায় সীমিত আকারের সময় পরিভ্রমণের নমুনা দেখা যায়। এখানে অ্যামি পৃথিবীর ৯ বছর ভবিষ্যতে পৌঁছে যেতে সম্ভব হয়েছে। টাইম ডাইলেশন বা স্থির সময়ের ঘটনা তখনই ঘটে যখন দুজন পর্যবেক্ষক একে অপরের সাপেক্ষে গতিশীল থাকেন। সাধারণত জীবনে আমরা সময়ের ধীর হয়ে যাওয়ার ঘটনা তেমন একটা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। কারণ এটি তখন দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে যখন গতি আলোরগতির কাছাকাছি হয়। এমনকি বিমানের গতিতেও সাধারণ একটি ভ্রমণের সময়ের ধীর হওয়ার পরিমাণ কয়েক ন্যানো সেকেন্ডের বেশি হয় না। তারপরেও পারমাণবিক ঘড়িগুলো এতো বেশি নিখুঁত যে, তারা সময়ের ধীর হয়ে

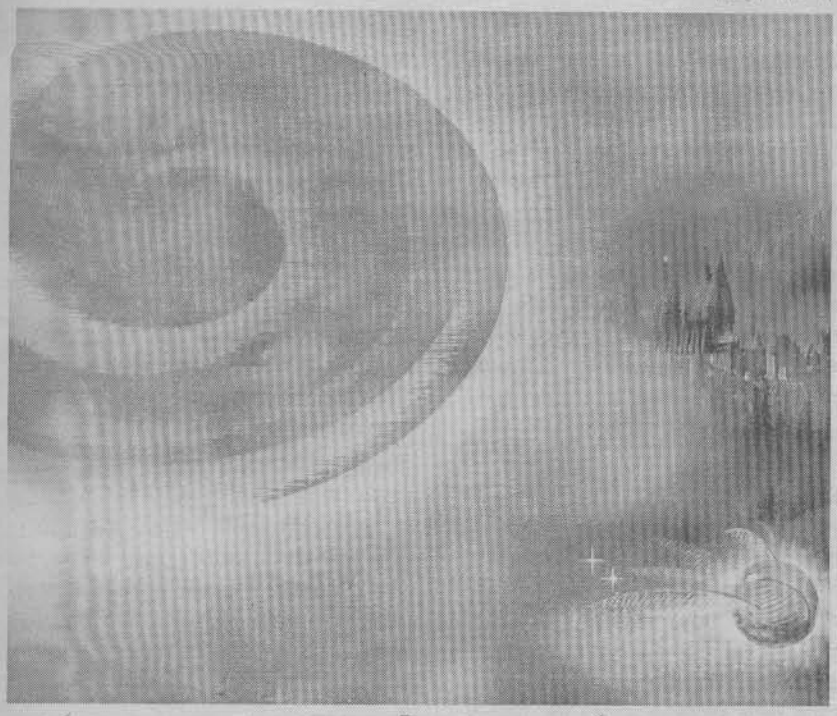

ওয়ার্মহোল তত্ত্বকে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সমর্থন করে। এখানে অভিকর্ষ শুধু সময়কেই নয়, স্থানকেও সঙ্কুচিত করছে। এটি অনেকটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা আর পাহাড়ের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গের রাস্তার মতো। ওপরের রাস্তার চেয়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে অনেক কম সময়ে একই জায়গায় পৌঁছান সম্ভব।

যাওয়াটিও পরিমাপ করতে সক্ষম। আর তাই ভবিষ্যৎ সময়ে পরিভ্রমণ করা অনেকটা প্রমাণিত। সময় পরিভ্রমণের ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করতে হলে আমাদের সাধারণ জীবনের ঘটনাবলী বাদ দিয়ে উপ-পারমাণবিক কণা বা সাব-এটোমিক পার্টিকেলগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। ত্বরণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের আলোরগতির কাছাকাছি গতি দান করা সম্ভব। এসব কণার কোনো কোনোটির নিজস্ব ঘড়িও রয়েছে। যেমন– মিউওন, মিউওনের অর্ধ-জীবন বা হাফ লাইফ আছে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা গেছে যে, উচ্চ গতিসম্পন্ন মিউওনের অর্ধ-জীবন সাধারণ গতির মিউওনের তুলনায় দীর্ঘ হয়ে থাকে। কিছু মহাজাগতিক রশ্মিও সময় পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। এ কণিকাগুলো আলোরগতির এতো বেশি কাছাকাছি গতিসম্পন্ন যে, তাদের দৃষ্টিতে পুরো গ্যালাক্সি পার হতে সময় লাগে মাত্র কয়েক মিনিট। যদিও পৃথিবীর দৃষ্টিতে এদের সময় লাগে কয়েক হাজার বছর।

ভবিষ্যতে যাওয়া না হয় সম্ভব হলো কিন্তু অতীতে যাওয়ার কি হবে? ১৯৭৪ সালে তুলান ইউনিভার্সিটির ফ্রাঙ্ক জে টিপলার হিসাব করে দেখান যে, প্রচণ্ড ভরসম্পন্ন অসীম দৈর্ঘ্যের কোনো সিলিন্ডার যদি নিজ অক্ষের ওপর আলোরগতির কাছাকাছি গতিতে আবর্তন করতে থাকে তাহলে মহাকাশচারীদের পক্ষে তাদের অতীতে যাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রেও এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, এই অতি ভরসম্পন্ন সিলিন্ডারটি তার চারপাশের আলোকে একটি চক্রের মধ্যে ধরে রাখবে। ১৯৯১ সালে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির জে রিচার্ড গট ধারণা করেন যে, কসমিক স্ট্রিংয়ের পক্ষেও এ রকম একটা প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। (মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষকদের মতে কসমিক স্ট্রিং হচ্ছে এমন একটি কাঠামো, যেটি বিগ ব্যাংয়ের আদি পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে।)। তবে আশির দশকের মাঝামাঝিতে টাইম মেশিন নিয়ে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। সেটি হচ্ছে ওয়ার্মহোল তত্ত্ব। কল্পবিজ্ঞানে ওয়ার্মহোলকে অনেক সময় স্টারগেটও বলা হয়ে থাকে। এটি হচ্ছে মহাকাশের বিশাল দূরত্বসম্পন্ন জায়গার মধ্যের শর্টকার্ট।

ওয়ার্মহোল তত্ত্বকে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সমর্থন করে। এখানে অভিকর্ষ শুধু সময়কেই নয়, স্থানকেও সঙ্কুচিত করছে। এটি অনেকটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা আর পাহাড়ের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গের রাস্তার মতো। ওপরের রাস্তার চেয়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে অনেক কম সময়ে একই জায়গায় পৌঁছান সম্ভব। ওয়ার্মহোলও ঠিক তেমনি। ১৮৯৫ সালে কন্ট্যাক্ট নামে একটি উপন্যাসে কার্ল স্যাগান ওয়ার্মহোল তত্ত্ব ব্যবহার করেন। এরপর ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির কিপ এস থর্ন এবং তার সহকর্মীরা প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞানের সহায়তায় ওয়ার্মহোলকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। তাদের মতে ব্ল্যাকহোলের মতো ওয়ার্মহোলেরও অসম্ভব রকম অভিকর্ষ থাকবে। কিন্তু ব্ল্যাকহোল যেখানে কোনো কিছুই বের করতে পারে না, ওয়ার্মহোল সে রকম হবে না। বরং ওয়ার্মহোলে প্রবেশের এবং বের হওয়ার জন্য রাস্তা থাকবে। শিগগিরই থর্ন এবং তার সহকর্মীরা বুঝতে পারলেন যে, যদি স্থিতিশীল একটি ওয়ার্মহোল তৈরি করা যায়, তাহলে সেটি টাইম মেশিনের মতো কাজ করবে।

কোনো মহাকাশচারী এর ভেতর দিয়ে গেলে শুধু যে মহাবিশ্বের অন্যত্র গিয়ে পৌঁছবে তাই নয়, সে অন্য একটি সময়েও গিয়ে পৌঁছবে। সেটি হতে পারে ভবিষ্যৎ অথবা অতীত। একটি ওয়ার্মহোলকে সময় পরিভ্রমণের উপযোগী করতে হলে সেটির এক মাথাকে নিউটন স্টারের পৃষ্ঠের কাছাকাছি টেনে রাখতে হবে। এতে করে নিউটন স্টারের অভিকর্ষ ওয়ার্মহোলের সেই মুখের কাছে সময়কে ধীর করে দেবে। আর এতে করে ওয়ার্মহোলের দু মুখের মধ্যে সময়ের তারতম্য ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠবে। এরপর যদি এই দু মাথাকে মহাকাশের সুবিধাজনক দু জায়গায় রাখা যায়, তাহলে এ দু মুখের মধ্যে সময়ের তারতম্য বিদ্যমান থাকবে।

ধরা যাক, দু মুখের মধ্যে পার্থক্য হলো ১০ বছর। এখন ওয়ার্মহোলের একমুখ দিয়ে লাফ দিয়ে মহাকাশচারীরা ১০ বছর ভবিষ্যতে চলে যেতে পারেন। তাহলে সেই অপর মুখ দিয়ে কেউ লাফ দিয়ে এ পাশের মুখ দিয়ে ১০ বছর অতীতে চলে আসতে পারবে। কিন্তু এভাবেও ওয়ার্মহোলটি প্রথম যখন তৈরি হয়, তার আগে কিছুতেই যাওয়া সম্ভব নয়। ওয়ার্মহোল টাইম মেশিন তৈরির প্রথম সমস্যা হচ্ছে প্রথমে ওয়ার্মহোল তৈরি করা। খুব ছোট মাত্রায় এ ধরনের ওয়ার্মহোল তৈরি করা সম্ভব। তাত্ত্বিকভাবে পারমাণবিক কেন্দ্রের মতো ছোট মাত্রায় ওয়ামহোল তৈরি করা সম্ভব। আবার এ ওয়ার্মহোলকে শক্তি প্রদানের মাধ্যমে স্থিতিশীল করা সম্ভব। এরপর এটিকে প্রয়োজনমতো বাড়িয়ে ব্যবহারের আকারে নিয়ে আসা সম্ভব। তাই তাত্ত্বিকভাবে টাইম মেশিন সমস্যার সমাধান হলেও বেশ কিছু প্যারাডক্স বা ধাঁধার জন্ম হয়ে গেছে এরই মধ্যে। এর মধ্যে রয়েছে কেউ যদি নিজের অতীতে গিয়ে নিজের মাকে হত্যা করে তাহলে কী হবে? তখন তার জন্ম হওয়া সম্ভব কিভাবে? কিংবা কেউ যদি ভবিষ্যতে গিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জেনে বর্তমানে এসে সেটা সবাইকে জানিয়ে দেয় তাহলে সে জ্ঞানের উৎস কোথায়? এত সব প্রশ্ন আর কৌতূহল এখন বিজ্ঞানীদের ওপরেই বর্তায়। এখন বিজ্ঞানীরা এ সময়যান নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন ও চেষ্টা করছেন। হয়তো বেশি দূরে নেই সাফল্য। হয়তো আগামী শতাব্দীর সপ্তাশ্চার্যের মধ্যে টাইম মেশিন অথবা সময়যানও একটি আশ্চর্য হিসেবে প্রতীয়মান হবে। সেই প্রতীক্ষায় দিন গুণছে মানবজাতি। সে পর্যন্ত সবাইকেই ধৈর্য ধারণ করতে হবে– সময়যানের প্রতীক্ষায়।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট

ইন্টারনেট ফিল্টার কতটা জরুরি?

রুহিয়া আখতার

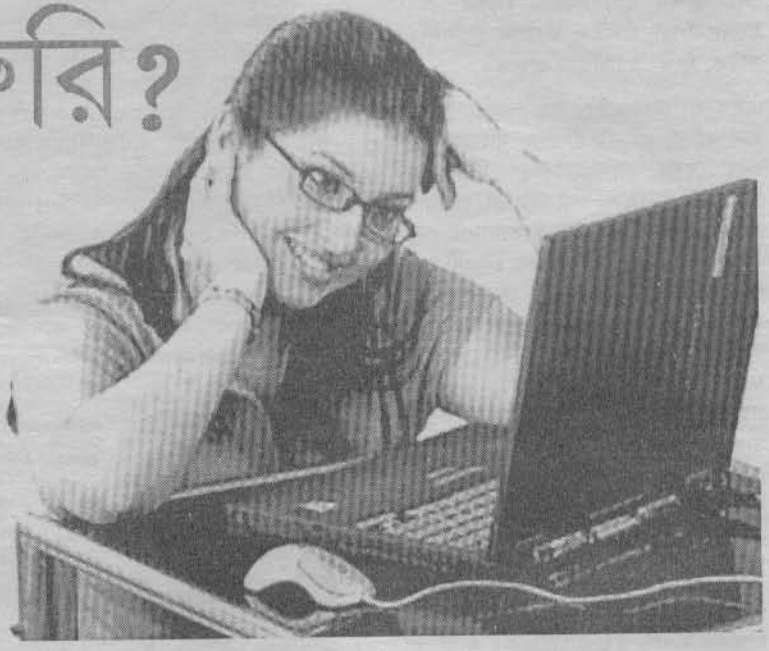

ইন্টারনেটের পর্ণ বা নিষিদ্ধ সাইটের প্রতিই তরুণ-তরুণীদের আগ্রহ বেশি। এর ফলে তারুণ্যের নৈতিক চরিত্র অবক্ষয় ঘটছে। এর প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে অভিভাকদের সতর্ক ভুমিকা থাকা প্রয়োজন। ইন্টারনেট ফিল্টারিং ব্যবস্থা এ বিপর্যস্ত অবস্থাকে কিছুটা হলেও কমাবে। বর্তমানে ইন্টারনেটে নগ্নতা বন্ধের লক্ষ্যে মার্কিন কংগ্রেসে আলোচনা উঠেছে। আমাদের দেশেও এ নিয়ে ভাববার সময় এসেছে।

ইন্টারনেট তথ্যপ্রযুক্তি জগতে জ্ঞান ও অপরিসীম বিনোদন ভাণ্ডার হলেও কোনো কোনো ওয়েবসাইট সব বয়সী ব্যবহারকারী, বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে, যার ছবি ও তথ্য আমেরিকার মতো সমাজেও অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করতে সে দেশের অভিভাবকরা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়ে পড়েছেন। ইন্টারনেট থেকে এ ধরনের নগ্ন ও অশ্লীল ওয়েবসাইট বাদ দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় ও মার্জিত ওয়েবসাইট যে সফটওয়্যারের সাহায্যে বেছে নেয়া যায় তাকে সেন্সরওয়্যার বলা হয়। অনেকে আবার এ সেন্সরওয়্যারকে ছাঁকন বা ফিল্টার বলে থাকেন।

যেহেতু আমাদের দেশে দিন দিন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলছে সেহেতু ইন্টারনেট ওয়েবসাইটের সেন্সরশিপ নিয়ে আমাদেরকেও ভাবতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারনেট তথ্যপ্রযুক্তি সস্তা হওয়ায় সে দেশের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের দোকানীও এ বিষয়ে জ্ঞাত। ইন্টারনেট তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত এ যাবতকালে যত আইন প্রণীত হয়েছে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হ্যাকার স্ক্যানার দমন ও নিরুৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন ইতোমধ্যে মার্কিন সিনেট প্রণয়ন করে ফেলেছে। বর্তমানে ইন্টারনেটে নগ্নতা বন্ধের লক্ষ্যে মার্কিন কংগ্রেসে আলোচনা উঠেছে।

আইন প্রণয়নকারীরা বলেছেন, যেসব লাইব্রেরি ও স্কুলের কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ আছে সেগুলোতে অবশ্যই ফিল্টার কিংবা সেন্সরওয়্যার ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এ সেন্সরওয়্যার বা ফিল্টার অত্যন্ত দামি। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এটা তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাই ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা এ ধরনের সফটওয়্যারের প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে যে, সেন্সরওয়্যার ব্যবহারে হিতে বিপরীত ঘটনা ঘটছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সেন্সরশিপের মাধ্যমে কেউ একজন ব্রেস্ট শব্দটি আপত্তিকর শব্দ তালিকায় উল্লেখ করে রাখলো। এর ফলে ব্রেস্ট ক্যান্সার নামের ওয়েবসাইটটি আর ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে না বা ডাউনলোড হবে না। অথচ এ ব্রেস্ট ক্যান্সার সাইটটি ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় একটি ওয়েবসাইট। আবার এ ঘটনার পুরো উল্টোটিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যাচ্ছে। এজন্য সেন্সরওয়্যারের প্রতি লোকজন এখন আর খুব একটা আস্থা রাখতে পারছে না।

ইন্টারনেট বর্তমানে অফিস-আদালত, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি আর গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ ছেড়ে সাধারণ ব্যবহারকারীর নিত্য ব্যবহার্য উপাদানের মতো ঘরের কোণে জায়গা দখল করে নিয়েছে। কম্পিউটার আছে এমন বাসায় দেখা যাচ্ছে যে, বাচ্চারা ভিডিও গেমস, টিভি, ভিসিপি বা ক্যাবল টিভির রঙিন মোহ ত্যাগ করে কম্পিউটারভিত্তিক গেমস ও ইন্টারনেট বিনোদনের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। যেসব অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরী বা টিনএজাররা অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে ইন্টারনেট ব্রাউজ করে থাকে তারা অবশ্যই

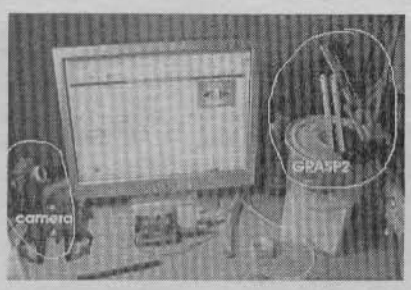

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটের নাম দেখে এর অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আর ওয়েবসেন্সর ওয়েবসাইটের নামগুলো স্ক্যান করে আপত্তিকর নামসমৃদ্ধ সাইটগুলো ফিল্টার করে থাকে। কিন্তু যদি কেউ সুন্দর কোনো ওয়েবসাইটের নামের আড়ালে কুরুচিপূর্ণ কোনো ছবি বা বক্তব্য সংযোজিত বা প্রবাহিত করে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেন্সরওয়্যারের তেমন কোনো কিছু করার থাকে না।

কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল ওয়েবসাইটের দিকে স্বাভাবিক কারণেই ঝুঁকে পড়ছে। বিশেষ করে সম্প্রতি আমাদের দেশে কম্পিউটার ও এর আনুষঙ্গিক উপাদানের মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যাওয়ায় দিন দিন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েই চলছে। আর সঙ্গত কারণেই ব্যবহারকারী টিনএজারের দলও প্রতিনিয়ত ভারী হচ্ছে।

কিছুদিন আগে পরিচালিত একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেটে সেক্স সম্পর্কিত শব্দ বেশি খুঁজে থাকে। এ ধরনের সাইটে তাদের বিচরণ সর্বাধিক। আমাদের দেশে পরিসংখ্যান চালালেও এর ব্যতিক্রম ঘটবে না। এ ধরনের প্রবণতা থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করতে স্বাভাবিকভাবে অভিভাবকরা এমন ধরনের সফটওয়্যার খুঁজে থাকেন, যা ইন্টারনেট থেকে আপত্তিকর বা যৌনসংক্রান্ত সাইটগুলো বাদ দিয়ে শুধু বাচ্চাদের ব্যবহার উপযোগী সাইটগুলো উন্মুক্ত রাখবে। এ হলো মোটামুটিভাবে সেন্সরওয়্যারের আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এ পর্যন্ত বাজারে যেসব সেন্সরওয়্যার এসেছে সেগুলো হলো- সাইবার পেট্রোল, নেট নানী, সেওটি নেট ইত্যাদি। তবে এ ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে তেমন কোনো উপকার হচ্ছে না বলে ব্যবহারকারীরা মন্তব্য করেছেন। তারা বলেছেন সেন্সরওয়্যার হাজারো রকম আপত্তিকর ওয়েবসাইট থেকে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ওয়েবসাইট শনাক্ত করতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সেন্সরওয়্যার কোনো অবস্থাতেই অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

আপত্তিকর ওয়েবসাইটের জনকদের অতি চালাকি বা ধূর্ততা সেন্সরওয়্যারের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে কোনো কোনো মহল মনে করছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটের নাম দেখে এর অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আর ওয়েবসেন্সর ওয়েবসাইটের নামগুলো স্ক্যান করে আপত্তিকর নামসমৃদ্ধ সাইটগুলো ফিল্টার করে থাকে। কিন্তু যদি কেউ সুন্দর কোনো ওয়েবসাইটের নামের আড়ালে কুরুচিপূর্ণ কোনো ছবি বা বক্তব্য সংযোজিত বা প্রবাহিত করে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেন্সরওয়্যারের তেমন কোনো কিছু করার থাকে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার এর উল্টো ঘটনাও দেখা গেছে। যেমন- ইয়াহু-তে কোনো আপত্তিকর শব্দ লিখে সার্চ করলে দেখা যাবে সুন্দর ও তথ্যমূলক কোনো প্রতিবেদন আমাদের চোখের সামনে ভেসে এসেছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে এ ধরনের ঝুটঝামেলা নতুন কিছু নয়। ইন্টারনেটে দুই দুষ্ট লোকের বিচরণ যেমন অবাধ, ঠিক তেমনি এদের প্রতিপক্ষরাও কম শক্তিশালী নন। আশা করা হচ্ছে, অতি শীঘ্রই সেন্সরওয়্যার সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। আর তখনই সারা বিশ্বব্যাপী ৭৫ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কোনো তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াই নির্ভয়ে তাদের কম্পিউটার বাচ্চাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে পারবে।

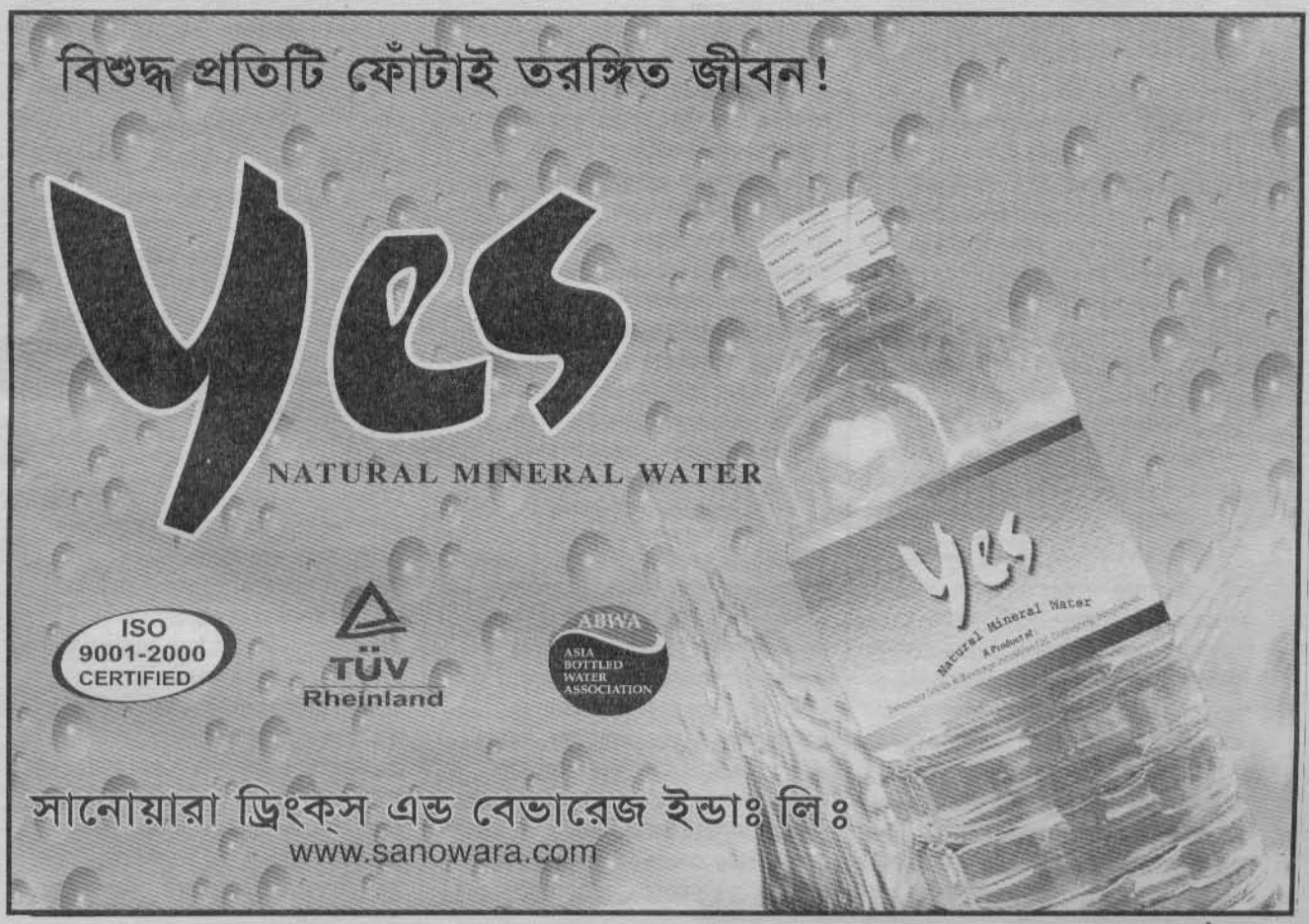

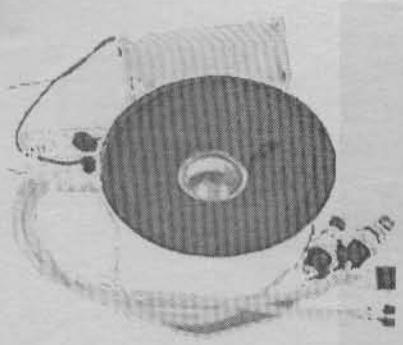

আসছে ইলেক্ট্রনিক বোমা

হীরক চৌধুরী

মিডিয়ার যুগে আমরা বাস করছি। এখন সবকিছুই টিভির পর্দায় চলে আসে। তাই যুদ্ধ লাগলে সেটার ভয়াবহতা মিডিয়ার কাছে এক নম্বর খবর হয়ে যায়। যুদ্ধে যে যত মানুষ মারে, সবাই তার বিপক্ষে চলে যায়। তাই নিখুঁত অস্ত্র সেটাকেই বলা যাবে, যেটা শত্রুপক্ষকে তার ঘরেই আটকে রাখবে কিন্তু তার কোনো ক্ষতি হবে না। এ ধরনের অস্ত্রের কাজ হবে টেলিকমিউনিউকেশন নেটওয়ার্ক সিস্টেম অকেজো করে দেয়া, পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করা, শত্রুপক্ষের অসংখ্য কম্পিউটার এবং ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি পুরোপুরি অকেজো করা। এটা করার পর শত্রুপক্ষের লোকজনের চুল পরিমাণ ক্ষতি হবে না, বাড়িঘর এবং রাস্তাঘাটও ঠিক থাকবে।

এ ধরনের বোমা বানানো কি সম্ভব? বানানো সম্ভব নয়, বরং বলা উচিত বানানো গেছে। এ নতুন অস্ত্র বা বোমার নাম হাই-পাওয়ার মাইক্রোওয়েভ বা (HPM)। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে অস্ত্রটার কাজ কী। এ বোমা এমন এক ধরনের ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক ওয়েভ-এর তীব্র বিস্ফোরণ ঘটায়, যার ফলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে 'মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড' (Micro-wave Frequency band)। এর ক্ষমতা হবে কয়েক শ মেগাহার্টজ থেকে কয়েক শ গিগাহার্টজ, যা ইলেক্ট্রিক সার্কিট ড্যামেজ করতে যথেষ্ট।

এ অস্ত্র এমন পরিমাণ কারেন্ট ছড়াবে, যাতে ইলেক্ট্রিক সার্কিট গলে যাবে। কম ক্ষমতাসম্পন্ন বোমার বিস্ফোরণের ফলে আইসি অকেজো করে দেবে, ফলে যার ভেতর এ আইসি আছে সেটা অকেজো হয়ে যাবে। এ ধরনের বিস্ফোরণের মাঝে মানুষ পড়ে গেলে, তারা সেটা বুঝতেই পারবে না। তবে মিছিলের মানুষকে ছত্রভঙ্গ করতে এক ধরনের মাইক্রোওয়েভ অস্ত্র বানানোর কাজ চলছে।

এ অস্ত্র নিয়ে কাজ চলছে খুব গোপনে। ইরাক যুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে গুজব উঠেছিল। কিন্তু মার্কিন সামরিক বাহিনী সেটা অস্বীকার করেছে। তবে একটা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা একমত, এ ধরনের অস্ত্র বানানোর উৎস পাওয়া গেছে। দিনের পর দিন এর উন্নতি হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এ অস্ত্রের ব্যবহার যুদ্ধের চেহারা পাল্টে দেবে। আর এ ব্যাপারে এগিয়ে আছে মার্কিন সেনাবাহিনী। তবে ইরাক যুদ্ধে যেসব নতুন অস্ত্র প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হয়েছে, তার ভেতর ই-বোমাও ছিল।

সামরিক দিক থেকে এ অস্ত্রকে রেডিওফ্রিকোয়েন্সি উইপনও বলা হয়। এ বোমায় রয়েছে অনেক সুবিধা। বিস্ফোরণের শকওয়েভ-এর গতি আলোর গতির সমান। যে কোনো জায়গা থেকে এটা নিক্ষেপ করা যায়। গ্রাভিটির এবং আবহাওয়ার কোনো প্রভাব থাকবে না এ বোমার ওপর।

এ বোমা দুই ধরনের– এক. আল্ট্রাওয়াইডব্যান্ড এবং দুই. ন্যারোব্যান্ড। প্রথমটাকে তুলনা করা যেতে পারে ফ্লাশলাইটের সাথে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে লেজারের মতো।

প্রথম ধরনের বোমা ব্যবহার করা হবে বিশাল এলাকা জুড়ে কিন্তু এর ক্ষমতা থাকবে কম (টেন জুলস পার পালস)। এ বোমার বিস্ফোরণের ফলে কয়েক ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে বোমার রেঞ্জের ভেতর অরক্ষিত সব ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি অকেজো বা ধ্বংস করে দেবে। বোমার ক্ষমতা নির্ভর করবে লক্ষ্যবস্তু থেকে বোমাটা কতদূরে আছে কিংবা কত উঁচু থেকে বোমাটা ফেলা হবে, তার ওপর।

দ্বিতীয় ধরনের বোমাটা ব্যবহার করা হবে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যবস্তুর জন্য। ন্যারোব্যান্ড ই-বোমা থেকে বের হবে একটা সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি (ক্ষমতা কয়েক শত থেকে কয়েক হাজার কিলো জুলস পার পালস)। এটা একবার ব্যবহার করা হতে পারে আবার কয়েক শতবার ব্যবহার করা হতে পারে। মনে করা যাক, শত্রুপক্ষের একটা হাসপাতালের ওপর তৈরি করা হয়েছে কমান্ড এবং কন্ট্রোল সেন্টার। হাসপাতালের আশেপাশে প্রচুর মানুষ বাস করে। এখন সাধারণ বোমা ব্যবহার করলে অসংখ্য মানুষ মারা যাবে আর মিডিয়াতে খবরটা চলে যাবে দ্রুত। ফলে যে এ কাজটা করবে তার জনপ্রিয়তা কমবে।

এখন দরকার **ন্যারোব্যান্ড ই-বোমা**। এখন এ কন্ট্রোল সেন্টারকে অকেজো করতে হলে ই-বোমা ব্যবহার করা হবে। এর ফলে কোনো মানুষ এবং বাড়িঘরের ক্ষতি হবে না। কারণ বোমাটা ফাটবে আকাশে। ন্যারোব্যান্ড ই-বোমা তৈরি করাটা বেশ জটিল। মার্কিন সেনাবাহিনী এটার ওপর জোর দিয়েছে।

ই-বোমা নানাভাবে ব্যবহার করা যাবে। ক্রুজ মিসাইলের মতো ছোড়া যাবে। আকাশ থেকে পাইলট-বিহীন বিমান থেকে ফেলা যাবে। ই-বোমাতে আছে মাইক্রোওয়েভ সোর্স এবং পাওয়ার সোর্স। নিউক্লিয়ার ডেটোনেশনের সময় যে ধরনের ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক পালস নির্গত হয়, আল্ট্রাওয়াইডব্যান্ড ই-বোমার ফলেও সেটা তৈরি হয়। কিন্তু এখানে পারমাণবিক পদার্থের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় সাধারণ রাসায়নিক বিস্ফোরণ।

একটা ন্যারোব্যান্ড ই-বোমা বার বার ব্যবহার করা যায়। নিজের পছন্দ মতো টিউন করা যায়। লেজারের মতো এ বোমার ফোকাস বিম লক্ষ্যবস্তুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, চারদিক ছড়িয়ে যায় না। ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ এক থেকে দশ গিগাহার্টজ নিয়ে ইলেক্ট্রনিক সিল্ড দিয়ে ঢাকা নিউক্লিয়ার ডেটোনেশন পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। শত্রুপক্ষের বাঙ্কার মাটির যত গভীরে থাকুক না কেন, তাদের দেয়াল যতই মোটা হোক না কেন, ন্যারোব্যান্ড ই-বোমার হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। কারণ মাইক্রোওয়েভ বিম লেজার বিমের মতোই তৈরি হয়।

ই-বোমা নিয়ে প্রধান সমস্যা হচ্ছে– এ বোমার ক্রুড ফর্ম বানানোর জন্য টেকনোলজি সবার কাছেই আছে। এমনকি সন্ত্রাসীদের কাছেও। যারা রাডার বানাতে জানে, তারা এ বোমা সহজেই তৈরি করতে পারবে। ইতোমধ্যে কমপক্ষে বিশটা দেশ ই-বোমা নিয়ে গবেষণা করছে।

ই-বোমা বানানোর টেকনোলজি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে এটার খারাপ লোকের হাতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। এটা একটা মারাত্মক সত্য। কিন্তু এর হাত থেকে মুক্তির পথ সহজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে মার্কিন সরকারও দিশেহারা হয়ে পড়ছে।

এর অপব্যবহার ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

একটা উদাহরণ : এক অপরাধী কম ক্ষমতাসম্পন্ন একটা মাইক্রোওয়েভ জেনারেটর জোগাড় করে সেটা একটা সুটকেসে ঢুকিয়েছে। এখন সে সেটা নিয়ে রাখল একটা প্যাচিঙ্কো ম্যাশিনের পাশে। এরপর সে মেশিনটা চালু করল। সাথে সাথে মেশিনটার মাথা যেন খারাপ হয়ে গেল। তার ভেতর যত কয়েন ছিল (কয়েন দিয়ে মেশিনটা চালু করতে হয়) সব বের হতে শুরু করল। এরপর মাঝে মাঝে সে বেশ কয়েকবার কাজটা করল। তবে শেষ পর্যন্ত সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

কয়েকটা সূত্র থেকে জানা যায়, রাশিয়ান সৈন্যরা চেচেনদের ওপর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে। কারণ এটা বানানো খুব সহজ। মাইক্রোওয়েভ ওভেন দিয়েই একটা ছোটখাটো ই-বোমা বানানো যায়। তবে সেটা করা বোকামি হবে। ইন্টারনেটে সেটা বানানোর কৌশল বলা আছে।

ই-বোমা সম্পর্কে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে– বোমা ফাটানোর পর এর কোনো চিহ্ন থাকে না। কেউ বলতে পারবে না যে এখানে কোনো বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল।

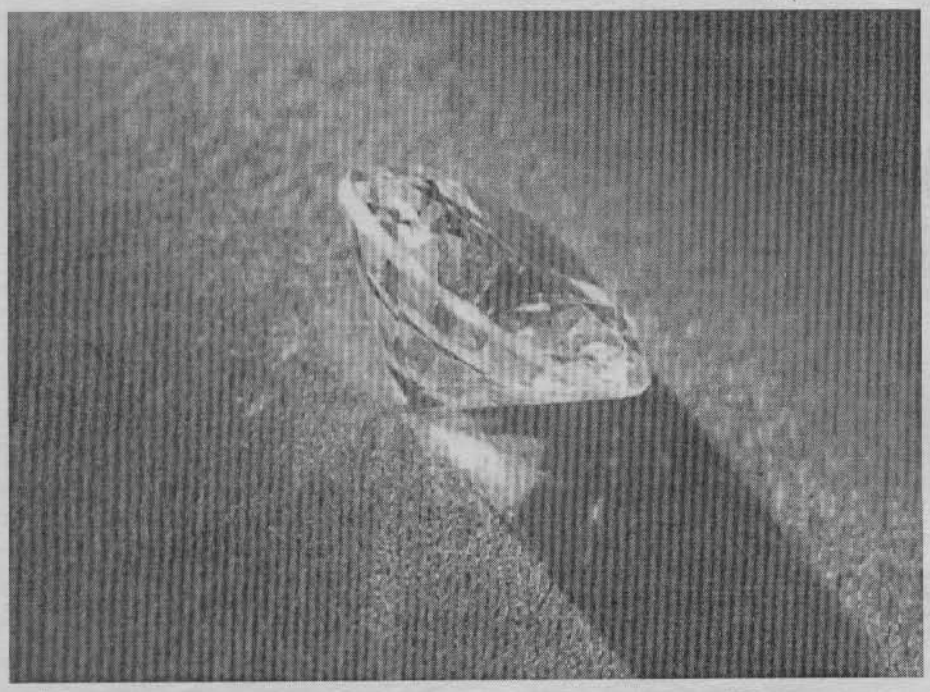

হীরার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী

মনীষা রায়

যে সব পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা বা যাচাই করা হয়, সেখানে একটি প্রশ্ন প্রায়ই দেখা যায়– পৃথিবীর সবচাইতে কঠিন পদার্থ কোনটি? আবার বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজেরও একটি জনপ্রিয় প্রশ্ন হচ্ছে– হীরা কাটা হয় কোন পদার্থ দিয়ে? দুটিরই উত্তর অভিন্ন– হীরা।

হ্যাঁ, হীরা পৃথিবীর সবচাইতে কঠিন পদার্থ এবং হীরা কাটতে হলে হীরারই সাহায্য নিতে হয়। আবার খুব ভঙ্গুর পদার্থ কাচ কাটতেও হীরার প্রয়োজন পড়ে। আজকাল অবশ্য অনেকে রশ্মি দিয়ে হীরা কাটার কথা বলে থাকেন, কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ। সাধারণভাবে খনি থেকে উত্তলিত হীরা কেটে কেটে আকর্ষণীয় রূপ দিয়ে অলংকার বানাতে বা বিশেষ ছাঁচে আনতে সাহায্য নিতে হয় অন্য আরেকটি হীরারই।

পৃথিবীর সবচাইতে দামি পদার্থগুলোর মধ্যেও হীরা অন্যতম। প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন বস্তুর মধ্যে হীরা দ্বিতীয় দামি পদার্থ। হীরা ব্যবহারিক দিক থেকে সাধারণ মানুষের কাছে যেমন দামি, তেমনি প্রায়োগিক দিক থেকে সমান দামি বিজ্ঞানীদের কাছেও। অধিকাংশ মানুষই যেমন দামের কারণে হীরা কিনতে পারেন না, তেমনি প্রায়োগিক দিকের স্বল্পতার কারণেও অনেক বিজ্ঞানী হীরা নিয়ে গবেষণা করতে পারেন না। প্রকৃতিতে কম পাওয়া যায় বলে এ পদার্থটি সাধারণ ও অসাধারণ অর্থাৎ বিজ্ঞানী– এ দুধরনের মানুষের কাছেই একটি কাঙ্ক্ষিত পণ্য হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিজ্ঞানীরা তবুও কৃত্রিম হীরা বানিয়ে তাদের কাজ চালিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের সে সুযোগটুকু নেই।

সাধারণ মানুষ হীরা ব্যবহার করেন মূলত অলংকার হিসেবেই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, তাতে হীরার একটি বড় ব্যবহার থাকে। আগেই বলা হয়েছে, কাচজাতীয় জিনিস কাটতে হলে হীরার সাহায্য নিতেই হয়। সুতরাং শিল্প-কারখানায়ও হীরার একটি বড় ব্যবহার রয়েছে। হীরার সাথে যোগসূত্র রয়েছে ইতিহাসেরও। বিখ্যাত কোহিনূর হীরার নাম কে না জানে। ভারতবর্ষের এ হীরা এখন শোভা পাচ্ছে ইংল্যান্ডের রানীর অলংকারের ভাণ্ডারে। বাণিজ্য করতে এসে একটানা দুশো বছর শাসন করার সময় ভারতবর্ষের গর্ব এই হীরাটিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্তরসূরিরা লুট করে নিয়ে যায়, যার সাথে জড়িত রয়েছে মোগল সম্রাটদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। কোহিনূরের মতো আরো অনেক বিখ্যাত হীরা ইংরেজরা তো নিয়েছেই, নিয়েছে পর্তুগীজরা, স্পেনীয়রাসহ বাণিজ্য কিংবা লুট করতে আসা অন্য বিদেশীরাও। হীরা নিয়ে রচিত হয়েছে কতশত কাহিনী। অভিশপ্ত হীরা বলে কিছু হীরার কথাও জানা যায়। সেসব হীরা যাদের কাছেই গেছে, তারাই কোনো না কোনোভাবে ধ্বংস হয়েছে বলে মনে করা হয়। অবশ্য এগুলোর কতটা গল্প আর কতটা সত্যি, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে মানুষের ইতিহাসের সাথে কঠিন গঠনের হীরা জড়িয়ে আছে অনেকভাবেই। হীরার এতসব গুরুত্ব, উপযোগিতা ও ব্যবহারযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই একুশ শতকে এসে কঠিন গঠনের হীরার ব্যবহারিক গুরুত্ব আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই হারিয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। হীরা নিয়ে যেসব গবেষণা করেন বিজ্ঞানীরা কিংবা শিল্প-কারখানায় যে হীরা ব্যবহার করা হয়, তার বদলে সেখানে ব্যবহৃত হতে পারে বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে আবিষ্কৃত নতুন কিছু কৃত্রিম পদার্থ। যেগুলো হীরার চাইতেও শক্তিশালী আণবিক গঠনের এবং ব্যবহারিক দিক থেকে আরো বেশি উপযোগী।

আমরা জানি, হীরা কার্বনজাতীয় যৌগ। কার্বন পরমাণু বিভিন্নভাবে অন্য পরমাণু বিশেষ করে হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে যেমন কয়লা কিংবা কাচজাতীয় পদার্থ গঠন করে , তেমনি পরমাণুর গঠন বদলে এ কার্বন পরমাণু দ্বারাই গঠিত হয় হীরা। তার মানে দেখা যাচ্ছে, মূল উপাদান একই থাকলেও কেবল বিন্যস্ত কিংবা সংগঠিত হওয়ার কৌশলের কারণে একটি পদার্থ আরেকটি পদার্থের চাইতে আলাদা হয়ে পড়ছে। বদলে যাচ্ছে তাদের মূল বৈশিষ্ট্যও। এমনকি এক পদার্থের সাথে অন্য পদার্থের পার্থক্যও স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় না। যেমন

আমাদের পরিচিত পৃথিবীর সব উপাদানের মধ্যে এখন সবচাইতে শক্তিশালী পদার্থ হচ্ছে বাকিবলস। হীরার স্থান এখন দ্বিতীয়তে।

হীরা পৃথিবীর অন্যতম কঠিন পদার্থ, কিন্তু কয়লা কিংবা কাচ ভঙ্গুর পদার্থের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করে। খনি থেকে যেসব যৌগ তোলা হয়, তার প্রতিটিই কার্বন যৌগ। পেট্রোলিয়াম, গ্যাস, হীরা, কয়লা কিংবা অপরিশোধিত তেল– এর সবই কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত। পৃথিবীর আদিতে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বিশাল বিশাল সব গাছপালা ও অন্যান্য উপাদান মাটির নিচে চাপা পড়ে তাপের তারতম্যের কারণে এসব ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করেছে। তাপের এ ভিন্নতায় কোনো এলাকায় গড়ে উঠেছে হীরার খনি, কোথাও তেলের আবার কোথাও বা কয়লার খনি।

যদি কার্বনজাতীয় যৌগের এ বিন্যস্ত হওয়ার তারতম্যের কারণেই হীরা এমন শক্ত পদার্থে পরিণত হতে পারে, তাহলে নিশ্চয়ই পরীক্ষাগারে কার্বনজাতীয় যৌগ দিয়ে হীরার চাইতে শক্ত পদার্থও তৈরি করা সম্ভব। বিজ্ঞানীদের এ চিন্তার পেছনে মূল যে কারণটি কাজ করেছে তা হচ্ছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিল্প-কারখানায় হীরার চাইতেও শক্ত কোনো পদার্থের প্রয়োজন হয়। হীরা দিয়েও সেসব কাজ করা যায়, কিন্তু সে কাজ খুব ধীরগতিতে সারতে হয়। ফলে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছিলেন এমন একটি পদার্থ তৈরি করতে, যা হীরার চাইতে শক্ত হবে। আর এ কাজে তারা কাজে লাগালেন হীরা তৈরির সূত্রটিকেই। অর্থাৎ কার্বনজাতীয় যৌগের পরমাণুর বিন্যাস নতুন করে সজ্জিত করে চেষ্টা করলেন নতুন একটি পদার্থ তৈরি করতে।বেশ কয়েক বছর প্রচেষ্টার পর অবশেষে বিজ্ঞানীরা এ ধরনের একটি নতুন কৃত্রিম পদার্থ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। কার্বনের কিছু 'ন্যানোরড'কে বিশেষ উপায়ে একত্র করে তারা এ পদার্থটি তৈরি করেছেন, যা হীরার চাইতেও শক্ত এবং কোনো কিছু আরো দ্রুত কাটতে কিংবা বিশ্লিষ্ট করতে সক্ষম। বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে পদার্থটির একটি খটোমটো নামও দিয়েছেন। তারা এ পদার্থটিকে অ্যাগ্রিগেটেড কার্বন ন্যানোরড বা এসিএনআর বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে রসায়নের ভাষায় এর যে সংকেত দাঁড়িয়েছে তা উল্লেখ করলে এ *সায়েন্স ওয়ার্ল্ড* পত্রিকার অন্তত অর্ধেক পাতা লেগে যাবে। আর হয়তো বোঝাও যাবে না কিছুই। তাই সেদিকে না হয় না-ই গেলাম।

তবে এ অ্যাগ্রিগেটেড কার্বন ন্যানোরড বা এসিএনআর জিনিসটিকে বিজ্ঞানীরা অনানুষ্ঠানিকভাবে আরেকটি বিশেষ নামেও উল্লেখ করছেন (অবশ্যই তা তাদের ল্যাবরেটরির বাইরে)। তারা এ পদার্থটির নাম দিয়েছেন বাকিবলস (buckyballs)। আশা করা যায়, এ নামটিই পরবর্তীতে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠবে। অন্যদিকে রসায়নবিদরা একে ডাকছেন কার্বন-৬০ নামে। এ বাকিবলসের প্রতিটি অনু ৬০টি এটম বা পরমাণু নিয়ে হেক্সাগনাল বা পেন্টাগনাল আকৃতিতে ফুটবলের মতো গঠিত।

কার্বন পরমাণুগুলোকে বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত করে সাধারণ বায়ুচাপের চাইতে অন্তত ২০০ গুণ বেশি চাপ দিয়ে এবং ২২২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ল্যাবরেটিতে তৈরি করা হয়েছে এ নতুন পদার্থটি। তৈরি করার পর পদার্থটি হীরার চাইতে কতগুণ শক্তিশালী তা পরীক্ষা করার জন্য ফ্রান্সে অবস্থিত ইউরোপিয়ান সিনক্রোট্রোন রেডিয়েশন ফ্যাসিলিটি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুটি সাধারণ হীরার মধ্যে অন্য একটি বিশেষ পদার্থ রেখে প্রথমে চাপ দিয়ে দেখা হয় দুটি হীরা কত চাপে সে পদার্থটিকে ভাঙতে পারে। হীরার পরীক্ষা শেষে একই পদার্থ এ নতুন বাকিবলসের মধ্যে রেখে চাপ দিয়ে ও অন্যান্য বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখা যায়, এটি হীরার চাইতে ০.৩% বেশি শক্তিশালী। তার মানে হচ্ছে, আমাদের পরিচিত পৃথিবীর সব উপাদানের মধ্যে এখন সবচাইতে শক্তিশালী পদার্থ হচ্ছে বাকিবলস। হীরার স্থান এখন দ্বিতীয়তে।

এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মানেই হচ্ছে একগাদা টাকা খরচ। প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা কেন এতো টাকা খরচ করে হীরার চাইতে এ শক্ত পদার্থ বানাতে গেলেন। একটু আগে বলা হয়েছে, শিল্প-কারখানা ও বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিভিন্ন কাজে হীরার চাইতে শক্ত পদার্থ দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ দরকার নিশ্চয়ই এতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না তাদের কাছে। কারণ এখন পর্যন্ত কেউই 'হীরা দিয়ে কাজ সম্ভব না' জাতীয় মন্তব্য করেননি। যেহেতু এটি গবেষণাগারে তৈরি, তার মানে হচ্ছে সাধারণ মানুষ এটি অলংকার হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন না। তাহলে বিজ্ঞানীরা কেন এ কাজটি করতে গেলেন? কী সুবিধা হবে এ নতুন পদার্থ দিয়ে? উত্তর দিচ্ছেন এ নতুন পদার্থ তৈরিতে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি নিজেই। জার্মানির ইউনিভার্সিটি অব বেরিউথ-এর গবেষক নাতালিয়া ডুবরোভিনসকাইয়া নতুন এ পদার্থের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন– সব নতুন পদার্থই একদিন না একদিন পুরনো হবে। আবার গবেষণা কাজ যতো পুরনো হবে, আবিষ্কৃত উপাদানটি উৎপন্ন করা ততো সহজ হতে পারে। এখন পর্যন্ত হীরা সবচাইতে নির্ভরযোগ্যভাবে পাওয়া যায় খনিতে। সে হীরার পরিমাণও দিন দিন কমে আসছে। ফলে এখন থেকেই অন্য একটি পদার্থ আমাদের তৈরি করতে হবে, যা হীরার বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে, সম্ভব হলে হীরার চাইতেও ভালো কাজ করতে পারে। সেই বিকল্প খুঁজতে গিয়েই আমরা এ প্রজেক্ট হাতে নিই। এ বাকিবলস নতুন তৈরি হলো মাত্র। পূর্ণাঙ্গ কাজ শেষ করা এখনো সম্ভব হয়নি। আর এটি যেহেতু প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে, তাই এখন এর দাম অবশ্যই অনেক বেশি হবে। আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে আরো সহজ পদ্ধতিতে সস্তায় এটি তৈরি করা যায়। যদি আমরা খুব সহজে এটি তৈরি করতে পারি, তাহলে আশা করা যায়, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে এটি দ্রুত হীরার জায়গা দখল করবে।

এ বাকিবলসের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইতোমধ্যেই বেশ আলোচিত হয়েছে। শিল্প-কারখানায় উচ্চতাপের কারণে যেখানে অন্য পদার্থ টিকতে পারে না, বাকিবলস সেখানে খুব সহজেই কাজ করতে পারে। সাধারণ হীরা ২০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি তাপমাত্রায় টিকতে পারে না। ফলে সে পরিবেশে কোনো কিছু কাটা এতোদিন সম্ভব হতো না। কাটতে হলে পদার্থটির তাপমাত্রা ২০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে নামিয়ে এনে কাটতে হতো। ফলে অনেক সময় বস্তুর ঘনত্ব, উপাদান ইত্যাদিতে সমস্যা সৃষ্টি হতো এবং ঠিক যেভাবে বানানো দরকার, সেভাবে বানানো সম্ভব হতো না। বাকিবলস আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

অন্যদিকে বিভিন্ন জিনিস ড্রিলিং বা ছিদ্র করা বা কাটার কাজে যে হীরা এতোদিন ব্যবহার করা হতো, তা যতোটুকু গভীর করে কাটতে পারতো, এ বাকিবলস তার চাইতে আরো গভীর করে এবং সূক্ষ্মভাবে কাটতে পারবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। ফলে এটি ড্রিলিংয়ের জগতেও নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করবে বলে তাদের ধারণা। তবে এর কোনোটাই এখন আপাতত করা সম্ভব হবে না, যদি না এর দাম কমানো হয়। আর অন্তত ততোদিন পর্যন্ত নির্ভর করতে হবে হীরার ওপরেই।

তবে হীরার যে ঐতিহ্য এতোদিনে গড়ে উঠেছে, সেটিরও একটি মূল্য রয়েছে। যেসব বিজ্ঞানী মনে করছেন, বাকিবলস সহজলভ্য ও সস্তা হলে হীরা হারিয়ে যাবে, তাদের এ আশা কিংবা আশঙ্কা সত্যি নাও হতে পারে। তাছাড়া অলংকার হিসেবে হীরার গ্রহণযোগ্যতা খুব শিগগিরই কমবে বলে মনে হয় না। বাকিবলস জনপ্রিয় হলেও হীরার জনপ্রিয়তা কমতে নাও পারে। শিল্প-কারখানায় হীরার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাকিবলসের ব্যবহার খুব বেশি হতে পারে, কিন্তু মানুষকে সাজাতে হীরা ফেলে কেউ বাকিবলস তুলে নেবে বলে মনে হয় না। আসল জিনিস থাকতে কি কেউ কৃত্রিম জিনিস তুলে নেয়?

পুরুষের শরীরেও জীবিত ভ্রূণ!

ফরিদুর রহমান পান্থ

বিষয়টি নতুন এবং চমকপ্রদ, তবে অবিশ্বাস্য নয়। ১৬ বছরের একটি ছেলে পেটে বাচ্চাধারণ করেছে। সংবাদটি শুনে আতকে উঠবেন না কিংবা ছেলেটিকে নিয়ে মাতামাতি শুরু করে দেবেন না, দয়া করে। কারণ সংবাদটি জনসমক্ষে ছড়িয়ে পরার পর এরই মধ্যে তাকে নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি হয়েছে। এমনকি তার কাছে এও জানতে চাওয়া হয়েছে, সে আসলেই পুরুষ কিনা! সব মিলিয়ে পুরো বিষয়টি ছেলেটির জন্য একদিকে যেমন বিব্রতকর তেমনি ঝামেলারও। জেনে রাখুন আরেকটু তথ্য, ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশেই।

ছেলেটির নাম পলাশ (কাল্পনিক নাম, ডাক্তারের অনুরোধে নামটি গোপন রাখা হলো), বয়স বড়জোড় ১৬ বছর। এতদিন জীবনযাত্রা স্বাভাবিকই ছিল। হঠাৎই হোচট্ খেল পলাশ। অস্তিত্ব অনুভব করলো শরীরের অভ্যন্তরে অনাকাঙ্ক্ষিত এমন কিছুর, যা নিয়ে সে চলতে পারছে না- কষ্ট

হচ্ছে। উপায়ন্ত না দেখে ডাক্তারের পরামর্শ নিল পলাশ। স্থানীয় ডাক্তার জানালেন, তার শরীরে টিউমার জাতীয় কিছু একটার অস্তিত্ব রয়েছে এবং দ্রুত অপারেশন করতে হবে। পলাশ যোগাযোগ করলেন ঢাকায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (পিজি হাসপাতাল)। সেখানে তার চিকিৎসা শুরু করলেন পিজি হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক এম এ মজিদ ।

প্রথম দিকে তিনিও পলাশের শরীরের অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি টিউমার বলেই ধারণা করেছিলেন। তবে এও বুঝালেন টিউমারটি স্বাভাবিক নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তিনি জানলেন, পলাশের পেটে যে টিউমারটি রয়েছে তা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ বড়। ফলে তার চলতে কষ্ট হচ্ছে। এম এ মজিদ বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন, জানলেনও বিস্তর। এক্স-রে করে জানতে পারেন তিনি যা ভেবেছিলেন বিষয়টি তেমনই। টিউমারটি জটিল আকৃতি ধারণ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা ওটাকে টিউমারই বলা যায়। ডাক্তারি ভাষায় বললে বলতে হয় 'ফিটাস ইন ফিটো'।

ভাইয়ের পেটে ভাই!

'ফিটাস ইন ফিটো', ডাক্তারি পরিভাষা। সহজ করে বলতে গেলে বলা যায়, 'ভাইয়ের পেটে ভাই', যার প্রকৃত উদাহরণ আকাশ। অধ্যাপক মজিদ ফিটাস ইন ফিটো বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জানালেন, মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় কোনো কারণে আকাশের জমজ ভাইয়ের ভ্রূণটি তার ভ্রূণের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু বিষয়টি এমনভাবেই ঘটে। ফলে আকাশ খুব স্বাভাবিক ভাবে জন্ম নেয় এবং বেড়ে উঠতে শুরু করে। সেই সাথে অপর ভ্রূণটিও রয়ে যায় আকাশের শরীরের ভেতরেই। সেও বাড়তে থাকে। পেটের মধ্যে যতদূর সম্ভব বড় হয়ে ওঠার পর ওটা যখন আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে তখনই আকাশের সমস্যা হতে শুরু করে। বলতে গেলে আকাশের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হতে শুরু হয়। আকাশ বুঝতে পারে, তার শরীরে এমন কিছু রয়েছে, যা তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে বাধা দিচ্ছে। আরো স্পষ্ট করে বললে, এটা চরমভাবে ভোগাচ্ছে তাকে। প্রথম দিকে চিকিৎসকগণ টিউমার হিসেবে ধারণা করলেও

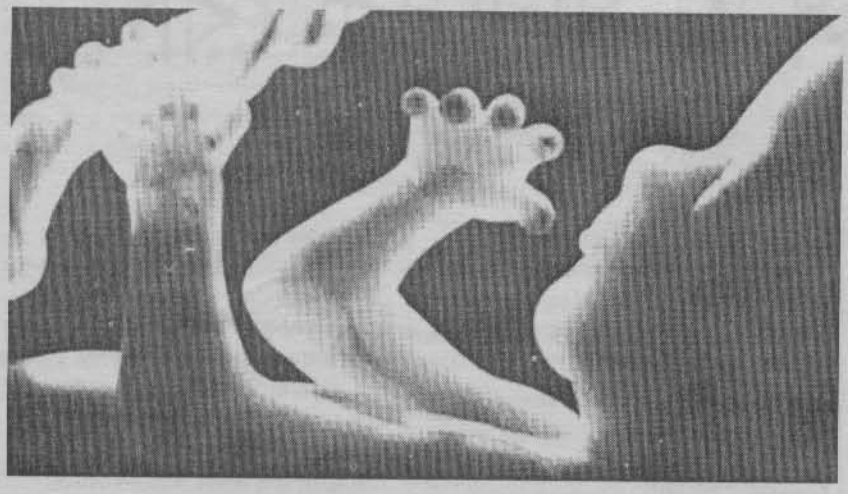

বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন এম এ মজিদ। গর্ভে থাকা অবস্থায় একটি ভ্রূণ পরিপক্ক এবং অন্যটি অপরিপক্ক থাকলে, অপরিপক্ক ভ্রূণটি পরিপক্ক ভ্রূণে গিয়ে আশ্রয় খুঁজতেই পারে। সেক্ষেত্রে পরিপক্ক ভ্রূণটি মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়ে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে। তবে অপরিপক্ক ভ্রূণটিও বসে থাকে না। ঐ অপরিপক্ক ভ্রূণটিও বেড়ে উঠতে শুরু করে পরিপক্ক ভ্রূণটির মাঝে। পরিপূর্ণ ভ্রূণের ভেতরে অবস্থান করে তার থেকেই খাদ্যগ্রহণ করে অপরিপক্ক ভ্রূণটি। বেড়ে ওঠে স্বাবলীলভাবে। জানালেন বাংলাদেশে প্রথম ঐ ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সার্জন অধ্যাপক এম এ মজিদ। আগস্টের ২১ তারিখ ঢাকা মেডিকেল কলেজের সম্মেলন কক্ষে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ভিত্তিক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল 'ডিএমসি ভয়েস' নামের কলেজের মুখপত্র সংগঠন। সেখানেই নিজের অভিজ্ঞতা উদীয়মান চিকিৎসকদের জানালেন এম এ মজিদ।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর জানা যায় ওটা আসলে আরো একটি ভ্রূণ। অধ্যাপক মজিদ বললেন, একটি ভ্রূণের মধ্যে আরেকটি ভ্রূণ থাকলেই তাকে ফিটাস ইন ফিটো বলা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমাণিত হয় বেড়ে ওঠা ঐ ভ্রূণটিরও নিজস্ব মেরুদণ্ড আছে। কেননা, ওটা যে ভ্রূণ ছিল তা প্রমাণ করা যাবে কেবল মেরুদণ্ড থাকলেই। আলোচনা সভাতে জানানো হয়, আকাশের শরীরের মধ্যে থাকা ভ্রূণটির ওজন ছিল দেড় কেজির মতো। ভ্রূণটি ডিম্বাকৃতির। রেডিওগ্রাফের মাধ্যমে শরীরের ভেতরে থাকা ঐ ভ্রূণটিতে ভার্টিব্রাল কলাম, হিউমেরাস, ফিমার এমনকি টিবিয়ার অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া গেছে।

কাল্পনিক নয়, সত্যি

অধ্যাপক মজিদ তার বক্তৃতায় জানালেন, ভাইয়ের পেটে ভাই হওয়ার এ ঘটনা অহরহ ঘটে না। তবে এ ঘটনা একেবারে নতুনও নয়। এর আগেও এমনটি ঘটেছে। তবে ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটার অনুপাত ২ঃ১। তথ্যটি দেয়ার সাথে সাথে তিনি দেশের মানুষকে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টিকে মেনে নেয়ার আহ্বান জানালেন। বললেন, কোনো মেয়ের শরীরে এমন একটি ভ্রূণ পাওয়া গেলে আমাদের সমাজ তা সহজে মানতে পারতো না। কোনো কিছু না ভেবেই তাকে অপয়া বলে অপবাদ দিত। কিন্তু মানুষকে জানতে হবে বিষয়টি মোটেও অস্বাভাবিক নয়। এ দেশে প্রথম হলেও আগেও এমন ৮৮টি ঘটনার রেকর্ড আছে। তিনি বললেন, দুঃখজনক হলেও সত্য আকাশ পুরুষ, তারপরও ঐ ঘটনাকে আমাদের সমাজ সহজে মেনে নিতে পারছে না। তার কাছে জানতে চাইছে, সে আসলেই পুরুষ কিনা! অধ্যাপক মজিদ আকাশের সমাজের মানুষকে অনুরোধ করে বলেছেন, দয়া করে আকাশকে বিব্রত করবেন না। আকাশ পুরুষ এবং তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অধ্যাপক মজিদ জানালেন, সিটি স্ক্যান করার পর আকাশের বিষয়টি ধরা পড়ে। এও জানালেন, আকাশ বর্তমানে সুস্থ আছে এবং দিব্যি তার কাজ করছে। অধ্যাপক মজিদ বিশ্বাস করেন এ ঘটনায় দেশের উদীয়মান চিকিৎসকদেরও অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করলো।

উল্লেখ্য, প্রথমবার ফিটাস ইন ফিটো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গিয়েছিল ১৮০৬ সালে, মিকেল নামের একজন চিকিৎসক প্রথম বিস্তারিত জানিয়েছিলেন বিষয়টি নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, জোড়া-বাচ্চার মতোই ঐ ভ্রূণটি বেড়ে উঠতে পারে এবং বেঁচে থাকতে পারে। তবে কোনো এক সময় ঐ ভ্রূণটি বড় হতে শুরু করে এবং জীবিত মানুষটিকে সমস্যায় ফেলতে শুরু করে। বড় হওয়ার কারণে কখনো কখনো ঐ বর্ধিত ভ্রূণটি শরীরের ভেতরের কোনো না কোনো অঙ্গাণুকে চাপের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। যে কারণে ব্যাহত হতে পারে মানুষটির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। তার আগ পর্যন্ত ঐ ভ্রূণটি নির্বিঘ্নেই বাড়তে পারে পোষক দেহে।

এবং জানা প্রয়োজন

মানবদেহের অনেক কিছু সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত ধারণা দিতে পারেননি। স্পষ্ট করে বললে, তারা এখনো অনেক কিছু জানেন না কিংবা আবিষ্কার করতে পারেননি। তাই বলে তারাও থেমে নেই। প্রতিনিয়তই চলছে বিজ্ঞানীদের গবেষণা। ফিটাস ইন ফিটো পুরনো আবিষ্কার হলেও বাংলাদেশের চিকিৎসকদের জন্য তা একেবারেই নতুন। দেশের মানুষের কাছে তো বটেই। তাই অধ্যাপক মজিদ দেশের সকল মানুষকে অন্য সব নতুন আবিষ্কারের মতো ফিটাস ইন ফিটোকেও সহজে মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি অনুরোধ করেছেন, এমন ঘটনায় পড়লে কাউকে বিব্রত করবেন না। এটা প্রকৃতিরই অংশ। আধ্যাত্মিকভাবে বললেন, সৃষ্টিকর্তার খেলা। অধ্যাপক মজিদ আকাশের সমাজের লোকের কাছেও তাকে বিরক্ত না করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৪ • সংখ্যা ৪৭ • নভেম্বর ২০০৫

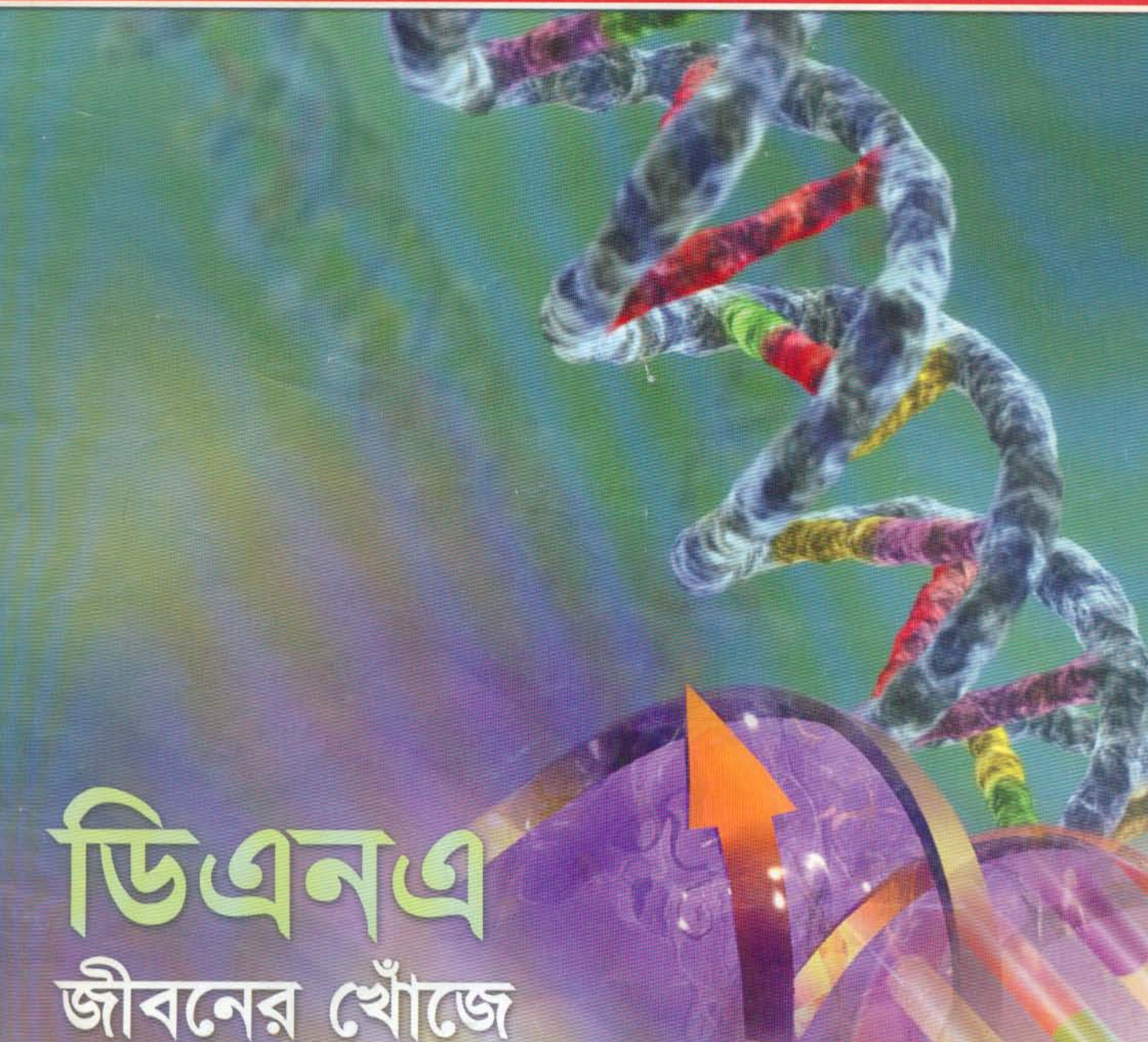

ডিএনএ
জীবনের খোঁজে

- ন্যানো মেশিন : আণবিক আকারের কলকব্জা
- শিম্পাঞ্জীর সংস্কৃতি
- জীবন রাঙাতে ভিটামিন
- মহাকাশের অস্ত্রভাণ্ডার
- বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী নায়কেরা

প্রফেসর'স প্রকাশনের একটি প্রকাশনা

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৪
সংখ্যা ৪৭
নভেম্বর ২০০৫

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-কম্পিউটার-স্বাস্থ্য
ও চিকিৎসা বিষয়ক ম্যাগাজিন

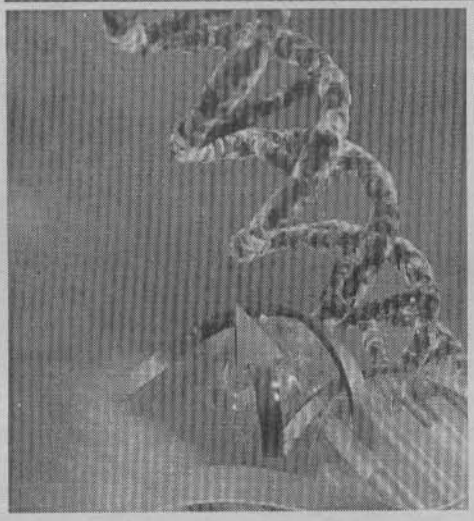

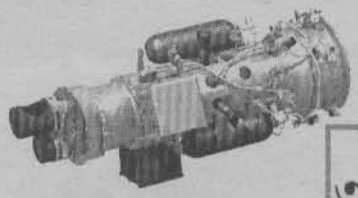

সম্পাদক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক
আতাউর রহমান কাবুল

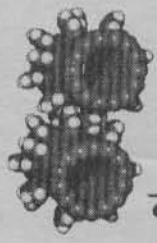

সহযোগী সম্পাদক
এস এম মুকুল

সহকারী সম্পাদক
সরোয়ার হোসেন

অতিথি লেখক
মাসুদ কামাল
ড. অরূপ রতন চৌধুরী
ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল

নিয়মিত লেখক
আসিফ, রেহানা পারভীন রুমা
পারভীন সুলতানা, শান্তা মারিয়া
ফারহানা মিলি, হিটলার এ হালিম
মাহবুব আনোয়ার শুভ, শফি ইসলাম
মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাদাত শাহরিয়ার
এ কে এম মুনির হোসেন
আনোয়ারুল হক খান

সার্কুলেশন
আমিনুল ইসলাম সোহাগ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫০৯৫
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৭১৭৫০৯৫

বিপণন
৩৭/১, বাংলাবাজার
দ্বিতীয় তলা, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫০৫৪, ০১৭১-১২০৭০১

মূল্য : পনের টাকা

প্রফেসর'স প্রকাশন, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত।

ই-মেইল : editor_sworld@yahoo.com

এ সংখ্যার সূচি

৬ ডিএনএ জীবনের খোঁজে
— ফরিদুর রহমান পান্থ

৩২ মহাকাশের অস্ত্রভাণ্ডার
— হীরক চৌধুরী

১৪ ন্যানো মেশিন
আণবিক সাইজের কলকব্জা
— ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম

অন্যান্য রচনা

ইন্টারপ্লানেটারি ইন্টারনেট
– তামজিদ হোসেন /৯
জীবন রাঙাতে ভিটামিন
– মনীষা রায় /১২
বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী নায়কেরা
– জিয়াউল হক সৈকত /১৮
শিম্পাঞ্জীর সংস্কৃতি
– শেখ আনোয়ার /২০
পরমাণু বোমা
– মোঃ আব্দুল ওয়াহাব /২৩
কালোকেশীদের তুলনায় স্বর্ণাকেশীদের ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি
– প্রাণ কানাই রায় চৌধুরী/২৭
বিষণ্ণতা : আপনাকে কুরে কুরে খায়
– মফিদুল হক /২৮
চুলের পক্ষে ওকালতি
– আসিফ আনোয়ার /৩০
ইন্টারনেটের গতি বাড়ানোর কৌশল
– মোঃ গোলাম মোস্তফা /৩৪
সুপারসনিক বিমান
– গৌতম রায় /৪০
মহাবিশ্বের রহস্য ভেদে সুপার কম্পিউটার
– নুসরাত রহমান /৪২
প্রযুক্তির বিস্ময় : গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম
– হাসিব রেজা রনি /৪৩

নিয়মিত বিভাগ

৩ চিঠিপত্র
৪ বিজ্ঞান বিশ্বের নতুন খবর
২৪ বিজ্ঞান প্রজন্ম
বিতর্ক ৩৬
বিজ্ঞান কুইজ ৪৭
সায়েন্স ফিকশন : হ্যালির স্বর্গ ৩৭

ডিএনএ
জীবনের খোঁজে

ফরিদুর রহমান পান্থ

হারিয়ে যাওয়া সন্তান কিংবা ভাইকে ফিরে পেতে বাংলা সিনেমার নায়কদের নির্ভরতা ছোটবেলায় একসাথে গাওয়া কোনো গান। তবে বাংলা সিনেমার ঐ পদ্ধতিটা বোধ করি পাল্টানোর সময় এসেছে।

হাজার হোক বিশ্ব এগিয়ে চলেছে। ধরেই নেয়া যায়, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ে একটু হলেও জানতে শুরু করেছেন সিনেমার পরিচালকরা। এরই মধ্যে নিশ্চিত করে জেনেছেন 'ডিএনএ পরীক্ষা' সম্পর্কেও। ফলে শৈশবে হারিয়ে ফেলা ভাই কিনা তা খুঁজে পেতে সিনেমার নায়কদের আর কষ্ট করে গান মনে রাখতে হবে না। তার ডিএনএ-এর সাথে ভাইয়েরটা মিলিয়ে নিলেই প্রমাণ মিলবে। অবাক হবেন না। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা ডিএনএ পরীক্ষা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান রাখে। আমরা একটু দেরিতে জানছি, এই যা। সবে শিখতে শুরু করেছি ডিএনএ কি এবং কেনইবা ডিএনএ পরীক্ষা।

জীবন অর্থ ডিএনএ

বিজ্ঞান বইয়ের ভাষায় ডিএনএ হলো, ডি-অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড। নাম থেকে অন্তত এ বিষয়টা পরিষ্কার যে, ওতে এসিড বা অম্ল জাতীয় কিছু একটার অস্তিত্ব রয়েছে। তবে সহজবোধ্য করে বলতে চাইলে বলা যেতে পারে, মানুষ তথা যে কোনো জীবিত প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে যেখানে, সেখানেই রয়েছে ডিএনএ। জীবনের বাহক যে জিন সেই জিনের

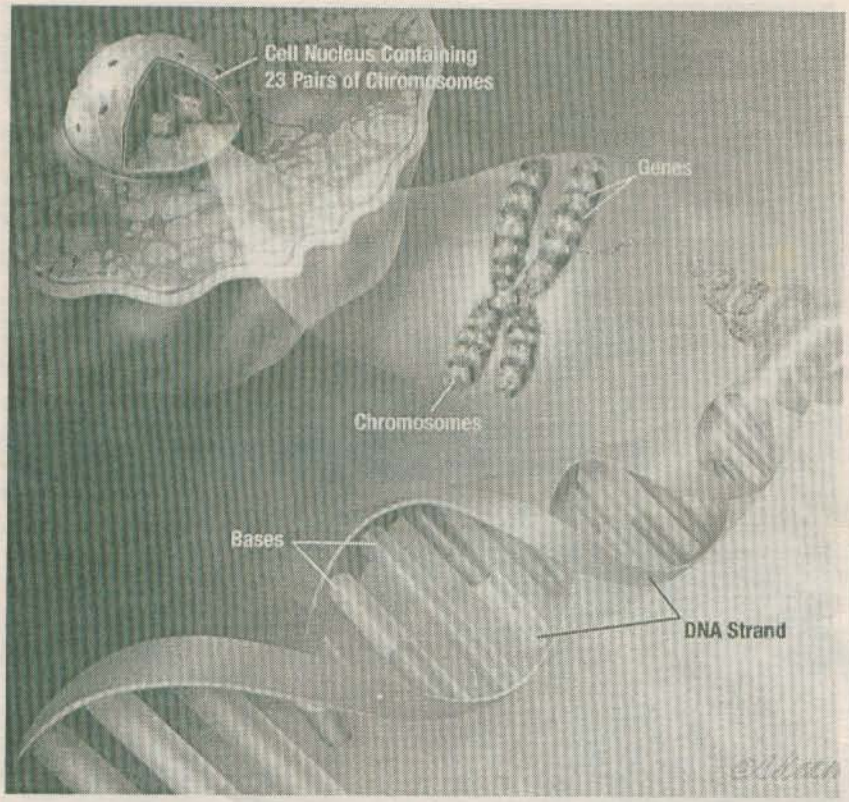

প্রধানতম উপাদান হলো ডিএনএ। বিজ্ঞান একে জেনেটিক উপাদান বলে উল্লেখ করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে সেখানেই ডিএনএ-এর দেখা মিলবে। মানুষ তথা কোনো প্রাণের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, তার নিয়ন্ত্রক ঐ অম্ল নির্ভর জিনগত উপাদান, ডিএনএ। আর যে কোনো জীবিত প্রাণী ওই ডিএনএ প্রাপ্ত হয় পূর্ব পুরুষ থেকে। এটুকু খুব বেশি জটিল হয়ে গেলে হালকা চালের একটি উদাহরণের সাথে পুরোটা মিলিয়ে নিন। ধরা যাক কোনো মানুষের চুল কালো, নাক লম্বা, চোখের রঙ হালকা নীলাভ, দেহের উচ্চতা ছয় ফুটের কাছাকাছি এবং গায়ের রং শ্যামলা। তাহলে আপনি বলেই ফেলতে পারেন, লোকটির বাবা-মায়ের কেউ অথবা দুজনই কিংবা তার পূর্ব পুরুষের কেউ বেশ লম্বাটে এবং কালো চুলের অধিকারী। সেসাথে তাদের পরিবারের কোনো পূর্ব পুরুষের ছিল নীলাভ চোখ। তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে, এতকিছু নিয়ন্ত্রণ করে যে উপাদান তা কোথায় থাকে? কেমন দেখতে কিংবা কারা একে খুঁজে বের করলো?

ডিএনএ-এর সন্ধান লাভ

ডিএনএ দেখতে তন্তুর মতো, প্রথমবারের মতো বিষয়টি জানা গেল ১৯৫৩ সালে। প্রথম বার যারা ডিএনএ সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন তাদের নাম ফ্রান্সিস ক্রিক আর জেমস ওয়াটসন। এর আগেও ডিএনএ নিয়ে গবেষণা হয়েছে অল্প-বিস্তর। ১৯২৮ সালে ফ্রেডরিক গ্রিফিতি নিউমোনিয়ার ব্যাকটেরিয়া ও ইঁদুর নিয়ে একটি গবেষণা করেছিলেন। তখনই ডিএনএ বিষয়ে জানা গিয়েছিল। তবে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প। পরে ওয়াটসন-ক্রিক জুটিই তন্তুকার ওই ডিএনএ-এর প্যাঁচ খুললেন। তাঁরা বলেছেন, প্রাণের জিনগত উপাদান হিসেবে ডিএনএ-ই সবকিছুর হোতা। তাঁরা জানালেন, ডিএনএ খুবই পাতলা। এতটাই পাতলা যে ১ ইঞ্চির মিলিয়ন ভাগের একভাগ স্থানে রাখা যাবে ১ ফুটের ডিএনএ! ওয়াটসন-ক্রিক বলেছেন, ডিএনএ হলো দ্বিসূত্রক। অর্থাৎ সর্পিলাকার দুটি সুতার মতো এর গঠন, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ডাবল হেলিক্স। যার বাইরের অংশ তৈরি রাইবোজ সুগার উপাদান এবং ফসফেট গ্রুপ সমন্বয়ে আর ভিতরের দিকে থাকে নাইট্রোজেন। একদিকে এডিনিন (A) এর সাথে জোড়া বাঁধে থায়ামিন (T)। আর অন্যপ্রান্তে সাইটোসিন (C)এর সাথে জোড় বাঁধে গুয়ানিন (G)। এই চারটি উপাদানই মূলত ডিএনএ-এর বেইস বা ব্লক। এ বেইসগুলো একের পর এক সজ্জিত হয়, অনেকটা ইটের ওপর ইট সাজিয়ে বাড়ি তৈরির মতো। অর্থাৎ এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, ওই বেইস বা ব্লক উপাদানগুলো হাইড্রোজেনের সাথেই সংযুক্ত হয়ে ডিএনএ গঠন করে। প্রশ্ন হতে পারে, আমাদের শরীরে ডিএনএ-এর সংখ্যা কত? মানুষের শরীরের একটি মাত্র কোষে যে পরিমাণ ডিএনএ থাকতে পারে, সেই পরিমাণ ডিএনএ গড়তে কম করে ৩২০ কোটি বেইস বা ব্লক প্রয়োজন পড়বে!

মানুষ হিসেবে আমাদের সকলেরই ৯৯ দশমিক ৯ ভাগ ডিএনএ-তে মিল পাওয়া যায়। তবে ওই দশমিক ১ ভাগ অমিলের কারণেই এক মানুষ অন্য মানুষ থেকে পৃথক হয়, শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য বদলে যায়! আর তাই দশমিক ১ ভাগ ডিএনএ পৃথকীকরণ ও সনাক্তকরণের মাধ্যমেই মানুষের পরিচিতি খুঁজে বের করা সম্ভব।

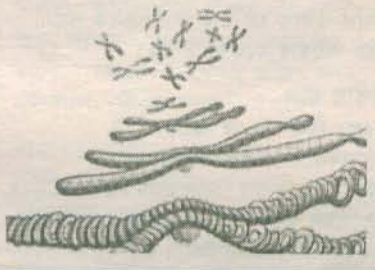

এবার জানা যাক, ডিএনএ কিভাবে প্রাণের পার্থক্য গড়ে দেয়। বেইস বা ব্লকগুলোর বিন্যস্ত হওয়ার ধরণেই পাল্টে যায় জীবের বৈশিষ্ট্য, চারিত্রিক কিংবা শারীরিক গঠন। কদিন আগে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমেস্ট্রি ও মলিকিউলার বায়োলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. হাসিনা খান বলেছেন, মানুষ হিসেবে আমাদের সকলেরই ৯৯ দশমিক ৯ ভাগ ডিএনএ-তে মিল পাওয়া যায়। তবে ওই দশমিক ১ ভাগ অমিলের কারণেই এক মানুষ অন্য মানুষ থেকে পৃথক হয়, শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য বদলে যায়! আর তাই দশমিক ১ ভাগ ডিএনএ পৃথকীকরণ ও সনাক্তকরণের মাধ্যমেই মানুষের পরিচিতি খুঁজে বের করা সম্ভব।

ডিএনএ-অবলম্বনে পিতার খোঁজ

'ম্যারাডোনা আমার বাবা' হল ভর্তি সাংবাদিকদের সামনে এমনই বোমা ফাটিয়েছিল কোথাকার কোন ছোকরা। পুরো হুলুস্থুল বাঁধিয়ে ফেলেছিল; কদিনের জন্য উত্তেজিত করে তুলেছিল সাংবাদিকদের। সংবাদের খোরাক জুগিয়েছিল তাদের। ঘটনা বেশি দিন আগের নয়। সে সময় জনা দুয়েক সাংবাদিক অতি উত্তেজনা ধরে রাখতে না পেরে ফুটবল ইশ্বর ম্যারাডোনার সাথে ছোকরাটির নাক, কান ইত্যাদি মিলিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন, মিল পেয়েছিলেনও! আড়ালে-আবডালে তারা বলতে শুরু করেছিলেন, 'ওই তো অবিকল ম্যারাডোনার নাক!' এমন কাহিনী শোনা গিয়েছিল পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক ইমরান খানের বেলাতেও। কিন্তু এমন বললেই হলো, বিজ্ঞান আছে না! পারলে

প্রমাণ করে দেখাও, ডিএনএ পরীক্ষা কর, নইলে মানবো কেন? আর তাই শেষ পর্যন্ত গুজবই রয়ে গেছে ঘটনাগুলো। প্রমাণ করা যায়নি। একইভাবে সর্বশেষ হারিয়ে যাওয়া চট্টগ্রামের শিল্পপতি জামাল উদ্দিনের পরিবার তাঁর পরিচিতি খুঁজতে দেশের সরকারের কাছে আবেদন করেছেন ডিএনএ পরীক্ষার। তাদের দাবি মানাও হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে পিতৃপরিচয় খুঁজতে কিংবা হারিয়ে যাওয়া সন্তান কিনা মিলিয়ে নিতে করা যেতে পারে ডিএনএ পরীক্ষা। এ পরীক্ষার রয়েছে কয়েকটি ধাপ।

ডিএনএ পরীক্ষার সাত-পাঁচ

ডি-অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিডকে বিশ্লেষণ করে মানুষ চেনার বিষয়টি প্রথম জানা গেল ১৯৮৫ সালে। যুক্তরাজ্যের লিচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেক জেফরি বিষয়টি জানানোর সাথে সাথে রীতিমতো হৈ চৈ পড়ে যায় বিজ্ঞানী সমাজে। তিনি জানালেন, অমিল থাকা ওই দশমিক ১ ভাগ ডিএনএ পৃথকীকরণের জন্যই উপাদান সংগ্রহ করতে হয় সবচেয়ে বেশি। কেউ হারিয়ে যাওয়া সন্তানের খোঁজ পেয়ে নিশ্চিত হতে চাইলে ছেলেটির রক্ত, হাতের নখ কিংবা অন্য কোনো উপাদান নিয়ে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। তারপর তার নিজের শরীর থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মিলিয়ে নিতে হবে। ব্যাস মিলে গেলেই বোঝা যাবে কে কার ছেলে অথবা কোন সন্তানের পিতা কে! মূলত ডিএনএ পরীক্ষার জন্য মানুষের শরীরের রক্ত, বীর্য, ব্যবহৃত কনডম, কাপড়ে লেগে থাকা বীর্য, ব্যবহৃত দাড়ি কামানোর রেজর, চুল ইত্যাদি থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এর বাইরে সিগারেট ফিল্টার, টুথ ব্রাশ, মূত্র, ব্যবহৃত পোশাক থেকেও ডিএনএ পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। ডিএনএ পরীক্ষা হতে পারে বেশ কয়েকভাবে। তবে জনপ্রিয়তা আর গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে তিনটি পদ্ধতিকে মেনে নেয়া হয় আদর্শ হিসেবে।

পিতৃপরিচয় খুঁজতে যে পদ্ধতিটি বেশি জনপ্রিয় তার নাম প্যাটর্নিটি পরীক্ষা। সাধারণত দেহের ২৩ জোড়া ক্রোমোজমই মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে। তার মধ্যে এক জোড়া হলো সন্তান নির্ধারক ক্রোমোজম। ওই এক জোড়া ক্রোমোজমই নিয়ন্ত্রণ করে সন্তান কোন লিঙ্গের হবে সে বিষয়টি। ক্রোমোজমের বিশ্লেষণী পরীক্ষার মাধ্যমেই তাই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব পিতার পরিচয়।
দ্বিতীয় পদ্ধতিটির নাম মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ পরীক্ষা। সাধারণত কোনো কোষে নিউক্লিয়াসের বাইরেও কিছু ডিএনএ-এর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়, ওগুলো আসলে মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়া পিতার কাছ থেকে আসে না বরং মায়ের বংশ থেকে পাওয়া যায়। ফলে মায়ের বংশের রক্ত থেকেও ডিএনএ পরীক্ষা করে পরিচয় বের করা সম্ভব। আরেকটি পদ্ধতি ঠিক মাইটোকন্ড্রিয়াল পরীক্ষার বিপরীত; নাম ওয়াই ক্রোমোজম পরীক্ষা। যেহেতু ওয়াই ক্রোমোজমটি আসে পিতার কাছ থেকে। ফলে এ পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করতে হয় পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে।

সাধারণত কোনো কোষে নিউক্লিয়াসের বাইরেও কিছু ডিএনএ-এর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়, ওগুলো আসলে মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়া পিতার কাছ থেকে আসে না বরং মায়ের বংশ থেকে পাওয়া যায়। ফলে মায়ের বংশের রক্ত থেকেও ডিএনএ পরীক্ষা করে পরিচয় বের করা সম্ভব।

যেভাবে পরীক্ষা হয়

ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে শুধু পিতৃপরিচয় জানাই নয় বরং অপরাধী সনাক্ত করাও সম্ভব। সেজন্য কয়েকটি ধাপে ডিএনএ-কে বিশ্লেষণ করে ফলাফল নির্ধারণ করা হয়।

প্রথম ধাপ

প্রথমেই নমুনা হিসেবে রক্ত, কলা (টিস্যু), চুল কিংবা অন্য কোনো নমুনা নিয়ে তার থেকে ডিএনএ-কে পৃথক করে ফেলা হয়। এরপর ডিএনএ-কে পরিষ্কার করে নেয়া হয়। যেহেতু সবসময় পরিষ্কার নমুনা পাওয়া সম্ভব হয় না বিশেষ করে অপরাধী সনাক্তকরণের সময় কার্পেটে পড়ে থাকা চুল, বস্ত্র ইত্যাদি থেকে সনাক্ত করতে হয় তাই ডিএনএ-কে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হয়।

দ্বিতীয় ধাপ

এরপর ডিএনএ-এর ভিতরে রাখা জিনোমগুলোকে টুকরো করা হয়। টুকরোগুলোতে চার কিংবা ছয়টি ভিত্তির ডিএনএ সিকোয়েন্স থাকে। বিশেষ ধরনের এনজাইমের মাধ্যমে জিনোমগুলো টুকরো করা হয়।

তৃতীয় ধাপ

এ ধাপে ক্ষুদ্রাংশগুলোকে ইলেকট্রোফোরেসিসের মাধ্যমে আবারও টুকরো করা হয়। সাধারণত বৃহত্তর টুকরোগুলো ধীরে চলে এবং বিপরীত ধর্মী ডিএনএ একে অন্যকে আকর্ষণ করতে চায় বলে আরেকটু ছেঁটে নেয়া হয়।

চতুর্থ ধাপ

এ ধাপে ডিএনএ-এর দু স্তরের প্যাঁচ ভেঙে একস্তরী সরল অবস্থায় নিয়ে আসা হয়।

পঞ্চম ধাপ

মূল ডিএনএ-এর প্যাঁচ থেকে ডিএনএ-এর অংশবিশেষ নিয়ে তাকে রেডিও অ্যাকটিভ উপাদান দিয়ে মোড়ানো হয়। অতিরিক্ত অংশ যাতে না তাকে সেজন্য নমুনা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়।

ষষ্ঠ ধাপ

বিশেষ ধরনের এক্স-রে ফিল্মের সাহায্যে রেডিওঅ্যাকটিভ উপাদানে মোড়ানো অংশের ছবিতে তুলে ফিল্মকে ছবিতে রূপ দিতে হয়। এরপর খুবই সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যাবে, ডিএনএ'র প্যাটার্ন।

জীবন রাঙাতে ভিটামিন

মনীষা রায়

জীবনধারণের জন্য ছয়টি খাদ্য উপাদানের মধ্যে ভিটামিন বরাবরই একটু বেশি কিংবা আলাদা করে গুরুত্ব পায়। খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে লবণ ও পানি নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা করতে হয় না। ভাত কিংবা আটাজাতীয় খাবার খেলেই পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা। ডাল, ডিম, মাছ-মাংস খেলে প্রোটিন বা আমিষ পাওয়া যায়। আর বিভিন্ন খাদ্যে চর্বি বা ফ্যাটের উপস্থিতি এতটাই বেশি যে শরীর থেকে বাড়তি ফ্যাট ঝরানোর জন্য কতই না কসরত করতে হয় অনেকের! মাথা ঘামাতে হয় কোলেস্টেরল নিয়েও। কিন্তু ভিটামিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ফ্যাটের ঠিক উল্টো চিত্র।

অনেকেই খাবারের সাথে ভিটামিন ঠিকমতো গ্রহণ করছেন কিনা, সে ব্যাপারে সন্দিহান থাকেন। বিশেষ করে মায়েরা তাদের সন্তানের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস থাকেন। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে– খাবার খেলেই ভিটামিন শরীরে প্রবেশ করবে, সে গ্যারান্টি নেই। ধোয়া এবং রান্নার সময়, শাকসবজি উৎপন্ন করার সময় রাসায়নিক ওষুধ দেয়ার কারণে কিংবা আর কিছু পরিবেশগত কারণে ভিটামিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ভিটামিন নিয়ে এসব জটিলতার কারণেই ভিটামিনের ট্যাবলেট বিক্রি হয় বেশ। দেশের অধিকাংশ মানুষই এই ভিটামিন স্বল্পতায় ভোগে বলে হয়তো ডাক্তাররাও ভিটামিন প্রেসক্রাইব করে থাকেন বেশ। ভিটামিন বা ভাইটাল অ্যামিনস শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আমাদের শরীর কিছু ভিটামিন বাইরের উপাদানের সাহায্যে তৈরি করতে পারলেও অধিকাংশ ভিটামিনই গ্রহণ করতে হয় খাবারের মাধ্যমে। একসময় ধারণা করা হতো, একমাত্র ভিটামিন ডি-ই সূর্যের আলোর সাহায্যে শরীরে উৎপন্ন করা সম্ভব। অন্য কোনো ভিটামিন খাবার ছাড়া কৃত্রিমভাবে শরীরে তৈরি করা সম্ভব নয়। গবেষকরা সেই ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে দেখিয়েছেন, কিছু ভিটামিনকে ত্বকের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো সম্ভব। আর এ ভিটামিন কৃত্রিমভাবে প্রবেশ করানোর ফলে স্বাভাবিকভাবে ত্বকের উন্নতি তো হয়ই, উপকৃত হয় চুলের কোষও। তবে এ প্রক্রিয়া কখনোই খাবারের মাধ্যমে গ্রহণকৃত ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। জীবন বাঁচানোর জন্য একমাত্র খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করতে হবে। কিন্তু জীবন রাঙাতে হলে নিতে পারেন এই কৃত্রিমতার আশ্রয়।

আমরা স্বাভাবিকভাবে যে প্রক্রিয়ায় খাবারের মাধ্যমে ভিটামিন গ্রহণ করি, সেটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় অ্যাকটিভ ডিফিউশন। অন্যদিকে ত্বকের বাইরের স্তর থেকে শরীরের ভিতরে ভিটামিন প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্যাসিভ ডিফিউশন। নামেই বোঝা যাচ্ছে এ প্রক্রিয়ায় ভিটামিন সরাসরি শরীরে না ঢুকে পরোক্ষভাবে একটি মাধ্যম অতিক্রম করে। সাধারণত ত্বকে ঘষে ঘষে কিংবা মেসেজ করে এবং অ্যানাফোরেসিস বা ইলেকট্রিক যন্ত্রের মাধ্যমে এ ভিটামিন ত্বকের কোষে প্রবেশ করানো হয় এবং এটি আস্তে আস্তে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তবে সারা শরীরে ছড়ালেও এর কার্যক্ষমতা সাধারণত ত্বকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ত্বকের মাধ্যমে শরীরে ভিটামিন ছড়ানোর পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অ্যানাফোরেসিসই সবচেয়ে কার্যকর বলে ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশনের মাধ্যমে একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে ভিটামিন জোর করে শরীরে প্রবেশ করানো হয়।

জোর করে প্রবেশ করানো হলেও ত্বক কিন্তু সব ভিটামিন শোষণ করতে পারে না। ভিটামিন এ, সি, ই, ডি, প্যানটোথেনিক অ্যাসিড ও নায়াসিন উপাদানগুলো এ পদ্ধতিতে শরীরে প্রবেশ করানো সম্ভব। বিজ্ঞানীরা ভিটামিন বি গ্রুপের কয়েকটি ভিটামিনকে কৃত্রিম উপায়ে শরীরে প্রবেশের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বি গ্রুপের ভিটামিনগুলো শরীরে প্রবেশ করানো গেলেও তা আসলে

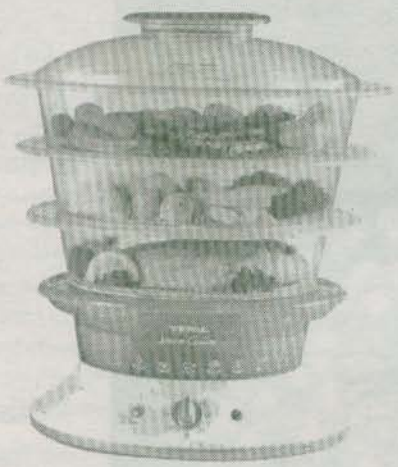

কোনো ইতিবাচক ফলাফল দিতে পারে না এবং পরবর্তী সময়ে নানান উপসর্গেরও জন্ম দেয়। যে কারণে এ প্রক্রিয়া থেকে পরবর্তী সময়ে ভিটামিন বি গ্রুপকে বাদ দেয়া হয়।

ভিটামিন এ

ত্বকের স্বাস্থ্য ও ঔজ্জ্বল্যতার ব্যাপারে যারা খুব বেশি সচেতন, ভিটামিন এ তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ ভিটামিন ত্বকের কোষের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে সহায়তা করে। বিশেষ করে ত্বকের যেসব জায়গায় মিউকাস মেমব্রেন থাকে, সেসব জায়গায় মেমব্রেনকে কার্যকর রাখতে এ ভিটামিন সর্বাধিক উপযুক্ত। যাদের শরীরে ভিটামিন এ-র অভাব রয়েছে, তাদের ঠোঁট কিংবা পা বেশি করে ফাটে। রাতকানা রোগের কারণও ভিটামিন এ-র অভাব।

ভিটামিন এ মূলত তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত– প্রি-ফর্মড ভিটামিন এ, বিটা ক্যারোটিন এবং রেটিনল। এ তিনটি উপাদান শরীরে প্রবেশের পর মিলেমিশে ভিটামিন এ-র কাজ করে। ফলে একে ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনও বলা হয়। সাধারণত প্রাকৃতিক অবস্থায় গাজর, পেঁপে ইত্যাদি ফল বা সবজিতে ভিটামিন এ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং শরীর এ ধরনের প্রাকৃতিক ভিটামিন খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারে।

একসময় ধারণা ছিল ভিটামিন এ কৃত্রিমভাবে শরীরে প্রবেশ করানো যায় না। কিন্তু ইলেকট্রিক স্টিমুলেশনের মাধ্যমে ভিটামিন এ শরীরে প্রবেশ করিয়ে বেশ কিছু ইতিবাচক ফল লক্ষ করা গেছে। আগেই বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক উপায়ে অর্থাৎ খাবারের মাধ্যমে শরীরে ভিটামিন এ প্রবেশ করালে যে ফল পাওয়া যাবে, কৃত্রিম উপায়ে সেটি পাওয়া সম্ভব হবে না। কৃত্রিম উপায়ে শরীরে ভিটামিন প্রবেশ করানো হলে সেটি শুধু ত্বকের কোষের ওপর কাজ করে। অর্থাৎ এটি কেবল মিউকাস মেমব্রেনেরই উপকার করে থাকে। সে হিসেবে বলা যায়, কৃত্রিম উপায়ে প্রবেশ করানো ভিটামিন এ ত্বকচর্চাকারীদেরই বেশি কাজে লাগে।

প্যানটোথেনিক অ্যাসিড ও নায়াসিন

প্যানটোথেনিক অ্যাসিড ও নায়াসিনকে কোনো কেনো বিজ্ঞানী ভিটামিন বি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। কিন্তু অনেকেই এ দুটো রাসায়নিক উপাদানকে বি গ্রুপের সাথে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে করেন না। এই উপাদানগুলোর বড় গুণ হচ্ছে, অন্য যে কোনো উপাদানের চেয়ে এগুলো ত্বক আর্দ্র রাখতে সহায়তা করে বেশি।

প্যাসিভ অ্যাবজর্ভেশনের মাত্রা এ দুটো উপাদানের মধ্যে এতটাই প্রবল যে, বর্তমানে অধিকাংশ কোম্পানিই এ উপাদান দুটো ময়েশ্চরাইজার তৈরিতে ব্যবহার করে। সুতরাং ময়েশ্চরাইজার কিনতে গেলে প্যাকেটে এ দুটো উপাদান আছে কিনা দেখে নিতে পারেন।

ভিটামিন সি

বয়স বাড়তে থাকলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বলিরেখা পড়তে থাকে। কুঁচকে যেতে থাকে শরীরের চামড়া। এর কারণ হচ্ছে, মানুষের শরীরে কোলাজেন নামক একপ্রকার টিস্যু রয়েছে যার কাজ মূলত ত্বকের টানটান ভাব বজায় রাখা।

মানুষের শরীরে যে পরিমাণ প্রোটিন রয়েছে, তার ২৫ শতাংশই হলো এই কোলাজেন। শুধু ত্বকের জন্যই নয়, শরীরে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট তৈরি করতেও ভিটামিন এ প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে ত্বক টানটান রাখার কাজ ছাড়াও কোলাজেন রক্ত চলাচলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মানুষের শরীরের ব্লাড ভেসেলসের সাপোর্টিং ম্যাট্রিক্স তৈরি হয় কোলাজেনের সাহায্যেই। আর এই কোলাজেনের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে এবং শরীরে নিয়মিত কোলাজেন তৈরি করতে যে ভিটামিন সর্বাধিক ভূমিকা রাখে, সেটি হচ্ছে ভিটামিন সি।

তবে কৃত্রিম উপায়ে ভিটামিন সি গ্রহণ করা হলে সেটি কেবল ত্বকের টিস্যু টানটান রাখতে পারবে। অন্য শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো এর দ্বারা করানো সম্ভব হবে না। মানুষের মাথার তালুর ত্বক শরীরের অন্যান্য ত্বক থেকে কিছুটা আলাদা। মাথার তালুর ত্বক ঠিক রাখতে প্যাসিভ ডিফিউশনের ভিটামিন সি সবচেয়ে কার্যকর বলে ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

ভিটামিন ই

ভিটামিন এ-র মতো ভিটামিন ই-ও একপ্রকার ফ্যাট সলিউবল কম্পাউন্ড। ফলে এ ভিটামিন ত্বক ও চুলের ওপর প্রভাব ফেলে খুব বেশি। বিশেষ করে ত্বকে ভিটামিন ই এতটাই কার্যকর যে বিউটিশিয়ানরা এ ভিটামিন বিভিন্ন ফর্মে ব্যবহার করে থাকেন। ত্বকের টিস্যুর আর্দ্রতা বজায় রাখা বিউটিশিয়ানদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময়। অনেকের ত্বক এতটাই শুষ্ক যে, কোনোভাবেই তাদের ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। সেজন্য ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে বিউটিশিয়ানরা সরাসরি এ ভিটামিন ব্যবহার করেন।

বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে আপনারা নিশ্চয়ই ন্যাচারাল টোকোফেরলের নাম শুনেছেন। এটি মূলত এই ভিটামিনেরই অন্য নাম। ভিটামিন ই-এর আলফা টোকোফেরল চুলের নানা উপকারে আসে। এছাড়া এটি ফেশিয়াল ট্রিটমেন্টেও কাজে লাগে। যাদের প্রিম্যাচিওর এজিং সমস্যা আছে, তারা নির্দ্বিধায় ভিটামিন ই গ্রহণ করতে পারেন।

ভিটামিন ই-এর আবার সাদৃশ্য আছে ভিটামিন সি-এর সাথেও। ভিটামিন সি থেকে যেমন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট পাওয়া যায়, তেমনি ভিটামিন ই-ও এই অক্সিডেন্টের অন্যতম উৎস। এছাড়া আনস্টেবল অক্সিজেন থেকে তৈরি হওয়া মলিকিউল ফ্রি র‍্যাডিক্যালসগুলো যেভাবে ত্বকের সুস্থ টিস্যু নষ্ট করে, তার বিরুদ্ধে একমাত্র অ্যান্টি অক্সিডেন্টই শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

ভিটামিন ডি

একসময় মনে করা হতো, একমাত্র ভিটামিন ডি-ই খাবার ছাড়া বাইরে থেকে সূর্যালোকের সাহায্যে সরাসরি শরীরে উৎপন্ন করা সম্ভব। অনেকের মনে ভুল ধারণা আছে যে, সূর্যের আলো ভিটামিন ডি-এর প্রধান কিংবা একমাত্র উৎস। বিষয়টি মোটেই সেরকম নয়। ভিটামিন ডি এর একটি বিশেষ রূপ আমাদের শরীরেই থাকে। সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এসে সেটি ভিটামিনে রূপান্তরিত হয় মাত্র। ত্বকে যে ৭-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল থাকে, সেটিই সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মির সাহায্য নিয়ে ভিটামিনে পরিণত হয়। যদিও ত্বকের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হওয়ার জন্য সূর্যালোকই সবচেয়ে বড় শত্রু, সূর্যের আলো ত্বকের নিচের মেলানিনকে শরীরে ছড়িয়ে দেয়। ফলে ত্বক আস্তে আস্তে কালো হতে থাকে। কিন্তু ভিটামিন ডি তৈরিতে এ সূর্যালোকই আমাদের সবচেয়ে বড় মিত্র।

ত্বকের জন্য তো বটেই, জীবনধারণের জন্যও ভিটামিন ডি খুব প্রয়োজনীয়। যাদের গায়ের রং কালো, তাদের শরীরে তুলনামূলক কম ভিটামিন ডি উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে যারা সূর্যের আলোর সংস্পর্শে কম আসেন, তারাও ভিটামিন ডি-এর অভাবজনিত রোগে ভোগেন বেশি। তাই ত্বকের ভালোর জন্য সান প্রোটেকশন জেলি ব্যবহার করে সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

শুধু রূপচর্চাই নয়, ত্বক ও চুলের ভালোর জন্যই আমাদের প্রতিনিয়ত ভিটামিন গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া শরীরবৃত্তীয় প্রয়োজনগুলো তো রয়েছেই। বেশি বেশি খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ভিটামিন গ্রহণের বিকল্প নেই, তাই কৃত্রিমভাবে ভিটামিন নেয়ার পাশাপাশি খাবারের মানের দিকেও লক্ষ রাখতে হবে। খাবারের মেন্যু এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে দৈনন্দিন ভিটামিনের চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ হয়। এ একটি কাজ ঠিকমতো করতে পারলেই জীবন রাঙানোর কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। কেননা জীবন রাঙানোর প্রধান উপাদানই যে ভিটামিন।

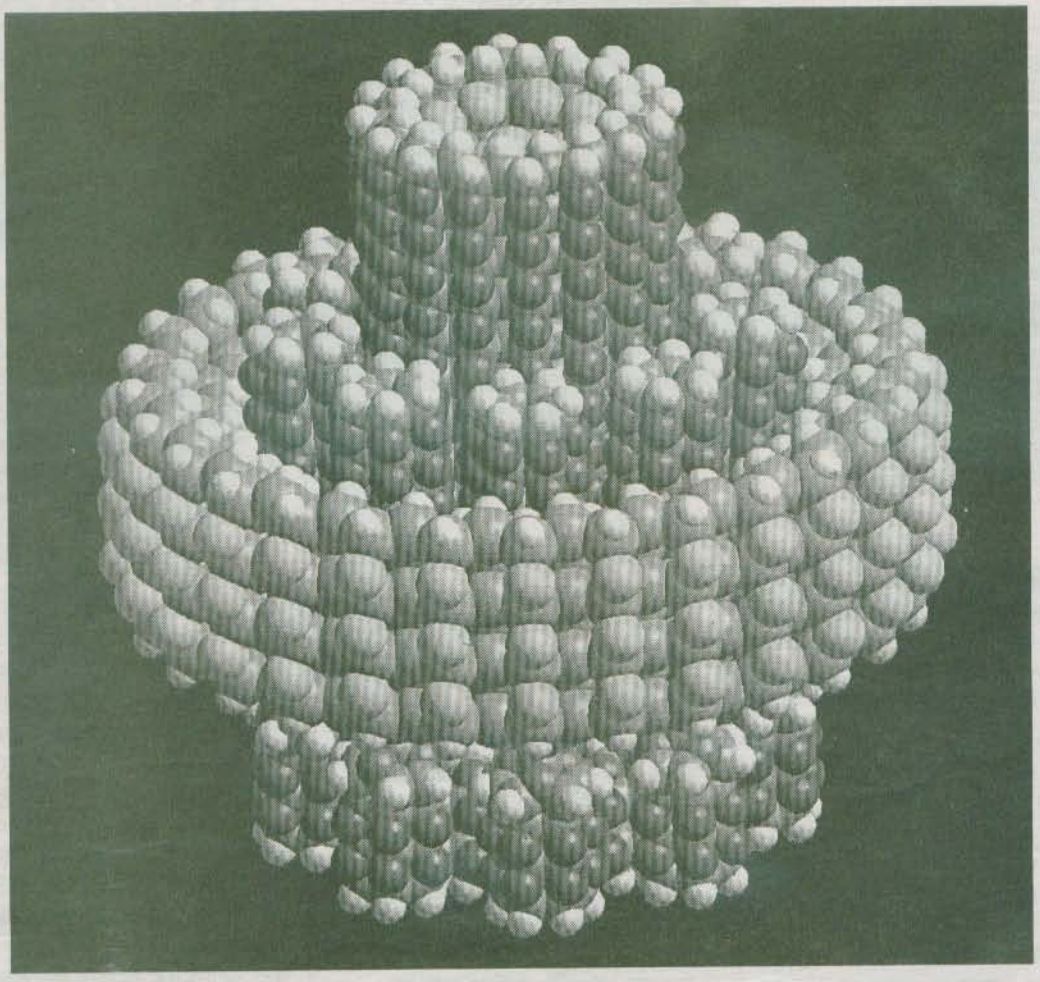

ন্যানো মেশিন

আণবিক সাইজের কলকব্জা

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম

বিজ্ঞানীরা এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হাতে নিয়েছেন। তা হলো অতি ক্ষুদ্র মেশিন তৈরি করার চ্যালেঞ্জ। সাধারণভাবে ক্ষুদ্র হওয়ার নয় এটি, একেবারে অণু-পরমাণুর মাপ নিয়ে ক্ষুদ্র! 'মাইক্রো' কথাটির সাথে এখন আমরা খুব পরিচিত। কারণ আমাদের ব্যবহার্য অনেক জিনিসকে এখন আমরা মাইক্রো পর্যায়ের ছোট করে নিতে পেরেছি। যেমন— মাইক্রোচিপ, মাইক্রো প্রসেসর ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর পরিমাপ এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ। তারও যদি হাজার ভাগের একভাগে যাই তবে সেটি হবে 'ন্যানো' পর্যায়ের। আমরা যে মেশিন বা যন্ত্রের কথা বলছি তা হলো সেই ন্যানো পর্যায়ের ক্ষুদ্র। প্রযুক্তিকে এ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখন বিজ্ঞানীরা খুবই সচেষ্ট। এই ন্যানো প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি বড় স্বপ্ন হলো এই সাইজের যন্ত্রপাতি তৈরি করা। স্বপ্নই বা বলি কেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি রীতিমতো তৈরিও হয়ে গেছে। যেমন— যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয়েছে জৈব অণু দিয়ে গড়া এমনি এক মেশিন, যার সাইজ রক্তের লোহিত কণিকারও পাঁচ ভাগের একভাগ। এ মেশিনে ই-কলাই ব্যাকটেরিয়ার একটি প্রোটিন ব্যবহার করা হয়েছে। নিকেলের তৈরি একটি নাটাই সদৃশ জিনিসের সাথে একটি প্রপেলার লাগিয়ে সেটি আবার ঐ প্রোটিনের সাথে আটকানো রয়েছে। প্রপেলারটি কয়েক ন্যানোমিটারের বেশি বড় নয়। অর্থাৎ কিনা মিলিমিটারের হাজার ভাগেরও হাজার ভাগের সমান পর্যায়ের! জৈব কোষে যেভাবে শক্তি উৎপাদিত হয় এ মেশিনের প্রপেলারও সেই শক্তিতেই ঘোরে। শরীরের শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে রক্তের লোহিত কণিকা যেরকম স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা

করতে পারে আস্ত এই মেশিনও যে তা পারবে তা বলাই বাহুল্য। সেভাবেই শরীরের কোষে কোষে নিয়ে গিয়ে একে কোনো কাজে হয়তো লাগিয়ে দেয়া যাবে একদিন!

ক্ষুদ্র হওয়ার বিপত্তি

এধরনের একটি সম্ভাবনার কথা পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান প্রথম বলেছিলেন আজ থেকে বহু বছর আগে ১৯৫৯ সালে আমেরিকান পদার্থবিদ্যা সমিতির এক সম্মেলনে। ফাইনম্যান অবশ্য মজার ভাষায় পদার্থবিদ্যার অনেক বড় বড় তত্ত্বকেও উপস্থাপনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এমনি একটি ক্ষুদ্র মেশিন তৈরিতে পদার্থবিদ্যার দিক থেকে সমস্যাগুলো কি হতে পারে? সম্ভাব্য উপায়ওবা কি হতে পারে —এসবই তিনি সেদিন খুব মজা করে বলেছিলেন।

ফাইনম্যান দেখালেন ধরা যাক একটি মোটরগাড়িকে যদি অনেক ক্ষুদ্র আকারে তৈরি করতে হয় তাহলে এর সব যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ঐ পর্যায়ের নির্ভুলতা থাকতে হবে। যেমন— পিস্টন আর সিলিন্ডারের মধ্যে ফিটিংসে। হয়তো প্রয়োজন হবে এক ইঞ্চির ১০ হাজার ভাগের ৪ ভাগের নির্ভুলতা। ওরকম একটি অবস্থায় ঐটুকু ভুল হলে তা হবে স্বল্প সংখ্যক পরমাণুর আকারের সমান ভুল! তার অর্থ সে অবস্থায় আমাদেরকে অণু-পরমাণুর পর্যায়ে ভাবতে হবে। এতখানি নির্ভুলভাবে গাড়িটি তৈরি করতে পারলে আমরা আসল গাড়ির চার হাজার ভাগের একভাগের সমান গাড়ি পাব। অর্থাৎ প্রায় এক মিলিমিটার সাইজের। এর চেয়েও নিখুঁত করতে পারলে আরও ছোট গাড়ি তৈরি সম্ভব হবে।

পদার্থবিদ্যার হিসেবে দেখা যায় একই রকম টানাপোড়েনের জন্য ঐরকম ক্ষুদ্র পর্যায়ে আয়তনের সাথে সাথে বলও কমে যায় সাংঘাতিক ভাবে। অর্থাৎ তখন বস্তুর ওজন, জড়তা ইত্যাদির তেমন কোনো অর্থ থাকবে না। এর ফলে তুলনামূলকভাবে বস্তুর সবলতা বেড়ে যাবে। ঐরকম ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের তাপ তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাবে। তাই অন্তর্দহন ইঞ্জিনের মতো ইঞ্জিন এখানে কাজ করবে না, যথেষ্ট তাপ জমিয়ে উঠতে পারবে না বলে। তাই এরকম যন্ত্রে শক্তি সঞ্চারের বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে; কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যানো মেশিনটি তৈরিতে যেমন জীব কোষের শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

তৈরি প্রক্রিয়া

ফাইনম্যান তাঁর অতি ক্ষুদ্র মেশিনটি তৈরির একটি সম্ভাব্য পদ্ধতির কথাও বলেছিলেন। বড় বস্তু কাটাছেঁড়া করে নয়, বরং একেকটি পরমাণু যেমনটি দরকার জুড়ে জুড়ে একত্র করে এটি তৈরি করা যায়। ১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটিতে কর্মরত এরিক ড্রেক্সলার 'ইঞ্জিন অব ক্রিয়েশন' নামে একটি বই লিখে বেশ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। এ বইতে তিনি দেখিয়েছেন যে, যেভাবে আমাদের অণু-পরমাণুকে নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা প্রায় বড় জিনিসের মতো বাড়ছে, তাতে মানুষ শিগগির কোনোদিন ঐ অণু-পরমাণুর সাইজের মেশিন তৈরি করতে পারবে। সেক্ষেত্রে মানুষ জৈব প্রকৃতিকেও হার মানিয়ে জীব কোষের চেয়েও ক্ষুদ্র কার্যকর যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করবে। শুধু তাই নয় জৈব প্রকৃতি যেটি অহরহ করছে— একটি কোষের মতো হুবহু আরেকটি কোষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করছে, তারই প্রায় অনুরূপ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র মেশিনের অসংখ্য প্রতিলিপিও সৃষ্টি সম্ভব হবে।

আসলে জৈব প্রক্রিয়ার অনুসরণে মানুষের এসব ক্ষুদ্র মেশিন শরীরবৃত্ত কাজে সূক্ষ্মভাবে হস্ত ক্ষেপও করতে পারবে এবং সেটি যদি নিয়মিতভাবে সক্ষম হয় তাহলে এসব মেশিন কোষের ভিতরে গিয়ে সেখানে মেরামত কাজ করে রোগ ও বার্ধক্য থেকে মানুষকে মুক্তিও দিতে পারবে। এভাবে ইঞ্জিন অব ক্রিয়েশন বইটিতে খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটি সম্ভাবনার চিত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। এটি এক দিকে যেমন ন্যানো মেশিনের গবেষণাকে এক ধরনের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তেমনি অনেকেই একে অবাস্তব প্রত্যাশা সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্তও করেছেন। তাঁদের মতে এরকম প্রত্যাশা বাস্তবে সংঘটিত সাফল্যগুলোকে বরং অবমূল্যায়িতই করছে।

ক্ষুদ্র মেশিনের ব্যবহার

ড্রেক্সলারের দৃশ্যপট অনুযায়ী গবেষণা বেশি না এগুলেও ন্যানো মেশিন ইতোমধ্যেই সম্ভব হয়েছে। ক্যানসার অথবা বার্ধক্যকে অতিক্রম করার কাজে না লাগলেও অসুখের সময় ওষুধ আরো ভালোভাবে গ্রহণের সুবিধা এসব মেশিন এখনই দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। রিচার্ড ফাইনম্যান যখন ন্যানো মেশিনের সম্ভাবনার কথা বলছিলেন তখন তিনি এর সম্ভাব্য ব্যবহারের প্রসঙ্গটিও তুলেছিলেন। মজা করে বলেছিলেন যে, নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র জীবাণু যাতে ড্রাইভ করে বেড়াতে পারে সেজন্যই তিনি মোটরগাড়ির কথা বলছেন না, তিনি বরং শরীরের রোগ সারাবার জন্য ন্যানো মেশিনের ক্ষুদ্র রোবট সার্জনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন। একে রক্তের মাঝে ঢুকিয়ে দিলে হার্টের কাছে পৌঁছে একযোগে অনেকগুলো মেশিন মিলে হয়তো ওখানে বসেই হার্টের নষ্ট ভাল্বটি মেরামত করে দিবে। শুধু তাই নয়, এরকম কোনো কোনো মেশিনকে শরীরের নানা অঙ্গকে সাহায্য করার জন্য স্থায়ীভাবেই সেখানে বসিয়ে দেয়া যাবে। জীবকোষের চেয়ে ছোট হবে বলে কোষের সাথে মিলেমিশে থাকতে তার তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। বর্তমানে যে ন্যানো মেশিন সম্ভব হয়েছে তার সৃষ্টিকাররা অনেকটা ফাইনম্যানের ঐ স্বপ্ন ধরেই এগুতে চাচ্ছেন মেশিনগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

ডায়াবেটিক রোগীর দেহে

খুব বিস্তারিত মেশিন না হলেও এরকম প্রথম ন্যানো প্রযুক্তির প্রয়োগের পরীক্ষা নিরিক্ষা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তেজাল দেশাই (ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা বিজ্ঞানী) ডায়াবেটিক রোগীর

মানুষ শিগগির কোনোদিন ঐ অণু-পরমাণুর সাইজের মেশিন তৈরি করতে পারবে। সেক্ষেত্রে মানুষ জৈব প্রকৃতিকেও হার মানিয়ে জীব কোষের চেয়েও ক্ষুদ্র কার্যকর যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করবে।

জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিন সময়মতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে রক্তে পৌঁছানোর জন্য এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। এজন্য তিনি এক মিলিমিটারের এক দশমাংশ বড় একটি ছোট সিলিকন বাক্স তৈরি করেছেন যা চারিদিকে অতি ক্ষুদ্র সব ছিদ্রের ব্যবস্থা করেছেন যেগুলোর ব্যাস ২০ ন্যানো মিটারের বেশি নয়। ইলেক্ট্রনিক্সে সচরাচর ব্যবহৃত ফটো-লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে ছিদ্রগুলো করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে মানুষের একটি চুলই এক লক্ষ ন্যানোমিটার পুরু। ছিদ্রগুলো এতই ক্ষুদ্র যে, কোনো কোনো অণু এর ভিতর দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু একটু বড় অণুগুলো যেতে পারে না। এ বাক্সে রাখা আছে কুকুর অথবা শুকরের প্যানক্রিয়াসের ইনসুলিন সৃষ্টিকারী কোষসহ কিছু কলাজেন কোষকলা। এসব নিয়ে ঐ ক্ষুদ্র বাক্সটি সহজেই ডায়াবেটিক রোগীর শরীরে বসিয়ে দেয়া হয়। গ্লুকোজের অণু বেশ ছোট বলে রক্তের গ্লুকোজ সহজে ঐ ছিদ্র দিয়ে বাক্সে ঢোকে এবং ওখানকার কোষগুলোকে স্পর্শ করে। ঐ কোষ যদি বেশি গ্লুকোজ অনুভব করে, তাহলে তা ইনসুলিন তৈরি আরম্ভ করে। ইনসুলিনও তুলনামূলকভাবে ছোট অণু হওয়াতে এটি ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে এসে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। কাজেই দিনের বিশেষ সময়ে দু-একবার ইনসুলিন ইনজেকশন নেয়ার বদলে এই ন্যানো প্রযুক্তি

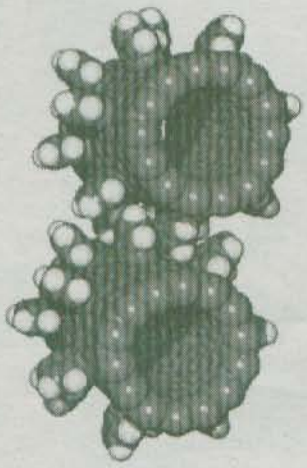

মজার ব্যাপার হলো এভাবে যে সূক্ষ্ম মেশিন তৈরি হলো তা আগাগোড়া সিলিকন প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হয়েছে। বর্তমানে সিলিকন চিপের ভিত্তিতে আইসি তৈরির যে বিশাল প্রচলিত শিল্প রয়েছে, তার মধ্যেই এরকম সম্পূর্ণ নুতন দৃষ্টিভঙ্গির জটিল ও ক্ষুদ্র যন্ত্র তৈরি সম্ভব হচ্ছে। এটিই সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ব্যাপার।

প্রায় একজন স্বাভাবিক মানুষের শরীরের মতো নিরবিচ্ছিন্নভাবে রক্তের গ্লুকোজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাক্সের ছিদ্রগুলো ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে বড় আকারের অণু এর মধ্য দিয়ে যাওয়া আসা করতে পারে না। ফলে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোন বিজাতীয় কোষকে ধ্বংস করার জন্য যে এন্টিবডি অথবা কম্প্লিমেন্টারি প্রোটিন ব্যবহার করে তার অণু ঐ ছিদ্র দিয়ে ঢুকতে পারে না। কাজেই এই এন্টিবডি অণুগুলো ইনসুলিন সৃষ্টিকারী বিজাতীয় কোষের নাগাল পায় না; সেগুলো নিরাপদেই থাকে। এটি না হলে আদৌ ব্যবস্থাটি সম্ভব হতো না। বাইরের ইনসুলিন সৃষ্টিকারী কোষ দেহে রাখাই যেত না।

ডায়াবেটিক্স রোগে আক্রান্ত ইঁদুরের দেহে এরকম ক্ষুদ্র বাক্স ঢুকিয়ে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ইঁদুরের রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে থেকেছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। এখন মানুষের ওপর পরীক্ষা শেষ হলেই এটি বাজারে আসতে পারে বলে আশা করা যায়।

একই ধাঁচের কাজের জন্য কিন্তু আরো চাঞ্চল্যকর ন্যানো মেশিন উদ্ভাবন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস বেকার। তিনি ন্যানো আকারের কিছু গোলাকৃতির অণু গড়ে তুলেছেন স্তরে স্তরে পরমাণু সাজিয়ে; অনেকটা যেভাবে ফাইনম্যান ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন অথবা ড্রেক্সলার বর্ণনা করেছেন। এ অণুগুলোর কাজ হবে শরীরে গিয়ে অসুস্থ কোষকে সনাক্ত করে সেটিকে রাঙিয়ে দেয়া। মারাত্মকভাবে আহত কোষ থেকে যে এনজাইম বের হয় তার ফলে ঐ অণু ফ্লোরোসেন্ট হয়ে আলো ছড়াতে থাকে। একই সাথে এর থেকে ওষুধ নির্গত হয়ে ঠিক সেই কোষকেই বিনষ্ট করতে পারে। পরে আল্ট্রাভায়োলেট লেজার আলো ওখানে ফেললে বোঝা যাবে যে চিকিৎসাটি কতখানি সম্পন্ন হয়েছে। স্তরে স্তরে অণুগুলো যখন গড়া হয় তখনই এর মধ্যে বিজাতীয় অণু হিসেবে ধ্বংস না হওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া যায়। কাজেই দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে এটি দ্রুত আহত কোষে গিয়ে ঢুকতে পারে।

জীবকোষের নজরদারিতে

জীবকোষের প্রকৃত অবস্থা প্রতি মুহূর্তে জানতে হলে যে মেশিন দরকার তার আকারও জীবকোষের সমান হলেই ভালো, আর এখন এমনটিই হতে যাচ্ছে। এরকম একটি ক্ষুদ্র মেশিন হার্টের কোষের সাথে ওখানে বসে হার্টের কাজকর্ম, উচ্চ রক্তচাপ ও হার্ট এট্যাকের আসন্নতা সম্পর্কে আগাম খবর দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

বর্তমানে কোষ পর্যায়ে এধরনের খবর পেতে হলে প্রত্যেকবার যথেষ্ট কঠিন প্রক্রিয়ায় সুঁচ, পিপেট ইত্যাদির প্রয়োগে হার্ট হতে কোষ বের করে আনতে হয়। এরপর সেই কোষকে কালচার করে বৈকল্যের খবরগুলো পাওয়া যেতে পারে। তবে সে খবর বেশি নিখুঁত নাও হতে পারে। কারণ কোষ বের করে আনার ফলে সে তার স্বাভাবিক অবস্থানে যেসব পুষ্টি দ্রবণে স্নাত থাকে, সেই পরিবেশের বাইরে চলে আসে। এতে তার আচরণেও তারতম্য ঘটে থাকে। কাজেই যথাস্থানে রেখেই হার্টের কোষের খবর নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়।

এর জন্য লসএঞ্জেলসএ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা বেশ অভিনব। তাঁরা সিলিকন-অক্সাইড দিয়ে দুটি অতি ক্ষুদ্র কেন্টিলিভার বিম তৈরি করেছেন। সাঁতারুরা ড্রাইভ দেয়ার সময় এক কিনারায় আটকানো অন্য কিনারায় উন্মুক্ত যেরকম তক্তা ব্যবহার করেন, সেই আকৃতির ব্যবস্থাকে বলা হয় কেন্টিলিভার বিম। এ বিমগুলোর একপ্রান্তে জীবকোষের সাথে আটকানোর জন্য এক ধরনের ক্ল্যাম্প থাকে। তাদের অন্য প্রান্তে থাকে কেলাসিত সিলিকনের তৈরি স্ট্রেইনগেজ বা বল প্রয়োগের ফলে বিমের বক্রতাটা সূক্ষ্মভাবে মাপতে পারে। বাঁকার ফলে সিলিকনের বৈদ্যুতিক রোধকতায় পরিবর্তন ঘটাতেই এরকম পরিমাপ সম্ভব হয়। শুরুতে পরীক্ষা-নিরিক্ষার সময় ইঁদুরের হার্ট থেকে একটি কোষ নিয়ে তা বিমের ক্ল্যাম্পে আটকানো হয়েছে। এখন ঐ কোষে পর পর ঘন ক্যালসিয়াম দ্রবণ ও পাতলা ক্যালসিয়াম দ্রবণ পাম্প করে তার সংকোচন প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে যে বল প্রয়োগ বিমের ওপর হয় তা স্ট্রেইনগেজ সূক্ষ্মভাবে মাপতে পেরেছে। দেখা গেছে বিভিন্ন হার্ট কোষে এর ফলে ১০০ ন্যানো-নিউটন থেকে ৫০ মাইক্রো নিউটন পর্যন্ত ক্ষুদ্র বল এভাবে প্রয়োগ করে থাকে। বলের পরিমাণ থেকে কোষের অবস্থাও অনুমান করা যায়।

মজার ব্যাপার হলো এভাবে যে সূক্ষ্ম মেশিন তৈরি হলো তা আগাগোড়া সিলিকন প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হয়েছে। বর্তমানে সিলিকন চিপের ভিত্তিতে আইসি তৈরির যে বিশাল প্রচলিত শিল্প রয়েছে, তার মধ্যেই এরকম সম্পূর্ণ নুতন দৃষ্টিভঙ্গির জটিল ও ক্ষুদ্র যন্ত্র তৈরি সম্ভব হচ্ছে। এটিই সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ব্যাপার। ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তির মেশিন এভাবে চলে যাচ্ছে শরীরের একেবারে কোষের পর্যায়ে। ফলে এক একটি কোষের পরিবর্তনের ওপর এটি নজরদারী করতে পারবে।

এ সম্পর্কে প্রাথমিক একটি লক্ষ্য হলো হাইপোট্রপিক হার্টের বিষয়ে গবেষণা করা। সাধারণত উচ্চ রক্তচাপ ও অনুরূপ নানা কারণে বেশি কাজ করতে গিয়ে হার্টের কোষ বড় ও অধিক সবল হয়ে পড়ে (যার ফলে হার্টটিও বড় হয়)। এর ফলশ্রুতিতে অবশ্য কোষটি দ্রুত বিকল হয়ে পড়ে। এভাবে মরা কোষের কারণে হার্ট এটাক হয়ে থাকে। এরকম বড় হয়ে যাওয়া হার্টকে হাইপোট্রপিক হার্ট বলা হয়। ক্রমে এভাবে অধিক কাজ করে বড় হতে থাকলে রোগী হার্ট এটাকের সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যায়। অথচ কোষ পর্যায়ে উদ্ভাবিত নুতন ক্ষুদ্র মেশিনের সাহায্যে শুরু থেকেই এরকম কোষের ওপর নজর রাখা সম্ভব। তখন কিছু কোষে প্রবণতাটি দেখা দিলেই অনায়াসে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে, পুরো হার্টে ব্যাপারটি ছড়িয়ে পড়ে জটিল আকার ধারণ করার আগেই।

জীব-কোষের মধ্যে ফ্যাক্টরি

এখন কেউ কেউ চেষ্টা করছেন মানুষের স্বাভাবিক কোষকে ন্যানো প্রযুক্তির মাধ্যমে ওষুধের ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরিতে পরিণত করতে। এখানে কার্যকর হবে ন্যানো পর্যায়ের কিছু ইলেক্ট্রনিক সার্কিট যা সরাসরি কোষের ওপর কাজ করে কাঙ্ক্ষিত ওষুধ ওখানেই তৈরি করবে। ঐ সার্কিট কোষকে উদ্দীপ্ত করে এ ওষুধ সৃষ্টি করবে। সে সাথে তখনই দেখা দেবে ঐ ফ্যাক্টরীতে ন্যানো মেশিনের আরো

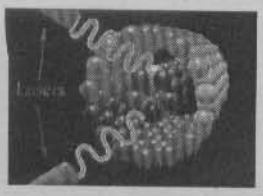

ন্যানো মোটর চলে কোষের মধ্যে জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি শক্তি দিয়ে। কোষের এটিটিপি নামক দ্রব্য ভেঙে গিয়ে ওখানে প্রোটিনের একটি অংশ ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণনকেই ন্যানো মোটরে শক্তি যোগাতে ব্যবহার করা হয়।

কাজ। যেমন— কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রপেলার সমেত যে ন্যানো মেশিন তৈরি হয়েছে সেটি তখন দরকার হবে তৈরি ওষুধ অণুগুলো কোষের কাছ থেকে কুড়িয়ে দ্রুত সরিয়ে ফেলা। এটি না করা হলে ওষুধের ক্রিয়া তার উৎস কোষটির ক্ষতি করতে পারে। কাজেই ঐ ন্যানো মোটরটির সাথে ১০০ ন্যানোমিটার বড় একটি ঘুরন্ত পর্দা ওষুধকে কুড়িয়ে নেবে। পর্দার ওপর থাকা সুনির্দিষ্ট কিছু এন্টিবডি ওষুধের অণুগুলোকে আটকিয়ে নিয়ে ঘূর্ণনের সাথে সাথে তাদেরকে একটি আলাদা চেম্বারে জমা করবে। এমনিতরো বিভিন্ন রকম মেকানিক্যাল কাজ; যেমন— সরানো, কুড়ানো, কাটা, ছেঁড়া ইত্যাদি এরকম ন্যানো মেশিনের দ্বারা সম্ভব হবে।

আগেই দেখেছি ঐ ন্যানো মোটর চলে কোষের মধ্যে জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি শক্তি দিয়ে। কোষের এটিটিপি নামক দ্রব্য ভেঙে গিয়ে ওখানে প্রোটিনের একটি অংশ ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণনকেই ন্যানো মোটরে শক্তি যোগাতে ব্যবহার করা হয়। এখন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি ন্যানো মোটরকে একত্র করে তাদের ঘূর্ণনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরির ব্যবস্থা করতে চান। কোষের মধ্যেই উৎপাদিত এ বিদ্যুৎ সেখানে অন্যান্য ন্যানো প্রযুক্তিতে শক্তি যোগাবে। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা নিজেরাও অবশ্য এরকম গবেষণার সমস্যাসংকুল দিনগুলো সম্পর্কে বেশ সচেতন। যদিও বৈদ্যুতিক সার্কিট, ওষুধ নিঃসরণ ব্যবস্থা ইত্যাদি নিশ্চল যন্ত্র হিসেবে ন্যানো প্রযুক্তি এখনই খুব বাস্তব অবস্থায় রয়েছে, ঠিক মেশিন বা মোটর তৈরি হয়েছে তার দক্ষতা ১ থেকে ৪ শতাংশের বেশি নয়। কাজের উপযোগী হতে হলে তাকে ৯৯ শতাংশেরও বেশি দক্ষ হতে হবে। তাছাড়া বর্তমানে যে পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীর হস্তক্ষেপে পরমাণু সাজিয়ে সাজিয়ে ন্যানো মেশিন তৈরি হয়েছে তাতে চলবে না। শরীরের জীবকোষের মধ্যে একটি প্রোগ্রাম অনুসরণ করে আপনা থেকে এভাবে মেশিনের এসেম্বলী হয়ে যেতে হবে অনেক সংখ্যায়। ন্যানো মেশিন তৈরি আর কোষের কার্যপ্রণালীর মধ্যে সীমারেখাটিই তখন যেন লোপ পাবে। এটিই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য আরও প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন। গবেষণায় প্রয়োজন প্রচুর অর্থ ব্যয়ের। সাধারণভাবে সেরকম অর্থের অভাব অবশ্য হচ্ছে না। হিউলেট প্যাকার্ড, আইবিএম, থ্রি এম প্রভৃতি বড় বড় কোম্পানি ইতোমধ্যেই তাদের সিংহভাগ গবেষণা ব্যয় ন্যানো প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই করছে। **ইঞ্জিন অব ক্রিয়েশনের** অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার কথা যদি বাদও দিই, যে কোনো ধরনের কার্যকর ন্যানো মেশিন— যা ঘুরবে, চলবে, কাজ করবে তার জন্যও প্রয়োজন আরও ব্যাপক গবেষণার। কিন্তু এসবের মাধ্যমেই ফাইনম্যান ও ড্রেক্সলারের কিছু কিছু স্বপ্ন সত্যি সত্যি বাস্তবায়নের পথে চলেছে।

লেখক : অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনপ্রিয় হচ্ছে ডুয়েল সিম পদ্ধতি

বর্তমানে নিত্য নতুন সুবিধা নিয়ে হাজির হচ্ছে মোবাইল অপারেটররা। তাই অনেক মোবাইল ব্যবহারকারীই একাধিক অপারেটরের সংযোগ ব্যবহার করে থাকেন। বেশির ভাগ ব্যবহারকারীই এক হ্যান্ডসেটের ওপর একাধিক সিম দিয়ে অত্যাচার করে। যখন তখন সেট অফ করো, ব্যাটারি খোলো, সিম পরিবর্তন করো, তারপর আবার লাগাও ইত্যাদি কত ঝামেলা! এত ঝামেলার ওপর ঘন ঘন হ্যানাডসেট খোলাবন্ধের কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাতো রয়েছেই। মোবাইল ব্যবহারকারীদের এতসব ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে এক সেটে একাধিক সিম ব্যবহারের পদ্ধতি। বর্তমানে একটি মোবাইল হ্যান্ডসেটে ২ থেকে ১৬টি পর্যন্ত সিম তথা লাইন লাগানো যায়। একাধিক সিম ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

টপ টুইন কার্ড

ডাবল সিম লাগানোর জন্য সবচেয়ে স্বল্প খরচের উপায় এটি। টপ টুইন কার্ডে দুইটি সিমের জন্য আলাদা ট্রে থাকে। ট্রের সাথে একটি মাস্টার সিম ক্যাবল দিয়ে সংযুক্ত থাকে। এই কার্ড ব্যবহারকারীরা ট্রেতে সিম দুটি প্রবেশ করায়। এরপর ক্যাবল দ্বারা সংযুক্ত মাস্টার সিমটিকে হ্যান্ডসেটের সিম বক্সে ঢোকানো হয়। সিম দুটি সেট করার পরে মোবাইল অন/অফ করে লাইন বদলাতে হয়। টপ টুইন কার্ডের মূল্য ১২০ টাকা।

ঘোস্ট ডুয়েল সিম

প্রথমত এ পদ্ধতিতে সিম কার্ড কাটতে হবে। আর্তকে ওঠার মতো কোনো কারণ নেই। সিম কার্ড মেশিনের সাহায্যে নিখুঁতভাবে কাটা হয়। তাই পরবর্তীতে তা আবার প্লাস্টিক বডির সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব। ঘোস্ট ডুয়েল সিম পদ্ধতি সাজেম ও টিসিএল ছাড়া অন্য সব ব্র্যান্ডের সেটে ব্যবহার করা যায়। ঘোস্ট ডুয়েল সিমের মূল্য ৩০০ টাকা।

জেনারেল ডাবল সিম

জেনারেল ডাবল সিম পদ্ধতি যে কোনো সেটে ব্যবহার করা যায়। জেনারেল ডাবল সিম হার্ডওয়্যারের সাথে সেটের সিম পকেট আকৃতির অতিরিক্ত প্লাস্টিক বডি রয়েছে। এই প্লাস্টিক বডিতে কাটা সিম মাপমতো লাগানো যায় এবং এককভাবে ব্যবহার করা যায়। জেনারেল ডাবল সিমের মূল্য ৪০০ টাকা।

জেনারেল ডাবল কার্ড

এ পদ্ধতিতে দু ধরনের সিম পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে নরমাল এবং অন্যটি অটো। নরমাল কার্ডটি জিএসএম এবং সিডিএমের রিম কার্ড দুটোই সাপোর্ট করে। এ পদ্ধতিতে সিম দুটি অবশ্যই একই ধরনের হতে হবে। এর মূল্য ৪০০ টাকা। জেনারেল ডাবল কার্ড 'অটো'এর রয়েছে একটি বিশাল সুবিধা। এটি হচ্ছে লাইন পরিবর্তনের জন্য সেট অফ-অনের প্রয়োজন নেই। এই অপশন ব্যবহার করলে প্রতি তিন মিনিট পর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইন পরিবর্তন হয়ে যায়। এটির মূল্য ৮০০ টাকা।

ম্যাজিক সিম

এটি সত্যিই ভয়াবহ! এ পদ্ধতিতে আপনি সর্বোচ্চ ১৬টি সিম তথা লাইন ব্যবহার করতে পারবেন। ম্যাজিক সিম পদ্ধতিতে একটি মাস্টার সিম থাকে। কম্পিউটার ব্যবহার করে এই মাস্টার সিমে অন্যান্য সিমের তথ্য কপি করে দিতে হয়। এজন্য ম্যাজিক সিমের হার্ডওয়্যার প্যাকেজের সাথে কম্পিউটার সফটওয়্যার, ক্যাবল ইত্যাদি দিয়ে দেয়া হয়। এর সফটওয়্যার ব্যবহার করে মোবাইল ব্যবহারকারী বাসার কম্পিউটারে বসেই সিম কপি করতে পারবে। ১৬টি সিম কপি করার ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিক সিমের মূল্য ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকার মধ্যে। ম্যাজিক সিমের আরেকটি ভার্সন রয়েছে যার ধারণক্ষমতা ৬ সিমের ডাটা। এটির মূল্য ১৫০০ থেকে ১৮০০ টাকার মধ্যে।

মোবাইল হ্যান্ডসেটে একাধিক সিম সংযুক্ত করা গেলেও একসঙ্গে একাধিক লাইন অ্যাকটিভ থাকবে না। অন্যটি বা অন্য সিমগুলো থাকবে অফ লাইনে। বাংলাদেশের ইস্টার্ন প্লাজা, বসুন্ধরা সিটি গার্ডেনসহ প্রায় সব মার্কেটের মোবাইলের দোকানে একাধিক সিম লাগানোর পদ্ধতিযুক্ত সিম পাওয়া যাচ্ছে।

— জিয়া

পরমাণু বোমা

মোঃ আব্দুল ওয়াহাব

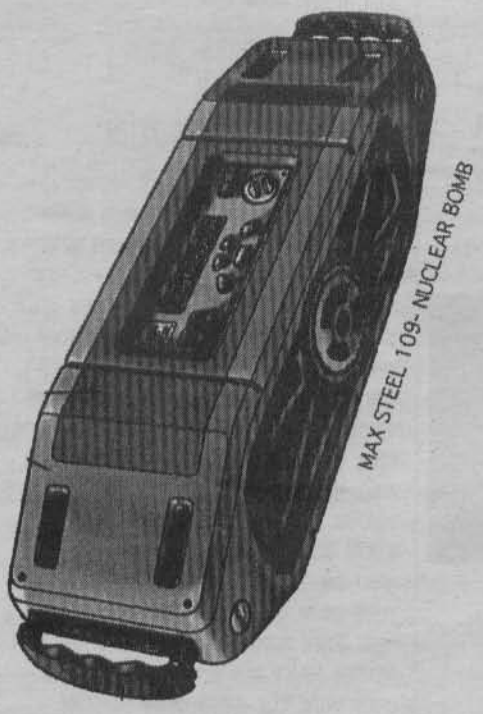

সাধারণ অবস্থায় আমরা পরমাণুর এ শক্তির আঁধার না দেখলে প্রচণ্ড আঘাতে যখন নিউক্লিয়াস বিদীর্ণ হয় তখন নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি ছাড়া পায় এবং তখনই ঘটে পারমাণবিক বিস্ফোরণ; আমরাও দেখি পরমাণুর প্রলয়ঙ্কর ক্ষমতা।

ষাট বছর আগে সেই ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট নির্জন অন্ধকারে মার্কিন বোমারু বিমান দুটি জাপানের হিরোশিমায় ফেলেছিল ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র পারমাণবিক বোমা। তার তিন দিন পর নাগাসাকিতে ফেললো আরও একটি বোমা। দুই বোমার বিস্ফোরণে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শহর দুটি। দু শহরে তাৎক্ষণিকভাবে মারা পড়েছিল প্রায় দেড় লাখ মানুষ। তেজক্রিয়তা আক্রান্ত হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক। জাপানের বিজ্ঞানীরা বুঝতেও পারেননি মুহূর্তে কি ঘটেছে!

পরে সারাবিশ্বকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জানিয়ে দিলেন, জাপানকে দমিয়ে রাখতে ফেলা হয়েছিল পারমাণবিক বোমা। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছিল তা আজকের হাইড্রোজেন বোমার তুলনায় খুবই নগণ্য।
পরমাণু বোমাগুলো ফেলা হয়েছিল শহরের ১৮৫০ ফুট উপর থেকে, বিস্ফোরিত হয়ে ৬৫০ গজের মধ্যে বাড়ি-ঘরগুলোর ছাদ ৪ ইঞ্চির ১ হাজার ভাগের ১ ভাগ প্রচণ্ড তাপে গলে গেছে। আগুনের ঝড় প্রায় ৫ মাইল পর্যন্ত পৌঁছেছে বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকে। ইলেকট্রিক ও টেলিফোন পোস্ট সবকিছু তুলার মতো উড়েছিল। পরে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিটি ছিল তেজক্রিয় বর্ষণ। অর্থাৎ পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর তেজক্রিয় জিনিসগুলো আকাশে মেঘের আকার ধারণ করে, পরে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ার পর এগুলো বৃষ্টির আকারে আবার ফিরে আসে নিচে। যার ফলে দেখা দেয় নানা রোগ, বিশেষ করে ক্যান্সার। এ তেজক্রিয়তা কোষের ডিএনএর ক্ষতি করে। যা পরবর্তীতে বংশানুক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। পরমাণু বিস্ফোরণের এটাই সবচেয়ে ভায়ানক দিক।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, এত শক্তি আসে কোথা থেকে পরমাণু বোমায়? শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও যে পরমাণু দেখা যায় না, তাতে এত শক্তি আসে কোথা থেকে? এতে রহস্যটা কি? অ্যারিস্টটলের ধারণাকে উপেক্ষা করে পরে গ্যালিলিও, দেকার্তে, বেকন, রবার্ট বয়েল, আইজ্যাক নিউটন এবং সর্বশেষ জন ডালটন অ্যারিস্টটলীয় মতবাদের ধারণাটি অমূল পাল্টে দেন। উনিশ শতকের প্রথমদিকে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন পরমাণু সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মতবাদটি দেন যা ডাল্টনের 'পরমাণু তত্ত্ব নামে পরিচিত। পরে তার তত্ত্বের একটি প্রধান অংশ ভুল প্রমাণিত হয় ও বেশির ভাগটাই আজও সত্য। যাহোক পরমাণুর এ শক্তির রহস্য বুঝতে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনই যথেষ্ট।

ইউরেনিয়াম-২৩৫ একটি পদার্থ। পদার্থটি থেকে তৈরি করা হয়েছিল প্রথম পরমাণু বোমা। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক ভর হলো ২৩৮, অর্থাৎ পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটন সংখ্যা ৯২টি আর নিউট্রন সংখ্যা ১৪৬টি । পরমাণু বিভাজন পরীক্ষা তাই ইউ-২৩৫ সবচেয়ে উত্তম। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো একটি পরমাণু যার ব্যাস ১ ইঞ্চির ৪'শ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। তারও নাকি আমাদের সৌরজগতের মতো একটা পরিমণ্ডল রয়েছে। পরমাণু কেন্দ্রের সবচেয়ে ভারী এবং ঘন বস্তুটি হলো নিউক্লিয়াস যা শক্তির আধার। তাতে রয়েছে তড়িৎ আধানযুক্ত ধণাত্মক প্রোটন কণিকা এবং তড়িৎ হীন অর্থাৎ ঋণাত্মক নিউট্রন কণিকা।

স্বাভাবিক পরমাণু তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি নামে পরিচিত। এতে একটু রকমফের এর অভাবে বাইরের দিকের কক্ষে দু-একটি ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে আসে বা বাইরে থেকে ইলেকট্রন পরমাণুতে ঢুকে পড়ে। তখনই হয়ে ওঠে সক্রিয় এক পরমাণুর সাথে অন্যের মিলন বা বিচ্ছেদ। আর সেই সাথে ঘটে শক্তির বিকিরণ বা শোষণ। আবার নিউক্লিয়াসেও চলছে এক শক্তির খেলা। নিউক্লিয়াসে এ শক্তির সৃষ্টি হয় প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে মেসন নামের এক ধরনের কণার আদান-প্রদানের ফলে। এ শক্তির নাম নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি। সাধারণ অবস্থায় আমরা পরমাণুর এ শক্তির আঁধার না দেখলে প্রচণ্ড আঘাতে যখন নিউক্লিয়াস বিদীর্ণ হয় তখন নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি ছাড়া পায় এবং তখনই ঘটে পারমাণবিক বিস্ফোরণ; আমরাও দেখি পরমাণুর প্রলয়ঙ্কর ক্ষমতা। প্রবল নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জিকে বন্ধনযুক্ত করতে হলে প্রচণ্ড শক্তিশালী নিউট্রন বা অন্য কোনো মৌল কণা দিয়ে আঘাত হানতে হবে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে।

সাইক্লোট্রন নামে এক ধরনের যন্ত্রে যে কাজটা করা হয়। কিন্তু তাতেও খুব একটা শক্তি মিলে না বলে ১৯৩৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী অটোহন এবং স্ট্রাসম্যান বিভাজন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। এর কয়েক মাস পর মাদাম কুরির জামাই ফ্রেডারিক জেকুরি পরীক্ষা করে দেখেন, বিভাজন ক্রিয়ার ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস থেকে কয়েকটি নিউট্রন ছিটকে এসে অন্যান্য ইউরেনিয়াম পরমাণুতে আঘাত করে। এভাবে প্রক্রিয়াটি চলতেই থাকে। ইতালীয় বিজ্ঞানী এনরিকো ফেরমি এ প্রক্রিয়াটির নাম দেন 'নিউক্লিয়ার সেল রিঅ্যাকশন' বা 'পারমাণবিক শৃঙ্খল বিক্রিয়া'। এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বছর চারেকের মধ্যে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে আমেরিকা তৈরি করে ফেলে বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমা। গোটা প্রকল্পটি চালাতে নিয়োগ করা হয় দেড় লাখ কর্মী। মাত্র ১০-১২ জন উচ্চ পদস্থ কর্মীই জানতেন কি তৈরি করতে যাচ্ছে তারা। ১৯৪২ সালে শুরু হওয়া প্রকল্পটির শেষ দেখল বিশ্ববাসী ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট। সে এক মানব ইতিহাসের চরম লজ্জার দিন।

ইন্টারনেটের গতি বাড়ানোর কৌশল

মোঃ গোলাম মোস্তফা

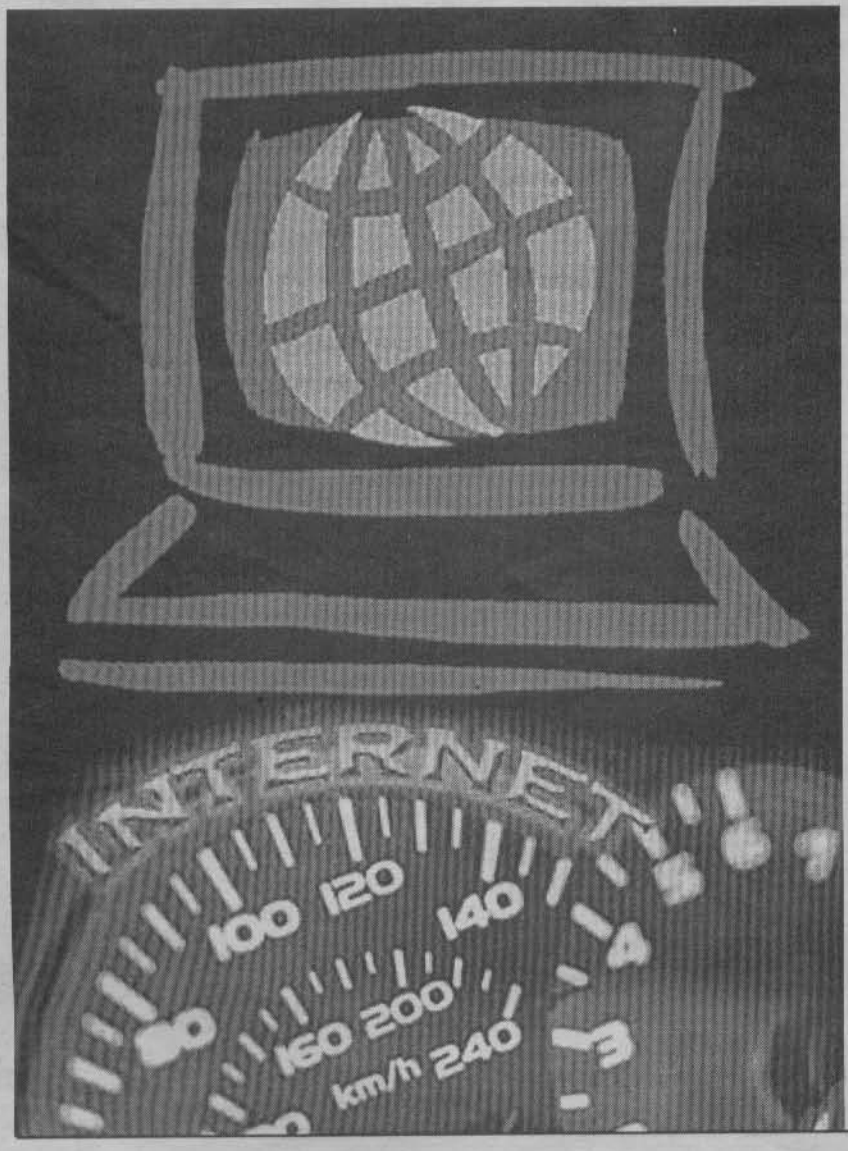

ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ে বসে যারা নিয়মিতভাবে ই-মেইল আদান-প্রদান, ওয়েব সার্চিং ও চ্যাটে ব্যস্ত থাকেন অধিকাংশ সময় এ ধরনের ব্রাউজাররা প্রায়ই বিরক্তি প্রকাশ করেন ইন্টারনেটের স্পিডের কারণে। কম গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট যে শুধু বিরক্তির কারণ তা নয়, বরং এটি মূল্যবান সময় ও অর্থের অপচয়ও ঘটায় ব্যাপকভাবে। সাধারণত ইন্টারনেটের স্পিড নির্ভর করে টেলিফোন লাইনের ব্যান্ডউইথ, কম্পিউটার সিস্টেমের কনফিগারেশন এবং কিছু কম্পিউটার সেটিংয়ের ওপর। উইন্ডোজের কিছু ডিফল্ট সেটিং রয়েছে। এ সেটিংগুলো পরিবর্তন বা মডিফাই করে ইন্টারনেটের সেরা পারফরমেন্স পাওয়া যায়। ইন্টারনেটের সেরা স্পিড পাওয়া যেতে পারে নীচের বর্ণিত কিছু টিপস ও ট্রিকসগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে।

ধাপ-১ : Full Buffers সেটিংয়ের মাধ্যমে ইন্টারনেট স্পিড বাড়ানো :

ইন্টারনেটের কিছু পরিমাণ পারফরমেন্স বাড়ানো যায় Transmit and receive সেট করে। প্রথমে Start → Control Panel এ ক্লিক করুন। এরপর Modem এর এপলেট ওপেন করুন। সেখান থেকে Properties এ ক্লিক করুন। এবার Connection ট্যাবে ক্লিক করুন। এরপর Port Setting বাটনে ক্লিক করুন। এবার Receive এবং Transmit বাফারকে পরিপূর্ণরূপে সেট করে OK করুন। এবার দেখবেন ইন্টারনেটের পারফরমেন্স কিছুটা বেড়ে গেছে।

ধাপ-২ : Com পোর্ট সেটিং পরিবর্তন করে ইন্টারনেটের স্পিড বাড়ানো :

কম্পিউটারের Port (পোর্ট) পরিবর্তন করে ইন্টারনেট স্পিড বাড়ানো যায় (যদি এক্সটার্নাল মডেম ব্যবহার করা হয়) পোর্ট সেটিং পরিবর্তন করার জন্য নিচের ধাপগুলো সম্পন্ন করুন।

স্টেপ-১ : প্রথমে Start → My Computer আইকনে রাইট ক্লিক করে পপ আপ মেনুর Properties এ ক্লিক করুন।

স্টেপ-২ : এরপর Hardware এ ক্লিক করুন। সেখানে System Properties এর ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হওয়ার পর Device Manager এ ক্লিক করুন।

স্টেপ-৩ : এবার Ports (Com and Lpt) তে ডাবল ক্লিক করুন। এরপর Com পোর্ট সিলেক্ট করুন (যে পোর্টে মডেমটি ইনস্টল করা হয়েছে)

স্টেপ-৪ : এরপর প্রপার্টিজ (Properties) বাটনে ক্লিক করুন।

স্টেপ-৫ : যদি ৫৬ কেবিপিএস-এর মডেম ব্যবহার করেন তাহলে Port Setting এ ক্লিক করে প্রতি সেকেন্ডে ১,১৫,২০০ বিট সিলেক্ট করুন। আর যদি ৩৩.৬ কেবিপিএস বিশিষ্ট মডেম ব্যবহার করেন, তাহলে প্রতি সেকেন্ডে ৫৭,৬০০ বিট সিলেক্ট করে Ok করলে দেখবেন নিশ্চিতভাবে ইন্টারনেটের স্পিড অনেকটা বেড়ে গেছে।

ইন্টারনেট ব্রাউজিংকে অধিকতর দ্রুত গতিসম্পন্ন করতে পারবেন। কেননা, খুব বেশি গ্রাফিক্স, সাউন্ড এবং এনিমেশন প্রভৃতি সবসময় দরকার না হলে আপনি ইচ্ছা করলে এগুলোর ডাউনলোডিং কার্যক্রম বন্ধ করতে পারেন।

ধাপ-৩ : কানেকশন টাইম বাড়িয়ে ইন্টারনেট স্পিড বাড়ানো :

কখনও কখনও নেটে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও দেখবেন বিশেষ করে ডায়াল আপ নেটওয়ার্কে "Logging on to the network" মেসেজ প্রদর্শিত হচ্ছে। এ ধরনের মেসেজ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করলে :

স্টেপ-১ : প্রথমে Connection ট্যাব এ রাইট ক্লিক করে Properties এ ক্লিক করুন।

স্টেপ-২ : এরপর Server Types-এর ক্লিক্ করুন।

স্টেপ-৩ : এবার 'Log on to network'; 'Netbevi' এবং 'IPX/SPX Compatible' অপশনগুলো আনচেক করে OK বাটনে ক্লিক করুন। এরপর ইন্টারনেটের পারফরমেন্স কেমন তা চেক্ করুন।

ধাপ-৪ :

ডায়াল টোনের স্পিড বাড়ানো Extra Setting-এর মডেম কমান্ডগুলো ব্যবহার করে ডায়াল টোনের স্পিড বাড়ানোর মাধ্যমে ইন্টারনেটে অধিকতর দ্রুত গতিতে ডায়াল করা যায়। Extra Setting- এর মাধ্যমে ডায়াল স্পিড বাড়ানো যায় নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে।

স্টেপ-১ : প্রথমে Control Panel- এর Modem আইকনে ডাবল ক্লিক করুন।

স্টেপ-২ : এরপর Properties-এ ক্লিক করে Connection ট্যাবে ক্লিক করুন।

স্টেপ-৩ : এবার Advance-এ ক্লিক করুন।

স্টেপ-৪ : অতিরিক্ত সেটিং (Extra setting) এ S11=50 টাইপ করুন। এতে করে দেখবেন ডায়াল টোন স্পিড বেড়ে ১০০ মিলিসেকেন্ড থেকে ৫০ মিলি সেকেন্ডে উন্নীত হবে।

ধাপ-৫ :

নিজস্ব ডিএনএস (ডাটাবেজ) তৈরি ও অনুসন্ধান প্রসেসের স্পিড বাড়ানো :

ওয়েবসাইট সনাক্ত করার জন্য ইন্টারনেট সাধারণত টিসিপি আইপি এড্রেস ব্যবহার করে। আর একই কাজ করার জন্য ব্যবহারকারীরা সাধারণত URL (যেমন : www.yahoo.com) ব্যবহার করে। কেননা টিসিপি/আইপি এড্রেস ব্যবহারকারীরা সহজে মনে রাখতে পারে না। ব্যবহারকারীরা ওয়েব সার্চিংয়ের জন্য ব্রাউজারে URL টাইপ করে। এটিইউআরএসটি-কে টিসিপি/ আইপি এড্রেসে কনভার্ট করার জন্য ডিএনএস সার্ভারকে অনুসন্ধান করে।

নিজস্ব ডিএনএস ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে ওয়েব সার্চিং প্রসেসের স্পিড বাড়ানো যায়। এ ফাইলের হোস্ট নেমের লিস্ট ও তৎসংশ্লিষ্ট আইপি এড্রেস স্টোর করে। হোস্ট নামের হার্ডডিস্কের একটি বিশেষ ধরনের ফাইল যা Cache নামে পরিচিত। এবার নোটপ্যাডে এই টেক্সট ফাইলটি তৈরি করতে হবে এবং http:// ছাড়া ইউআরএল এর নামের পরে যথাযথভাবে টিসিপি/আইপি এড্রেস টাইপ করুন। এক্ষেত্রে আইপি এড্রেস ও ইউআরএল-এর মধ্যে নূন্যতম একটি স্পেস দিতে হবে। এ ফাইলে ইচ্ছামতো ইউআরএল যুক্ত করা যায়। এবার ফাইলটিকে Text এক্সটেনশন ছাড়াই hosts নামে সেভ করুন। এবার

www.yahoo.com
www.amity.com
www.rediff.com

ফাইলটি সেভ করে ওয়েবের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখুন। উপরিউল্লিখিত ওয়েব সাইটগুলো প্রায়ই ওপেন থাকে। সুনির্দিষ্ট ওয়েব সাইটে যথযথভাবে টিসিপি/আইপি এড্রেস জানার জন্য প্রথমে ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে এমএসডস প্রম্পটে গিয়ে ping কমান্ড টাইপ করুন। ওয়েবসাইট এড্রেসের আগে ping কমান্ড বসাতে হয়। যেমন— Ping www.yahoo.com.

ধাপ-৬ :

দীর্ঘ ওয়েব এড্রেসের জন্য শর্টকাট তৈরি :

দীর্ঘ ওয়েব এড্রেস প্রতিবার টাইপ করা যেমন ঝামেলাদায়ক তেমনি ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তাই দীর্ঘ ওয়েব এড্রেসের শর্টকাট তৈরি করা উচিত। যেমন— আপনি প্রায়ই timesofindia.com ওয়েব এড্রেসে এক্সেস করেন। আপনি এর জন্য একটি শর্টকাট Toi তৈরি করে খুব সহজে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। ওয়েব এড্রেসের শর্টকাট তৈরির জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন।

স্টেপ-১ : প্রথমে Start → Program → Accessories → Note pad এ ক্লিক করে Hosts ফাইলটি ওপেন করে নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করে মডিফাই করুন।

ya # = এটি yahoo.com এর শর্টকাট।
am # = এটি amiety.com এর শর্টকাট।
re # = এটি rediff.com এর শর্টকাট।
এটি একটি প্রতীক যার মাধ্যমে আপনি যুক্ত করতে পারবেন অপশনাল কমান্ড; যাতে করে শর্টকাটটি মনে রাখা যায়।

স্টেপ-২ : এ ফাইলটি Hosts নামে করুন।

স্টেপ-৩ : এবার এক্সপ্লোরার ওপেন করে উপরিউল্লিখিত যে কোনো একটি শর্টকাট এড্রেসবারে টাইপ করলে আপনি সেই ওয়েব সাইটে লগ অন করতে পারবেন।

ধাপ-৭ :

ধাপ-৭ এর টিপসের মাধ্যমে আপনি ইন্টারনেট ব্রাউজিংকে অধিকতর দ্রুত গতিসম্পন্ন করতে পারবেন। কেননা, খুব বেশি গ্রাফিক্স, সাউন্ড এবং এনিমেশন প্রভৃতি সবসময় দরকার না হলে আপনি ইচ্ছা করলে এগুলোর ডাউনলোডিং কার্যক্রম বন্ধ করতে পারেন। গ্রাফিক্স, সাউন্ড, এনিমেশন প্রভৃতি ডাউনলোডিং কার্যক্রম বন্ধ করা যায় নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করে।

স্টেপ-১ : প্রথমে Internet Explorer এ রাইট ক্লিক করে পপ আপ মেনু থেকে Properties সিলেক্ট করুন।

স্টেপ-২ : এরপর Advanced ট্যাবে ক্লিক করুন।

স্টেপ-৩ : মাল্টিমিডিয়ার নিম্নলিখিত অপশনগুলো আনচেক করুন।

Play Video, Play animation, Play Sound, Show Picture

স্টেপ-৪ : এরপর ok বাটনে ক্লিক করুন। আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় এ অপশনগুলো চেক বা আনচেক করতে পারেন।

সায়েন্স টুয়ার্স

বর্ষ ৪ • সংখ্যা ৪৮ • ডিসেম্বর ২০০৫

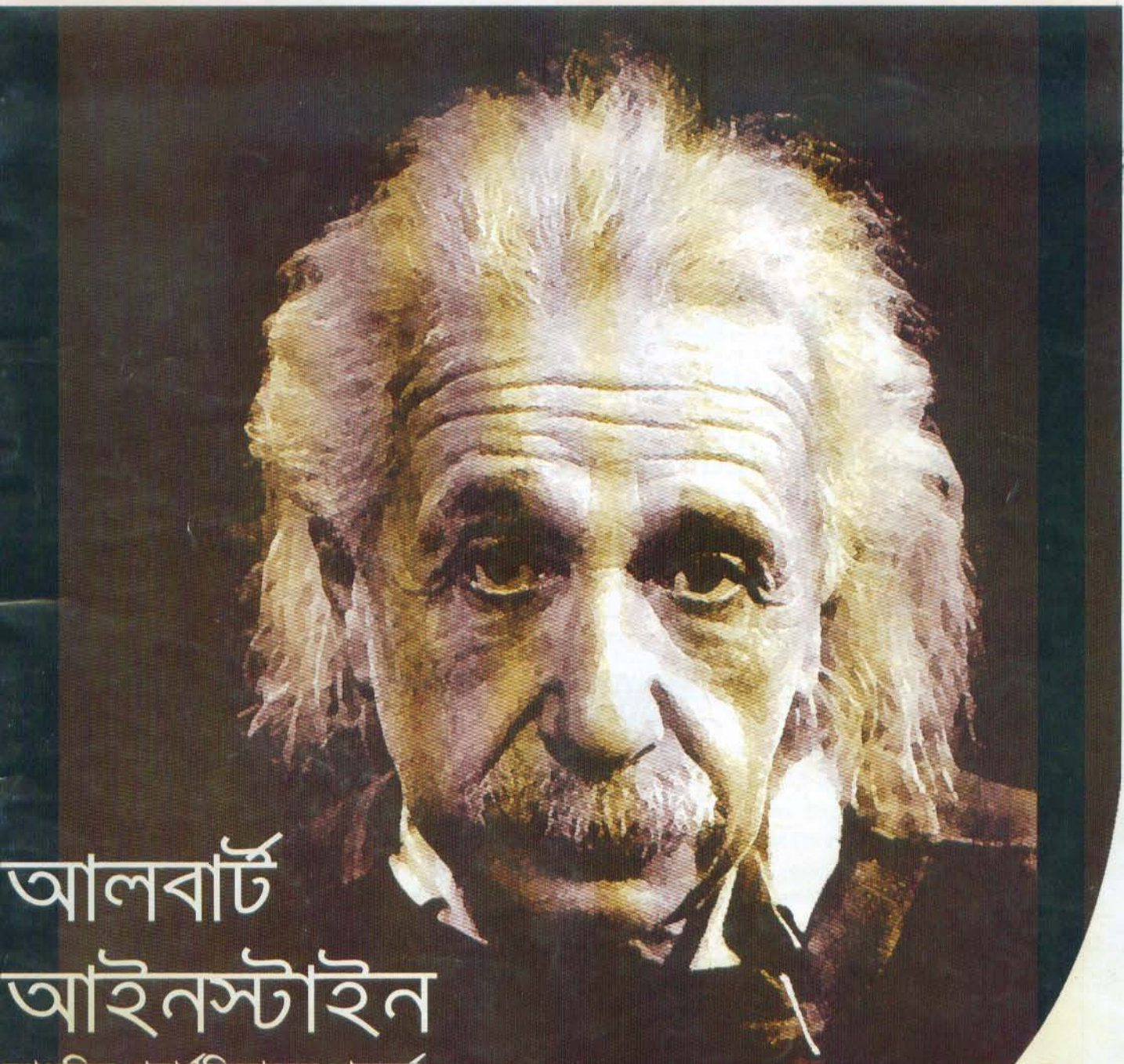

আলবার্ট আইনস্টাইন

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের শতবর্ষ

খাদ্যে বিষক্রিয়া : মেধাশূন্য প্রজন্মের আশঙ্কা ■ বার্ড ফ্লু
মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী রোবট ■ বুলেট প্রুফ ■ দশ মিনিটেই চিন্তামুক্ত

বিশেষ সংখ্যা

প্রফেসর'স প্রকাশনের একটি প্রকাশনা

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-কম্পিউটার-স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ম্যাগাজিন

বর্ষ ৪
সংখ্যা ৪৮
ডিসেম্বর ২০০৫

এ সংখ্যার সূচি

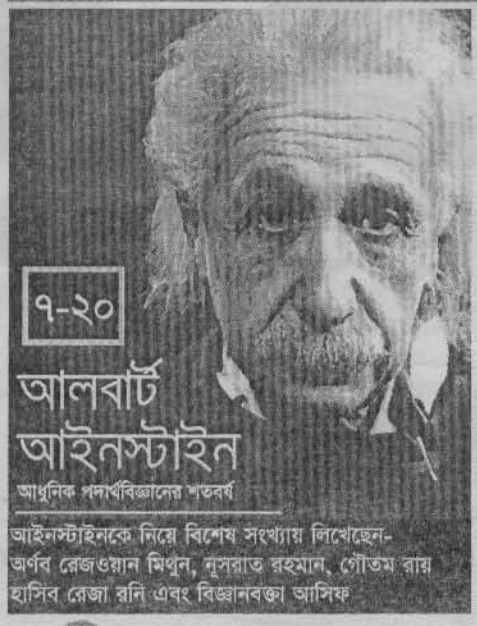

৭-২০
আলবার্ট আইনস্টাইন
আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের শতবর্ষ
আইনস্টাইনকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যায় লিখেছেন- অর্ণব রেজওয়ান মিথুন, নুসরাত রহমান, গৌতম রায় হাসিব রেজা রনি এবং বিজ্ঞানবক্তা আসিফ

৪৬
জেনেটিক্যালি মডিফাইড মানুষ কি সম্ভব?
— মনীষা রায়

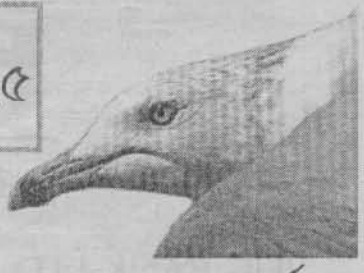

২৫
বার্ড ফ্লু
ঝুঁকির মুখে বাংলাদেশ
— কাজী জিয়াউল হক

মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী
২৮
রোবট
— পি কে রায়

অন্যান্য রচনা

খাদ্যে বিষক্রিয়া
মেধাশূন্য প্রজন্মের আশঙ্কা
– রওনক জাহান /২১
স্যার আইজ্যাক নিউটন
– এম হাসান /৩৩
মোবাইল প্রযুক্তির নতুন অধ্যায় এজ্
– রনি হাসান /৩৪
বুলেট প্রুফ
– শেখ আনোয়ার /৩৬
এইডস : বাঁচতে হলে জানতে হবে
– অনিকেত ইসলাম /৩৮
দশ মিনিটেই চিন্তামুক্ত
– তামজিদ হোসেন/৪২
ই- মেইল নিয়ন্ত্রণ কৌশল
– মোঃ গোলাম মোস্তফা /৪৪
বাদুড় কাহিনী
– হীরক চৌধুরী /৫০
জন্ডিস ও ভাইরাস হিপাটোট্রপিক
– রেজা আহমেদ /৫২

নিয়মিত বিভাগ

৩ চিঠিপত্র
৪ বিজ্ঞান বিশ্বের নতুন খবর
৩০ বিজ্ঞান প্রজন্ম
বিতর্ক ৪১
বিজ্ঞান কুইজ ৫৫
সায়েন্স ফিকশন : সুখী দম্পতি ৪৮

সম্পাদক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

সহযোগী সম্পাদক
এস এম মুকুল

সহকারী সম্পাদক
সরোয়ার হোসেন

অতিথি লেখক
মাসুদ কামাল
ড. অরূপ রতন চৌধুরী
ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল

নিয়মিত লেখক
আসিফ, রেহানা পারভীন রুমা
পারভীন সুলতানা, শান্তা মারিয়া
ফারহানা মিলি, হিটলার এ হালিম
মাহবুব আনোয়ার শুভ, শফি ইসলাম
মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাদাত শাহরিয়ার
এ কে এম মুনির হোসেন
আনোয়ারুল হক খান

সার্কুলেশন
আমিনুল ইসলাম সোহাগ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫০৯৫
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৭১২৩৯১৩

বিপণন
৩৭/১, বাংলাবাজার, দ্বিতীয় তলা
ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫০৫৪,০১৭১-১২০৭০১

মূল্য : পনের টাকা

প্রফেসর'স প্রকাশন, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত।

ই-মেইল : editor_sworld@yahoo.com

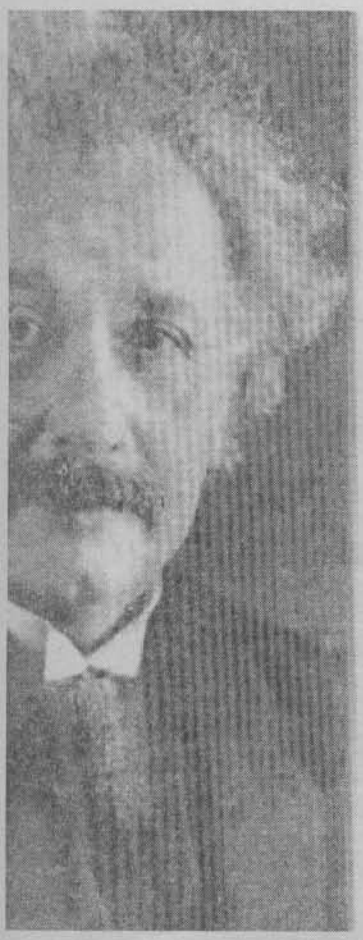

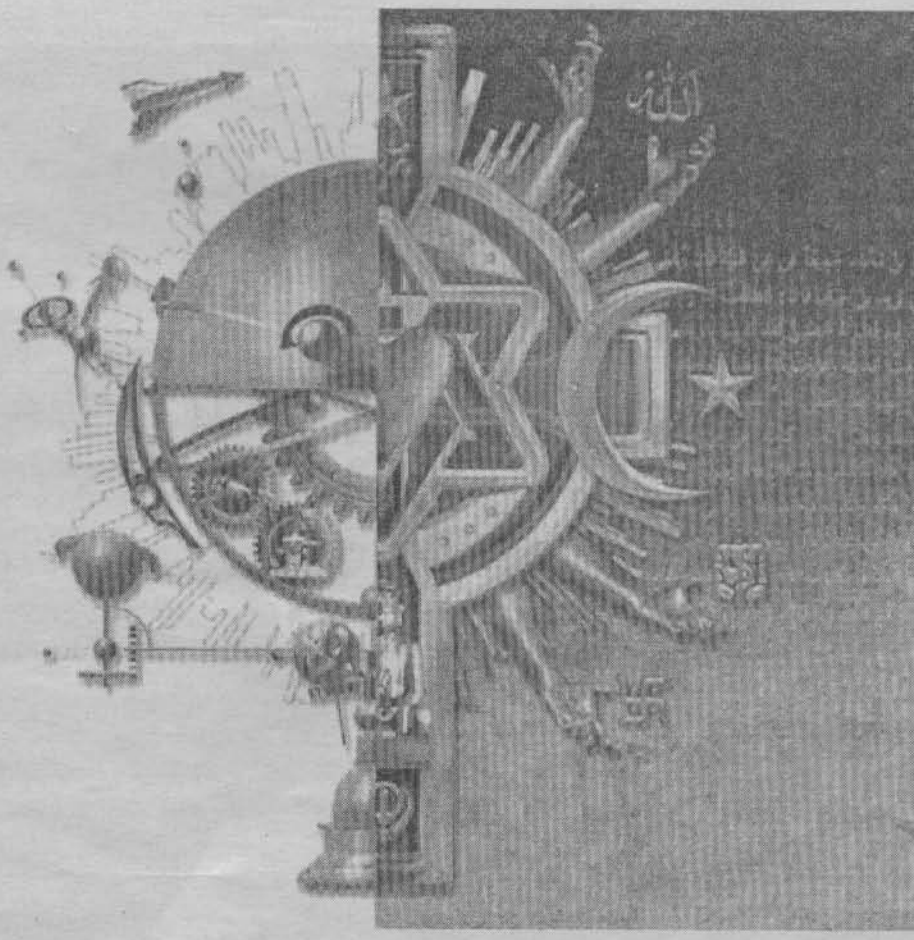

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের শতবর্ষ

আলবার্ট আইনস্টাইন

২০০৫ সালটা অন্যান্য বছরগুলোর চেয়ে একটু অন্যরকম। ঠিক একশ বছর আগে-১৯০৫ সালে আইনস্টাইন বার্লিনের একটা নামকরা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'Annalen Der Physik'-এ তিনটে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আর এ প্রবন্ধ তিনটিই মানবজাতির চিন্তা-চেতনায় এক বৈপ্লবিক ধারার জন্ম দেয়। আজকের দিনে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান (Modern Physics) বলতে আমরা যা বুঝি, ১৯০৫ সাল থেকে প্রকৃতপক্ষে তার যাত্রা শুরু। আর তাই ২০০৫ সালকে আমরা বলি 'আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের শতবর্ষ। এদিক থেকে বিচার করলে ২০০৫ সাল আমাদের জন্য বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের কর্ম, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং তার বর্ণিল জীবনের নানান বিষয় নিয়ে লিখেছেন—

অর্ণব রেজওয়ান মিথুন, নূসরাত রহমান, গৌতম রায়, হাসিব রেজা রনি এবং বিজ্ঞানবক্তা আসিফ

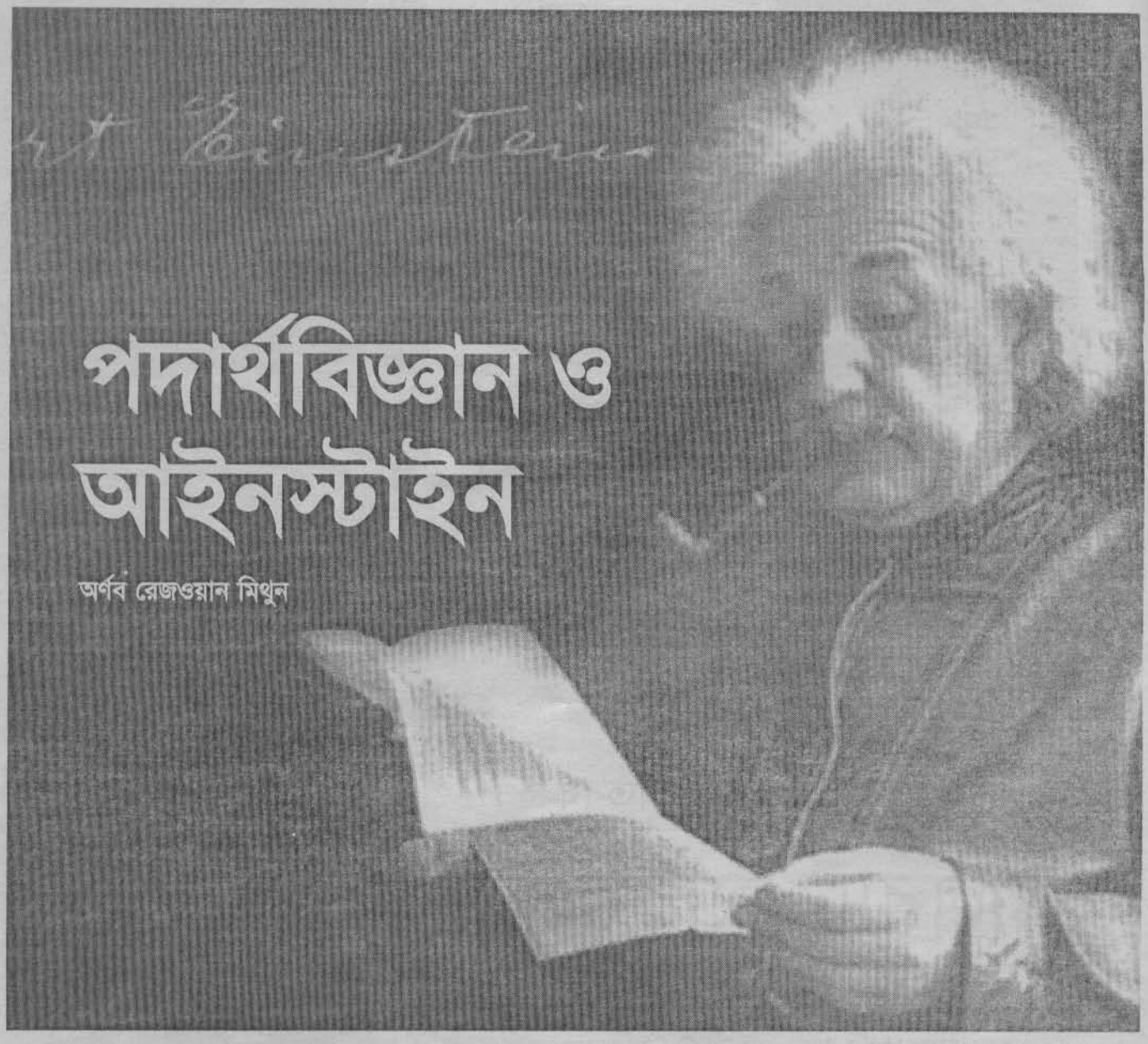

পদার্থবিজ্ঞান ও আইনস্টাইন

অর্ণব রেজওয়ান মিথুন

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এমন একজন বিজ্ঞানী যাকে নিয়ে কোনো কিছু লিখতে যাওয়া মানে একটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নেয়া। আইনস্টাইনের জীবন সম্পর্কে বলা যতটা না দুঃসাহসিক, তার চেয়ে বেশি সাহসিকতাপূর্ণ কাজ হলো আইনস্টাইনের গবেষণা সম্পর্কে বলা। তবু আইনস্টাইনের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রেখে তার জীবন ও গবেষণা কর্ম সম্পর্কে বলার মতো কিছুটা দুঃসাহস আমি দেখাচ্ছি।

২০০৫ সালটা অন্যান্য বছরগুলোর চেয়ে একটু অন্যরকম। ঠিক একশ বছর আগে-১৯০৫ সালে আইনস্টাইন বার্লিনের একটা নামকরা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'Annalen Der Physik'-এ তিনটে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আর এ প্রবন্ধ তিনটিই মানবজাতির চিন্তা-চেতনায় এক বৈপ্লবিক ধারার জন্ম দেয়। আজকের দিনে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান (Modern Physics) বলতে আমরা যা বুঝি, ১৯০৫ সাল থেকে প্রকৃতপক্ষে তার যাত্রা শুরু। আর তাই ২০০৫ সালকে আমরা বলি 'আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের শতবর্ষ। এদিক থেকে বিচার করলে ২০০৫ সাল আমাদের জন্য বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯০৫ সালের ঐ প্রবন্ধে আইনস্টাইন কী এমন লিখেছিলেন যার ফলে নিউটনের বলবিদ্যা অমন প্রচণ্ড ধাক্কা খেল? আসলে আইনস্টাইন নিউটনের ধারণাগুলোকে সম্প্রসারিত করেছিলেন তখন। নিউটনের মতে, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা এ তিনমাত্রা দিয়েই জগৎ গঠিত। এ তিনটি মাত্রার পরিবর্তনশীলতা দিয়েই জগতের সবকিছুর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। কিন্তু আইনস্টাইন নিউটনের তিনমাত্রার বিশ্বের সাথে আরেকটি মাত্রা যোগ করলেন। আর তা হলো সময় বা কাল (Time)।

এবার বেশ খানিকটা পিছনে যাওয়া যাক। তা না হলে আইনস্টাইনের কাজ সম্পর্কে ধারণাগুলো পরিষ্কার হবে না। ১৬৪২ সালের ৮ জানুয়ারি বিজ্ঞানী গ্যালিলিও মারা যান। আর ঐ বছরই ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের মধ্যরাতে স্যার আইজ্যাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্ঞানী নিউটন ছোটবেলায় এত রোগাপাতলা আর অসুস্থ ছিলেন যে, অনেকেই তার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু নিউটন বেঁচে গিয়েছিলেন এবং বাঁচিয়েছিলেন বিজ্ঞানকে। ১৬৬১ সালে নিউটন কেম্ব্রিজে যান গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে পড়াশুনা করতে। ১৬৬৫ সালে কেম্ব্রিজে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হলে নিউটন লিঙ্কনশায়ারে তার গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। সেখানে থেকেই নিউটন তখনকার দিনের বলবিদ্যার সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। ১৬৬৫-৬৬ সালে নিউটন একাকী গ্রামের ঐ বাড়িতে বসে যে চিন্তাগুলো করেছিলেন, সেগুলোই পরবর্তী তিনশ বছরের পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। বলবিদ্যার মৌলিক তিনটে সূত্র (যেগুলো এখন 'নিউটনের গতিসূত্র' নামে পরিচিত), মহাকর্ষ সূত্র, আলোর কণাতত্ত্ব, গণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ক্যালকুলাস প্রভৃতি আবিষ্কার নিউটনকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর মর্যাদা এনে দেয়। পরবর্তীতে যারা এসেছেন- হাইগেন্স, ইয়ং, ফ্রেনেল, জেমস ওয়াট, জুল, সাদি, কার্নো, হ্যালি, ল্যাগরেঞ্জ প্রমুখ বিজ্ঞানী শুধু নিউটনকেই অনুসরণ করে গেছেন। কিছুকাল পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আসেন মাইকেল ফ্যারাডে, যিনি তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা প্রথম দেখাতে সমর্থ হন এবং এরপর আসেন মহান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-১৮৭৯), যিনি ফ্যারাডের তড়িৎ চুম্বক সংক্রান্ত ঘটনাবলিকে মাত্র চারটে সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেন এবং আলোর তাড়িত চৌম্বক তত্ত্বের অবতারণা করেন। ম্যাক্সওয়েল পর্যন্ত সকলেই তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে কাজ করে গেছেন, তবে তারা সবাই একটা মানদণ্ডের সাপেক্ষে কাজ করেছেন। সেই মানদণ্ডটা হচ্ছে 'নিউটন'। প্রত্যেকেই, পদার্থবিজ্ঞানের যে যে শাখায়ই গবেষণা করেছেন সকলেই নিউটনের সূত্রগুলোকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন যদিও কেউ কেউ নিউটনের সূত্রের সর্বজনীনতা সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ পোষণ করতেন। কিন্তু কেউই এর উর্ধ্বে উঠে নতুন কোনো তত্ত্ব দাঁড় করাতে পারেননি। যেমন ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে হাইগেন্সের তরঙ্গতত্ত্ব (Wave Theory) প্রচলিত ছিল। কিন্তু হাইগেন্সও আলোর গতিবেগ পরিমাপের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড ধরে নিয়েছিলেন। সেটা হলো 'ইথার'। এই ইথার অবশ্য জৈব রসায়নের পরীক্ষাগারে দ্রাবক রূপে যে ইথার ব্যবহৃত হয়, সেই ইথার নয়। মনে করা হতো যে, ইথার নামক একটি পদার্থ (যার স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি, তবে ঘনত্ব খুবই কম) মহাবিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান। মহাবিশ্বের সমস্ত গতিবিধিই এই ইথার সাপেক্ষে গণনাযোগ্য। হাইগেন্স কিন্তু এই ইথারের অস্তিত্বের কল্পনা করেছিলেন নিউটনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই। কেননা নিউটন স্থানের একটা সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড ধরতেন যার সাপেক্ষে বলবিদ্যার বিধিগুলো প্রযোজ্য হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেকেই ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন, কিন্তু কেউই মহাবিশ্বে ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেননি। ১৮৮৭ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী মাইকেলসন (১৮৫২-১৯৩১) ও মর্লি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে, বাস্তবে ইথার বলে কিছুই নেই। ফলে ইথারজনিত সমস্যাটা দূর হলো। কিন্তু আরও সমস্যা একটা রয়েই গেল। ইথার বলে যদি কোনো কিছু না-ই থাকে তাহলে আলোর গতিসহ বলবিদ্যার অন্যান্য সূত্রগুলো কার সাপেক্ষে প্রযোজ্য হবে? এ সময়ই আইনস্টাইন সুইজারল্যান্ডের পেটেন্ট অফিসের কেরানির চেয়ারে বসে প্রমাণ করে দেখালেন যে, যদি আমরা একটু কষ্ট করে হলেও মেনে নিই যে নিউটনের তত্ত্ব অসম্পূর্ণ, তাহলেই ইথার সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। নিউটনের পরকাল সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ত্যাগ করতে পারলে ইথার সম্পর্কিত সমস্ত ধারণা যে নিষ্প্রয়োজন তা প্রমাণ হয়ে যায়। অর্থাৎ পূর্বে পরম বলতে যা কিছু মনে করা হতো, এখন তার বদলে সবকিছুকেই আপেক্ষিক বলে ধরে নিতে হবে। এটাই হলো আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (Theory of Relativity), যা তিনি ১৯০৫ সালে প্রকাশ করেছিলেন। আইনস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ, শুক্রবার; জার্মানির উলম শহরের, এক ইহুদি পরিবারে। ছোটবেলায় লেখাপড়াতে মোটেই ভালো ছিলেন না তিনি, এমনকি একবার স্কুল থেকে বহিষ্কৃতও হয়েছিলেন। মেধার অভাবে জুরিখের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে পারেননি, নিজে একবার রসায়নবিদ অসওয়াল্ডের কাছে কাজ চেয়ে একটা চিঠি লিখেছিলেন, তার বাবাও ছেলের জন্য অসওয়াল্ডের কাছে সুপারিশ করেন। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ না হলে আইনস্টাইন বেঁচে থাকার জন্য পেটেন্ট অফিসে একটা কেরানির চাকরি নিলেন। সারাদিন অফিসের জরাজীর্ণ কাঠের টেবিলটায় বসে বিভিন্ন ফাইলে ভুলত্রুটি খুঁজে বের করা, আর ফাইলের শেষে নিজের নামটা স্বাক্ষর করা -এই হলো কাজ। বাকিটা সময় একদম ফ্রি। কিন্তু সময় নষ্ট না করে নিজের প্রিয় বিষয় পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে একটু একটু করে পড়াশুনা করতে থাকলেন তিনি। প্রথমে নিউটনের বলবিদ্যা তথা চিরায়ত বলবিদ্যা (Classical Mechanice) পড়া শুরু করলেন। কিন্তু যতই পড়ছেন, কেমন যেন একটু খট্‌কা লাগছে তার। নিউটন স্থানকালের পরম ধারণা সম্পর্কে যা বলে গেছেন তা কি সবই সত্য? আইনস্টাইন এবার নিউটনিয়ান ধারণার বাইরে গিয়ে অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে লাগলেন। পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণাগুলোকে নিউটনিয়ান ধারায় না ফেলে নিজের মতো করে ঝালাই করতে লাগলেন। এর ফলে অদ্ভুত সব ফল পেতে শুরু করলেন তিনি। ১৯০৫ সালের জুন মাসের ত্রিশ তারিখ তার একটা গবেষণা প্রবন্ধ 'Annalen Der Physik' বের হলো। ঐ একটা প্রবন্ধ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করল। সবাই ভাবলেন, "নিউটনের সূত্র ভুল- এও কি সম্ভব কখনও?" আইনস্টাইন দেখালেন, সম্ভব। নিউটনের সূত্রগুলো একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সত্য। কিন্তু তার পরে নয়। এরপর দরকার হয় আপেক্ষিকতা তত্ত্বের।

কিন্তু ১৯০৫ সালের ঐ প্রবন্ধে আইনস্টাইন কী এমন লিখেছিলেন যার ফলে নিউটনের বলবিদ্যা অমন প্রচণ্ড ধাক্কা খেল? আসলে আইনস্টাইন নিউটনের ধারণাগুলোকে সম্প্রসারিত করেছিলেন তখন। নিউটনের মতে, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা এ তিনমাত্রা দিয়েই জগৎ গঠিত। এ তিনটি মাত্রার পরিবর্তনশীলতা দিয়েই জগতের সবকিছুর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। কিন্তু আইনস্টাইন নিউটনের তিনমাত্রার বিশ্বের সাথে আরেকটি মাত্রা যোগ করলেন। আর তা হলো সময় বা কাল (Time)। ফলে জগৎটা হয়ে দাঁড়াল চারমাত্রিক (Fourth Dimendional)। আর বিজ্ঞানের নতুন মানদণ্ডটা দাঁড়াল স্থান-কাল (Space-Time)। ১৯০৫ সালের ঐ গবেষণাপত্রে আইনস্টাইন এই ফোর্থ ডাইমেনশনের গাণিতিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং এরপর দেখ গেল যে, আইনস্টাইনের এই ফোর্থ ডাইমেনশন থিওরি ইথারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দেয়। অথচ

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আইনস্টাইন যখন তার এই 'Theory of Relativity' প্রকাশ করেন, তখনও ১৮৮৭ সালের মাইকেলসন মর্লির এক্সপেরিমেন্টের কথা তার কানে আসেনি।

আইনস্টাইনের 'Theory of Relativity' মেনে নিতে বৈজ্ঞানিক মহল খুব বেশি সময় নেয়নি। যার ফলে কোনোরকম ডক্টরেট ডিগ্রি ছাড়াই তিনি ১৯০৫ সালের মধ্যেই বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তখন তার বয়স মাত্র ছাব্বিশ। H.G. Wells -এর কল্পনা এখনও পর্যন্ত বাস্তবে রূপ না নিলেও তার কল্পনাটা যে শুধুই কল্পনা নয়, এটা Theory of Relativity আমাদেরকে বলে। একটা মানুষ যদি গতিশীল অবস্থায় চলে, তাহলে তার নিকট সময়, ভর বা অন্যান্য কোনোকিছুর পরিবর্তন হয় না বলে নিউটন যা বলেছিলেন, আইনস্টাইন সেটা ভুল প্রমাণ করেন। Theory of Relativity এর ভাষ্য হলো- যদি কেউ আলোর কাছাকাছি বেগে (আলোর বেগ $3x10^8$ m/sec বা সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার) গতিশীল হয়, তাহলে তার নিকট সময় ধীরে বইবে, তার দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে এবং ওজন বৃদ্ধি পাবে। আইনস্টাইন গাণিতিকভাবে এটা প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। তবে আমাদের প্রযুক্তি এখনও অতদূর অগ্রসর হতে পারেনি। যার ফলে আইনস্টাইনের থিওরির বাস্তব প্রমাণ দেয়া এখনও সম্ভব হয়নি। কেননা, আমাদের বর্তমান যুগের রকেট বা স্পেসশিপগুলো যে বেগে চলে, তা আলোর বেগের কয়েক সহস্রাংশেরও কম। আর এত কম বেগের ক্ষেত্রে Theory of Relativity -এর সূত্রগুলো নিউটনিয়ান বলবিদ্যার সাথে একীভূত হয়ে যায়।

১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে আইনস্টাইনের আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (Theory of Relativity প্রকাশের আগে) যেটাতে ব্রাউনীয় গতিসংক্রান্ত জটিলতাগুলো দূর করেন তিনি। কোনো একটা পোলেন কণাকে পানিতে ছেড়ে দিলে তা খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হয়, আর এই কণাগুলো পানির মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গতিশীল থাকে। তরল পদার্থের মধ্যে ক্ষুদ্র বস্তুর এ ধরনের গতিকে বলা হয় ব্রাউনীয় গতি (Brownian Motion)। ব্রিটিশ উদ্ভিদবিদ রবার্ট ব্রাউন এটা আবিষ্কার করেন। তার এ আবিষ্কারের পর থেকে বিজ্ঞানীরা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ব্রাউনীয় গতির কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউই সফল হননি। অবশেষে আইনস্টাইন পদার্থের গতি তত্ত্ব এবং ম্যাক্সওয়েলের বেগ-বণ্ঠন তত্ত্বের ভিত্তিতে এ ঘটনার ব্যাখ্যা দেন।

১৯১৫ সালে আইনস্টাইন আবিষ্কার করলেন General Theory of Relativity বা আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব। তত্ত্বটার আগে General বা 'সাধারণ' কথাটা লেখা থাকলেও তা মোটেই সাধারণ নয়। বরং Special Theory of Relativity -এর চেয়ে অনেক বেশি জটিল এবং দুর্বোধ্য। তত্ত্বটার গাণিতিক ব্যাখ্যা এতই জটিল যে তা সঠিকভাবে বুঝতে হলে গণিতে রীতিমতো একটা Ph.D লাগবে।

আলবার্ট আইনস্টাইনের সংক্ষিপ্ত জীবনকাল

১৮৭৯ : আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম জার্মানির উলম-এ। তার পিতার নাম ছিল হারম্যান আইনস্টাইন (HARMANN EINSTEIN) এবং মাতার নাম পওলিন (PAULINE)।

১৮৮৯ : মাত্র ১০ বছর বয়সে আইনস্টাইন নিজেই তার পড়াশোনার নির্দেশনা ঠিক করেন, তবে এক্ষেত্রে তিনি বিজ্ঞানকে যতটুকু সম্ভব প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

১৯৯৪ : আইনস্টাইনের পরিবার মিউনিখ ছেড়ে ইতালির পাবিয়াতে চলে আসেন।

১৮৯৫ : আইনস্টাইন এ সময় সুইসের পলিটেকনিক্যালে ভর্তি হন। এখানে আইনস্টাইন আর্টস-এ ফেল করেন। ফলে আইনস্টাইনের বাবা-মা তাকে সুইস শহর আরউ-তে পাঠিয়ে দেন হাইস্কুলে পর্যায় সমাপ্ত করার জন্য।

১৮৯৬ : আলবার্ট ১৭ বছর বয়সে হাইস্কুল সমাপ্ত করেন এবং জুরিখে গিয়ে 'দ্য ফেডারেল পলিটেকনিক'-এ ভর্তি হন।

১৮৯৮ : আলবার্ট তার সহপাঠিনী মিলেভা মেরিখ-এর সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। মিলেভা ছিলেন একজন হাঙ্গেরিয়ান।

১৯০০ : আলবার্ট 'দ্য ফেডারেল পলিটেকনিক' থেকে গ্রাজুয়েশন সমাপ্ত করেন।

১৯০১ : আলবার্ট সুইজারল্যান্ডের নাগরিকত্ব অর্জন করেন। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন একজন বেকার। এরপর একজন টিউটরের চাকরি পান আলবার্ট। সে সময় আলবার্ট মিলেভার সাথে দক্ষিণ ইতালিতে দেখা করেন। তখন মিলেভা গর্ভবতী ছিলেন।

১৯০২ : জানুয়ারি মাসে আলবার্টের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। মেয়ের নাম রাখা হয় লিয়াসেরল। এ সময় আলবার্টের চাকরি হয় সুইস প্যাটেন্ট অফিসে। এ বছরেই আইনস্টাইনের জীবনে পিতৃবিয়োগ ঘটে।

১৯০৩ : আলবার্ট এবং মিলেভা জানুয়ারিতে বিয়ে করেন।

১৯০৪ : আইনস্টাইনের প্রথম পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। নাম রাখা হয় হ্যানস আলবার্ট।

১৯০৫ : এ বছরটি ছিল আইনস্টাইনের মিরাকল ইয়ার। তার বিশেষ সূত্র 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' অর্থাৎ আপেক্ষিকতার সূত্র এ সময় সকলের সামনে উত্থাপিত হয়। ৩০ জুন আলবার্ট যাবতীয় পেপার কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেন।

১৯০৬ : আলবার্ট বার্নে সুইস পেটেন্ট অফিসের পরীক্ষক ছিলেন।

১৯০৭ : আলবার্ট তার বিশেষ তত্ত্ব 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' এর সাথে আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়ক পরীক্ষণ শুরু করেন।

১৯১০ : আইনস্টাইনের আরেক পুত্র সন্তান এডওয়ার্ড এর জন্ম হয়।

১৯১১ : আলবার্ট জার্মান ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপকের চাকরি পান। এবছর আয়োজিত হয় প্রথম পদার্থবিজ্ঞান সম্মেলন। এটি অনুষ্ঠিত হয় ব্রাসেলস-এ। এ গুরুত্বপূর্ণ 'সলভেয় কনফারেন্স' এ আইনস্টাইন অংশগ্রহণ করেন।

১৯১২ : আইনস্টাইন 'দ্য ফেডারেল পলিটেকনিক'-এ (ETH) পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

১৯১৩ : আইনস্টাইন তার নতুন 'থিওরি অব গ্রাভিটি'-এর কাজ শুরু করেন।

১৯১৪ : এ সময় আইনস্টাইন বার্লিনের কায়সার উইলহেলম ইন্সটিটিউট -এর পরিচালক পদে যোগদান করেন এবং একই সাথে ইউনিভার্সিটি অব বার্লিন' এর পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৯১৫ : আইনস্টাইন তার 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' এর কাজ সম্পন্ন করেন।

১৯১৭ : আইনস্টাইনের ক্রিয়াশক্তি বেশ লোপ পায় এবং তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। আরোগ্য লাভের আশায় তিনি তার কাজিন এলসার কাছে চলে যান।

১৯১৯ : মে মাসের ২৯ তারিখে আলবার্ট এলসাকে বিয়ে করেন।

১৯২২ : এটা আইনস্টাইনের জীবনের অন্যতম সেরা বছর। তিনি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

১৯২৭ : তার কোয়ান্টাম মেকানিকস-এর উন্নয়নের কাজ শুরু হয় এবছর।

১৯৩২ : এ সময় একজন ইহুদি হিসেবে তিনি নাৎসি (জার্মানি) বাহিনীর আঘাত অনুভব করেন। বিষয়টি তার মনে বেশ দাগ কেটেছিল।

১৯৩৩ : আলবার্ট এবং এলসা আমেরিকায় চলে যান। এখানে তিনি 'দ্য ইন্সটিটিউট ফর এডভান্সড স্টাডি' তে যোগদান করেন।

১৯৩৬ : এলসা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৩৯ : শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ সময় আলবার্ট প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টকে একটি চিঠি লিখেন। এতে তিনি জার্মানির আণবিক বোমা সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন।

১৯৪০ : আলবার্ট আমেরিকান নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং সুইস নাগরিকত্ব বজায় রাখেন।

১৯৪৯ : আইনস্টাইনের প্রথমা স্ত্রী মেলিভা মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৫৫ : হার্টের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ১৬ এপ্রিল মহান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন মৃত্যুবরণ করেন।

নূসরাত রহমান

তবে সাধারণভাবে তত্ত্বটার মূলকথা হলো, আমরা আগে যে সমতল মহাবিশ্বের কল্পনা করতাম তা মোটেও সেরকম নয়। বরং সেটা বঙ্কিম। মহাবিশ্বে অবস্থিত বিভিন্ন তারকা বা নক্ষত্রের প্রবল মহাকর্ষ ক্রিয়ার ফলে স্পেস তার নিজের ওপর বেঁকে যায়। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটনের নেতৃত্বে একটি দল গেল ব্রাজিলের পূর্ব উপকূলে। অপর একটি দল তাবু ফেলল আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তে। ১৯১৯ সালে ঐ দুই স্থান থেকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখতে পাওয়ার কথা ছিল। আর ঐ অভিযাত্রীদের উদ্দেশ্য ছিল আইনস্টাইনের তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করা। আইনস্টাইন বলেছিলেন, সূর্যের প্রবল মহাকর্ষের কারণে স্পেস তার ওপর বেঁকে যাবে, ফলে সূর্যের পিছন বরাবর অবস্থিত যেসব তারকা থেকে আগত আলোক রশ্মিগুলো সূর্যের অভিমুখে আসবে, সেসব আলোক রশ্মির অভিমুখ বেঁকে যাবে। ফলে স্বাভাবিকভাবে যেসব তারকার অস্তিত্ব আমরা জানি না বা জানা থাকলেও তাদেরকে দেখতে পাই না, সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদ সূর্যের সব আলোকে আটকে দিলে সেসব তারকাগুলো আমরা দেখতে পাব।

১৯১৯ সালের ঐ পরীক্ষায় দেখা গেল যে, আলো বাঁকে। অর্থাৎ স্পেস মহাকর্ষের কারণে বেঁকে যায়। এটা ছিল আইনস্টাইনের এক ঐতিহাসিক বিজয়। এরপর থেকে আইনস্টাইনকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীতো বটেই, এমনকি মহাবিজ্ঞানী বলেও স্বীকৃতি দিলেন সকলে। এ ঘটনাই আইনস্টাইনের ১৯২১ সালের নোবেল বিজয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। অবশ্য আইনস্টাইন তার Theory of Relativity -এর জন্য নোবেল পাননি। তিনি পেয়েছিলেন আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে ধাতুর ফটো-তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য। ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে (ব্রাউনীয় গতি এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রকাশের আগে) এটা সম্বন্ধে 'Annalen Der Physic' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। ১৯৯০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (১৮৫৮-১৯৪৭) বলেন, আলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির প্যাকেট হিসেবে নির্গত হয়। এই ক্ষুদ্র প্যাকেটের তিনি নাম দিয়েছিলেন কোয়ান্টা (Quanta)। এটাকে আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলা হয়। এ কাজের জন্য প্ল্যাঙ্ক ১৯১৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আইনস্টাইন প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আরেকটু সম্প্রসারিত করে বললেন, আলো একটি নূন্যতম শক্তি সহযোগে কণার আকারে বিচ্ছিন্নভাবে নির্গত হয়। এই নূন্যতম শক্তি সম্পন্ন প্রবাহমান কণার নাম দিলেন ফোটন। কোনো কোনো ধাতুর ওপর আলো পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু ইলেক্ট্রন নির্গত হয়। একে বলা হয় আলোক তড়িৎ ক্রিয়া। আলোর তরঙ্গতত্ত্বের সাহায্যে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। ফলে আইনস্টাইন তার ফোটন তত্ত্বের সাহায্যে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তবে 'থিউরি অব রিলাটিভিটি' এর জন্য নোবেল পুরস্কার না পাওয়ার কারণটা হলো- আলফ্রেড নোবেল নিজেই তার উইলে লিখে গিয়েছিলেন যে, পুরস্কার অবশ্যই মানব কল্যাণমুখী আবিষ্কারের জন্য দিতে হবে। থিউরি অব রিলাটিভিটি এর প্রকৃত মানবকল্যাণমুখী প্রভাব তখনও বোধগম্য হচ্ছিল না বিধায় নোবেল কমিটি ফটো তড়িৎ ক্রিয়াকেই বেছে নেয়। কারণ এটার উল্লেখযোগ্য বাস্তব প্রয়োগ ছিল।

আইনস্টাইনের থিউরি অব রিলাটিভিটি বিশ্লেষণ করে ভর ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করেন। ১৯০৫ সালেরই নভেম্বরে আরেকটি গবেষণাপত্রে তিনি $E = mc^2$ সমীকরণটি প্রতিপাদন করে দেখিয়ে দেন যে, ভর এবং শক্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। সামান্য একটু ভর থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যেতে পারে। তখন অনেক বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এ সমীকরণের সত্যতার ব্যাপারে সন্দিহান থাকলেও ১৯৩৮ সালে অটোহ্যান এবং স্ট্রেসম্যান পরমাণু বিভাজন করে দেখতে পান যে, আইনস্টাইনের সমীকরণটি সঠিক। তারপর থেকেই পারমাণবিক যুগের সূত্রপাত হলো। এই পারমাণবিক শক্তি একদিকে যেমন আশার সঞ্চার করল, অন্যদিকে যথেষ্ট আতঙ্কেরও কারণ হয়ে দাঁড়াল। আইনস্টাইন নিজেও পারমাণবিক শক্তির অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কেননা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে তিনি পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহতার কথা জানিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

১৯১৬ সালের General Theory of Relativity এর একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল ছিল মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু আইনস্টাইন স্থির মহাবিশ্ব সম্পর্কে এত বেশি নিশ্চিত এবং আশাবাদী ছিলেন যে, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বন্ধ করার জন্য তিনি তার সমীকরণে একটি ধ্রুবক যোগ করেন। এটাকে বলা হয়, মহাবিশ্বতাত্ত্বিক ধ্রুবক। কিন্তু ১৯২৯ সালে এডুইন হাবল নামক একজন মার্কিন জ্যোতির্বিদ ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির একটি মান মন্দিরে মহাবিশ্বের বিভিন্ন তারকার উজ্জ্বলতা পর্যবেক্ষণকালে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেন। তিনি লক্ষ করেন যে, দূরবর্তী তারকাগুলো হতে আগত আলোকরশ্মিগুলো হতে লাল রশ্মিগুলো অপসারিত (Red Shift) হচ্ছে। অর্থাৎ সেগুলো বর্ণালীর লাল প্রান্তের দিকে সরে যাচ্ছে। বিষয়টাকে ডপলার ইফেক্ট এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। অস্ট্রেলিয়ান পদার্থবিদ জোহান ক্রিশ্চিয়ান ডপলার ১৮৪২ সালে এটা আবিষ্কার করেন। কোনো অ্যাম্বুলেন্স যখন আমাদের নিকট অগ্রসর হয় তখন অ্যাম্বুলেন্স থেকে নির্গত শব্দের কম্পাঙ্ক বেড়ে যায় ফলে আমাদের কাছে শব্দটা তীব্রতর হচ্ছে বলে মনে হয়। অ্যাম্বুলেন্সটা দূরে সরে যাওয়ার সময় ঠিক তার বিপরীত ঘটনা ঘটে। আলোর ক্ষেত্রেও

আইনস্টাইন হাউজ

ব্যাপারটা প্রযোজ্য। যখন উৎস হতে নির্গত আলোর কম্পাঙ্ক বেড়ে যাবে, তখন আমরা দেখব যে তা ক্রমাগত বেগুনি বা নীল হয়ে যাচ্ছে। কেননা দৃশ্যমান আলোর বেগুনি বর্ণের কম্পাঙ্ক সবচেয়ে বেশি। আবার উৎস হতে নির্গত আলোর বর্ণ ধীরে ধীরে লাল হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যাচ্ছে, তথা কম্পাঙ্ক হ্রাস পাচ্ছে। কেননা লাল আলোর কম্পাঙ্ক সবচেয়ে কম। সুতরাং হাবলের ঐ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারকাটা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের এই মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। অতএব, ১৯১৬ সালে আইনস্টাইন তার General Theory of Relativity—তে যে ধ্রুবক পদটা যোগ করেন সেটা ভুল ছিল, বরং তিনি আগেই সঠিক ছিলেন। এ ঘটনার পর অবশ্য আইনস্টাইনের মন্তব্য হলো, "ঐ Cosmological Constant-ই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।"

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। একটা হলো Theory of Relativity এবং অন্যটা হলো Quantum Mechanics। এই Quantum Mechanics এর উদ্ভাবক হলেন জার্মান পদার্থবিদ ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ (১৯০১-১৯৬১)। তবে এর বিকাশ ও উন্নয়নে শ্রোয়েডিংগার (১৮৮৭-১৯৬১) এবং ডিরাকেও (১৯০২-১৯৮৪) এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। এই Quantum Mechanics এরও ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিলেন আইনস্টাইন সেই ১৯০৫ সালে, যখন তিনি কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে আলোর ধর্মাবলী ব্যাখা করেন। কিন্তু Quantum Mechanics কে আইনস্টাইন কখনও পুরোপুরি মেনে নেননি। এর কারণ হলো, আইনস্টাইন Quantum Mechanics এর অনিশ্চয়তার নীতিটা বিশ্বাস করতেন না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান আজ যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তা শুধু একজন মানুষের কাজের ওপর ভিত্তি করে। আর তিনি

আইনস্টাইনের প্রথম স্ত্রী

হলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নে অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অবদান আছে সত্যি, কিন্তু তাদের শেকড় গাঁথা রয়েছে আইনস্টাইনের কাজের মধ্যে। যেমন- ২০০৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় যে তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানীকে , তাদের কাজ ছিল– মৌলিক কণিকাগুলো যেসব (Quark) কর্ক দিয়ে গঠিত তাদের ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান, যার ফলে প্রকৃতির মৌলিক তিনটি বল– মহাকর্ষীয় বল (Gravitational Force), তাড়িৎচৌম্বক বল (Electromagnetic Force) এবং নিউক্লীয় বল (Nuclear Force)-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা বোঝা যায়। ১৯৭৯ সালে পাকিস্তানী পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুস সালাম (১৯২৬-১৯৯৬) পদার্থে নোবেল পেয়েছিলেন। কারণ তিনি দুর্বল নিউক্লিয় বল (Weak Nuclear Force)-কে তাড়িৎ চৌম্বক বলের সাথে একীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্যি বলতে কী, বর্তমানে পৃথিবীর বেশির ভাগ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীর লক্ষ্য হলো, প্রকৃতির মৌলিক বল তিনটাকে একত্র করে একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করা। কেম্ব্রিজের পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং যার নাম দিয়েছেন 'মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব' বা 'Grand Untified Theory'; কেউ কেউ বলে থাকেন 'Unified Field Theory' বা 'theory of Every Thing'। যত নামেই আমরা এটাকে প্রকাশ করি না কেন, এসব চিন্তাধারার জনক হচ্ছেন আইনস্টাইন। জীবনের শেষ দশটা বছর আইনস্টাইন চেষ্টা করেছেন এমন একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করতে যা প্রকৃতির মৌলিক বল তিনটাকে সমন্বয় করতে পারবে। তবে তিনি সফল হতে পারেননি। এর পিছনে দুটো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। প্রথমত, সে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা-নাগাসাকির ওপর আমেরিকার পারমাণবিক হামলা আইনস্টাইনকে প্রচণ্ড আঘাত করে, যার ফলে তিনি মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েন। দ্বিতীয়ত, পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব। তখনকার সময়ে নিউক্লিয় বল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি বলে তথ্যের অভাবে আইনস্টাইন এগুতে পারেননি।

তাই পদার্থবিজ্ঞানের যে কোনো শাখার কথা আলোচনা করতে গেলে নিউটনের সাথে সাথে আইনস্টাইনের নামটাও আপনা-আপনি চলে আসে। আইনস্টাইন শুধু একজন পদার্থবিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে একজন দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি। আইনস্টাইনের চিন্তা-চেতনায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশটা বেশ প্রকট। আর সঙ্গীতে তার হাতেখড়ি হয় মাত্র ছয় বছর বয়সে। মোজার্ট, বিটোভেন প্রভৃতি সঙ্গীত মহারথীদের নানা সুর তিনি চমৎকারভাবে বেহালায় ফুটিয়ে তুলতেন। আর তার শান্তিপ্রিয়তার কথাতো আজ ইতিহাস হয়ে আছে। যুদ্ধ-বিগ্রহকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। এমনকি রাসেলের সাথে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তার এই শান্তিপ্রিয় মনোভাব এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি যুদ্ধ হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ উদ্যোগে ১৯৩০ সালে জার্মানিতে গিয়ে আইনস্টাইনের সাথে দেখা করেন। এসব সত্ত্বেও আইনস্টাইন কিন্তু মনেপ্রাণে ভালোবেসে গেছেন পদার্থবিজ্ঞানকে। আইনস্টাইন নিজে ইহুদি ছিলেন, আর সেজন্য জার্মানিতে তৎকালীন ইহুদিদের ওপর খ্রিস্ট্রানদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তিনি ইহুদীদের একটা স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রস্তাব করেন। তার এই স্বপ্ন পূরণ হলে পরে ইসরাইল থেকে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ইসরাইলের প্রথম প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করার জন্য। কিন্তু তিনি সরাসরি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "রাজনীতি শুধু বর্তমানের জন্য, কিন্তু সমীকরণ চিরকালের জন্য।" বিজ্ঞানের প্রতি কতটা ভালোবাসা থাকলে একজন মানুষ এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন!

১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় এলে আইনস্টাইন পালিয়ে আমেরিকা চলে যান। সেখানে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন এবং জীবনের বাকি দিনগুলো এখানেই কাটান। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সুনাম যখন হুড়মুড় করে তার জীবনে ঢুকে পড়েছে, তখনও তিনি ছিলেন অবিচল, নিস্পৃহ। ক্ষণিকের জন্যও সামান্য অহঙ্কার বোধ বা আত্মম্ভরিতা তার মধ্যে খুঁজে পায়নি কেউ। এতবড় একজন বিজ্ঞানী, অথচ তার সারল্য ছিল শিশুদের মতো। আর তাই তো বিশ্বের সবাই আইনস্টাইনের ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত করে। টাইম ম্যাগাজিনের নির্বাচনে তিনি হয়েছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্টতম ব্যক্তিত্ব এবং পেয়েছেন Person of The Century উপাধি।

কিংবদন্তীতুল্য মেধা ছিল আইনস্টাইনের; অথচ ছিল না বিজ্ঞানে কোনো উচ্চ ডিগ্রি, এমনকি কোনো দীর্ঘ পারিবারিক ঐতিহ্য। শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় মেধাকে তিনি তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন এমন এক পর্যায়ে, সেখানে পৌছানো একপ্রকার অসম্ভব বলেই মনে হবে আমাদের কাছে। বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বিজ্ঞানী কে? আইনস্টাইন নাকি নিউটন -এ নিয়ে পৃথিবীতে বেশ দ্বন্দ্ব-তর্ক-বিতর্ক হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তবে কিছু কিছু দিক থেকে নিউটন আইনস্টাইনের চেয়ে একটু এগিয়ে। যেমন- তাত্ত্বিক বা গাণিতিক জ্ঞানের সাথে সাথে পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানেও (Experimental Physics) নিউটন ছিলেন সমান দক্ষ। কিন্তু সেই তুলনায় আইনস্টাইন ল্যাবরেটরিতে খুব বেশি সময় দেননি, যতটা দিয়েছেন খাতা আর কলমের পিছনে। তবে আইনস্টাইনের সময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা যতটা ছিল, নিউটনের সময় তা ছিল না এবং ইহুদি হওয়ার কারণে আইনস্টাইনকে আত্মরক্ষার জন্য এদেশ ওদেশ করতে হয়েছিল, কিন্তু নিউটনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো সমস্যা ছিল না। আবার নিউটন ছিলেন চিরকুমার, কিন্তু আইনস্টাইন ঘর-সংসার করেছেন। আসলে প্রত্যেক মহান ব্যক্তিই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। কারও সাথে কারও এভাবে তুলনা করাটা ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। আইনস্টাইন নিজেও নিউটনের ব্যাপারে ছিলেন নিঃসংশয়। একবার এক সাংবাদিক এক সাক্ষাৎকারে আইনস্টাইনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কে?" আইনস্টাইন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, "আইজ্যাক নিউটন।"

জীবনের শেষদিকে এসে পদার্থবিজ্ঞানকে ঐক্যবদ্ধ করার যে অসাধারণ একটা স্বপ্ন আইনস্টাইন দেখতেন, তা এখনও পূরণ হয়নি। তবে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। দুর্বল নিউক্লীয় বল এবং তড়িতচৌম্বক বলকে একীভূত করা সম্ভব হয়েছে, আর সবল নিউক্লিয় বলকে তাদের সাথে একীভূত করার প্রচেষ্টাও অনেকদূর এগিয়েছে। এখন বাকি থাকছে শুধু মহাকর্ষীয় বলকে এদের সাথে একীভূত করা। এটা সম্ভব হলেই মহান আইনস্টাইনের সেই মহান স্বপ্নটা পূরণ হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা যেভাবে এগুচ্ছে, তাতে একটা চূড়ান্ত তত্ত্ব পেতে খুব বেশি আর দেরি হবে না বোধহয়। পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত হাতে আছে, উন্নত প্রযুক্তি আমাদের আয়ত্তে আছে, আর আইনস্টাইনের মতো একজন মহান আদর্শ যখন সামনে আছে, তবে কেন দেরি হবে?

তথ্যসূত্র :

1. Evolution of Physics- by Albert Einstein & leopold Infeld, 2. Special and General Theory of Relativity - by Albert Einstein, 3. A Brief History of Time - by Stephen Hawking, 4. The Nature of Space and Time - by Stephen Hawking & Roger Penrose, 5. Ideals & Reality - by Prof. Abdus Slalm., 6. আইনস্টাইনের জীবনী গ্রন্থ, 7. Website.

আইনস্টাইনের সঙ্গীরা

গৌতম রায়

ধপধপে সাদা চুলের বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই কারো। তাই মৃত্যুর এত বছর পরও আইনস্টাইন তাই রীতিমতো তারকা। তাকে নিয়ে মানুষের এই আগ্রহ যে কেবল তার বৈজ্ঞানিক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়; তার ব্যক্তি জীবন নিয়েও আগ্রহ আছে অনেকের। কীভাবে তিনি এত প্রতিভাবান হয়ে উঠলেন, তার সফলতার পিছনে কারা তাকে শক্তি-অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, নিত্যনতুন গবেষণার পিছনে তার সহকর্মী হিসেবে কে কে অবদান রেখেছেন, কাদের তিনি ভালোবেসেছিলেন, কার কার ভালোবাসা তিনি পেয়েছিলেন ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে আইনস্টাইনের জীবনী লেখা হয়েছে অনেক। সাধারণ মানুষের চোখে এই অতিমানব ব্যক্তিটিও যে আশেপাশের আর দশটি মানুষের মতোই আবেগী, সাধারণ, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করতেন, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে ঐসব জীবনীতে। তবে সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে আইনস্টাইনের জীবনে আসা নারীদের কথাও। বিশেষভাবে মেলিভা ও এলশার কথা জানা গেছে বিস্তারিত। ব্যক্তি মানুষ ও চারপাশের জগৎ নিয়ে আবিষ্কারে মেতে ওঠা আইনস্টাইনের জীবন খুবই ঘটনাবহুল। তার এই ঘটনাবহুল জীবন সম্পর্কে না জেনে কেবল বিজ্ঞানী হিসেবেই জানলে তার সম্পর্কে পুরোপুরি জানা হবে না। তাকে জানতে, বুঝতে হলে তারে সম্পর্কে পুরোপুরি জানাটা খুবই জরুরি। সেই সাথে জানা দরকার তার সঙ্গীদের, যারা সহায়তা করেছেন আইনস্টাইনকে এ অবস্থানে আসতে।

আইনস্টাইনের প্রথম প্রেম

শেষপর্যন্ত আইনস্টাইনকে স্কুলে ভর্তি হতেই হলো। তবে এ স্কুলের পরিবেশ মিউনিখের চেয়ে অনেক উন্নত। ১৮৯৫ সালের ২৬ অক্টোবর সুইজারল্যান্ডের আরাউয়ের একটি টেকনিক্যাল স্কুলের থার্ড ইয়ারে ভর্তি হয়ে আইনস্টাইন পড়ালেখায় মনযোগ দিলেন। কিন্তু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি ;ানতে পারছেন না কিছুতেই। একা একা কী করে থাকবেন তিনি?

আইনস্টাইন থাকেন স্কুলেরই প্রফেসর জর্জ উইন্টেলারের বাড়িতে, অনেকটা আমাদের দেশের লজিং সিস্টেমের মতো।

বিশাল এই বাড়িতে একা একা কতক্ষণ থাকবেন তিনি? স্কুলের সময়টা বাদ দিয়ে বাকি সময় তো তার করার কিছুই নেই। মাঝে মাঝে বেহালা নিয়ে বসেন। অন্য কারোর সমস্যা হবে ভেবে দরজা ভেজিয়ে আনমনে সুর তুলতে থাকেন বেহালায়। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় কিন্তু হুঁশ হয় না আইনস্টাইনের। তাই তিনি জানেনও না, বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ তার বাজানো বেহালা শুনছে কিনা।

প্রফেসর জস্ট উইন্টেলারের তিন কন্যা- রোজা, অ্যানা ও মেরি। মেরি সর্বকনিষ্ঠ। বয়সে আইনস্টাইনের দু'বছরের বড়। দারুণ মনযোগ পিয়ানো বাজানোতে। কিন্তু দুঃখ একটাই– এখন পর্যন্ত তার পিয়ানো শোনার সমঝদার শ্রোতা পাওয়া গেল না। একসময় বুঝতে পারলেন, আইনস্টাইনই বোধহয় বুঝতে পারবে তার সুর। এরই সূত্র ধরে পরিচয় এবং একসময় বেজে উঠলো আইনস্টাইন-মেরির যুগল পিয়ানো-বেহালার সুর। বাইরের সুরটা সবাই শুনতে পেলেও ভিতরের সুরটা বাজতে থাকে তাদের নিজেদের মধ্যেই।

কিন্তু চাকরি নিয়ে মেরি ওলসবার্গ চলে যাওয়ার পর নিঃসঙ্গ আইনস্টাইন আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। এর মধ্যে এমন একটি কাজ করে বসেন তিনি যার ব্যাখ্যা কাউকেই কোনোদিন দেননি। জুরিখে পড়াশুনায় এরই মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই মেরির চিঠি আসে। কিন্তু উত্তর দিতে যেন আইনস্টাইনের প্রবল অনীহা। অবশেষে না পেরে একটি চিঠি লিখলেন, যার শেষ প্যারায় ছিল 'আমি তোমার সাথে আর কোনো যোগাযোগ রাখতে চাই না'। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মেরি জানতে পারেননি কেন তাকে আইনস্টাইন এভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।

ক্লাসের একমাত্র মেয়ে

প্রথমবার পরীক্ষা দিয়ে সাধারণ জ্ঞানে বিশ্রি রেজাল্ট করার পর দ্বিতীয়বার ঠিকই ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ভর্তি হলেন আইনস্টাইন। যেখানে পড়াশুনা করা তার স্বপ্ন ছিল, সেখানে ভর্তি হতে

এলশা ও আইনস্টাইন

মিলেভা ও আইনস্টাইন

পেরে তিনি যেন গোগ্রাসে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকলেন। অন্য কোনোদিকে মন নেই তার। কেবল একটা দিক ছাড়া।
কাঠখোট্টা শব্দটির অর্থ ভালো করেই জানেন আইনস্টাইন। কিন্তু মিলেভা মেরিককে দেখে তার মনে হলো, ডিকশনারির এ শব্দটির অর্থ বদলানো উচিত। মেয়েটি কী পড়াশুনার বাইরে আর কিছুই জানে না?
মিলেভা মেরিককে কেউ সুন্দরী বলবেই না। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। তার দিকে নজরও নেই ক্লাসের অন্য কারো। আইনস্টাইন একদিন মেরির সাথে তুলনা করে দেখলেন শারীরিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে মেরিকে ১০০ নম্বর দিলে মিলেভা পাবে ১০। তারপরও কেন যেন তিনি মেয়েটির প্রতি দুর্বলতা বোধ করছেন। একসময় উপলব্ধি করলেন, পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে মেরিকের সাথে ক্লাসের কেউ পাল্লা দিতে পারবে না। মেরিককে ভালো লাগার কারণ কী এটাই!

মিলেভা মেরিকের কথা

মেয়ে হিসেবে মিলেভাকে যে অনেক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে, তা ভালো করেই জানেন মিলেভা। এই ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার সময়ই সেটি ভালো করে পুনরায় টের পেয়েছেন তিনি। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে ভালো রেজাল্ট করার পরও তাকে ভর্তি হওয়ার জন্য বিশেষ অনুমতি নিতে হয়েছে। তাও ভালো, তার বাবা মিলোস মেরিক একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। তা না হলে মিলেভাকে হয়তো সারাজীবন পড়ালেখা করতে না পারার দুঃখ বইতে হতো।

মিলেভা জানেন, এই স্কুলে খুব কম মেয়েই পড়তে আসে। তার ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত মাত্র চারজন মেয়ে এখানে পড়েছে, তিনি পঞ্চম। তিনি এটাও জানেন, ছেলেদের দৃষ্টি এড়িয়ে ভালো রেজাল্ট করতে পারলে তার সব চাওয়া পূরণ হবে। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত তার আগ্রহের বিষয়, বিধায় এর সাথেই কাটিয়ে দিতে পারবেন সারাটা জীবন। বিয়ে না করলেও তার চলবে। কোনো সাথি না হলেও তার চলবে। তাই পারতপক্ষে মিলেভা কারো দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেন না।
মাঝে মাঝে একা একা লাইব্রেরিতে বসে মিলেভা ভাবেন তার পূর্ববর্তী দিনগুলোর কথা। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে ভর্তি হয়েছিলেন জুরিখ ইউনিভার্সিটির মেডিকেল স্কুলে। কনজেনিটাল হিপ ডিফরমিটির কারণে তাকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয় এবং ক্লাসের ছেলেরা সব যেন এটা নিয়েই মেতে উঠলো। ক্লাসে সে একমাত্র মেয়ে। একা কী আর সে করতে পারে!
সব অত্যাচার সহ্য করেও মিলেভা মেডিকেলের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অ্যানাটমির ক্লাসে যখন ছাত্রদের সাথে শিক্ষকরাও নারী শরীর নিয়ে নোংরা আলোচনায় মেতে উঠলো, তখন আর ধৈর্য ধরতে পারেননি মিলেভা। মেডিকেল ছেড়ে চলে আসলেন এই পলিটেকনিকে। প্রতিজ্ঞা করলেন, ছাত্র তো নয়ই, পারতপক্ষে কোনো শিক্ষকের সাথেই তিনি কথা বলবেন না। কিন্তু আইনস্টাইন নামের ওই ঝাঁকড়া চুলের ছেলেটার সাথে কী তিনি কথা না বলে থাকতে পারবেন? ছেলেটা যে পদার্থবিজ্ঞান এবং অংকে ভালো। ভদ্রও তো বেশ। তাকে কতদিন ঠেকিয়ে রাখবেন?

একসাথে মিলেভা-আইনস্টাইন

প্রথম বর্ষে খুবই ভালো রেজাল্ট করলেন মিলেভা। তাই দ্বিতীয় বর্ষে একটি কোর্সে চান্স পেয়ে হাইডেলবার্গ পড়তে চলে যান তিনি। চিঠিপত্রে যোগাযোগ চললো আইনস্টাইনের সাথে। চিঠির মূল ভাষাবিজ্ঞানের ওপর হলেও ফাঁকে ফাঁকে হৃদয়ের ভাষাও সেখানে স্থান পেতে শুরু করে। প্রথমদিকে নিজেকে সংবরণ করলেও শেষপর্যন্ত আর পারেননি মিলেভা। অচিরেই আইনস্টাইনের কাছে মিলেভা হয়ে উঠলেন 'ডলি', আর তার কাছে আইনস্টাইন 'জনি'।
কিন্তু সব শুভ্র মাঝেই বোধহয় ছোট ছোট অশুভ থেকে যায়। আইনস্টাইন-মিলেভার সম্পর্কেও ছোট ছোট অশুভ দানা বাধতে থাকে। মিলেভাকে না দেখেই আইনস্টাইনের মা মেয়েটির খুঁত ধরতে থাকেন। বাবা কিছু বলেন না। ছোট বোন মায়া দাদার পক্ষে থাকলেও মায়ের বিরুদ্ধে সে কী করে কথা বলে? অন্যদিকে মিলেভাও দেখলেন আইনস্টাইন কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। বিয়ের আগেই তাকে বউয়ের মতো হুকুম দেয়া শুরু করেছেন। রান্নাবান্না তো তাকে করতেই হয়, ইদানিং আইনস্টাইন তার কাপড় কাচতেও বলছেন। কিন্তু পড়ালেখা বাদ দিয়ে এগুলো করবেন কখন? আর আইনস্টাইন কী তাকে শুধু ঘরের বউ করে রাখতে চান?
ফলে যা হওয়ার তাই হলো। রেজাল্ট খারাপ হলো দুজনেরই। আইনস্টাইনের যত্ন নিতে নিতেই মিলেভার সময় শেষ, তারপর পড়ালেখার কোনো সময় থাকে না। তারপরও ছয় পয়েন্টের মধ্যে তিনি চার পেলেন। অন্যদিকে আইনস্টাইন পেলেন ৪.৯। শিক্ষকরা সেটাকেই ৫ ধরে তাকে উত্তীর্ণ করে দিলেন। স্কুলের নিয়মানুযায়ী ৫ না পেলে পাশ করা যায় না। আইনস্টাইনের এই রেজাল্টে কেউ বিস্মিত হননি। কিন্তু মিলেভা কী করলেন? যে মেয়ে আইনস্টাইনের সাথে পরিচিত হওয়ার আগে সর্বোচ্চ ৫.৫ পেয়ে প্রথম হয়েছিলেন, তিনিই কিনা পাশই করতে পারলেন না!

আইনস্টাইন বিয়ে করতে চান মিলেভাকে। কিন্তু মিলেভার ইদানিং কেমন যেন সন্দেহ হওয়া শুরু করেছে। আইনস্টাইনের কাপড় সে কেচে দেননি বলে মেরিকে সব কাপড় পোস্ট করে দেন। যদিও আইনস্টাইন মিলেভাকে মেরি সম্পর্কে কিছুই বলেননি, কিন্তু তার একটি সন্দেহ দানা বাধতে শুরু করে।
এদিকে মিলেভার বাবা জানেন, তার মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে আসবে না। মেয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, সেটা যত না বড় দোষ; তার চেয়ে বড় দোষ মেয়ে অনেক লেখাপড়া জানে। এরকম বিদুষী মেয়েকে কে বিয়ে করতে চায়? আইনস্টাইনের মাও তো এই লেখাপড়া জানা মেয়েকে ছেলের বউ করতে রাজি নন।

চারদিকে প্রকাণ্ড সব বাধা, অসহায় মিলেভা

চাকরি খুঁজছেন আইনস্টাইন। পাচ্ছেন না। এদিকে মিলেভা একটি ল্যাবরেটরিতে অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ নিয়েছেন। পাশাপাশি পরীক্ষারও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চাকরি খুঁজতে মিলানে গেছেন আইনস্টাইন। কিন্তু ছুটিতে ফিরে আসেন মিলেভার কাছে। ফলে পরীক্ষার প্রস্তুতি সত্যিকার অর্থে ভালোভাবে নিতে পারছেন না মিলেভা। এরমধ্যে আইনস্টাইন আর মিলেভা মিলে কোমো হ্রদে গেলেন। আনন্দফুর্তিতে কাটিয়ে আসলেন বেশ কয়েকটি দিন। পরীক্ষা বাদ দিয়ে হ্রদের স্বচ্ছ জলে সারাদিন নৌকায় ঘুরে বেড়ালেন, রাতে নাচলেন, মজা করলেন।
পরীক্ষার মাত্র কয়েকদিন বাকি। ইতোমধ্যে বাবার বকুনি খেয়ে কিছুটা হুঁশও হয়েছে তার। পূর্ণ উদ্যমে চলছে পড়ালেখা। ঠিক এমনি সময় টের পেলেন তিনি সন্তানসম্ভবা। তাড়াতাড়ি করে চিঠি লিখলেন আইনস্টাইনকে। কিন্তু কোনো উত্তর নেই। ইউরোপে তখন কুমারী মাতাকে অস্পৃশ্য মনে করা হতো। বার কয়েক চিঠি দেয়ার পরও আইনস্টাইনের কোনো উত্তর নেই। এমনকি এ খবর শোনার পর দেখাও করেননি মিলেভার সাথে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া মিলেভা এবারও পাস করতে পারলেন না।
এদিকে ১৯০১ সালের ডিসেম্বরে সুইস পেটেন্ট অফিসে কেরানির কাজ নিলেন আইনস্টাইন। ১৯০২ সালের জানুয়ারিতে জন্ম নিল তার প্রথম সন্তান লিজারেল। আইনস্টাইন কখনও তার এই মেয়েকে দেখতে যাননি। পরবর্তীতে কী হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো খোঁজখবরও নেননি।

বিয়ে...

চাকরি পাওয়ার প্রায় এক বছর পর আইনস্টাইন বিয়ে করলেন মিলেভাকে, কিন্তু মেয়ের স্বীকৃতি দেননি। লিজারেল বড় হতে থাকে মিলেভার মার কাছে। এরই মধ্যে চাকরিতে উন্নতি হয় আইনস্টাইনের। দম্পতি হিসেবে তাদের প্রথম সন্তান হ্যান্স আইনস্টাইনের জন্ম হয় পরবর্তী বছরেই। এরই মধ্যে নোবেল পুরস্কার পান মিলেভার আদর্শ শিক্ষক মেরি কুরি। সপ্তাহের ছয়টি দিনই আইনস্টাইন ব্যস্ত থাকেন তার গবেষণায়। ১৯০৫ সালে চারটি পেপার প্রকাশিত হয় তার এবং এই পেপারগুলোই পরবর্তী সময়ে পৃথিবীকে বদলে দেয়। দ্রুত বিখ্যাত হয়ে যান আইনস্টাইন।

বিখ্যাত হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই ইউনিভার্সিটি অব জুরিখ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। ১৯০৮ সালে যোগ দেন লেকচারার পদে। পরের বছরই প্রফেসর।

এদিকে হঠাৎ করে আসা এত সাফল্যের মাঝখানে আইনস্টাইন মিলেভাকে সময় দেয়া একদমই কমিয়ে দিলেন। সংসারে শুরু হলো অশান্তি। মিলেভাও হঠাৎ করেই জানতে পারলেন এনেলি মেয়ার নামে আরেকজনের সাথে আইনস্টাইনের প্রেম চলছে। মিলেভা এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলেও আইনস্টাইন উত্তর দেন না রেগে যান। মিলেভা কড়া চিঠি দিলেন এনেলির পিতার কাছে। সংসারের অশান্তি যখন চরমে, তখনই জন্ম নেয় আইনস্টাইনের দ্বিতীয় সন্তান এডওয়ার্ড। এদিকে এনেলির গর্ভে জন্ম হয় কন্যা এরিকার।

এলশা অধ্যায় শুরু এবং...

পরের বছর আইনস্টাইন যোগ দেন ইউনিভার্সিটি অব প্রাগে। পরিচয় হলো সুন্দরী বিধবা এলশার সাথে। আইনস্টাইন যেন হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন এলশা মিলেভার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। মিলেভার নিষেধ সত্ত্বেও একমাত্র এলশার আকর্ষণে জুরিখে এক বছর শিক্ষকতা করে ইউনিভার্সিটি অব বার্লিনে ১৯১৪ সালে চলে এলেন আইনস্টাইন।

বেশ কয়েক বছর কাটলো এভাবেই। মিলেভার দিকে আইনস্টাইনের নজর নেই। এলশাই এখন তার সব। এদিকে শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের কথা চিন্তা করে মিলেভাসহ সন্তানদের পাঠিয়ে দিলেন জুরিখে। নিজে রয়ে গেলেন বার্লিনেই। এদিকে জুরিখ থেকে বারবার মিলেভা চিঠি দিয়ে জানালেও আইনস্টাইনের সময় নেই তাদের দেখতে যাওয়ার। এক পর্যায়ে ডিভোর্স চাইলেন মিলেভার কাছে। মিলেভা তখন হাসপাতালে। আইনস্টাইন ভাবলেন অসুস্থতার ভান করে মিলেভা চাইছে তাকে জুরিখে নিয়ে যেতে।

এদিকে মিলেভা ভাবছেন ডিভোর্স হলে কীভাবে তিনি সন্তানদের মানুষ করবেন। আইনস্টাইনের তখন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। তার আগেই ডিভোর্সে রাজি হলেন তিনি। বললেন, নোবেল পুরস্কারের টাকা তাকে দিলে তিনি ডিভোর্সে রাজি আছেন। খুব দ্রুতই রাজি হলেন আইনস্টাইন।

বিয়ের জন্য তৈরি হচ্ছেন আইনস্টাইন ও এলশা। ঠিক তখুনি এলশার মেয়ে আইলসকে ভালো লেগে গেল তার। আইলসেরও ভালো লাগে তাকে। যদিও তার একজন বয়ফ্রেন্ড আছে। কিন্তু মা-মেয়ের কাকে বিয়ে করবেন, সেটা তিনি ঠিক করতে পারলেন না। তাই দুজনকে ডেকে একদিন তাদেরকেই ঠিক করতে বললেন কে আইনস্টাইনকে বিয়ে করতে চায়। যে ঠিক হবে তাকেই বিয়ে করবেন আইনস্টাইন। এলশার মনে হলো জীবনে এর চেয়ে বড় অপমান তাকে আর কেউ করেনি। আইলস জানতো না তার মা আইনস্টাইনকে পছন্দ করেন। সবকিছু জানার পর আইলস নিজে থেকেই সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে ১৯১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনস ডেতে মিলেভাকে ডিভোর্স দিলেন তিনি। এর ঠিক চার মাস পর বিয়ে করলেন এলশাকে।

নোবেল পুরস্কার

বিয়ে করলেও আইনস্টাইনকে বিশ্বাস করেন না এলশা। এর মধ্যেই ১৯২২ সালে ঘোষণা দেয়া হলো ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আইনস্টাইন। পুরস্কারের এক লাখ একুশ হাজার পাঁচশ বাহাত্তর সুইডিশ ক্রোনার দিয়ে দিলেন মিলেভাকে।

পুরস্কার পাওয়ার পর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বক্তৃতা দিতে লাগলেন আইনস্টাইন। সাথে থাকেন তার সেক্রেটারি বন্ধু হ্যান্স বুশামের ভাগ্নি নিউম্যান। এলশা বুঝতে পারলেন সবই। হাল ছেড়ে দিলেন তিনি। এদিকে সম্পর্ক হয়ে গেছে মার্গারেট লেনবাখ নামের এক অস্ট্রিয়ান মহিলার সাথে। তারপর আসলেন টনি মেন্ডেল।

সারাদিন বক্তৃতা দিতে দিতে ক্লান্ত আইনস্টাইন একদিন হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তারের পরামর্শে একদম বেডরেস্টে থাকতে হলো তাকে। তার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন হেলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই হেলেনই তার কাছে ছিলেন। এমনকি হেলেনকে না জানিয়ে আইনস্টাইনের সাথে কেউ দেখাও করতে পারতেন না। কিন্তু শেষপর্যন্ত আইনস্টাইন থাকতে পারলেন না জার্মানিতে। ইহুদিবিদ্বেষী সরকারের পদক্ষেপে ১৯৩৩ সালে জার্মানি ছাড়েন আইনস্টাইন।

এদিকে ১৯৩৬ সালে মারা যান এলশা। ১৯৪৮ সালে মারা যান মিলেভা। ১৯৫৭ সালে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে মারা যান মেরি। আইনস্টাইন মারা যান ১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল। কিন্তু হেলেন যাতে স্বস্তিকর জীবনযাপন করতে পারেন, সেজন্য রেখে যান প্রচুর টাকা। বাকি টাকা দিয়ে যান সন্তানদের।

আইনস্টাইনের এই ব্যক্তিগত জীবন বিশেষ করে নারী সাথিদের নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে পশ্চিমা সমাজে। কারো মতে, আইনস্টাইন সত্যিকার অর্থে কারো সাথে প্রেম করেননি, কাউকে ভালোবাসেননি। কাউকে তিনি ভালোবাসতেই জানেন না এমন মতও দিয়েছেন অনেকে। আবার অন্য অনেকের মতে, আইনস্টাইন একের পর এক সম্পর্কে জড়িয়েছেন। কারণ কারো ওপর তিনি নির্ভর করতে পারছিলেন না। তিনি চাইতেন সবাই তার প্রতি প্রচুর যত্ন নিক, মনযোগ দিক। শেষদিকে হেলেনের মধ্যে সেটা পেয়ে তিনি আর কোনো নারীর কাছে যাননি। যদিও হেলেনকে তিনি বিয়ে করেননি, কিন্তু হেলেনই ছিলেন তার সব।

তবে এলশা ও তার কন্যা আইলসকে বিয়ে করা নিয়ে অনেকেই আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। আইনস্টাইন সে সময় মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন– এমনও বলেছেন অনেকে। যদিও তাদের এসব কথার পক্ষে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই।

কিন্তু এত বিতর্কের মধ্যে সবাই একটি বিষয়ে একমত যে, যারাই আইনস্টাইনের জীবনে এসেছেন, তারা সবাই চেয়েছেন আইনস্টাইন অনেক বড় হোক। যেজন্য সবাই তার প্রতি প্রচুর মনযোগী ছিলেন। তবে মিলেভা মেরিক যদি আইনস্টাইনের সারাজীবনের সাথি হতেন, তাহলে হয়তো তিনি আরও কিছু দিতে পারতেন পৃথিবীকে। অন্যদিকে মিলেভা মেরিকের মতো প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর কাছ থেকেও হয়তো পৃথিবী কিছু না কিছু উপহার পেত। কী হতো আর কী হতো না, তা বলে শেষ করা যাবে না। তবে এই কাহিনীগুলো আইনস্টাইনের জীবনে ঘটেছিল; এটাই সত্যি। আইনস্টাইনের এমন মৃত্যু কেউই আশা করেননি। তবুও মানুষ মৃত্যুর আগে তার ভিতরকার কথাগুলো সবাইকে জানিয়ে যেত, হোক তা দুঃখের কিংবা সুখের। এ বিষয়টি আইনস্টাইনকে বেশ আবেগতাড়িত করেছিল। এ থেকেই আইনস্টাইন পরবর্তীতে রচনা করেন সেলফ পোর্টেট (SELF PORTRAIT)। এটি তার আত্মজীবনী। আইনস্টাইন তার জীবনীতে লিখেছিলেন আমার জীবনে বেশিরভাগ সময়টুকুতে আমি মূলত তাই করেছি যা আমার আত্মা চেয়েছিল। সবার শ্রদ্ধা কিংবা ভালোবাসা পেতেই আমি এ কাজে আগ্রহী হয়েছিলাম।

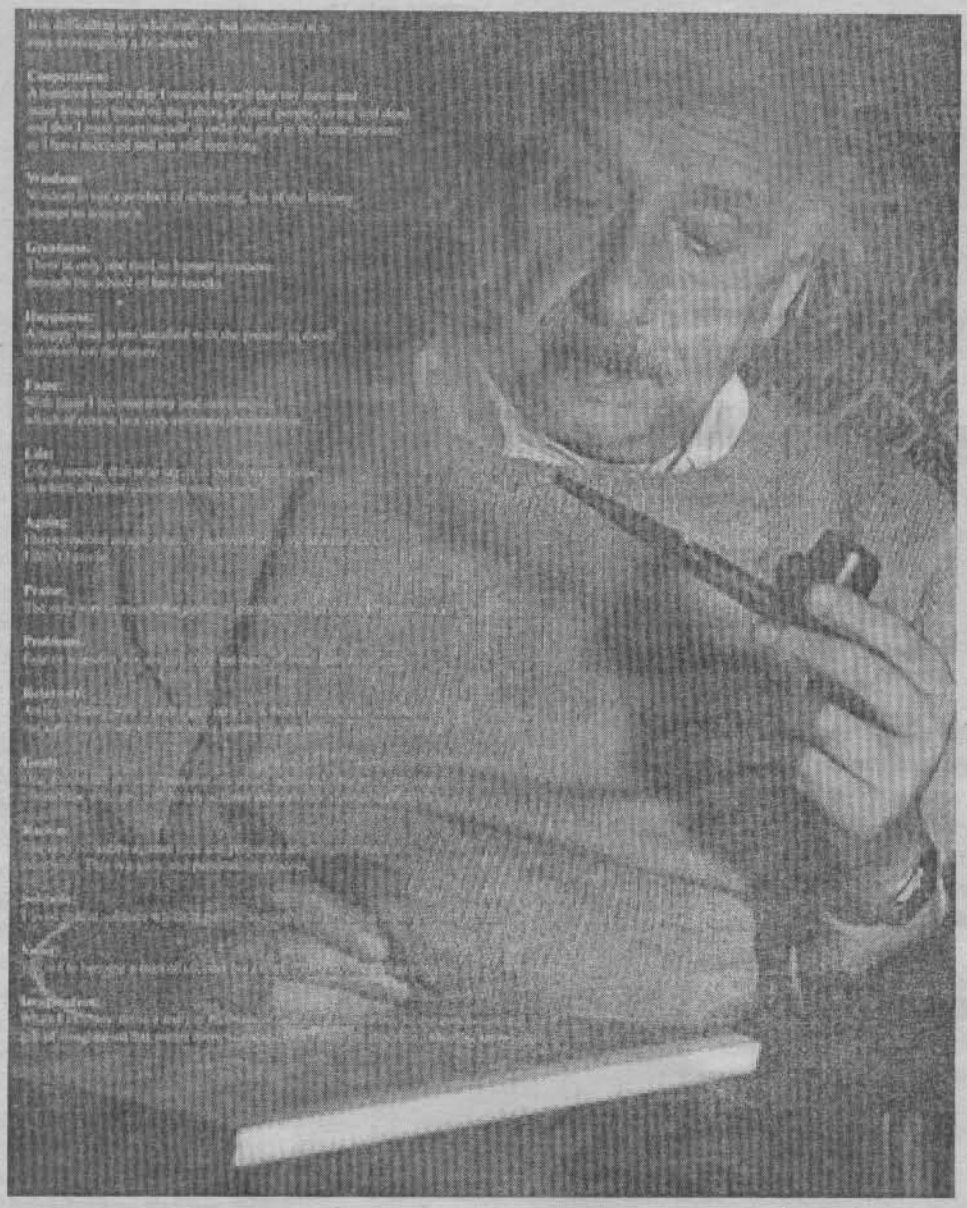

আইনস্টাইনের লেখনি ভাবনা এবং কিছু কথা

হাসিব রেজা রনি

আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞান, গণিত এবং প্রযুক্তির সাথে দর্শন, নীতিশাস্ত্র, আত্মিক এবং কলাবিদ্যার সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন নেই। কেননা আইনস্টাইনের মতে তারা একটি বৃক্ষের বিভিন্ন শাখামাত্র। তিনি মনে করতেন ধর্ম, কলাবিদ্যা এবং বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে মহান করে তুলতে পারে। এর সাথে কেবলই প্রয়োজন শারীরিক অক্ষমতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা। তিনি অনুভব করতেন গির্জাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষে আত্মিক উন্নয়ন সাধন করার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। তিনি ভাবতেন প্রত্যেক গির্জা এবং সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বেশ খানিকটা দূরে যা প্রকৃতপক্ষে খুব সামান্যই ব্যক্তির উন্নয়ন ঘটাতে পারে। আইনস্টাইনের মতে মহান শিক্ষা দেয়া তখনই সম্ভব যদি তারা সকলকে প্রকৃত অর্থে নৈতিকতা এবং সামাজিকতার

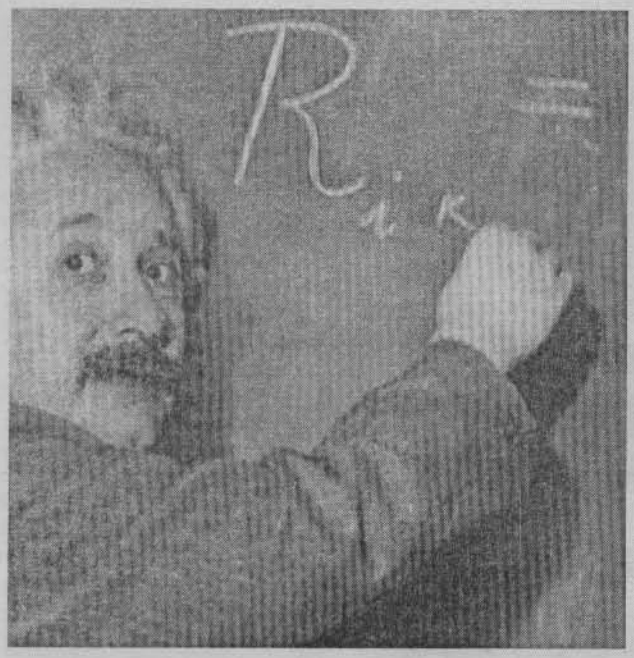

শিক্ষা দিতে পারে। তবে অবশ্যই এ শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। নৈতিকতা সহকারে আইনস্টাইন বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে যে, মানুষ বর্তমানে জীবনযুদ্ধে লিপ্ত হয় কেননা সে একজন সামাজিক জীব। আইনস্টাইন তার 'দ্য রিলেজিওসনেস অব সায়েন্স' (THE RELIGIOUSNESS OF SCIENCE)-এ লিখেছিলেন বিজ্ঞানীরা বিশ্বব্যাপী সর্বজনীন বিভিন্ন কার্যকারণ সম্পর্কীয় জ্ঞানের অধিকারী। কেননা ভবিষ্যতে পূর্বতনের এসব জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। এখানে ন্যায়পরায়ণতার মাঝে কোনো দৈবতা নেই। আবার ঐশ্বরিক কোনো কিছু এখানে বিদ্যমান নয়। আছে শুধু মানুষের সত্যিকারের ভালোবাসা।

এখানে একজন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এমন ধর্মীয় মনোভাব পোষণ করে যা সত্যিকারে পরম আনন্দদায়ক এবং এটি সকলকে বেশ আকৃষ্ট করে। এটা সেই সাথে ভিতরকার চরম বুদ্ধিমত্তাকে প্রকাশ করে যাকে সুপরিওটির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এ কথাও সেই সাথে বলা যেতে পারে, সকল নিয়ন্ত্রিত চিন্তাভাবনা এবং কর্মকাণ্ড ভিত্তিক মানুষের কর্মকাণ্ড অর্থহীন। এটা সামাজিকতার সাথে পুরোপুরি মিলে যায় না। হয়তোবা এ ধরনের চিন্তাভাবনা জীবনের এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিশ্চিত রাখে। কিন্তু এ ধরনের চিন্তাভাবনা তাকে সফল করলেও পুরোপুরি ধার্মিক হতে পারে। আইনস্টাইনের মানবজাতি সম্পর্কে এমন বিবৃতি সত্যিকার অর্থেই জীবনের প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরেছিল।

মহান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তার 'গুড অ্যান্ড ইভিল (GOOD AND EVIL)' বইতে লিখেছিলেন একজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব মূলত নির্ভর করে তার মূল্যবোধ এবং চিন্তার ধার কতটুকু সুদূরপ্রসারী তার ওপর। এছাড়া এর ওপর ভিত্তি করে কাজের মূল্যায়ন কতটুকু করতে পারেন সেটিও দেখার বিষয়। কেননা শুধুমাত্র চিন্তাপ্রসূত পরিকল্পনা হলেই হয় না এর বাস্তব রূপ দেয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একজন মানুষকে ভালো কিংবা খারাপ হিসেবে মূল্যায়ন করে থাকি মূলত তার কর্মের ওপর ভিত্তি করে। সেক্ষেত্রে প্রথমে সামাজিকভাবে তার অবদানটুকু পর্যালোচনা করা হয়। এটা কিন্তু পরিস্কারভাবে বলা যায় সমাজ থেকে আমরা যে পদার্থ, উপাদান, নৈতিকতা কিংবা আত্মিকতা প্রভৃতি বিষয়াদি পেয়ে থাকি তা বিবেচনা করে সমাজের পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করা যায়। সভ্যতার প্রথম আগুন, কৃষিকাজে কিংবা ইঞ্জিন সবই মানুষের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। এজন্য কেউ হয়তো বা একাকি চিন্তাভাবনা করেছেন।

এরপর তা কিন্তু এককের জন্য নয় বরং সমাজকে ঘিরে প্রবর্তিত হয়েছিল। এসব উদ্ভাবন সমাজকে আধুনিকতার আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। তবে উদ্ভাবনী শক্তি, স্বাধীন চিন্তাধারা কিংবা যথাযথ ব্যক্তিস্বাধীনতা ছাড়া সমাজের উন্নয়ন কল্পনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায় ব্যক্তিক উন্নয়ন সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। এটা ঠিক, এসব উদ্ভাবনী ক্ষমতা সকলের মধ্যে বিদ্যমান নয়। তবে প্রত্যেককেই সুযোগ দেয়া উচিত। এর মাধ্যমে কারও মধ্যে লুকানো প্রতিভা বিদ্যমান থাকলে তা উন্মুক্ত হবে। স্বাধীনতা, আইনস্টাইনের যথার্থ কাঙ্ক্ষিত চিন্তাধারা। তার কাছে ব্যক্তিক স্বাধীনতা ছিল বিশ্বাস পরায়ণতার প্রথম ধাপ । এ বিষয়ে আইনস্টাইন ১৯৩৩ সালে চমৎকারভাবে বিবৃতি দেন। তিনি বলেছিলেন স্বাধীনতা বিষয়ে আমার নিজস্ব মতামত হলো, "আমি এমন একটি দেশে থাকতে চাই যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সর্বক্ষেত্রে অধিবাসী আইনের চোখে সমান।" আইনস্টাইন অনুভব করতেন সামাজিক, রাজনৈতিক, মেধা বা বুদ্ধিমত্তা কিংবা আত্মিকতার স্বাধীনতা। সবকটি বিষয় পৃথকভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

আইনস্টাইন আরও লিখেছিলেন প্রত্যেক মানুষের এ বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। সুযোগ পেলেই সামর্থ অনুসারে তা বাড়াবার চেষ্টা করা উচিত। তার মতে বাহ্যিক স্বাধীনতাকে সামাজিক উপাদানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। আইনস্টাইন ভাবতেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি বিভাজনভিত্তিক জ্ঞানার্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। তিনি আরও ভাবতেন আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা বিজ্ঞানের উন্নয়ন এবং প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি প্রকৃতির বিরল উপহার এবং প্রত্যেকের জন্য এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আইনস্টাইন মনে করতেন সামাজিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আভ্যন্তরীণ অবদান রাখতে পারে। কেবলমাত্র এর জন্য সবাইকে উৎসাহিত করা এবং এতে কারও আবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ রোধ করা প্রয়োজন।

আইনস্টাইন তার অন এডুকেশন (ON EDUCATION) বইতে লিখেছিলেন বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থীদের বা তরুণদের উন্নয়নে এমনভাবে কাজ করা উচিত যাতে সকলের মাঝে আদর্শ গুণাবলি এবং যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। কেননা তাতে করে দেশের মঙ্গল হবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ রাখা উচিত যেন কোনোভাবেই তা যেন কারও ব্যক্তিগত বা নিজস্ব গুণাবলি নষ্ট না করে। যে কোনো সমাজ প্রকৃত ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত লক্ষ্য ছাড়া আধুনিক হতে চাইলে তা হবে ভুল। কেননা একসময় তা দুর্বল সমাজে পরিণত হতে পারে। আবার এতে করে সেসব সমাজের সম্ভাব্য সফলতা ক্রমঃশ হ্রাস পায়। এ সময় তা হয়ে পড়ে ঝুঁকির সম্মুখীন। এজন্য সকল সমস্যাকে মোকাবিলা করা কিংবা সম্ভাব্য সমস্যার আগাম সমাধানের চেষ্টা করা প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন স্বাধীন প্রতিনিধিত্ব এবং মত প্রকাশের অধিকার। আইনস্টাইন মনে করতেন প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমনভাবে কার্যপ্রক্রিয়া পরিচালনা করা প্রয়োজন যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে না তুলে অন্তত সকল ক্ষেত্রে চলার মতো যোগ্য করা যায়। যদি কোনো শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠ গ্রহণ করতে পারে এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা এবং কাজ করার শক্তি অর্জন করে তবে আশা করা যায় সে সফল হবে। কাজে লাগাতে সক্ষম হবে তার অর্জনকে।

মহান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন শুধুমাত্র অসাধারণ বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, দার্শনিক, নীতিবাদী এবং শিক্ষকই ছিলেন না সেই সাথে তার আরেকটি বড় দিক হলো তিনি একজন অসাধারণ আদর্শবাদী মানুষ। আমরা শুধুমাত্র তার কাছ থেকে পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত শিক্ষা পাইনি। সেই সাথে আরও শিখতে পেরেছি কিভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলা যাবে। তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় আমাদের মাঝে আর কী কী পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। ভবিষ্যৎকে সুন্দর এবং সম্ভাবনাময় করে তুলতে এর বিকল্প নেই।

আমরা এখন বুঝতে পেরেছি আমাদের উচিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক জ্ঞান এবং যথার্থ অধিকার দেয়া। তাদের অবহেলা করা উচিত নয়। পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি সকলকে সামাজিক চর্চায় এগিয়ে আসতে হবে। রোধ করতে হবে সামাজিক অবক্ষয়। তাহলেই আলোকিত হবে আমাদের এ পৃথিবী। সে সাথে এ স্বপ্ন পূরণের সঠিক নির্দেশক হিসেবে অমর হয়ে থাকবেন আরও একজন। তিনি মহান বিজ্ঞানী এবং আমাদের অন্যতম আদর্শ আলবার্ট আইনস্টাইন।

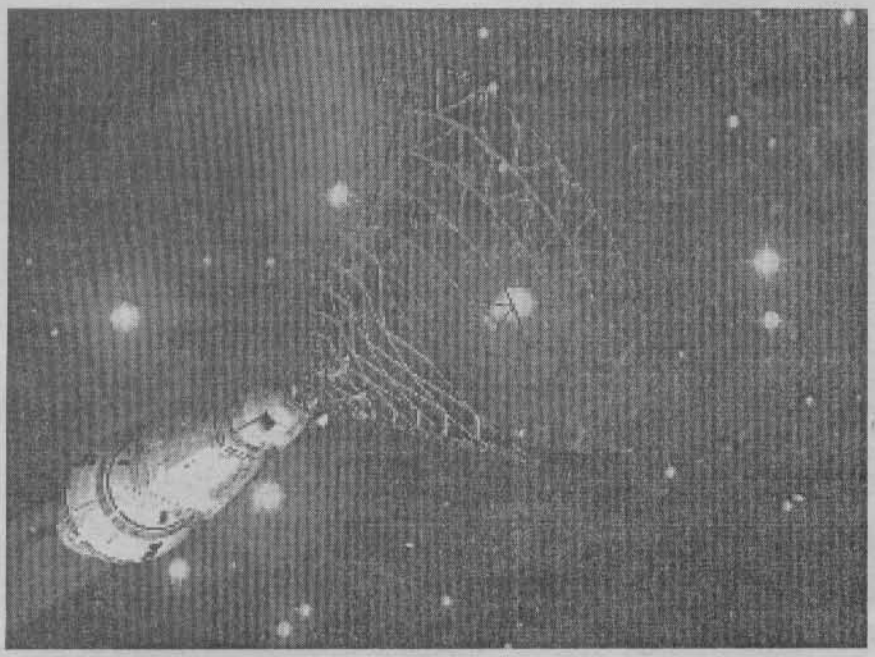

ভবিষ্যতে যাওয়া যাবে কিন্তু পিছনে ফেরা যাবে না

আসিফ

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে স্থির পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে সমবেগে গতিশীল পর্যবেক্ষকের সময় ধীর লয়ে ছোটে। বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখানো যায়। তবে যে উদাহরণটি এখানে ব্যবহার করবো তা বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে গেলে প্যারাডক্স বা স্ববিরোধিতার উদ্ভব ঘটে। তাই এটা টুইন প্যারাডক্স (**Twin Paradox**) নামে পরিচিত।

মনে করি দুটো অভিন্ন ঘড়ি যার একটি পৃথিবীতে অবস্থানরত আর অন্যটা আলোর কাছাকাছি দ্রুতিতে মহাশুন্যে ভ্রমণ করে আবার ফিরে আসবে। আমরা ঘড়ির বদলে একজোড়া যমজ ছেলে-মেয়ের কথা চিন্তা করতে পারি এবং এ প্রতিস্থাপনটি সঠিক হবে কারণ জীবনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা ধারবাহিক কার্যাবলি; যেমন- হৃদ স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদিও এক ধরনের জৈব ঘড়ি। পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জৈব, অজৈব প্রক্রিয়াসমূহ একই প্রকারের। কাজেই মানুষ নির্মিত ঘড়ি যদি বেগের কারণে ধীর লয়ে চলে তবে শরীরের অভ্যন্তরের সময় রাখার যন্ত্রগুলোর ক্ষমতাও গতি দ্বারা প্রভাবিত হবে। ধরি, যমজ ভাইবোনের তাদের ভাইটির যখন ২০ বছর বয়স তখন বোনকে পৃথিবীতে রেখে ২০ আলোকবর্ষ দূরের এক নক্ষত্রের উদ্দেশ্যে আলোর গতির কাছাকাছি সেকেন্ডে ১লক্ষ ৪৮ হাজার মাইল (আলোর গতি হলো সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল) বেগে যাত্রা শুরু করলো।

এখানে আলোর গতির কাছাকাছি বেগে চলার কথা বলার কারণ হলো সময় ধীরে চলার ফলাফলটি ব্যাপক আকারে প্রত্যক্ষ করা। এক সময় সে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে। তার যমজ বোন যে পৃথিবীতে আছে তার কাছে সময় প্রসারণ সূত্রানুসারে মনে হবে ভ্রমণের সময় তার ভাইয়ের সময় একটু ধীরে চলছে, হিসাব অনুসারে 60% অর্থাৎ যমজ ভাইয়ের প্রত্যেকবার শ্বাস নেয়ার সময়ে যমজ বোন নেবে ১-২/৩ বার, যমজ ভাইয়ের প্রত্যেকবার খাবার গ্রহণের সময় যমজ বোন খাবার গ্রহণ করবে ১-২/৩ বার। যমজ বোনের বিবেচনায় ভাইয়ের গিয়ে আসতে প্রত্যেকবারের জন্য সময় লাগবে মোট ৫০ বছর। কিন্তু ভাইয়ের ভ্রমণের জন্য সময় লেগেছে ৬০%। অর্থাৎ সে ছিল ৩০ বছরের জন্য ভ্রমণে। আর যখন সে ফিরে আসবে সেই হিসেবে তার বয়স হবে ৫০ বছর কিন্তু তার বোনের বয়স হবে ৭০ বছরের বৃদ্ধা মহিলা। তাহলে প্যারাডক্সটি কোথায়? আবার পুরো ঘটনাটি মহাকাশযানে অবস্থানরত ভাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে আমরা দেখবো পৃথিবী ১ লক্ষ ৪৮ হাজার মাইল বেগে গতিশীল, যেহেতু সমবেগে পরস্পরের সাপেক্ষে গতিশীল দুটি কাঠামোর কোনোটি থেকেই বলা সম্ভব নয় কোনটি গতিশীল এবং ঘটনাটি ঘটেছে সম্পূর্ণ উল্টোভাবে অর্থাৎ বোনের বয়স হবে ৫০ বছর এবং ভাইয়ের বয়স হবে ৭০ বছর। আপেক্ষিক তত্ত্বে এ বিভ্রান্তিকর অবস্থা বা স্ববিরোধিতাটা **Twin Paradox** নামে পরিচিত।

বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য আরও গভীরে গেলে আমরা দেখবো যমজ বোন সর্বদা একই জড় কাঠামোতে অবস্থান করে যেহেতু তার বেগ বাড়েও না, কমেও না। কিন্তু যমজ ভাইকে ১ লাখ ৪৮ হাজার মাইল (.৮c) বেগপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য আস্তে আস্তে বেগ বৃদ্ধি করতে হবে তার মহাকাশযানের। কারণ হঠাৎ করে এত বড় বেগ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ফলে প্রতিমুহূর্তে জড় কাঠামো পরিবর্তন করতে হয়। আবার নক্ষত্রে পৌঁছে ফিরে আসতে হলে তাকে যানের গতি মন্দিভূত করে জড়কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে। তারপর আবার গতিমুখ উল্টোদিকে

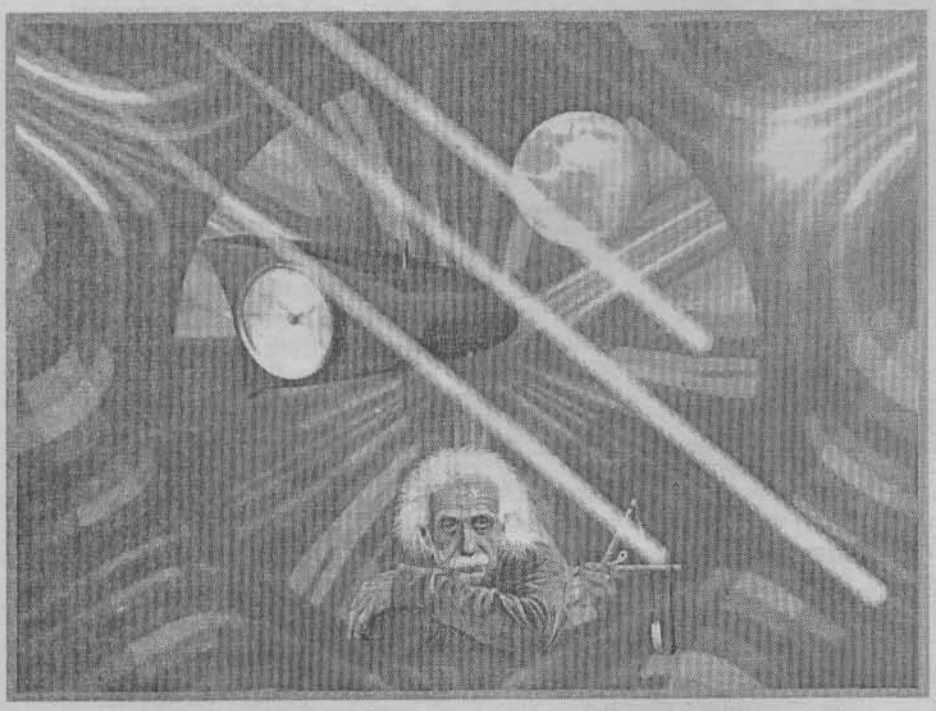

যদি আমরা অনেক দূরে মহাকর্ষহীন মহাকাশযানের ভিতর থাকতাম এবং আমাদের মহাশুন্যযানকে 1g তে ত্বরনায়িত করতাম তাহলে মনে হত আমরা পৃথিবীর পরিবেশে আছি। যানের ভিতরে থেকে কোনো ক্রমেই বুঝতে পারতাম না মহাকর্ষ বলের কারণে এই ত্বরণ, না গতিবৃদ্ধির কারণে এই ত্বরণ।

রেখে যানকে ত্বরান্বিত করে আগের বেগ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৪৮ হাজার মাইল বেগে (.৮c) নিয়ে আসার সময়ও তাকে জড় কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে। তা না হলে যমজ ভাই কখনও পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে না। ফলে উপরের বিশ্লেষণটি সঠিক হবে না। অর্থাৎ যমজ ভাইটি দেখছে যে তার বয়স ৭০ হয়ে যাচ্ছে আর তার বোনের বয়স ৫০। এটা ঠিক নয়। মূলত যমজ বোনের দেখাটাই ঠিক কারণ তাকে কোনো জড় কাঠামো পরিবর্তন করতে হয় না। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব এ বিষয়টি আমাদের কাছে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের মূল ভিত্তি সমতুল্যতার নীতি প্রয়োগ করে মহাকাশযানের ত্বরণকে মহাকর্ষক্ষেত্রের ফলরূপে বিবেচনা করলে এই বলক্ষেত্রের জন্য আলোক কম্পনাঙ্কের যে পরিবর্তন দেখা যায় তা থেকে নিখুঁত হিসাব পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যায় যে, ভাইয়ের বয়স বাস্তবিকই বোনের তুলনায় ২০ বছর কম বাড়বে যা সময় প্রসারণ সূত্রের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। অর্থাৎ ভাইয়ের মহাকাশযান গতিশীল থাকার কারণে সময় ধীর লয়ে ছুটেছে। জৈবিক, অজৈবিক সব প্রক্রিয়াই আস্তে চলেছে ফলে ভাইয়ের বয়স বোনের তুলনায় কম বেড়েছে।

সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব :

এই পৃথিবী আমাদের নির্দিষ্ট পরিমাণে মহাকর্ষ বলে আকর্ষণ করে। গাছ অথবা উঁচু জায়গা হতে পড়ার সময় আমরা ত্বরণ হিসেবে এই আকর্ষণ বলের অভিজ্ঞতা লাভ করি। এই ত্বরণকে মহাকর্ষজনিত ত্বরণ বলা হয় যার পরিমাণ 1g। প্রতি সেকেন্ডে ৯৮০ সেন্টিমিটার করে বেগ বৃদ্ধি হলে আমরা 1g ত্বরণ বলি। আমরা 1g ত্বরনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি; এবং এর মধ্যেদিয়ে বড় হয়ে উঠি। যদি আমরা অনেক দূরে মহাকর্ষহীন মহাকাশযানের ভিতর থাকতাম এবং আমাদের মহাশুন্যযানকে 1g তে ত্বরণায়িত করতাম তাহলে মনে হতো আমরা পৃথিবীর পরিবেশে আছি। যানের ভিতর থেকে কোনোক্রমেই বুঝতে পারতাম না মহাকর্ষ বলের কারণে এই ত্বরণ, না গতি বৃদ্ধির কারণে এই ত্বরণ। আবার পৃথিবীতে লিফট যদি 1g ত্বরণে নিচের দিকে নামে তাহলে লিফটের ভিতরে দর্শক ওজনহীন অবস্থা অনুভব করবে। কিন্তু আগের থেকে জানা না থাকলে কোনোভাবেই সে বলতে পারবে না এই ওজনহীনতা মহাকর্ষহীনতার কারণে, না লিফটের 1g ত্বরণে নীচে নামার কারণে। অতএব স্থানীয়ভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা মহাকর্ষ শক্তি বিলুপ্ত করে দেওয়া যায় এবং এই ত্বরণ হালকা ভারী সমস্ত পদার্থের ক্ষেত্রে একইভাবে কার্যকর। বাস্তবিকই মহাকর্ষ জ্বনিত ত্বরণের বল এবং মহাশুন্যযানের ত্বরণের ফলে অনুভূত বলের সমতুল্যতাই হল আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কারের খবর ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। যা আইনস্টাইনের আগে আর কেউ চিন্তা করেন নি। এ নীতির ওপর ভিত্তি করে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব ১৯১৫ সালে প্রকাশ করেন। এই সমতুল্যতার নীতিটি শুধুমাত্র বলবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে এটা নিতান্তই অকিঞ্চিতকর নীতি হিসেবে পরিগণিত হতো। আইনস্টাইন বলেন, সমতুল্যতার নীতিটি শুধু বলবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না সামগ্রিকভাবে আলোক ও বিদুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু কৃষ্ণবিবর বা ব্লাক হোলের মতো অসীম ঘনত্ব সম্পন্ন পরিস্থিতির কোনো ব্যাখ্যা সে করতে পারে না। হকিং বলেন এরকম প্রচণ্ড মহাকর্ষশক্তির কোনো অঞ্চল এবং অসীম ঘনত্ব সম্পন্ন কোনো বিন্দুতে স্থান-কালের প্রকৃতি বোঝার জন্য সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মধ্যে সমন্বয় অপরিহার্য যাকে মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলা হবে। এই তত্ত্বের সন্তোষজনক কাঠামো এখনও দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি।

এরফলে আমরা জানতে পারলাম মহাকর্ষ আলোর গতিকে বাঁকিয়ে দেয়, সময়ের প্রবাহকে শ্লথ করে দেয়। অর্থাৎ উচ্চ শক্তিসম্পন্ন মহাকর্ষক্ষেত্রের সময় আস্তে প্রবাহিত হয় স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন মহাকর্ষক্ষেত্রের তুলনায়। এই আস্তে চলা সকল প্রকার ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য। সেজন্য এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং এর প্রথম তলায় যে মহিলা টাইপিষ্ট কাজ করছে তার বয়স বৃদ্ধি ঐ বিল্ডিং এর সর্বোচ্চ তলায় কর্মরত তার জমজ বোনের চেয়ে কম হচ্ছে। অবশ্য তারতম্যের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প, দশ বছরে এক সেকেন্ডের কয়েক লক্ষ ভাগের একভাগ কম। সূর্য ও পৃথিবীপৃষ্ঠের মধ্যে মহাকর্ষের পার্থক্য অধিক হওয়ার কারণে সময়ের পার্থক্য আরও বেশি হবে। এক শতাংশের দশ হাজার ভাগের একভাগ। সময়ের পার্থক্য পরিমাপের সূত্র $t(r+\delta r) = t(r) \{1+GM\delta r/r^2c^2\}$ এখানে M হল পৃথিবীর ভর। এই ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষা করা হয়েছিল ১৯৬২ সালে, একটা জলাধার স্তম্ভের উপরে ও নীচে একজোড়া নির্ভুল ঘড়ি স্থাপনের মাধ্যমে। দেখা গেল পৃথিবীর নিকটতর রাখা ঘড়িটির গতি ধীরতর উপরে রাখা ঘড়িটির তুলনায়। আপেক্ষিক তত্ত্ব তথা মহাকর্ষ সময়কে যে শ্লথ করে দেয় তা প্রমাণিত হয়। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে আগত সংকেতের ভিত্তিতে নির্ভুল নৌ ও বিমান চালনার ব্যাপারে এ হিসাব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একে অগ্রাহ্য করলে অবস্থানের হিসাবে কয়েক মাইল ভুল হয়ে যেতে পারে। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের তিনটি স্বীকার্য হলো :

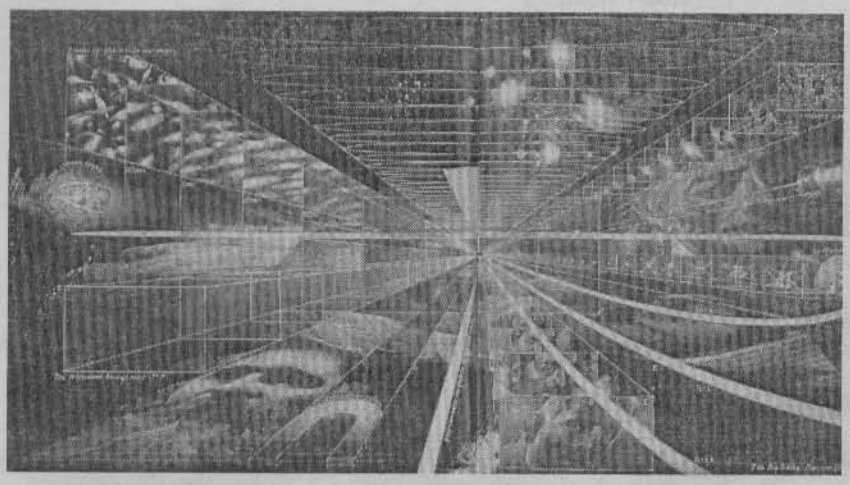

১) মুক্তভাবে পতনশীল প্রসঙ্গ কাঠামোতে স্থানীয়ভাবে কোনো পরীক্ষণের ফলাফলই গতির ওপর নির্ভর করে না;

২) এ ধরনের সকল প্রসঙ্গ কাঠামোতে সকল স্থানে ও সকল সময়ে প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল একই রকম;

৩) মুক্তভাবে পতনশীল যে কোনো প্রসঙ্গ কাঠামোতে স্থানীয়ভাবে সম্পাদিত সকল পরীক্ষার ফলাফল আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে।

আপেক্ষিক তত্ত্ব ভিত্তিক ভ্রসণে ভবিষ্যতের মহাকাশযান

আলোর একেবারে কাছাকাছি গতিবেগ সম্পন্ন মহাকাশযান নিয়ে আন্তঃনাক্ষত্রিক অভিযানের জন্য শত শত বছর নয় বরং হাজার হাজার বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে এটা নীতিগতভাবে সম্ভব। এ ধরনের একটি মহাকাশযান হলো আর ডব্লিউ বুসার্ড এর প্রস্তাবিত রামজেট। এই রামজেট জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করবে আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পদার্থকে যার বেশির ভাগই হাইড্রোজেন পরমাণু। এগুলোকে ত্বরান্বিত করা হবে ফিউসন ইঞ্জিনের মধ্য দিয়ে এবং বের করে দেয়া হবে পিছন দিক দিয়ে। হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হবে সম্ভবত জ্বালানি ও রিএক্সন ভর উভয়ই হিসেবে। কিন্তু মহাশূন্যের গভীরে প্রতি ১০ ঘন সেন্টিমিটারে অর্থাৎ একটি আঙুলের সম আয়তন জায়গায় মাত্র একটি পরমাণু থাকে। রামজেটকে ঠিকমতো কাজ করতে দেয়ার জন্য এ মহাকাশযানের সামনের দিকের ১০০ কিলোমিটার ব্যাপী পদার্থকে সরিয়ে দেয়ার যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। যখন মহাকাশযান রিলেটিভিস্টিক বেগে পৌছায় তখন হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোও তার সাপেক্ষে প্রায় আলোর গতিতে ছুটতে থাকবে। যদি পর্যাপ্ত সতর্কতা না নেয়া হয় তাহলে মহাশূন্যযান এবং এর যাত্রীরা জ্বলে যাবে এই আবেশিত মহাজাগতিক পদার্থের আঘাতে। এই সমস্যাটার সমাধানের জন্য একজনের প্রস্তাবনা ছিল লেজার ব্যবহারের, যা আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্যের পরমাণুগুলো থেকে ইলেক্ট্রনকে বিচ্ছিন্ন করে ঐগুলোকে বিদ্যুতায়িত করে তুলবে। তখনও মহাকাশযানটি বেশ খানিকটা দূরেই অবস্থান করবে। এ ধরনের প্রযুক্তি আমাদের পৃথিবীতে এখনও বিস্ময়ের ব্যাপার। আমরা এমন এক ধরনের ইঞ্জিন নিয়ে কথা বলছি যার আকার ছোটখাট একটি পৃথিবীর সমান।

আমরা কি সময়কে থামিয়ে অপরিমেয় দূরত্ব অতিক্রম করতে পারি:

1g ত্বরণে কোনো মহাকাশযানের গতি বাড়তে থাকলে মহাকাশযানের আলোর খুবই কাছাকাছি গতিবেগে আসতে এক বছর সময় লাগবে $[(0.01 km/sec^2) \times (3\times10^7 sec) = 3\times10 km/sec]$. মনে করি 1g ত্বরণসম্পন্ন ওই ধরনের একটি স্টারশিপ যে ক্রমাগতভাবে আলোর গতির কাছাকাছি আসতে থাকবে ভ্রমণের অর্ধেকটা আসা পর্যন্ত। এরপর বাকি অর্ধেক পথন্থন হতে থাকবে অর্থাৎ গন্তব্যে পৌছন পর্যন্ত। ভ্রমণের বেশিরভাগ সময় মহাকাশযানের বেগ আলোর গতির কাছাকাছি থাকার ফলে সময়ের গতি শ্লথ হয়ে যাবে ভীষণভাবে। এই মিশনের কাছের গন্তব্য প্রায় ছয় আলোকবর্ষ দূরের বার্নাড নক্ষত্র হলে মহাকাশযানের ঘড়ির সময়ে এই নক্ষত্রের কোনো গ্রহে (যদি থাকে) যেতে সময় লাগবে ৮ বছর; মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যেতে সময় লাগবে ২১ বছর; অবশ্যই যে পৃথিবীতে থাকবে তার ঘড়িতে সে ভিন্নভাবে দেখবে। সে দেখবে মহাকাশযানের ৩০ হাজার বছর সময় লেগেছে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে পৌছাতে। ২০ লক্ষ বছর দূরের M_{-31} অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিতে যেতে সময় লাগবে ২৮ বছর, পৃথিবীতে যে থাকবে সে দেখবে ৪০ লক্ষ বছর পার হয়ে গেছে!। যখন আমরা বাড়িতে ফিরতাম তখন আমাদের জন্য আর কোনো বন্ধুই থাকতো না সম্ভাষণ জানানোর জন্য। নীতিগতভাবে আলোর গতির কাছাকাছি (দশমিক পার্থক্যে) বেগে চলে মহাকাশযানের ৫৬ বছর সময় লাগবে পরিচিত বিশ্ব ভ্রমণ করতে। ভ্রমণ শেষে আমরা ফিরে আসতাম এক হাজার কোটি বছর দূর ভবিষ্যতের পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে এবং তার মৃত সূর্যকে দেখতে। আপেক্ষিকতাভিত্তিক মহাকাশভ্রমণ অপরিমেয় মহাবিশ্বকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে উন্নত সভ্যতার কাছে; শুধুমাত্র তাদের কাছে যারা ভ্রমণে যাবে। এমন কোনো পথ নেই যার মাধ্যমে রেখে আসা পৃথিবীতে আলোর গতির চেয়ে দ্রুত তথ্য পাঠানো যেতে পারে, আর যে যাবে সে নিজেও সেই পরিচিত পৃথিবী, ভাইবোন, এবং প্রিয়জনদের কাছে কখনও ফিরে আসবে না। তারা সবাই কালের অন্তরালে হারিয়ে গেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বলে সময়ের গতিকে শ্লথ করে দেয়া সম্ভব, দূর ভবিষ্যতেও যাওয়া সম্ভব। কিন্তু সেখান হতে কোনোক্রমে ফিরে আসা সম্ভব নয়। আইনস্টাইন ঠিক এ কথাটিই আজ থেকে একশ বছর পূর্বে আমাদের কাছে দিয়ে গেছেন।

মিসাইল কেন আকাশের দিকে ছোড়া হয়?

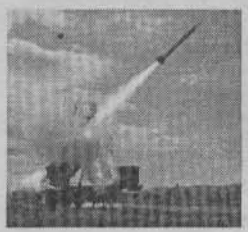

মিসাইল বা মর্টার শেল সাধারণত আকাশের দিকে কোনো নির্দিষ্ট কোণে ছোড়া হয় যদিও লক্ষ্যবস্তু আকাশে নয়, মাটিতেই হয়তো বেশ কিছু দূরে। বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলা অবশ্য আকাশের দিকে ছোড়াই স্বাভাবিক, কারণ লক্ষ্যবস্তু বিমান তো আকাশেই অবস্থান করে। কিন্তু অনেক দূরের কোনো গ্রাম যদি লক্ষ্যবস্তু হয় তাহলে কামানের গোলা ভূমির সমান্তরালে না ছুড়ে আকাশের দিকে ছোড়া হয়। এর সহজ ও বোধগম্য কারণ হলো লক্ষ্যবস্তুর পথে অনেক গাছপালা, ঘর-বাড়ি, পাহাড়-পর্বত থাকে, যা এড়ানোর জন্য অনেক উঁচু দিয়ে গোলা মারতে হয়। কিন্তু পথে যদি বাধা না থাকে তাহলেও সাধারণত আকাশের দিকেই গোলা তাক করা হয়, এর কারণ হলো কামানের গোলা ভূমির সমান্তরালে ছোড়া হলে সেটা বেশি দূর যেতে পারে না, ফলে দূরপাল্লার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা সম্ভব হয় না।

লক্ষ্যবস্তু কাছে থাকলে অবশ্য সমস্যা নেই, সরাসরি আঘাত হানা যায়, কিন্তু দূরে হলে সমস্যা। যে- কোনো বস্তু ছুড়ে মারলে তার ওপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং বাতাসের বাঁধা ক্রিয়া করে। ফলে ছুড়ে মারা বস্তুটি নির্দিষ্ট দিকে সরলরেখায় না চলে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে মাটিতে পড়ে। সে জন্য দূরের কোনো লক্ষ্যবস্তু যদি বাধাহীন অবারিত খোলা প্রান্তরে মাটির ওপরও থাকে তাহলেও গোলাটি অনুভূমিকা না ছুড়ে আকাশের দিকে ছোড়া হয়। এতে গোলাটি বাতাসের বাধা কম পায় এবং বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। অবশ্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে হলে কামানের মুখ কত ডিগ্রি কোণে আনত করতে হবে সেসব অনেক হিসাব-নিকাশ করে নির্ধারণ করার পর গোলা ছোড়া হয়।

মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী রোবট

পি কে রায়

মুরাতা বয় ঠিক মানুষের মতোই রোবট সাইকেল চালক। তার আছে এমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধিকেও হার মানায়...

এমন এক সময় ছিল যখন মনে করা হতো বিদ্যা, বুদ্ধি আর ধন এ তিন উপাদানের সমন্বয় ঘটানো হলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন দ্রুত ঈর্ষণীয় পর্যায়ে উপনীত হয়। তাই ব্যবসায় সাফল্যের লক্ষ্যে তখনকার মানুষ হন্যে হয়ে এ তিন উপাদানের পিছনে ছুটতো। এখন তা মনে করা হয় কিনা জানি না। তবে এখন উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবসায়ী বাজার গবেষণা করেন এবং কোনো পণ্য বা সেবার কেমন চাহিদা আছে সে অনুযায়ী উৎপাদন বা সেবা প্রদানের উদ্যোগ নেন। রোবট ব্যবসায়ও এর ব্যতিক্রম নয়। আগামী ২০ বছর পর অর্থাৎ ২০২৫ সাল নাগাদ সারাবিশ্বে রোবট পণ্যের কেমন চাহিদা হবে এবং এর বাজারই কেমন হবে সে সম্পর্কিত এক গবেষণায় দেখা গেছে উক্ত সময়ে রোবটের বাজার হবে ৭.২ ট্রিলিয়ন ইয়েন। জাপান রোবট এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে পরিচালিত উক্ত গবেষণা থেকে জানা যায় ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকায় অত্যাধুনিক রোবট পণ্যের চাহিদা বাড়ার কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এত বড় একটি সম্ভাবনাময় খাতের প্রতি সারাবিশ্বের রোবট নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো তাই ব্যতিক্রম সব প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের এ প্রচেষ্টার এক ফলশ্রুতি মুরাতা বয় রোবট। এটি ঠিক মানুষের মতোই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শক্তি সম্পন্ন এক রোবট যার প্রধান কাজ সাইকেল চালানো। শুধু তাই নয়, সাইকেল চালানো প্রতিযোগিতায় এটি মানুষের সাথেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার উপযুক্ত এবং বিজয়ী হওয়ার এক উন্মাদনা শক্তি এর মধ্যে কাজ করে।

যারা সার্কাস দেখেন তাদের তারের ওপর সাইকেল চালনা দেখার সৌভাগ্য নিশ্চয় হয়েছে। দীর্ঘদিনের অনুশীলন আর প্রচেষ্টার ফলেই মানুষ এ ক্যারিশমাটিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। যাতে একবার সাইকেল চালাতে দেখার পর বারংবার দেখার ইচ্ছে জাগে। এ রোবট ঠিক তাই। এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বা সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান এর নামকরণ করেছে মুরাতা বয় রোবট। জাপানের রোবট কম্পোনেন্ট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও সরবরাহকারী মুরাতা এর স্রষ্টা। ঘূর্ণমান বস্তুসমূহের গতিতত্ত্ব ব্যাখ্যার যন্ত্র গ্রায়োস্কোপিক সেন্সর মানুষের সাভাবিক শ্রবণশক্তির অতিশায়ী শব্দতরঙ্গ ধারক আল্ট্রাসনিক সেন্সর, কম্পন ধারক তথা সরু সেন্সর, গতি শক্তির নিয়ন্ত্রক মোশন কন্ট্রোলার, ব্যাটারি, ইমেজিং ও কমিউনিকেশন মডিউলের সমন্বয়ে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। এটি প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে এবং সেকেন্ডে ৬০ সেন্টিমিটার গতিতে চলতে পারে। সাইকেল চালনার এ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এর রয়েছে আরও অনেক গুণাগুণ। সাইকেল চালিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় সামনে কোনো প্রতিবন্ধক থাকলে রোবট নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে ঠিকমতো অবস্থান করতে পারে। সাইকেলের সামনে কোনো প্রতিবন্ধক থাকলে সে আগে থেকেই তা উপলব্ধি করতে পারে। কারণ এতে সমন্বিত অবস্থায় অবস্টাকল ডিটেকশন সিস্টেম রয়েছে।

সাধারণত যারা সাইকেল চালান তাদের সামনে বা পিছনে কিংবা ডানে-বায়ে কোনো প্রতিবন্ধক থাকলে তারা বিকল্প কোনো পথে এগুনো বা পিছানোর চেষ্টা করেন। এ রোবটেরও সে গুণাগুণ রয়েছে। এছাড়া একে রিমোট কন্ট্রোলার দিয়ে সুবিধামতো বা পূর্বনির্ধারিত পথে পরিচালনা করা যায়। এজন্য এতে বিশেষভাবে নির্মিত ওয়্যারলেস রিসিভার সমন্বিত করা হয়েছে। এর সাহায্যে পরিচালক এর অবস্থান পরিবর্তন করা ছাড়াও এতে কোনো নির্দেশ পাঠাতে পারবেন এবং মুরাতা রোবট কর্তৃক কোনো দৃশ্য ধারণ করে এর সাথে ওয়্যারলেসলি কানেক্টেড পিসিতে এসব দৃশ্য পাঠাতে পারবেন। এ দৃশ্য ধারণ করার পর পিসি অপারেট করে ছবিগুলো সুবিধামতো এডিট করা যাবে এবং ব্যবহার করা যাবে। এ ছবিগুলো এনালাইসিস করে গবেষক বা পর্যবেক্ষকরা জানতে পারবেন যে রাস্তায় এটি চলেছে সে রাস্তার বর্তমান অবস্থান কেমন।

মুরাতা বয়ের বৈশিষ্ট্যের কথা শুনে যারা অবাক হয়েছেন তাদের জন্য আরও কিছু বিস্ময় হচ্ছে এতে পজিশন ডিটেকশন গ্রায়ো সেন্সর সমন্বিত থাকায় সে নিজে নিজেই নিজের অবস্থান সনাক্ত করতে পারে। কিংবা পূর্বের তুলনায় এখন কতদূর দূরত্ব অতিক্রম করেছে তা নির্ধারণ করতে পারে। এছাড়া এতে এঙ্গেল ডিটেকশন

গ্রায়ো সেন্সর সমন্বিত করায় দ্রুতগতিতে সাইকেল চালানোর সময় প্রতিবন্ধকের শিকার হলে পজিশন ডিটেকশন গ্রায়ো সেন্সর সে তথ্য পাঠাতে পারবে এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিকল্প পথে এগিয়ে যেতে পারবে। কিংবা কখন কোথায় গতি কমাতে হবে বা থামতে হবে তাও নির্ধারণ করতে পারবে। এ কাজে তাকে সহায়তা করবে আল্ট্রাসনিক সেন্সর। এর সাহায্যেই সে বুঝতে পারে তার চারপাশে কোথায় কী আছে এবং প্রতিবন্ধকতার শিকার হবে কিনা। চলার পথে অনেক সময় প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে সাইকেল চালানোর সময় এই ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয় বেশি। এ সময় যদি সাইকেল চালক সাইকেলের ওপর বসা অবস্থায় নিজের অবস্থান ঠিক না রাখতে পারে তাহলে সাইকেল থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। আর সাইকেল চালক যখন রোবট হন তখন রোবট চালক পড়ে গেলে কী অবস্থার সৃষ্টি হবে তা তো সহজেই অনুমেয়। আর পড়ে যাওয়ার ব্যাপার যদি সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতার সময় হয় তাহলে নিশ্চিত পরাজয়। এ অসুবিধা যাতে না হয় সেজন্য মুরাতা বয় রোবটে ভাইব্রেশন ডিটেকশনের লক্ষ্যে শক সেন্সর সমন্বিত করা হয়েছে। এর কাজ হচ্ছে দ্রুতগতিতে সাইকেল চালানোর সময় যেসব ঝাঁকুনি বা কম্পনের সৃষ্টি হয় তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপলব্ধি করা এবং ঝাঁকুনি বা কম্পন প্রতিরোধে প্রয়োজন শক্তি সৃষ্টি করা যাতে সাইকেল চালক রোবট নিজের অবস্থান নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন।

রোবটের মাধ্যমে সাইকেল চালানোর খবর নতুন কোনো বিষয় নয়। অনেক দিন যাবৎ গবেষকরা এ ধরনের রোবট নির্মাণের সম্ভাবনার কথা বলে আসছেন। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন মডেলের সাইকেল চালক রোবট নির্মাণের কথা স্বীকারও করা হচ্ছিল। কিন্তু বিস্ময় হচ্ছে, বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে সেগুলো মুরাতা রোবটের মতো বা সমপর্যায়ের ছিল না। তাই এর আগে যত সাইকেল চালক রোবট উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলো মুরাতা রোবটের মতো এত সাড়া জাগাতে পারেনি। যারা বিভিন্ন রোবট কম্পোনেন্ট দিয়ে রোবট নির্মাণের কথা ভাবছেন তাদের জন্য মুরাতা রোবট অত্যাধুনিক রোবট নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এক মডেল বলা চলে।

বাংলাদেশেও ব্যক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে রোবট নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ধরনের রোবট ইতোমধ্যে রোবকনেও স্থান করে নিয়েছে। এসব রোবটের মানও খারাপ নয়। কিন্তু বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে এগুলো মুরাতা বয় রোবটের চেয়ে অনেক সেকেলে ধরনের। এসব রোবট যে এক সময় মুরাতা রোবটের সমপর্যায়ের হতে পারবে না তা নয়। কিন্তু এজন্য অনেক গবেষণা উন্নয়নের প্রয়োজন হবে। এ কাজ চাইলেই সম্পন্ন করা যাবে না। তার আগে জানতে হবে অত্যন্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শক্তি সম্পন্ন রোবট নির্মাণ করতে হলে কী ধরনের রোবটিক কম্পোনেন্ট ব্যবহার করতে হয়। মুরাতা বয় রোবটকে যারা মডেল হিসেবে ধরে অত্যাধুনিক রোবট নির্মাণের কথা ভাবছেন, তাদের পজিশন ডিটেকশন গ্রায়ো সেন্সর, এঙ্গেল ডিটেকশন গ্রায়ো সেন্সর, আল্ট্রাসনিক সেন্সর ও শফ সেন্সর ব্যবহার ছাড়াও কিছু সাধারণ ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহারের কৌশল হস্তগত করতে হবে। নচেৎ রোবট হয়তো নির্মাণ সম্ভব হবে কিন্তু তার বুদ্ধি হবে খুবই কম বা সেটি ঠিকমতো কাজ করতে পারবে না।

এখন সঙ্গত কারণেই অনেকে জানতে চাইবেন এসব কমন ইলেকট্রনিক সার্কিটগুলো কী। এগুলো হচ্ছে চিপ মনোলিথিক সিরামিক ক্যাপাসিটর সিরামিক রিতোনেটর (CER-ALOCK), এনটিসি থার্মিস্টার, ট্রিমার পটেনশিওমিটার, ইমি ফিল্টার (EMIFIL) ইত্যাদি। এসব সার্কিটের মধ্যে চিপ মনোলিথিক সিরামিক ক্যাপাসিটরের কাজ হচ্ছে যথাযথভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। সিরামিক রিজোনেটরের কাজ হচ্ছে রেফারেন্স সিগনালগুলো রিজোনেট অর্থাৎ প্রতিধ্বনিময় করে তোলা। এনটিসি থার্মিসেন্টারের কাজ হচ্ছে তাপমাত্রা নির্ধারণ করা। ট্রিমার পটেনশিওমিটারের কাজ হচ্ছে একাধিক সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগত অমিলের কারণে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তা নিরসন করা অর্থাৎ বিদ্যমান সার্কিগুলোর মধ্যে কম্পাটিবিলিটি বজায় রাখা এবং ইমি ফিল্টারের কাজ হচ্ছে বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় শক্তিগুলো একটি অন্যটির সাথে মিশে পরস্পরের বিঘ্ন সৃষ্টি যাতে না করে তার প্রতি খেয়াল রাখা। এ ধরনের বিভিন্ন কার্যক্ষমতার সার্কিটের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে মুরাতা রোবট। একে অনুকরণ করে রোবট নির্মাণের পূর্বে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মেকের্ড মুরাতা বয় রোবটের মতো কার্যক্ষমতার রোবট নির্মাণ করতে পারবেন।

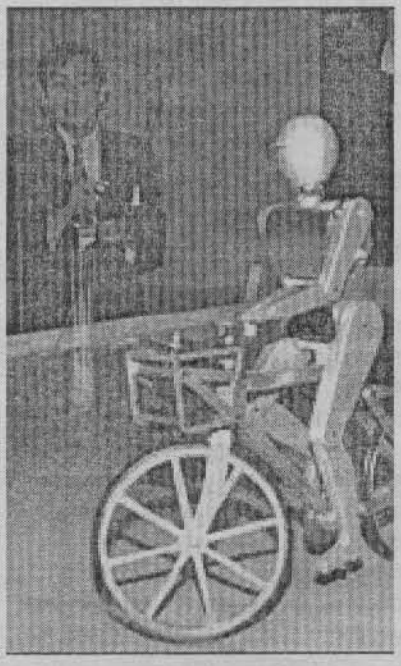

সাইকেল চালক যখন রোবট হন তখন রোবট চালক পড়ে গেলে কী অবস্থার সৃষ্টি হবে তা তো সহজেই অনুমেয়। আর পড়ে যাওয়ার ব্যাপার যদি সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতার সময় হয় তাহলে নিশ্চিত পরাজয়।

এ ধরনের রোবট নির্মাণ উদ্যোক্তাদের চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে জাপানের রোবট কম্পোনেন্ট নির্মাতা মুরাতা বিভিন্ন কাজের উপযুক্ত কম্পোনেন্ট তৈরি করছে। যার একটির সাথে অন্যটি জুড়ে দিয়ে বিভিন্ন কাজের উপযুক্ত রোবট নির্মাণ করা যাবে। বাংলাদেশে রোবটের ব্যবহার বলতে গেলে এখন শুরু হয়নি। এক্ষেত্রে জাপান অনেক এগিয়ে। সেখানে এখন রোবট ব্যবহার করে কোনো ঝুঁকি ছাড়াই দুরূহ কাজ সহজে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও বিশেষত সিটি কর্পোরেশনের মতো প্রতিষ্ঠান দ্রুত নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের রোবট দেশে সংযোজনের উদ্যোগ নিতে পারে; যার কোনোটি লাইট পোস্ট বেয়ে উঠে নষ্ট হওয়া বৈদ্যুতিক বাতি লাগাবে, কোনোটি ঝাড়ু দিবে, কোনটি ধ্বসে পড়া দালানের অভ্যন্তরে ঢুকে জীবিত মানুষের সন্ধান দিবে, কোনোটি সুয়ারেজের লাইনের মধ্যে ঢুকে খুজে দেখবে কোথায় ময়লা আবর্জনা আটকে পয়নিঃসরণের পথে বাধা সৃষ্টি করছে ইত্যাদি।

এ প্রেক্ষিতে অনেকে জানতে চাইবেন বাংলাদেশে রোবট সংযোজনের উপযুক্ত জনবল আছে কিনা। নেই তা নয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র শিক্ষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে একটা রোবট নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। এতে ঢাকার ধোলাই খাল ও স্টেডিয়াম থেকে পুরানো সার্কিট সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয়েছে। পুরানো সার্কিট দিয়ে যদি বাংলাদেশীয় রোবট নির্মাণ করার পর তা বিদেশের মাটিতে প্রশংসা কুড়াতে পারে তাহলে মুরাতা রোবট থেকে সার্কিট এনে তারা অত্যাধুনিক কৃত্রিমবুদ্ধিমত্তার শক্তি সম্পন্ন রোবট নির্মাণ করতে পারবে না কেন! তাই আমাদের উচিত বাংলাদেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সম্ভাব্য অন্যান্যদের এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা। এ কাজটুকুও যদি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আমরা করতে পারি তাহলে ২০২৫ সাল নাগাদ বিশ্বে ৭.২ ট্রিলিয়ন ইয়েনের যে বাজার সৃষ্টি হবে তার একটি অংশ অর্জন করতে পারবো।

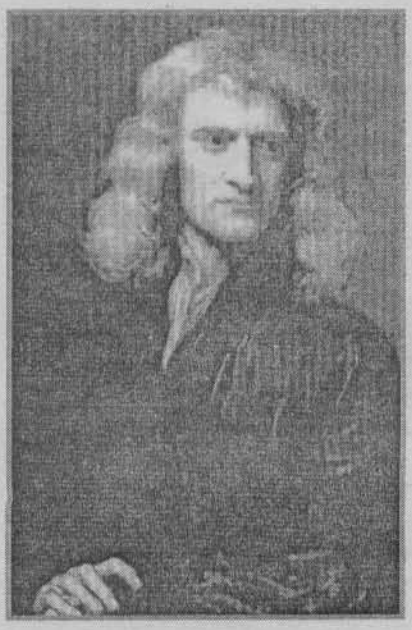

স্যার আইজ্যাক নিউটন

এম. হাসান

বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় যিনি গবেষণা করে গেছেন, এই গবেষণার কারণেই যিনি জীবনে কখনও বিয়ে করেননি, যিনি মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে লিখেছিলেন "পৃথিবীর মানুষ আমাকে কী ভাবে জানি না, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আমি মনে করি একটা ছোট ছেলের মতো সাগরের তীরে খেলা করছি আর খুঁজে ফিরছি সাধারণের চেয়ে সামান্য আলাদা পাথরের নুড়ি বা ঝিনুকের খোলা। সামনে আমার পড়ে রয়েছে অনাবিষ্কৃত বিশাল জ্ঞানের সাগর।" তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৫ তার ৩৬৩তম জন্মবার্ষিকী। তার এ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার স্মৃতি ও কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবারের আয়োজন।

জন্মকথা

নিউটন ১৬৪২ সালের ২৫ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের লিংকনশায়ার নামের একটি ছোট্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নামও ছিল আইজ্যাক নিউটন। তার বাবা ছিলেন নিরক্ষর এক কৃষিজীবী। নিউটনের জন্মের তিনমাস আগেই তিনি মারা যান। নির্ধারিত সময়ের অনেক দিন আগে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কারণে জন্মের সময় নিউটন ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। ডাক্তাররা তার বাঁচার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। শিশু নিউটন এতই ছোট আর দুর্বল ছিলেন যে খেতে কিংবা মাথা তুলে নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারতেন না। মাথা খাড়া করে রাখার জন্য তার গলায় বিশেষ ধরনের কলার বেঁধে রাখা হতো।

বাল্যকাল

নিউটনের বয়স যখন মাত্র তিন বছর; তখন তার বিধবা মা হান্নাহ একজন বিপত্নীককে বিয়ে করেন। বারনাবাস স্মিথ নামের ঐ বিপত্নীক ছিলেন অত্যন্ত ধনী এবং উচ্চশিক্ষিত কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তিনি মার সাথে শিশু নিউটনকে নিতে রাজি ছিলেন না। নিউটন জানতেন তার সৎ বাবা তার কাছ থেকে তার মাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এই কষ্ট শিশু নিউটনকে মানসিকভাবে কুরে কুরে খেত। মা-বাবার আদর বঞ্চিত শিশু নিউটনের তাই মেজাজ ছিল খিটখিটে। কারও সাথে তেমন মিশতেন না। বরং নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘরের কোণে বসে সময় কাটাতেন। নিউটনের বয়স যখন দশ বছর তখন তার সৎ বাবা মারা যান। স্বামীর সম্পত্তি এবং তিন সন্তানসহ নিউটনের মা আবার নিউটনের কাছে ফিরে আসেন। অবশ্য ততদিনে কিশোর নিউটন মানুষের সান্নিধ্য এড়িয়ে একান্ত নিজস্ব নিঃসঙ্গ একটি ভুবন তৈরি করে নিয়েছিলেন। নিজের ঘরে বসে একা একা তৈরি করতেন নানা ধরনের নক্সা, যন্ত্রপাতি, ঘুড়ি।

শিক্ষাজীবন

প্রথমে নিউটনকে নিকটবর্তী একটি গ্রাম্য স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। সেখানকার পাঠ শেষ করার পর তাকে ভর্তি করে দেয়া হয় গ্যান্থাম গ্রামার স্কুলে। কিন্তু স্কুলের পড়ায় তার মোটেই মনযোগ ছিল না। ক্লাসের আশি জন ছাত্রের মধ্যে তার অবস্থান ছিল উনআশিতম। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৬৬১ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র অবস্থাতেই নিজের রুমে তিনি তার প্রাথমিক গবেষণাগুলো শুরু করেন। এ সময় তিনি আলোর ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেন এবং ১৬৬৪ সালে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার আগেই আলো বিষয়ে যাবতীয় গবেষণা সম্পন্ন করেন।

১৬৬৪ সালে নির্ধারিত পরীক্ষায় পাশ করার মাধ্যমে নিউটন 'স্কলার' তালিকাভুক্ত হন। পরের বছর ১৬৬৫ সালে তিনি ব্যাচেলর অব আর্টস ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করার ফলে তিনি ট্রিনিটি কলেজে পরবর্তী চার বছর তার পছন্দের বিষয়ের ওপর গবেষণা করার সুযোগ পান। ঠিক সে সময় লন্ডন শহরে মহামারী রূপে দেখা দেয় 'প্লেগ' নামে অতি ভয়ঙ্কর একটি রোগ। ভীত ও সন্ত্রস্ত মানুষ প্লেগের ভয়ে দলে দলে লন্ডন শহর ছাড়তে শুরু করে। ফলে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্ররা সবাই যে যার বাড়িতে ফিরে যায়। নিউটনও লিংকনশায়ারে তার মায়ের বাড়িতে ফিরে যান। লিংকনশায়ারের নির্জন, শান্তিময় পরিবেশে তার উদ্ভাবনী ও কল্পনা শক্তি বেড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা অবস্থায় ১৬৬৬ সালের গ্রীষ্মকালে নিউটন একদিন মায়ের আপেল বাগানে একটি গাছের নিচে বসে গভীর মনযোগ দিয়ে পড়ছিলেন। এমন সময় গাছ থেকে একটি আপেল তার মাথায় পড়ে। আপেল পড়ার ফলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিষয়টি তার কাছে পরিষ্কার হয়। এর আগে নিউটন দীর্ঘদিন ধরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিয়ে ভাবছিলেন। তখন থেকেই তিনি তার বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের প্রবর্তন শুরু করেন। ১৬৬৭ সালে প্লেগ নির্মূল হলে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় দেড় বছর পর আবার খুলে দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের রুমে ফিরে এসে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং গাণিতিক আকারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্র তৈরি করেন। ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জনের পর নিউটন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মাস্টার্স' অব আর্টস সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে ১৬৬৭ সালের ফেলোশি নির্বাচনে দাঁড়ান। আলো, গণিত ও মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত আবিষ্কারের কারণে তিনি 'ফেলো অব ট্রিনিটি কলেজ' নামের সম্মানজনক পদ পান। তখন তার বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। ফেলো নির্বাচিত হওয়ার ফলে তিনি কলেজের একাডেমিক কমিউনিটির স্থায়ী সদস্যপদও অর্জন করেন। গণিত বিষয়ে তার মৌলিক উদ্ভাবনের জন্য মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ক্যামব্রিজের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম প্রফেসর হিসেবে গণিত বিভাগে যোগ দেন।

রয়্যাল সোসাইটির সদস্য

ইতালির বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি ১৬১০ সালে টেলিস্কোপ-এর উন্নত ও জনপ্রিয় ডিজাইন উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীতে নিউটন ১৬৭০ সালের শুরুর দিকে একটি নতুন এবং আরও অনেক বেশি শক্তিশালী টেলিস্কোপ তৈরি করেন। উন্নত ধরনের টেলিস্কোপ তৈরি করার জন্য ১৬৭২ সালে মাত্র ৩১ বছর বয়সে নিউটন রয়্যাল সোসাইটির সদস্য পদ লাভ করেন। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম, বিনোদন সবকিছু ভুলে গিয়ে রাত-দিন নিউটন নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন গবেষণার কাজে। ফলে একান্ন বছর বয়সে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ঐ অসুস্থতা তাকে ১৬৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কাবু করে রাখে। ১৬৯৬ সালে তিনি লন্ডনে রয়্যাল মিন্টে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করার আমন্ত্রণ পান এবং ক্রমশ অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠেন। ১৭০৩ সালে নিউটন ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

শেষ জীবন

অপটিক্স আলো বিষয়ক বই প্রকাশিত হওয়ার পর ১৭০৫ সালে তার বৈজ্ঞানিক ও প্রসাশনিক কর্মদক্ষতা ও সফলতার জন্য ইংল্যান্ডের রানী নিউটনকে 'নাইট' সম্মানে ভূষিত করেন। স্যার আইজ্যাক নিউটন বেশ কয়েক মাস অসুস্থ থাকার পর ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ৪ এপ্রিল তার মরদেহ সমাধিস্থ করা হয় লন্ডনের মিনিস্টার অ্যাবিতে। যেখানে ব্রিটেনের রাজা-রানী, ডিউকদের সমাধি রয়েছে। শেষকৃত্যের সময় ডিউক এবং লর্ড চ্যান্সেলর তার কফিন বহন করেন।

মোবাইল প্রযুক্তির নতুন অধ্যায়

এজ্

EDGE

রনি হাসান

প্রতিনিয়ত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিত্যনতুন উদ্ভাবন ঘটছে। এর ছোঁয়া লেগেছে মোবাইল প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে মোবাইলের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বেড়েছে। সে সাথে বেড়েছে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এবং বাজার ধরে রাখার জন্য কোম্পানিগুলো বিভিন্ন কৌশলগত পদ্ধতি, বিল কমানো এবং নিত্যনতুন প্রযুক্তি অনুসরণ করছে। আমাদের দেশে ওয়াব ব্লুটুথ, জিপিআরএস, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রযুক্তির কথা আমরা আগেই শুনেছি, এবার সে ধারাবাহিকতায় এসেছে এজ্ (EDGE)। এদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মোবাইল ফোন প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ফোন লিমিটেড প্রথমবারের মতো নিয়ে এসেছে দ্রুতগতির মোবাইল ইন্টারনেট ও ডাটা সার্ভিস এজ্ (EDGE)। যার পুরো রূপটি হলো এনহ্যান্সড ডাটা রেটস ফর গ্লোবাল ইভোলিউশন (Ennanced Data Rates for Global Evolution). EDGE চালু হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকগণ ভিডিও এবং মিউজিক ক্লিপ ডাউনলোড, পরিপূর্ণ মাল্টিমিডিয়া মেসেজিং চলমান অবস্থায় রঙিন ইন্টারনেট ও ই-মেইল ব্যবহারের মতো অত্যাধুনিক সেবা উপভোগ করতে পারবেন। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে (EDGE) চালু করা হয়েছে এবং অচিরেই এটি বাণিজ্যিকভাবে সারাদেশে চালু করা হবে। এবছরের মধ্যেই দেশের অনান্য এলাকা এর আওতায় আসবে।

এজ্ (EDGE) সম্পর্কিত ধারণা

এনহ্যান্সড্ ডাটা রেটস ফর গ্লোবাল ইভোলিউশন বা এজকে পরবর্তী প্রজন্মের মোবাইল ফোন প্রযুক্তি বলা হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত জিপিআরএস বা জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস প্রযুক্তির চেয়ে এটি অনেক আধুনিক প্রযুক্তি। এটিকে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি বলা হয়ে থাকে। তৃতীয় সিগন্যাল এ প্রযুক্তি জিপিআরএস প্রযুক্তির চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি গ্রাহক অপারেট করতে পারে এবং এর ডাটা সেনসিভেটি বা লোডিং ক্ষমতা প্রায় তিনগুণ বেশি। এজ্ মূলত সিগন্যাল ইন্টারফেসকে উন্নত করার মাধ্যমে কাজ করে থাকে। এজ্ প্রযুক্তি জিপিআর প্রযুক্তির চেয়ে কিছুটা ভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এর নাম 8PSK বা এইট ফেস সিফট্ কিং। এজ টিডিএমএ (টাইম ডিভিশন মাল্টিপল এক্সেস) ফ্রেস স্ট্রাকচার, লজিক চ্যানেল এবং ২০০ কিলোহার্জ ক্যারিয়ার ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে। অনান্য প্রযুক্তির চেয়ে এজ্-এর ভয়েস কমিউনিকেশনের ক্যাপাসিটি অনেক বেশি। এ নেটওয়ার্কের অধিক ধারণক্ষমতা ও দ্রুতগতির জন্য কনটেন্ট (ভিডিও ক্লিপ ছবি) ডাউনলোড ও যোগাযোগ হয় আরও দ্রুততর। এজ জিপিআরএস অর্থাৎ জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিসের উন্নত এবং আধুনিক সংস্করণ। এটি জিপিআরএস প্রযুক্তির চেয়ে ৮ গুণ বেশি দ্রুতগতি সম্পন্ন।

এজ্ ব্যবহারের সুবিধাসমূহ

এজ ব্যবহারে গ্রাহক এখন আরও উন্নত ও শক্তিশালী বিভিন্নপ্রকার সুযোগসুবিধা পাবেন। এজ ব্যবহার করে প্রয়োজন মাফিক যখন ইচ্ছে ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যাবে। এখন গ্রাহক আরও সহজে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে পারবেন। যে কোনো স্থানে (কাভারেজভুক্ত এলাকায়) বসে ইন্টারনেটে সংযোগ পাওয়া যাবে। এর অন্যতম আরেকটি সুবিধা হলো গ্রাহক যদি চান তাহলে তিনি তার ল্যাপটপ কম্পিউটারে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে মোবাইল ফোনটি ব্যবহৃত হবে মডেম হিসেবে। এছাড়াও একজন গ্রাহক এর সাহায্যে তার পারসোনাল একাউন্টের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন। এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-মেইল চেক করা যাবে। এতে রয়েছে এমএমএস বা মাল্টিমিডিয়া মেসেজ সুবিধা। এতে করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকেরা ছবি, শব্দ, অডিও ও ভিডিও ক্লিপ (১০০ কিলোবাইট পর্যন্ত) এনিমেশন ইত্যাদি টেক্সট মেসেজের সাথে যোগ করে পাঠাতে পারবেন। হাতের মোবাইল ফোনটিতে ক্যামেরা অপশন না থাকলেও ছবি, ভিডিও ক্লিপ, এনিমেশন, ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ালপেপার প্রভৃতি ডাউনলোড করা যাবে। এজ্-এ রয়েছে উন্নতমানের কনটেন্ট সুবিধা। এছাড়া এ প্রযুক্তির মাধ্যমে রিংটোন, গ্রাফিক্স, গান, মুভি, ক্লিপ, ভিডিও, অ্যানিমেশন লোগো প্রভৃতি চমৎকারভাবে ডাউনলোড করা যাবে। অনেক ইউজার মোবাইল ফোনে গেমস খেলতে খুব পছন্দ করেন। এ প্রযুক্তিতে তাও সম্ভব। এর মাধ্যমে মোবাইলে ইন্টারনেট থেকে বা কানেকশনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার গেমস ডাউনলোড করা যাবে এবং সেগুলো খেলা যাবে। এটি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় বিষয়। এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো মোবাইল ফোনে ব্রাউজ করার সময় কোনো কল এলে তা রিসিভ করা যাবে। কথা বলা শেষ হলে আবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাটা ট্রান্সফার শুরু হয়ে যাবে।

এজ্ ব্যবহারের জন্য যা প্রয়োজন

এজ্ প্রযুক্তি ব্যবহার করার অন্যতম দিক হলো এসএমএস বা মাল্টিমিডিয়া মেসেজিং সার্ভিস। এমএমএস পাঠাতে বা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে বা ব্রাউজ করতে কিংবা সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়, থিম, ক্লিপ, গেমস, ওয়ালপেপার, কালার লোগো,এনিমেশন প্রভৃতি ডাউনলোড করতে মাল্টিমিডিয়া সুযোগসমৃদ্ধ জিপিআরএস বা এজ্ সুবিধাসম্পন্ন হ্যান্ডসেট প্রয়োজন। এছাড়াও প্রয়োজন নেটওয়ার্কের সাবসক্রিপশন যা এজ্ সার্পোট করে। এর বাইরে সেটের অনান্য সেটিংস; যেমন- WAP, MMS কিংবা ইন্টারনেট সেটিং ঠিক করে নিতে হবে।

গ্রামীণ ফোন বর্তমানে যে সার্ভিস দিচ্ছে

স্বল্প পরিসরে চালু হওয়া EDGE -এর জন্য বর্তমানে যেসব সেবা পাওয়া যাবে সেগুলো হচ্ছে :

* ইন্টারনেট (ইয়াহু, গুগল প্রভৃতি) সার্চিং এবং ই-মেইল ব্যবহার।
* এমএসএস প্রেরণ ও গ্রহণ (ছবি, শব্দ, ভিডিও ক্লিপ, টেক্সট প্রভৃতি)
* এনিমেশন, ভিডিও ও অডিও ক্লিপ, উন্নতমানের রিংটোন এবং চমৎকার ও আকর্ষণীয় রঙ্গীন লোগো ডাউনলোড।

EDGE অ্যাকটিভ করা

EDGE প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে WAP, MMS, Internet (ইন্টারনেট) অ্যাকটিভ করতে হবে। এজন্য সর্বমোট তিনটি ম্যাসেজ পাঠাতে হবে। সেজন্য প্রথমে হ্যান্ডসেটের Message অপশনে গিয়ে New

Message কিংবা Write-এ (সেটে যেভাবে আছে) গিয়ে লিখতে হবে EDGE P1 তারপর এটি SMS করতে হবে 5000 নম্বরে। এরপর ফিরতি মেসেজে গ্রাহক জানতে পারবেন কিভাবে EDGE অ্যাকটিভ করতে হবে। বর্তমানে যেহেতু তিনটি সার্ভিস WAP, Internet এবং MMS চালু রয়েছে তাই এগুলোতে আলাদাভাবে অ্যাকটিভ করতে হবে নিম্নোক্তভাবে :

WAP অ্যাকটিভ করার জন্য

টাইপ করুন <Wap> <Handset name> <Model Number> এবং সেটি SMS করুন ৮০৮০ নম্বরে।
উদাহরণস্বরূপ : NOKIA 3220 Model এর সেটে WAP অ্যাকটিভ করার জন্য লিখুন "WAP Nokia 3220" এবং SMS করুন ৮০৮০ নম্বরে।

Internet অ্যাকটিভেট করার জন্য :

টাইপ করুন <Internet> <Handset name> <Model no> এবং SMS করুন ৮০৮০ নম্বরে।

MMS অ্যাকটিভেট করার জন্য :

টাইপ করুন <MMS> <Handset name> <Model no> এবং SMS করুন ৮০৮০ নম্বরে। ওপরের সার্ভিসগুলোর প্রতিটির জন্য গ্রাহক অনুরোধ করার পর প্রতিটি সার্ভিসের জন্য আলাদাভাবে Reply SMS পাওয়া যাবে। SMS গুলো সেভ করে রাখতে হবে। এর ৭২ ঘন্টার EDGE সার্ভিস অ্যাকটিভ হবে। তবে যেসব সেট এমএমএস ভিত্তিক সেটিংস এর উপযোগী নয় সেগুলো ম্যানুয়াল সেটিংস এর মাধ্যমে কনফিগার করতে হবে।

WAP সেটিংস-এর ক্ষেত্রে :

Profile/ settings name = GP-WAP
APN (Access Point Name) = gpwap
WAP Gateway
(Proxy) IP = 10.128.1.2
WAP Gateway (Proxy) Port = 8080
WAP Homepage = http:// wap.gp surf.net/gp
Data Bearer = GPRS

Internet সেটিংস এর ক্ষেত্রে

Profile / settings name = GP-INTER-NET
APN(Access Point Name) = gpinternet

MMS সেটিংস এর ক্ষেত্রে

Profile / settings name = GP-MMS
APN (Access Point Name) = gpmms
WAP Gateway (Proxy) 1P = 10.128.1.2
WAP Gateway (Proxy) Port = 8080
Realy Server URL = http://mms gpsurf.net/ servlets/mms
Data Bearer = GPRS

যদি সফলভাবে EDGE কানেকশনে যুক্ত হওয়া যায় তবে সেটে এর চিহ্নভিত্তিক আইকন দেখা যাবে। যেমন এরিকসন (Ericson) সেটের ক্ষেত্রে এটি হতে পারে উল্টানো কালো ত্রিভুজ, সিমেন্স (Siemens) সেটের [GPRS] আবার নোকিয়া (NOKIA) সেটের ক্ষেত্রে তা হতে পারে 'G' অতএব এ ধরনের কোনো চিহ্ন বা অক্ষর সেটে দেখা গেলে বোঝা যাবে গ্রাহক এ প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত হয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া ম্যাসেজ সার্ভিস (MMS)

EDGE -এর ব্যবহারের অন্যতম দিক হলো মাল্টিমিডিয়া মেসেজ সার্ভিস বা এমএমএস। অন্যভাবে বলা যায় EDGE -এর মূল ব্যবহারই এটি। এর মাধ্যমে আকর্ষণীয়, গুরুত্বপূর্ণ বা চমৎকার মুহূর্তগুলো গ্রাহক শেয়ার করতে পারবেন। পাঠাতে পারবেন দারুণ সব মাল্টিমিডিয়া মেসেজ, বিভিন্ন তোলা ছবি, ভিডিও ক্লিপ, শব্দ, অ্যানিমেশন, লোগো সবকিছুই এ সার্ভিসের মাধ্যমে শেয়ার করা যাবে।

এমএমএস পাঠানোর উপায়

কাউকে এমএমএস (MMS) করা খুব সহজ। এজন্য নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে পারেন (অবশ্য সেটভেদে তা কিছুটা ভিন্ন হতে পারে)।

1. Message menu-তে যান।
2. Multimedia Message Select করুন
3. Create Message Select করুন।
4. মেসেজটি লিখে 'Option'-এ Click করুন।
5. Insert image Select করুন, তারপর ইমেজ ফাইল খুলে পছন্দের ছবিটি Select করুন।
6. Insert Sound Select করুন, তারপর সাউন্ড ফাইল খুলে পছন্দের অডিও ফাইলটি Select করুন।
7. চাইলে গ্রাহক আরও স্লাইড ইনসার্ট করতে পারবেন।
8. কনফার্মেশনের পর Option Select করুন
9. 'Send to number' Select করে কাঙ্ক্ষিত নম্বরটি লিখে Send বাটনে ক্লিক করে পাঠিয়ে দিন।

তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ই-মেইল করা যাবে সেক্ষেত্রে Send to email Select করে MMS করতে হবে। ই-মেইল করা যাবে Yahoo, hotmail, gmail বা অনান্য মেইলে। মনে রাখতে হবে প্রতিটি মেসেজের সাইজ যেন ১০০ কিলোবাইটের মধ্যে হয়।

ওয়েব সাইটে ব্রাউজিং

যদি গ্রাহক ওয়েব সাইটে ব্রাউজ করতে চান তাহলে জিপিআরএস বা এজ্ সুবিধা সম্পন্ন হ্যান্ডসেট থাকতে হবে। এজ্ কনফিগার করার পর গ্রাহক ব্রাউজিং করতে পারবেন। নিচে বেশ কয়েকটি সাইটের ঠিকানা দেয়া হলো যেখানে হ্যান্ডসেটের মাধ্যমে ব্রাউজ করা যাবে।

http:// wap.hollywood.com
http:// wap.gpsurf.net/gp
http:// cricket only.com
http:// wap.livescore.com
http:// wap.pt.com
http:// wap.cricket.online.org
http:// mobile.msn.com
http://www.bbc.co.uk
http://mobile.yahoo.com
http://mobile.google.com

এক্ষেত্রে গ্রাহক কনটেন্ট ডাউনলোড করতে পারবেন। এজন্য যেতে হবে http://wap.gpsurf.net/gp তে। এখানে ঢোকার পর প্রচুর রিংটোন, ওয়ালপেপার, অ্যানিমেশন, লোগোসহ অনেককিছু পাবেন।

এজ্ বিল্ডিং সিস্টেম (প্যাকেজ)

বর্তমানে এ সার্ভিস দুভাবে পাওয়া যাবে। প্রথমটিতে কোনো মাসিক ফি নেই। শুধুমাত্র ইন্টারনেট ব্যবহারে কিংবা ডাউনলোড করার জন্য চার্জ দিতে হবে। কনটেন্ট ডাউন লোড করার ক্ষেত্রে চার্জ আলাদা। এ পদ্ধতিতে প্রতি কিলোবাইট ব্রাউজ করতে ০.০২ টাকা চার্জ দিতে হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শুধুমাত্র পোস্ট-পেইড গ্রাহকদের জন্য। এতে গ্রাহক ১০০০ টাকায় পুরোমাস ব্রাউজ করতে পারবেন। তবে কনটেন্ট ডাউনলোড করার ক্ষেত্রে আলাদা চার্জ লাগবে।

এজ্ কনটেন্টগুলোর মধ্যে টোনস ২০ টাকা, পলিফোনিক টোনস ১৫ টাকা, ওয়ালপেপার ১০ টাকা, থিমস ২০ টাকা, এনিমেশন ১০ টাকা, জাঁকা গেমস ৪০ টাকা, ভিডিও ক্লিপ ৩০ টাকা ও কালার লোগো ১০ টাকা। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এর সাথে ১৫% ভ্যাট দিতে হবে।

বাংলাদেশে এজ্-এর ভূমিকা

সমগ্র প্রযুক্তিকে সাথি করে অনেক দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হলে প্রযুক্তিকে অবশ্যই সমর্থন করতে হবে। EDGE চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশের আইসিটি খাত একটি নতুন স্তরে প্রবেশ করবে এবং গ্রামীণফোনের কাভারেজভুক্ত এলাকার মধ্যে সর্বত্র মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে মোবাইল ফোন ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস করার অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে শতকরা ১ ভাগেরও কম মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ আছে।

সুতরাং আশা করা যায় এ প্রযুক্তি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেই সাথে এটি খুলে দেবে এদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের নতুন সম্ভাবনার দুয়ার।

জোনাকি পোকা আলো পায় কোথা থেকে?

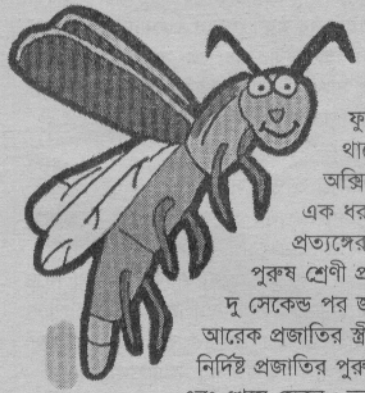

সাধারণত বসন্তের শেষে বা গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় গ্রামের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে জোনাকি পোকা উড়ে বেড়ায়। অন্ধকারে শুধু দেখা যায় কিছু আগুনের ফুলকি জ্বলছে আর নিভছে। জোনাকি পোকার আলোর ফুলকি সৃষ্টির নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে। জোনাকির পেটের পিছনের দিকে আলোক সৃষ্টির বিশেষ প্রত্যঙ্গটি থাকে। এ প্রত্যঙ্গ থেকে লসিফেরিন নামক এক ধরনের পদার্থ নিঃসৃত হয়, যা শ্বাসনালি দ্বারা গৃহীত অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে জ্বলে ওঠে। এই জারন-প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটিয়ে কাজ করে লুসিফেরেজ নামক এক ধরনের এনজাইম। আলোর ফুলকি সৃষ্টির সময়কাল নিয়ন্ত্রিত হয় জোনাকির দেহের আলো সৃষ্টির প্রত্যঙ্গের স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা। বিশ্বের অনেক প্রজাতির জোনাকি রয়েছে। আমেরিকায় এক ধরনের জোনাকির পুরুষ শ্রেণী প্রতি পাঁচ সেকেন্ড অন্তর জ্বলে ওঠে আর এর প্রতিক্রিয়ায় মাটিতে অপেক্ষমাণ স্ত্রী জাতীয় জোনাকি প্রায় দু সেকেন্ড পর জ্বলে ওঠে। এভাবে তারা পরস্পর মিলিত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সংকেত আদান-প্রদান করে। আমেরিকার আরেক প্রজাতির স্ত্রী জাতীয় জোনাকি ভিন্ন কোনো প্রজাতির জোনাকির অনুকরণে আলো জ্বালে। এতে আকৃষ্ট হয়ে ওই নির্দিষ্ট প্রজাতির পুরুষ জাতীয় জোনাকি যেই না কাছে আসে, অমনি প্রথমোক্ত স্ত্রী জাতীয় জোনাকি তাকে আক্রমণ করে এবং খেয়ে ফেলে। তবে বেশিরভাগ জোনাকি ফুলের রেণু বা মধু খায়, অর্থ বা বলতে গেলে তেমন কিছু খায় না।

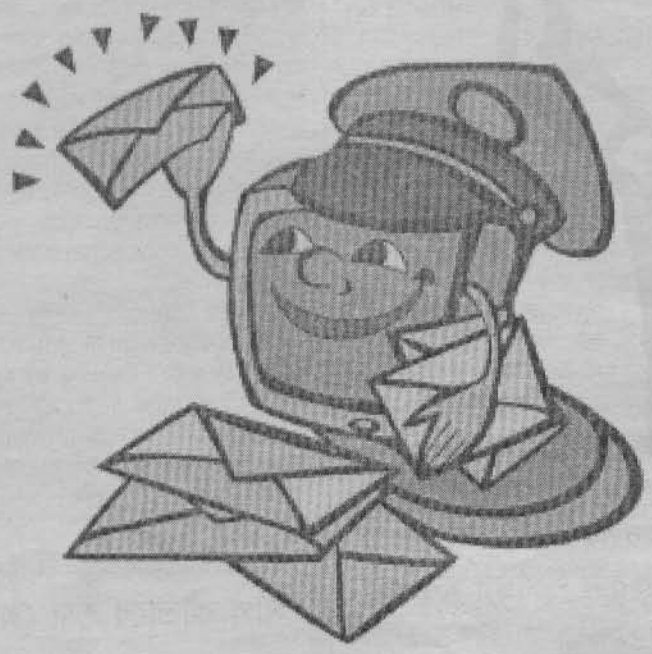

ই-মেইলের নিয়ন্ত্রণ কৌশল

মোঃ গোলাম মোস্তফা

ই-মেইল হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক মেইল যা বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি যোগাযোগের মাধ্যম। ই-মেইলের আবির্ভাবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা ঘটেছে। পোস্টাল সার্ভিস ও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা যেমন চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে পারি তেমনি কম্পিউটারের সাহায্যেও চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা যায়। কম্পিউটারের সাহায্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের এ ব্যবস্থাকে বলা হয় ই-মেইল। এ ই-মেইল আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে আরও দ্রুততর এবং পরিকল্পিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু নিয়মকানুন সম্পর্কে জানব।

মাইক্রোসফট আউটলুক : মাইক্রোসফট আউটলুক ব্যবহারকারীরা এর কিছু প্রয়োজনীয় টিপস এবং অ্যাড ইনগুলো ব্যবহার করে তাদের ই-মেইল ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারেন।

শর্টকাট কি : মাইক্রোসফট আউটলুকের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাট কি রয়েছে। যেগুলো আমরা ব্যবহার করে আউটলুককে আরও সহজতর এবং দ্রুত করে তুলতে পারবো। যেমন- আপনি যদি একসাথে (Ctrl+Shift+I) চাপ দেন তাহলে দেখবেন সাথে সাথে ইনবক্স (Inbox) ফোল্ডারটি ওপেন হবে। একইভাবে আউটবক্স ওপেন করার জন্য (Ctrl+Shift+O) কিগুলো ব্যবহার করতে হবে।
যদি ক্যালেন্ডার নিয়ে কাজ করার সময় তাৎক্ষণিকভাবে সাপ্তাহিক থেকে মাসিক ব্যবস্থায় এবং মাসিক থেকে সাপ্তাহিক ব্যবস্থায় আসতে হয় তাহলে [Alt + (–) + (=)] কিগুলো ব্যবহার করুন।

ক্যালেন্ডার প্রিন্ট করা : অনেক সময় হয়তো জরুরি ভিত্তিতে সাপ্তাহিক বা মাসিক কিছু ক্যালেন্ডারের প্রিন্ট আপনার প্রয়োজন হতে পারে। মাইক্রোসফট আউটলুকের সাহায্যে এ কাজটি করতে পারবেন। এজন্য আপনাকে 'Calender' আইকনটি ক্লিক করে 'New Folder' সিলেক্ট করুন। এরপর এই নতুন ফোল্ডারটির জন্য একটি নাম টাইপ করে OK বাটন সিলেক্ট করুন। এরপর নতুন তৈরি করা ফোল্ডারটি সিলেক্ট করে পছন্দমতো স্টাইলে প্রিন্ট করুন।

সময় সংযোজন : যদি ই- মেইলের কোনো জায়গায় সময় উল্লেখ করতে চান তাহলে আউটলুকের কিছু শর্টকাট কি ব্যবহার করতে পারেন। যেমন— আপনার মেইলে যদি 5pm টাইপ করার প্রয়োজন হয় তাহলে শুধুমাত্র 5p টাইপ করুন। ঠিক একইভাবে যদি 7am এর জন্য শুধুমাত্র 7a টাইপ করুন।

ই-মেইলকে সজ্জিত করুন : অনেক সময় দেখা যায় গৃহীত অনেক মেইলে Subject উল্লেখ করা থাকে না। যার ফলে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় মেইলটি খুঁজে পেতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। এ ধরনের সমস্যা এড়াতে মেইলটি ওপেন করুন এবং সাবজেক্ট লাইনটির ওপর ক্লিক করুন। এবার মেইল অনুযায়ী টাইটেল টাইপ করার পর সেভ করুন।

কনটাক্ট ফরওয়ার্ড করা : কনটাক্ট লিস্টের মাধ্যমে অপর কোনো ব্যক্তিকে ফরওয়ার্ড করতে চাইলে Contacts এর ফোন লিস্ট টাইটেল বারটি ওপেন করুন। এবার আপনার পছন্দ অনুযায়ী এক বা একাধিক এড্রেস সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করুন এবং ফরওয়ার্ড আইটেমস সিলেক্ট করুন। এরপর সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির ই-মেইল এড্রেস লিখে সেন্ড (Send) আইকনটিতে ক্লিক করুন।

পিএসটি (Pst) ফাইল নিয়ন্ত্রণ : মাইক্রোসফট আউটলুকে প্রতিটি ই-মেইলে পিএসটি (Pst) এক্সটেনশন সহকারে একটি নির্দিষ্ট ফাইলে সংরক্ষিত হয়। এ ফাইলটির ডাটা সাইজ সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকে। ফলে পরবর্তীতে তা সমস্যার কারণ হিসেবে দাঁড়াতে পারে। এ সমস্যার কবল হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনি একটি নির্দিষ্ট ফাইলের পরিবর্তে একাধিক ডাটা ফাইল তৈরি করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পার্সোনাল মেইলের জন্য একটি, ডিপার্টমেন্টাল মেইলের জন্য একটি, অফিসিয়াল মেইলের জন্য একটি ইত্যাদি এরকম আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক পৃথক ডাটা ফাইল তৈরি করতে পারেন।

নতুন কোনো ডাটা ফাইল তৈরির জন্য File>data File Management এবং Personal Folder File (*.pst) সিলেক্ট করুন এবং নতুন ডাটা ফাইলটির নাম টাইপ করে Ok বাটন চাপুন। এখন আপনার কাছে আসা

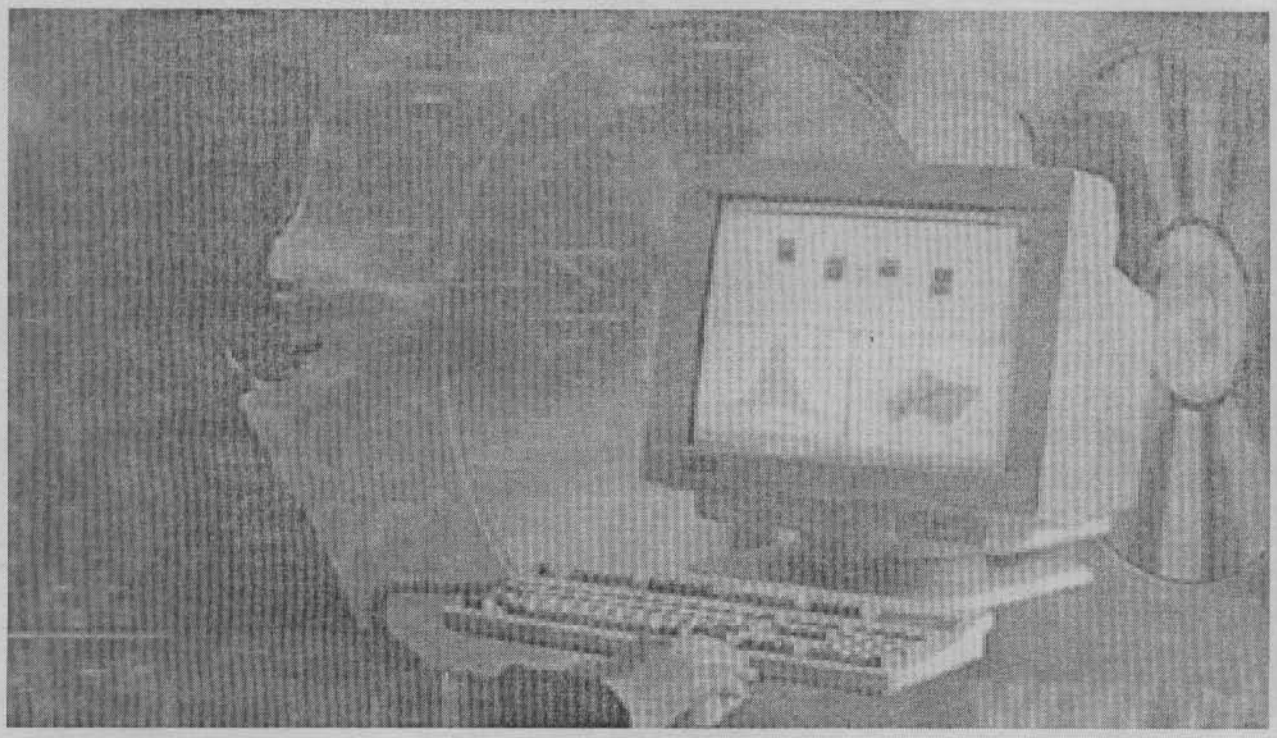

মেইলগুলো সরাসরি নির্দিষ্ট ডাটা ফাইলে সংরক্ষণের জন্য আপনাকে নতুন করে ই-মেইল সংরক্ষণের নিয়মাবলিকে পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

অ্যাড ইন করা : মাইক্রোসফট আউটলুকের জন্য বেশ কিছু অ্যাড ইন রয়েছে সেগুলোর কাজকে অটোমেইট করে দিবে। এই অ্যাড ইনগুলো ইন্টারনেট থেকে সহজেই ডাউনলোড করা সম্ভব। এখানে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য অ্যাড ইন নিয়ে আলোচনা করা হলো।

এটাচমেন্ট নিয়ন্ত্রণ : এটাচমেন্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য অসংখ্য অ্যাড ইন রয়েছে। এগুলো ই-মেইল থেকে এটাচমেন্টগুলো আলাদা করে একটি ভিন্ন ফোল্ডারে সংরক্ষণ করে। একই সাথে এই অ্যাড ইনগুলো সংরক্ষিত এটাচমেন্ট ফাইলের লিংক ই-মেইল স্থাপন করে। এরকম একটি অ্যাড-ইন হলো TODI. এ অ্যাড ইন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে www. aufgang.org ওয়েবসাইটে।

অটো প্রিন্ট : অটোপ্রিন্ট অ্যাড ইনগুলো মূলত অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এমন অনেক অফিস আছে যেখানে তাৎক্ষণিকভাবে ই-মেইল প্রিন্ট করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু অটো প্রিন্ট অ্যাড-ইন আউটলুকে কোনো নতুন ই-মেইল আসার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রিন্ট আউট করে দিবে। এরকম অ্যাড-ইন পাবেন www. sperrysoftware.com ওয়েব সাইটে।

টাইপ স্ট্যাম্প : অনেক সময় দেখা যায় আপনার পাঠানো একটি ই-মেইল কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌছাতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যায়। অনেক সময় ব্রডব্যান্ডের ক্ষেত্রেও এ ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এমন

এমন অনেক অফিস আছে যেখানে তাৎক্ষণিকভাবে ই-মেইল প্রিন্ট করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু অটো প্রিন্ট অ্যাড-ইন আউটলুকে কোনো নতুন ই-মেইল আসার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রিন্ট আউট করে দিবে।

কিছু অ্যাড ইন রয়েছে যেগুলো আপনি কোনো মেইল পাঠানোর সাথে সাথে মেইলটির সাথে আপনার মেইল পাঠানোর সুনির্দিষ্ট সময় এবং তারিখ সংযুক্ত করে দিবে। এ ধরনের অ্যাড-ইন পাওয়া যাবে www.sperrysoftware.com ওয়েব সাইটে।

অটো জিপ এটাচমেন্ট : এধরনের অ্যাড-ইন ই-মেইল পাঠানোর সময় বাঁচাতে সাহায্য করবে। অনেক সময় বড় একটি এটাচমেন্ট ফাইলসহ কোনো ই-মেইল পাঠানো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। অটো জিপ অ্যাড-ইনগুলো আপনার যে কোনো ই-মেইলের সাথে সংযোগ করা এটাচমেন্ট ফাইলগুলোকে জিপ ফাইলে পরিণত করে। কোনো ই- মেইল পাঠানোর আগেই এই অ্যাড-ইনটি এটাচ ফাইলকে জিপ করে। যার ফলে ই-মেইল পাঠাতে অনেক কম সময় ব্যয় হয়। এমন একটি অ্যাড ইন হলো bx-av-to-zip. এ অ্যাড-ইনটি পাওয়া যাবে www.baxbex.com ওয়েব সাইটে।

রিমেইন্ডার অ্যাড-ইন : এ ধরনের অ্যাড ইনগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে আপনার বন্ধুকে, সহকর্মীকে এমনকি নিজেকেও ই-মেইল পাঠাতে পারবেন। এ ধরনের অ্যাড-ইনের সাহায্যে আপনি কোনো ই-মেইল লিখে এর প্রাপকের ই-মেইল এড্রেস এবং প্রাপকের কাছে মেইলটি পাঠানোর সুনির্দিষ্ট সময় লিখে সংরক্ষণ করে রাখলে অ্যাড-ইনটি পরবর্তীতে আপনার নির্ধারিত সময়ে প্রাপকের কাছে ই-মেইলটি পাঠিয়ে দিবে। এ অ্যাড-ইনটি পাওয়া যাবে www. sperrysoftware.com ওয়েব সাইটে।

অটোরিপ্লাই : অনেক সময় দেখা যায় আপনার মেইল বক্সে আসা প্রতিটি ই-মেইলের উত্তর দেয়া আপনার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে অ্যাড-ইন এ আগত ই-মেইলের বিষয়বস্তু অনুযায়ী তার ওপর পূর্বে সংরক্ষণ করা ই-মেইলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠাতে পারে।

এজন্য অ্যাড-ইনটির সেটআপ এমন হতে হবে যেন তা কোনো মেইলে Business বা Invitation এ এরকম কিছু নির্দিষ্ট শব্দ খুঁজে পেলে তার পূর্বে লিখে রাখা মেইলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠিয়ে দিবে। আপনি এ ধরনের অ্যাড-ইন পাবেন www. nextword.com ওয়েব সাইটে।

এস এম এস : এ ধরনের অ্যাড-ইনের সাহায্যে আপনি কোনো ব্যক্তির ই-মেইল এড্রেসের স্থানে তার মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে ইন্টারনেটের সাহায্যে তার মোবাইলে এসএমএস পাঠাতে পারবেন।

এ অ্যাড-ইনটি পাওয়া যাবে www. tamingthebest.net ওয়েব সাইটে।

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৫ ● সংখ্যা ৪৯ ● জানুয়ারি ২০০৬

বাংলাদেশ ঘুরে গেলেন তথ্যপ্রযুক্তির অধীশ্বর

বিল গেটস

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | স্টিফেন হকিং-এর জন্মবার্ষিকী

বেস্ট টেকনোলজি অব দ্য ইয়ার ২০০৫ | ভূমিকম্প : কতটা প্রস্তুত বাংলাদেশ?
সেরা গেমস-এর ইতিবৃত্ত | ডিজিটাল জগতের ধনী-দরিদ্র
পিঁপড়াদের রহস্যময় চলাফেরা

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-কম্পিউটার-স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ম্যাগাজিন

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৫ সংখ্যা ৪৯ জানুয়ারি ২০০৬

সম্পাদক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

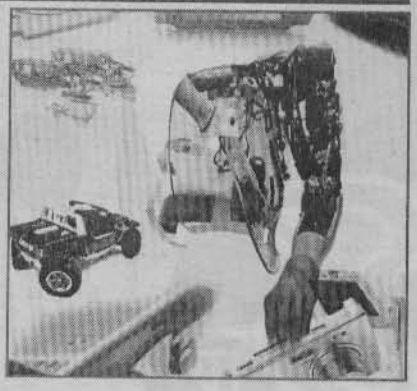

সহযোগী সম্পাদক
এস এম মুকুল

সহকারী সম্পাদক
সরোয়ার হোসেন

অতিথি লেখক
মাসুদ কামাল
ড. অরূপ রতন চৌধুরী
ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল

নিয়মিত লেখক
আসিফ, রেহানা পারভীন রুমা
পারভীন সুলতানা, শাম্তা মারিয়া
ফারহানা মিলি, হিটলার এ হালিম
মাহবুব আনোয়ার শুভ, শফি ইসলাম
মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাদাত শাহরিয়ার
এ কে এম মুনির হোসেন
আনোয়ারুল হক খান

সার্কুলেশন
আমিনুল ইসলাম সোহাগ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫০৯৫
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৭১২৩৯১৩

বিপণন
৩৭/১, বাংলাবাজার, দ্বিতীয় তলা
ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫০৫৪,০১৭১-১২০৭০১

মূল্য : পনের টাকা

প্রফেসর'স প্রকাশন, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত।

ই-মেইল : editor_sworld@yahoo.com

এ সংখ্যার সূচি

প্রচ্ছদ রচনা
বাংলাদেশ ঘুরে গেলেন তথ্যপ্রযুক্তির অধীশ্বর
৯ বিল গেটস

বেস্ট টেকনোলজি অব দ্য ইয়ার
২০০৫ ১৮

পার্শ্ব রচনা ১৪
সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞান ব্যক্তিত্ব ৮
স্টিফেন হকিং

২৭ ভূমিকম্প
কতটা প্রস্তুত বাংলাদেশ

অন্যান্য রচনা

শিশুদের মানসিক সমস্যা /২১
পরিবেশ বান্ধব হাইব্রিড গাড়ি /২২
পিঁপড়ার রহস্যময় চলাফেরা /৩০
সুস্থ সুন্দর দাঁতের যত্ন /৩২
অরবিস : উড়ন্ত হাসপাতাল /৩৪
সোলার হোম সিস্টেম /৩৭
ডিজিটাল জগতের ধনী-দরিদ্র /৩৯
সেরা গেমস-এর ইতিবৃত্ত /৪১

নিয়মিত বিভাগ

৩ চিঠিপত্র
৪ বিজ্ঞান বিশ্বের নতুন খবর
৫ স্বাস্থ্য সংবাদ
৬ প্রযুক্তির খবর
৭ মহাকাশ বার্তা
বিজ্ঞান প্রজন্ম ২৪
বিতর্ক ৩৬
সায়েন্স ফিকশন : রক্তশূন্যতা ৪৪
বিজ্ঞান কুইজ ৪৭

গাড়ি চালাতে লিকুইড অটোগ্যাস

বাংলাদেশে গাড়ির জ্বালানিতে এসে গেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সিএনজি গ্যাসের সিলিন্ডার বিতর্কের মধ্যেই এখন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপি গ্যাস) দিয়ে চালানো যাবে যে কোনো মোটর গাড়ি। এতে গাড়ির ইঞ্জিনের সুরক্ষা হবে। রক্ষণাবেক্ষণ হবে সহজতর। সিএনজিচালিত গাড়ির কার্যকর বিকল্প হয়ে

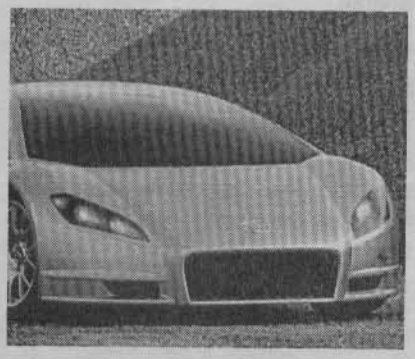

উঠবে বলে এ লিকুইড অটোগ্যাস ইতোমধ্যে ৩০টির বেশি গাড়ি এলপিজিতে কনভার্ট করা হয়েছে। সেগুলো ভালোভাবে রাস্তায় চলাচল করছে বলে জানালেন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা। বাংলাদেশে 'ক্লিনহিট অটোগ্যাস' নামে সিলিন্ডারজাত অটোগ্যাস বাজারজাত করছে ওয়েসফার্মার্স ক্লিনহিট এলপিজি লিমিটেড। সম্প্রতি চালু হওয়া এ নতুন জ্বালানিতে ঢাকায় ১০টি এবং খুলনা, যশোর অঞ্চলে ২০টি গাড়ি চলছে। এতে গাড়ির জ্বালানি ব্যয় প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। ৪৫ টাকা লিটারের অকটেনের পরিবর্তে অটোগ্যাসের দাম পড়ছে ২৭ টাকা।

ক্লিনহিট এলপিজির পরিবেশক ট্রান্স (বিডি) এনার্জি লিমিটেডের সূত্রে জানা গেছে, অটোগ্যাসের সব সিলিন্ডার এক আয়তনের হবে। ৪৮ লিটারের একটি সিলিন্ডারের ওজন হবে ১৯ কেজি। এ এলপিজিতে ১৩০০ সিসি'র গাড়ি ৩শ কিলোমিটারের বেশি পথ যাতায়াত করতে পারে। এ দূরত্বের জন্য এলপিজিতে খরচ পড়বে ৬৭৫ টাকা এবং অকটেনে খরচ পড়বে ১১২৫ টাকা। সাশ্রয় হবে অর্ধেকের কাছাকাছি। সবচেয়ে বড় কথা সিএনজিতে মনোকার্বন সিস্টেমের কারণে ইঞ্জিন বেশি গরম হয় ও ক্ষতি হয়। এলপিজিতে ইঞ্জিনের তেমন কোনো ক্ষতিই হয় না। বাংলাদেশে নতুন হলেও এলপিজিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দীর্ঘদিন ধরে গাড়ি চলছে। ক্লিনহিট অটোগ্যাস ২০ বছর ধরে এলপিজিতে গাড়ি চালাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়। এশিয়ার মধ্যে চীন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ায় গাড়িতে ব্যাপক হারে লিকুইড অটোগ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসে বিশ্বের অনেক দেশে গাড়ি চলছে। এটি সিএনজি গ্যাসের মতোই বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

রোবোটিক সার্জারি চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন মাত্রা

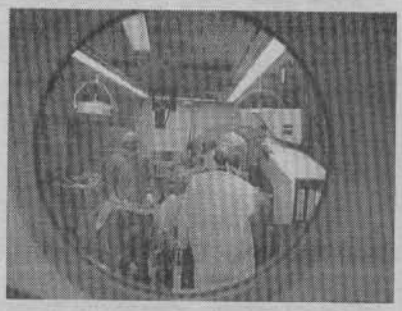

রোবোটিক সার্জারি চিকিৎসাক্ষেত্রে এক নতুন সংযোজন। রোবোটিক সার্জারির মাধ্যমে জটিল অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে কম রক্তপাত ঘটে এবং ব্যথার পরিমাণও কমিয়ে আনা যায়। আর তাই সার্জারির ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণও কমে যায়। এছাড়া রোগী খুব দ্রুত সেরে ওঠেন বলে হাসপাতালে বেশিদিন অবস্থানেরও প্রয়োজন হয় না। এমনকি প্রস্টেট ক্যান্সারের মতো রোগী অপারেশনের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাঁটতে সক্ষম হয়েছেন এবং পরের দিনই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন এমন নজিরও স্থাপিত হয়েছে।

রোগী অপারেশনের তিন-চারদিনের মধ্যেই প্রতিদিন কয়েক মাইল একনাগাড়ে হেঁটে যাওয়া, মাত্র ১০ দিনের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে যোগদান, তিন সপ্তাহের মধ্যে খেলাধুলা করা এমনকি মাত্র দু'মাসে স্বাভাবিক রেচন প্রক্রিয়া এবং যৌনক্রিয়ায় অংশ নিতে সক্ষম হয়েছেন এমন নজিরের কথা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক প্রেসবাইটেরিয়ান হসপিটালের রোবোটিক প্রস্টেটেকটোমি'র ডিরেক্টর ড. আশুতোষ তেওয়ারি। রোবোটিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে জটিল সব সার্জারি আজ এতটাই নিখুঁত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে, যা কিছুদিন আগেও ছিল কল্পনার বিষয়। হার্ট বাইপাস সার্জারি থেকে শুরু করে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টের মতো জটিল প্রায় ৩৬ হাজার ৬শ রোবোটিক সার্জারি এ বছর সম্পন্ন করা হয়েছে। বৃদ্ধির দিক থেকে এটি গত বছরের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেশি। বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, ২০০৬ সালেই এটি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৭০ হাজারে দাঁড়াবে।

দক্ষ সার্জনদের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে রোবোটিক সার্জারির কাজ। সার্জনরা সাধারণত একটি ঘরে বসেই সব কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন। তারা একটি কনসোলের সামনে বসে দুটি নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অতি ক্ষুদ্র সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি চালিয়ে থাকেন। এসব যন্ত্র অ্যাডজাস্টেবল রোবোটিক বাহুর সাথে যুক্ত থাকে। ফলে দক্ষতার সাথে কাজ করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে রোগীর দেহে মাত্র চার-পাঁচবার কাটাছেঁড়ার প্রয়োজন পড়ে। একজন সার্জিক্যাল সহকারী অতিক্ষুদ্র ক্যামেরা ও বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি কলম আকৃতির অতিক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেন। এগুলো রোবোটিক বাহুতে যুক্ত থাকে। এ অস্ত্রোপচারে ফোরসেপ বা কাঁচিও নিয়ন্ত্রিত হয় রিমোটের মাধ্যমে। ক্যামেরা থেকে গৃহীত ইমেজ দশ গুণ বাড়িয়ে সার্জনদের সামনে থাকা থ্রিডি মনিটরে প্রদর্শিত হয় এবং সার্জন তখন দ্রুত ও দক্ষভাবে অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হন।

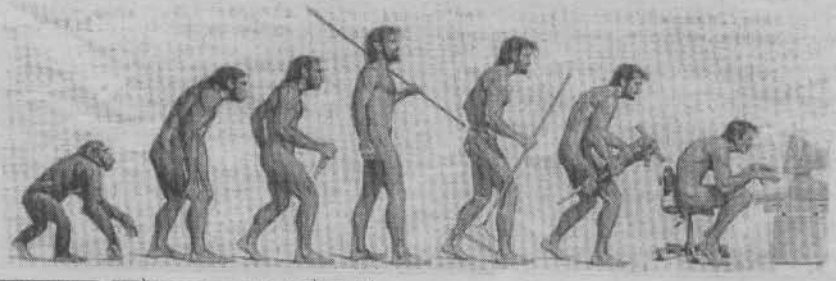

অমরত্ব লাভ করছে মানুষ!

মানুষ অমরত্ব লাভ করতে চায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানও তাদের আকাঙ্ক্ষার ধীরে ধীরে পূর্ণতা দিয়ে যাচ্ছে। এমনকি অনুন্নত দেশগুলোর মানুষেরও গড় আয়ু ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বর্তমানে ৬৩ বছর। ৫৫ বছর আগে পৃথিবীর মানুষের কাঙ্ক্ষিত আয়ু ছিল ৪৭ বছর। গত শতকের শেষ দিকে এসে তা ৬৬ বছরে দাঁড়ায়। দরিদ্র দেশগুলোর মানুষও এক্ষেত্রে ধনী দেশের মানুষের কাছাকাছি গড় আয়ু লাভ করতে যাচ্ছে।

আগামী ২০২৫ সালে পৃথিবীর মানুষের কাঙ্ক্ষিত আয়ু হবে ৭৩ বছর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এ তথ্য প্রকাশ করেছে। চমকপ্রদ তথ্য হলো, যদি পৃথিবীবাসীর কাঙ্ক্ষিত আয়ুষ্কাল ৭০ বছর থেকে উন্নীত করে ৮০ বছর করা যায়, তবে মানুষের ১০০ বছর আয়ুষ্কাল লাভ করা খুবই সহজ হবে। আমরা এ ব্যাপারে আশাপ্রদ হতে পারি, মানুষের সুস্বাস্থ্য অর্জনের সাথে সাথে আয়ুষ্কালও বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞরা এখন কাঙ্ক্ষিত সুস্বাস্থ্যের সাথে কাঙ্ক্ষিত অয়ুষ্কাল একত্রে হিসাব করতে শুরু করেছে। আর মানুষের এ দীর্ঘায়ু অর্জনের এ ধারা এ পৃথিবীকে ক্রমশ পাল্টে দেবে। কে জানে, হয়তো একদিন মানুষ সত্যি সত্যি চিরযৌবনা হবে; অমর হবে।

বিবাহ-পূর্ব রক্ত ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা জরুরি

বিয়ে সন্তান জন্মদান ও বংশবিস্তারে সর্বজন স্বীকৃত প্রক্রিয়া। 'সেটেল ম্যারেজ' কিংবা যারা আবেগপ্রবণ সম্পর্কের মাধ্যমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তারা যোগ্যতা, গুণাবলী, আর্থিক সঙ্গতি ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দিলেও 'বিবাহ-পূর্ব স্বাস্থ্য পরীক্ষা' অত্যন্ত জরুরি। ছেলে বা মেয়ের যদি কোনো প্রকার জটিল সমস্যা থাকে তবে তা বিয়ের আগেই চিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে নেয়া জরুরি। তাছাড়া একজন পুরুষের যদি কোনো সমস্যা থাকে তবে একজন নিষ্পাপ, সুস্থ মেয়েকে বিয়ে করে সারাজীবন তাকে নিঃসন্তানভাবে আবদ্ধ করে রাখার কোনো যুক্তি নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, থ্যালাসেমিয়া রোগের শতকরা ৫০ ভাগ মায়ের বংশ থেকে আর ৫০ ভাগ পৈতৃক বংশ থেকে আসে। মা ও বাবা উভয়ে এ রোগের বাহক হলে ২৫ শতাংশ শিশু হবে রোগাক্রান্ত, ৫০ শতাংশ শিশু রোগের বাহক এবং মাত্র ২৫ শতাংশ শিশু হবে সুস্থ। এসব রোগাক্রান্ত শিশু ১৫-২০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। RH+ve পুরুষের সঙ্গে RH-ve (আরএইচ নেগেটিভ) মহিলার বিয়ের পর তাদের সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় এন্টিজেন বৃদ্ধি পায় এবং দুটি বিপরীতধর্মী এন্টিজেনের কারণে বারবার মৃত সন্তান জন্ম দেয় অথবা শিশু জন্মের পর মারাত্মক রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এসব কারণে বলা হয়, সুস্থ, সুন্দর, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনে বিবাহ-পূর্ব রক্ত ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা জরুরি।

ক্যান্সার ম্যাপ আবিষ্কার

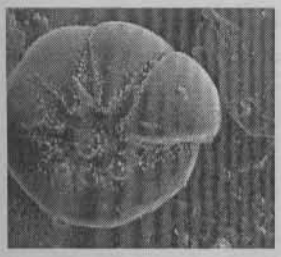

প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত এলাকা থেকে ক্যান্সার কিভাবে শরীরের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে - এ বিষয়টি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানী-রা। এ আবিষ্কার বিভিন্ন ঘাতকব্যাধির চিকিৎসা ও প্রতিরোধের নানা দিক উন্মোচন করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এতদিন ধারণা ছিল, ক্যান্সার রোগে শরীরের যে কোনো একটি কোষ প্রথমে টিউমার আকারে ছড়িয়ে পড়ে। পরে এর আক্রান্ত কোষের অংশ রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে শরীরের অন্য প্রত্যঙ্গে পৌছায় এবং সেখানে দ্বিতীয় একটি টিউমার সৃষ্টি করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা বলছেন, শরীরের নতুন এলাকা বা প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ার আগে ক্যান্সারের জীবাণু প্রথমে সেখানে প্রতিনিধি পাঠায়, যাকে বলা যায় জীবাণু প্রতিনিধি। এসব জীবাণু প্রতিনিধিকে মাঝপথে বাধাগ্রস্ত বা ওষুধের মাধ্যমে এদের কার্যক্রমকে প্রতিরোধ করা গেলে ক্যান্সারের বিস্তার ঠেকানো যেতে পারে।

ঝগড়া বিবাদ শরীরের জন্য ক্ষতিকর

সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে গবেষকরা জানিয়েছেন, অসুখী দম্পতিদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ তাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত ওই রিপোর্টে জানানো হয়, দাম্পত্য কলহ থেকে যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় তা রক্তে প্রোটিনের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দেয়। অসুখী দম্পতিদের জন্য বড়ই দুঃসংবাদ! এসব দম্পতির দাম্পত্য কলহ কেবল সংসারেই অশান্তির সৃষ্টি করে না বরং তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে তাদের স্বাস্থ্যের। গবেষকরা গবেষণা করে দেখেছেন, সুখী দম্পতিদের চেয়ে অসুখী দম্পতিদের ক্ষত বা ঘা নিরাময় হতে দীর্ঘ সময় লাগে। এছাড়া এ ধরনের অসুখী দম্পতিদের বিষাদগ্রস্ততা, উচ্চ রক্তচাপসহ হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বেশি থাকে।

স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে সতর্কতা

স্তন ক্যান্সার এমনই ক্ষতিকর রোগ যা মানবদেহের কোষ কলায় আক্রমণ করে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যায়। স্তনের মধ্যে পিণ্ড হলেই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন এমনটি ভাবার কারণ নেই। চল্লিশোর্ধ্ব মহিলারাই স্তন ক্যান্সারে বেশি ভোগেন। স্তন ক্যান্সার সাধারণত স্তনের মধ্যে মাংসপিণ্ড শক্ত এবং বোঁটার আকৃতি পরিবর্তন হয়ে পরে ধীরে ধীরে টিউমারে পরিণত হয়। যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করে দেখেছেন, গড়ে ১০ জন মহিলা এ সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা নিতে আসলে তাদের মধ্যে একজন মাত্র স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত। বাকি ৯ জনই এই রোগে আক্রান্ত নয়। প্রাকৃতিকভাবেই অনেকের স্তনে পিণ্ড থাকে, যেটা পুঁজ কোষের মতো ক্ষতিকর কোনো অবস্থার সৃষ্টি করে না। তবে স্তন পিণ্ডের কিংবা স্তনের অন্যকোনো পরিবর্তন দেখা দিলে সাথে সাথে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে হবে। যুক্তরাজ্যে জরিপ করে দেখা গেছে, যেসব মহিলারা ক্যান্সারে মারা গেছেন, তাদের অধিকাংশই স্তন ক্যান্সারের কারণে মারা গেছেন।

মহিলাদের স্তন ক্যান্সার হলে প্রতি ৯ জনের মধ্যে একজনের সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি থাকে। বিশেষ করে চল্লিশোর্ধ্ব মহিলাদের ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি বেশি। তার মানে এই নয় যে, চল্লিশের কম বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ক্যান্সার হবে না। তবে তার পরিমাণ খুবই কম। বংশগত কারণে অনেকের এই ক্যান্সার হতে পারে। পূর্বে কোনো ক্যান্সারে আক্রান্ত থাকলে এবং ১০-১৫ বছরের মধ্যে হরমোন থেরাপি নিলে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন। এছাড়া অল্প বয়সে মাসিক শুরু ও দেরিতে তা শেষ হওয়া, দেরিতে প্রথম সন্তান ধারণ করা প্রভৃতি কারণে স্তন ক্যান্সার হতে পারে। একটু সচেতন থাকলেই কিছুটা রেহাই পাওয়া সম্ভব। প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম করতে পারেন, ধূমপানের অভ্যাস থাকলে ত্যাগ করুন, চর্বিযুক্ত খাবার কম খাবেন। প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি, রঙিন মৌসুমী ফল, ছোট মাছ খাবেন। সবচেয়ে ভালো, স্তন পরিচর্যায় যত্নশীল ও সতর্ক হোন। - বিবিসি

লিভারের জন্য উপকারী চা-কফি

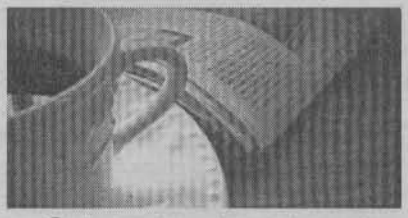

সম্প্রতি গবেষকরা ১০ হাজার লোকের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, যারা প্রতিদিন ১ কাপ বা তার চেয়েও কম চা-কফি পান করেন তাদের তুলনায় যারা প্রতিদিন ২ কাপেরও বেশি চা-কফি পান করেন তাদের লিভারের সমস্যা অনেক কম। গবেষক ড. কন্সট্যান্ট রুহল জানান, চা এবং কফির মধ্যে ক্যাফেইন নামক যে পদার্থ থাকে তা লিভারের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। যারা কফি ও চা নিয়মিত পান করেন তাদের জন্য এটি সুখবর! বিশেষত যারা অতিরিক্ত মদপান করে ইতোমধ্যে তাদের লিভারের বারোটা বাজিয়েছেন তারা নিয়মিত কফি বা চা পান করে উপকৃত হতে পারেন। দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডায়াবেটিস অ্যান্ড ডিজেস্টিভ অ্যান্ড কিডনি ডিজিস অ্যান্ড সোস্যাল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক সিস্টেমের গবেষকরা আরো জানান, কেবল লিভারই নয়, যাদের ওজন অতিরিক্ত এবং রক্তে আয়রনের পরিমাণ বেশি তাদের ক্ষেত্রেও চা-কফির বিশেষ উপকারিতা রয়েছে। তাই লিভারের সমস্যায় যারা ভুগছেন তাদের ড. রুহল এবং তার সহকর্মীরা চা-কফি পান করার পরামর্শ দিয়েছেন।

নিয়মিত কফি পানে কর্মদক্ষতা বাড়ে

যারা নিয়মিত কফি পান করেন তাদের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকে, ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। এমনকি গর্ভাবস্থায় কফি পান করলে গর্ভবতী মা এবং গর্ভস্থ শিশুর কোনোপ্রকার ক্ষতির আশঙ্কা নেই। নিয়মিত এবং পরিমিত মাত্রায় কফি প্রান করলে দেহের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং মন-মেজাজ ফুরফুরে থাকে। কফি প্রস্তুত করার পর যত তাড়াতাড়ি পান করা যায় এর উপকারিতা তত বেশি পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন কফির মধ্যে যে ক্যাফিন আছে তা খুবই ক্ষতিকর। আসলে সবকিছুই অতিরিক্ত খাওয়া ক্ষতিকর। সুতরাং বেশি পরিমাণ কফি খাওয়ার ব্যাপারে একই আপত্তি থাকতে পারে।

৮ জানুয়ারি ২০০৬ স্টিফেন হকিং-এর ৬৪তম জন্মবার্ষিকী

স্টিফেন হকিং

এম হাসান

মাত্র একুশ বছর বয়সে এএলএস নামক দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে প্যারালাইজড হয়েও যিনি ১৯৮৮ সালে 'A Brief History of Time : From The Big Bang to Black Holes'বইটি লিখে সারাবিশ্বে আলোড়ন তোলেন, তিনি হচ্ছেন বিংশ শতাব্দীর সেরা বিজ্ঞানী ও বর্তমান যুগের জিবন্ত কিংবদন্তী বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। ৮ জানুয়ারি ২০০৬ তার ৬৪তম জন্মবার্ষিকী। তার এ জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে তার প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ তার সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে এবারের আয়োজন।

জন্ম কথা

স্টিফেন হকিং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড শহরে জন্মগ্রহণ করেন। চার ভাইবোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। স্টিফেনের বাবা ফ্রাঙ্ক হকিং এবং মা ইসোবেল হকিং।

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

ছেলেবেলায় স্টিফেন চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। রেলগাড়ি ও অন্যান্য চলন্ত খেলনার ব্যাপারে তার খুব কৌতূহল ছিল। খেলনাগুলো কীভাবে চলে তা দেখার জন্য তিনি ওগুলোর বিভিন্ন অংশ খুলেমেলে দেখতেন। তিনি নিজে নিজে রেডিও কন্ট্রোল নৌকা ও প্লেন বানাতেন। স্টিফেন আট বছর বয়সে পড়তে শেখেন। অত্যন্ত মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও স্কুলে তিনি মোটেই ভালো করছিলেন না। লেখাপড়ায় অমনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫৯ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে স্টিফেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করেন এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি ভর্তি পরীক্ষায় সম্মানের সাথে পাশ করেন। পরীক্ষার ফলাফল খুব ভালো হওয়ার কারণে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাকে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে পড়ার জন্য স্কলারশিপ দেয়। ১৯৬২ সালে মাত্র বিশ বছর বয়সে মেধাবী ও কম পড়ুয়া স্টিফেন অক্সফোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষায় ফাস্টক্লাশ পেয়ে গ্রাজুয়েট এবং ১৯৬২ সালেই কসমলজি (Cosmology) বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ক্যামব্রিজে যান।

এএলএস রোগে আক্রান্ত

ক্যামব্রিজে যাওয়ার পর স্টিফেন লক্ষ করেন তিনি ক্রমশ খুব এলোমেলো হয়ে পড়ছেন। প্রায়ই তিনি হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেন। সাধারণ খুঁটিনাটি কাজগুলো করতেও তার খুব অসুবিধা হতো। অক্সফোর্ডের শেষ বছর থেকেই তিনি লক্ষ করছিলেন যে, তার হাতগুলোর কর্মদক্ষতা যেন কমে যাচ্ছে। জুতোর ফিতে বাঁধতে; কিংবা কলম ধরে লিখতেও তার বেশ কষ্ট হতো। কিন্তু তিনি তখন এগুলোকে তেমন গুরুত্ব দেননি।

সেবার ক্রিসমাসের ছুটিতে ক্যামব্রিজ থেকে বাড়িতে গেলে স্টিফেনের মা তার অসুস্থতা লক্ষ করেন। তিনি স্টিফেনকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা যায়, স্টিফেনের দূরারোগ্য এএলএ (Amyotrophic Lateral Sclerosis) রোগ হয়েছে এবং স্টিফেন আর মাত্র দু বছর বেঁচে থাকবেন। প্রথম দিকে স্টিফেন লাঠিতে ভর করে হাঁটতে পারলেও মাংসপেশী ক্রমশ অবশ ও অকেজো হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি হাঁটতে পারতেন না। তখন থেকে তিনি হুইল চেয়ারে বসে চলাফেরা করেন। এ রোগ মানুষের দেহকে অবশ করে ফেললেও মানুষের স্মরণশক্তি এবং চিন্তাশক্তিকে নষ্ট করে না। রোগীর হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও ব্রেইন আগের মতোই কাজ করে। ফলে অসুস্থ হওয়ার পরও স্টিফেন সবকিছু মনে রাখতে পারতেন। সব শব্দ শুনতে পেতেন। তবে তার কথা জিহ্বায় জড়িয়ে যেত।

বিবাহিত জীবন

১৯৬৫ সালে ক্যামব্রিজ একটি কলেজে রিচার্স ফেলো পদে চাকরি করার সময় তিনি বিয়ে করেন। বিয়ের দু বছর পর ১৯৬৭ সালে তাদের প্রথম ছেলে রবার্ট জন্মগ্রহণ করে। মেয়ে লুসি জন্মগ্রহণ করে ১৯৭০ সালে এবং ১৯৭৯ সালে ছেলে টিমথির জন্ম হয়। ১৯৯০ সালে তিনি এবং জেন আলাদাভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৯৫ সালে স্টিফেন তার নার্স ইলেন ম্যাসনকে বিয়ে করেন।

সম্মাননা

গবেষণার জন্য তিনি বহু সম্মাননাসূচক পদক পান। ১৯৭৪ সালে তিনি গ্রেটব্রিটেনের 'রয়্যাল সোসাইটির সদস্য হন। ১৯৭৮ সালে তিনি আলবার্ট আইনস্টাইন পদক পান। রানী এলিজাবেথ ১৯৮২ সালে স্টিফেনকে ইংল্যান্ড-এর সর্বোচ্চ সম্মানজনক পদক 'কমান্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এমপায়ার' পদে অধিষ্ঠিত করেন। এগুলো ছাড়াও অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্টিফেনকে অনারারি ডিগ্রি দেয়। ১৯৭৯ সালের ২৯ এপ্রিল ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় স্টিফেনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদ 'লুকাসিয়ান প্রফেসর অব ম্যাথমেটিকস' -এ ভূষিত করে।

বাকশক্তি হারানো

স্টিফেন ১৯৮৫ সালে সুইজ্যারল্যান্ড সফরকালে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে স্টিফেন নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না। তখন ডাক্তাররা জরুরি ভিত্তিতে অস্ত্রপচার করে তার গলায় একটি কৃত্রিম টিউব বসিয়ে দেন, যার সাহায্যে স্টিফেন আবার নিঃশ্বাস নিতে পারেন। ঐ অস্ত্রপচারের ফলে তার জীবন বেঁচে গেল বটে; কিন্তু তার বাকশক্তি পুরোপুরি লোপ পায়। আগে তিনি যদিও অস্পষ্ট জড়ানো ভাষায় কথা বলতে পারতেন; পরে আর তাও পারতেন না।

স্টিফেন হকিং এর এ সমস্যার কথা জানতে পেরে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ স্টিফেনকে একটি বিশেষ ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম পাঠান। এ প্রোগ্রামের সাহায্যে শুধুমাত্র হাতের আঙুল ব্যবহার করে তিনি সুইচ চেপে কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখা শব্দের তালিকা থেকে প্রয়োজনীয় শব্দগুলো বেছে নিতে পারেন। কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত একটি স্পিচ সিনথেসাইজার স্টিফেনের বাছাই করা শব্দটি পড়ে শোনায়। হুইল চেয়ারের সাথে ছোট একটি কম্পিউটার ও সিনথেসাইজার সংযুক্ত করে এখন স্টিফেন তার নতুন 'কণ্ঠস্বর' টিকে বয়ে বেড়াতে পারেন সর্বত্র।

সিনেমায় স্টিফেন

১৯৯২ সালে আমেরিকার হলিউডের একজন চিত্র পরিচালক স্টিফেনের জীবন ও গবেষণা বিষয়ে একটি ফিল্ম তৈরি করেন। স্টিফেনের বিখ্যাত বই 'A Brief History of Time'-এর নামানুসারে ফিল্মটির শিরোনাম দেয়া হয়। ১৯৯৩ সালে জনপ্রিয় সায়েন্স ফিকশন টিভি সিরিয়াল 'স্টার ট্রেক : দ্য নেক্সট জেনারেশন' এ সিরিজে অভিনয় করেন।

গবেষণা

স্টিফেনের প্রথম দিকের গবেষণাগুলো ছিল কৃষ্ণ গহ্বর বা (Black Hole) সম্পর্কিত। ধীরে ধীরে স্টিফেন ব্লাক হোল ছাড়িয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম ও পরিণতি বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। তার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি সর্বজনীন বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করা, যার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি এবং এর ভিতরে অবস্থিত যাবতীয় গ্যালাক্সি, গ্রহ-নক্ষত্রের ধরন ও প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিজ্ঞানী হিসেবে স্টিফেন হকিং আজ অবধি তার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সুস্থ সুন্দর দাঁতের জন্য

মৌসুমী

নির্মল ও সুন্দর হাসির জন্য দরকার সুস্থ ও সুন্দর দাঁত। সুস্থ ও সুন্দর দাঁতের হাসিতে অপরপক্ষ যতটা সাড়া দিবে, ততটা সাড়া আপনি পাবেন না যদি আপনার দাঁতে কোনো সমস্যা থাকে। আর সুস্বাস্থ্যের জন্যও দাঁতের একটি ভূমিকা থাকেই। সুতরাং দাঁত সুস্থ রাখা আমাদের সবার জন্যই জরুরি।

হাসি দিয়ে পৃথিবী জয় করতে চায় না এমন মানুষ বোধহয় খুব একটা নেই। তবে হাসি দিতে গেলে সবার আগে মনে রাখতে হবে হাসিটি যেন নির্মল হয়, সুন্দর হয়। তা না হলে হাসিতেও কোনো কাজ হবে না। আর নির্মল ও সুন্দর হাসির জন্য দরকার সুস্থ ও সুন্দর দাঁত। সুস্থ ও সুন্দর দাঁতের হাসিতে অপরপক্ষ যতটা সাড়া দিবে, ততটা সাড়া আপনি পাবেন না যদি আপনার দাঁতে কোনো সমস্যা থাকে। আর সুস্বাস্থ্যের জন্যও দাঁতের একটি ভূমিকা থাকেই। সুতরাং দাঁত সুস্থ রাখা আমাদের সবার জন্যই জরুরি। তবে চেষ্টা করলেও অনেক সময় দাঁত সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখা যায় না। বিভিন্ন সময়ে দেখা দেয় বিভিন্ন উপসর্গ। এসব সমস্যা থেকে কীভাবে মুক্ত থাকা যায়, তা-ই দেখানো হয়েছে এ লেখায়।

দুর্ঘটনায় দাঁত ভেঙে বা পড়ে গেলে

দুর্ঘটনায় দাঁতের সামনের অংশ বা বেশ কিছুটা ভেঙে যেতে পারে। কিংবা পুরো দাঁতই পড়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় কী করা উচিত? দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, ভেঙে যাওয়া দাঁতটি রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে চিকিৎসা করিয়ে তারপর লাইট কিওর কম্পোজিট পদার্থের সাহায্যে কসমেটিক রক্ষণ পদ্ধতিতে বহুদিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। এ অবস্থায় দাঁতটিকে কিন্তু বাইরে থেকে কেউ দেখলে বুঝতেও পারবে না যে দাঁতটি ভাঙা। তবে দাঁত খুব বেশি ভেঙে গেলে রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্টের পর আরো কিছু কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে মূলত সিরামিক ক্রাউন ক্যাপই বেশি লাগানো হয়। তবে কারো পুরো দাঁত পড়ে গেলে সেক্ষেত্রে দাঁত বাঁধানো ছাড়া উপায় নেই। অনেকে অবশ্য নকল দাঁত লাগাতে চান। সেক্ষেত্রে ক্রাউন অ্যান্ড ব্রিজ প্রসথেসিস কিংবা ইমপ্ল্যান্টের মাধ্যমে বাঁধিয়ে নেয়া যায়।

দাঁতের মধ্যবর্তী ফাঁক বাড়তে থাকলে

আমরা অনেকেই হয়তো জানি না, প্রতিটি দাঁতের মধ্যেই কিছু না কিছু ফাঁক থাকে। কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। তবে অনেক সময় সঠিকভাবে ব্রাশ না করার কারণে, আঘাত বা অন্য কোনো কারণে দাঁতগুলো সরে যেতে থাকে। অধিকাংশ সময়ই কোনো নির্দিষ্ট দুটো দাঁত ফাঁক হয়ে যেতে থাকে। ফাঁকা দাঁত দেখতে খারাপ লাগে বলে অনেকে বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। কিন্তু দাঁতের মধ্যবর্তী ফাঁক খুব বেশি না হলে তা নিয়ে আসলে চিন্তা করার কিছু নেই। সৌন্দর্যের দিক থেকে কিছুটা ঘাটতি এতে হয় বটে, কিন্তু ফাঁকা দাঁত ভরাট করতে যাওয়াটা কিন্তু এক বিড়ম্বনা।
তবে যারা ফাঁকা দাঁত ভরাট করাতেই চান, তাদের জন্যও আছে চিকিৎসা পদ্ধতি। সেই একই লাইট কিওর কম্পোজিট পদার্থের সাহায্যে সুন্দরভাবে ফাঁকা দাঁত ভরাট করা যায়। এভাবে ভরাট করা দাঁত বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এ দাঁতগুলোর মধ্যে ফাঁকা ছিল।
তবে এভাবে ফাঁকা দাঁত ভরাট করার স্থায়ীত্বও তুলনামূলকভাবে কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যেই এই কিওর কম্পোজিট পদার্থ খুলে পড়ে যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে অবশ্য সাত-আট বছর স্থায়ী হওয়ার কথাও শোনা গেছে। তবে দাঁত আঘাত পেলে এটি যে কোনো সময়ই খুলে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে দাঁতটি আবার ভরাট করে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

দাঁতের দাগ

ধূমপায়ী কিংবা পান খাওয়ার অভ্যাস যাদের আছে, তাদের দাঁতে রং লাগবেই। নানান বর্ণের এসব রং একসময় গভীর কালোতে পরিণত হয়। শুধু পান-সিগারেট নয়, যারা নিয়মিত মাদকদ্রব্য গ্রহণ করেন, দোক্তা, খৈনি কিংবা মশলা খান, তাদের দাঁতেরও একই পরিণতি হয়। তারা যখন জনসমক্ষে কথা বলতে যান, তখন দাঁতের কারণেই তাদের অত্যন্ত দৃষ্টিকটু দেখায়।
দাঁতের দাগ কীভাবে দূর করা যায়? দাঁতের দাগ দূর করতে হলে প্রথমেই এসব অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। তা না হলে যে চিকিৎসাই করা হোক না কেন, আবার এসব হবেই। দাঁতের দাগ উঠানোর জন্য চিকিৎসকের কাছে

গেলে তিনি দাগ দেখেই বুঝতে পারবেন কীভাবে সেগুলোকে উঠানো সম্ভব। সাধারণত হালকা দাগের জন্য আলট্রাসনিক স্কেলিঙের সাহায্য নেয়া হয়। তবে যারা একটানা কয়েক বছর দাঁতের দাগ বাড়িয়ে চলেছেন, তাদের দাঁতের দাগ এতটাই গাঢ় হয় যে স্কেলিঙের পাশাপাশি ব্লিচিংও করতে হয়।

দাঁতের পাথর

যারা নিয়মিত দাঁত মাজেন না কিংবা সঠিকভাবে দাঁত ব্রাশ করার পদ্ধতি সম্পর্কে যাদের জানা নেই, তাদের মুখের লালানিসৃত বিভিন্ন অজৈব লবণ দাঁত ও মাড়ির সংযোগস্থলে ক্রমাগত জমতে থাকে এবং দাঁতের ওপরে এক ধরনের শক্ত পাথরের আবরণ সৃষ্টি করে। হলুদ রঙের এসব পাথরকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় টার্টার বা ক্যালকুলাস। এই দাঁতের পাথর বাড়তে থাকলে তা মাড়িতে প্রদাহ সৃষ্টি করে আর মাড়িতে প্রদাহ হলে রক্ত পড়া শুরু হয় এবং মুখে জীবাণু সংক্রমণ হতে শুরু করে। ফলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় ব্রাশ করতে গেলে ব্রাশের সাথে রক্ত চলে আসে। এ ঝামেলার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে আলট্রাসনিক স্কেলিং করাতেই হবে। স্কেলিং করানোর পর সঠিক নিয়মে দাঁত ব্রাশ করতে হবে। তা না হলে পুনরায় এ দাঁতের পাথর হতেই থাকবে।

নড়ে যাওয়া দাঁত

অনেক সময় কোনো না কোনো কারণে দাঁত নড়ে যায়। খুব বেশি হয়তো নয়, কিন্তু সামান্য পরিমাণে নড়া দাঁতও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। দন্ত বিশেষজ্ঞরা বলেন, "অনেক সময় খুব সামান্য নড়ে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। যদি বন্ধ না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।"

মাড়ির প্রদাহের কারণেই মূলত দাঁত নড়ে যেতে পারে। অনেক সময় আঘাতের কারণেও দাঁত নড়তে পারে। তবে ঠিক কী কারণে দাঁত নড়ছে, সে বিষয়টি আগেই নির্ধারণ করা উচিত। আঘাতের কারণে দাঁত নড়লে এক প্রকার চিকিৎসা এবং মাড়ির প্রদাহের কারণে অন্য চিকিৎসা দেয়া হয়। সাধারণত লাইট কিওর কসমেটিক পদ্ধতির মাধ্যমে অল্প নড়া দাঁতকে খুব শক্তভাবে বসিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু দাঁত যদি খুব বেশি নড়াচড়া করে তাহলে অন্য পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়।

আক্কেল দাঁত সমস্যা

আক্কেল দাঁত অনেকের জন্যই একটি মারাত্মক সমস্যা। আক্কেল দাঁত সোজা উঠতে থাকলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। সমস্যা হয় তখনই যখন আক্কেল দাঁত সোজা না উঠে তার ইচ্ছেমতো উঠতে থাকে। এ অবস্থায় মাড়ি ভেদ করে স্বাভাবিকভাবে উঠতে পারে না এবং অন্য দাঁতের গঠন নষ্ট করে ফেলে। শুরু হয় প্রচণ্ড ব্যথা।

আক্কেল দাঁতের যে কোনো সমস্যার জন্য দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। চিকিৎসক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক্স-রে করতে দেন। এক্স-রে থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় দাঁতটি কোথায় কী অবস্থানে রয়েছে। অনেক সময় আক্কেল দাঁত সোজা ৯০ ডিগ্রি ওঠার বদলে ৪০-৪৫ ডিগ্রি কোণ করেও উঠতে থাকে। এ অবস্থা খুব বিপজ্জনক। এ অবস্থায় আক্কেল দাঁত যদি কিছুটা উঠে থেমে যায়, তাহলে তা হয়তো আপাত কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবে না। পরবর্তী সময়ে এটি মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে আশেপাশের দাঁতগুলোকে নষ্ট করে ফেলতে পারে। তাই যখনই দেখা যাবে আক্কেল দাঁত সোজা না উঠে বাঁকাভাবে উঠছে, তখনই দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তা তুলে ফেলা উচিত। তা না হলে পরবর্তী সময়ে এই একটি দাঁতের কারণে আশেপাশের আরো তিন-চারটি দাঁত হারাতে হতে পারে।

দাঁতের পরিচর্যা

নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার করতে হবে। দাঁত পরিষ্কার করার সঠিক সময় হচ্ছে রাতে ঘুমানোর আগে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর নয়। নরম টুথব্রাশ ও ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেস্ট দিয়ে রাতে খাবার পর ঘুমানোর আগে ব্রাশ করতে হবে। সম্ভব হলে সকালে নাস্তার পর আরেকবার ব্রাশ করা ভালো।

দাঁত মাজার সময় কয়লা, ছাই, দাঁতের মাজন ইত্যাদি গুঁড়ো জাতীয় জিনিস ত্যাগ করাই ভালো। এগুলো দাঁতের ফাঁকে অবস্থানে অনেক সময় দাঁত ও মাড়ির প্রদাহকে বাড়িয়ে তোলে।

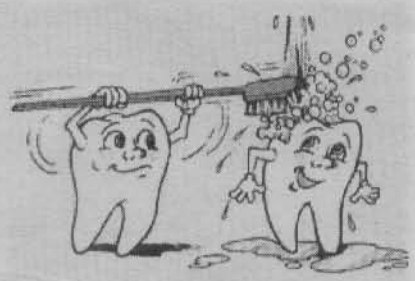

মাড়ির প্রদাহের কারণে বা আঘাতের কারণেও দাঁত নড়তে পারে। তবে ঠিক কী কারণে দাঁত নড়ছে, সে বিষয়টি আগেই নির্ধারণ করা উচিত।

খুব বেশি জোরে এবং বেশি সময় ধরে দাঁত মাজবেন না। দাঁত মাজতে হয় মাত্র ১-২ মিনিট। এ সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে দাঁত মাজুন। উল্টোপাল্টা দাঁত মাজবেন না।

দাঁত মাজার পর কিছুক্ষণ হাত দিয়ে দাঁতের মাড়ি ম্যাসাজ করবেন। প্রতিনিয়ত জিভ পরিষ্কার রাখবেন।

একই টুথপেস্ট সবসময় ব্যবহার করবেন না। ব্র্যান্ড বদলে একেক সময় একেক টুথপেস্ট ব্যবহার করুন। একই টুথপেস্ট বেশিদিন ব্যবহার করলে দাঁতের জীবাণুগুলো এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে বলে অনেক দন্ত চিকিৎসক মনে করেন।

প্রত্যেকবার খাওয়ার পর ভালো করে কুলি করবেন। বিশেষ করে মিষ্টি জাতীয় জিনিস খাওয়ার পর অবশ্যই কুলি করবেন।

দাঁত পরিষ্কার করার পর দাঁতের ফাঁক পরিষ্কার সুতা দিয়ে পরিষ্কার করুন।

খাবার ভালো করে চিবিয়ে খেতে অভ্যাস করুন। পান, জরদা, ধুমপান ইত্যাদি পরিত্যাগ করুন।

প্রতিবছর অবশ্যই দাঁতের সুস্বাস্থ্যের জন্য দন্ত চিকিৎসককে দিয়ে দাঁত পরীক্ষা করাবেন।

অনেক উঁচু থেকে পড়লেও বিড়ালের কিছু হয় না কেন?

বিড়ালকে যত ওপর থেকেই ফেলে দেয়া হোক না কেন, সে অবধারিতভাবে তার চার পায়ের ওপরই পড়ে এবং তার থাবার নরম তুলতুলে পেশী তাকে রক্ষা করে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে। অন্য অনেক প্রাণীর তুলনায় বিড়াল এ ব্যাপারে অনেক বেশি দক্ষ। তার এ দক্ষতার পিছনে মূল ভূমিকা পালন করে দুটি বিষয়। একটি হলো ওপর থেকে পড়ার সময় শূন্যে বিড়ালের শরীরকে পাক খাওয়ানোর অসাধারণ সক্ষমতা। আর দ্বিতীয় একটি ব্যাপার হলো বিড়ালের সুবিধাজনক শারীরিক কাঠামো, যা তাকে পতনের আঘাত হ্রাসে সাহায্য করে। বিড়াল যে সবসময় ঠিক তার পায়ের ওপর ভর দিয়ে পড়ে, মাথা নিচু হয়ে পড়ে, কখনো মাথা ভাঙে না তার কারণ হলো বিড়াল 'রাইটিং রিফ্লেক্স' (Righting Reflex) এর অধিকারী। এর অর্থ হলো ওপর থেকে পড়ার সময় বিড়াল বুঝতে পারে কোনটা নিচ আর কোনটা ওপর এবং সে অনুযায়ী সে তার শরীরকে প্রয়োজনমতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাক খাইয়ে বা ডিগবাজি খাইয়ে এমনভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে যেন মাটিতে সে তার চার পায়ের ওপর ভর দিয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, বিড়ালের মেরুদণ্ড অসাধারণ নমনীয়তার অধিকারী। শুধু তা-ই নয়, বিড়ালের 'কলার বোন' বা গলার দুপাশের শক্ত হাড় দুটি নেই। এতে সুবিধা হলো সহজেই সে তার ঘাড় ও পা চারটা ঘোরাতে পারে। ওপর থেকে পড়ার সময় সে অনায়াসে তার চার পা ছড়িয়ে ও শরীরকে ফুলিয়ে তুলতে পারে। এতে তার ভরের তুলনায় শরীরের আয়তন অনেক বেড়ে যায় এবং এভাবে সে তার পতনের গতি কিছুটা কমাতে সাহায্য করে। ফলে অনেক উঁচু থেকে পড়লেও বিড়াল ততটা ব্যথা পায় না।

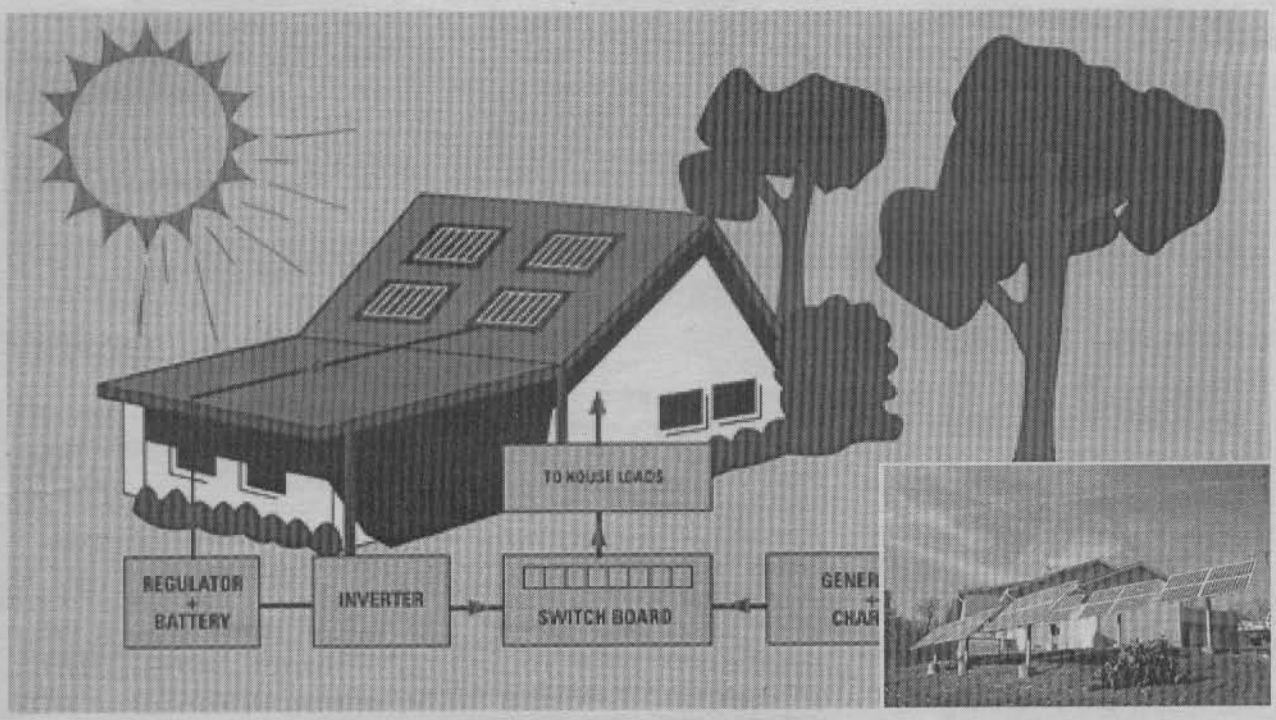

সোলার হোম সিস্টেম
যেখানে সূর্যের আলো সেখানেই বিদ্যুৎ

হুমায়ুন কবির

সূর্যের আলোর সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তাকে সৌরবিদ্যুৎ বলা হয়। সূর্যের আলো সরাসরি একটি বড় বাঁধানো ছবির মতো জিনিসের ওপর পড়ে, এর নাম সোলার প্যানেল। এর ওপর সূর্যের আলো পড়লেই এতে ব্যাটারির মতো ভোল্টেজ সৃষ্টি হয় এবং সংযুক্ত তারের মাধ্যমে এটা থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। যতক্ষণ আলো পড়ে ততক্ষণ এভাবে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। রাতের বেলায় সূর্যের আলো থাকে না বলে স্টোরেজ ব্যাটারির মাধ্যমে দিনের বেলায় উৎপন্ন বিদ্যুৎ জমিয়ে রাখা হয় এবং রাতে এ ব্যাটারি থেকে সরঞ্জামে (টিভি, লাইট ইত্যাদি) বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

সৌরবিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা

#যেখানে গ্রিড লাইনের বিদ্যুৎ নেই সেখানে সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে আপনি আপনার ঘরবাড়ি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আলোকিত করতে পারবেন।
ঘরবাড়ি আলোকিত করার পাশাপাশি সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে আপনি রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার, টেলিভিশন চালানো ছাড়াও ডিসি মোটর চালিত যে কোনো যন্ত্রপাতি যেমন, ফ্যান, বিভিন্ন মেশিন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবেন।
হ্যারিকেন বা কুপি বাতির চেয়ে আপনি অনেক গুণে পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল সৌরবিদ্যুতের বাতি ব্যবহার করতে পারবেন।
এ ব্যবস্থায় খরচ করতে হয় মাত্র একবার অর্থাৎ শুধু কেনার সময়। তারপরে আপনি বহু বছর দিনের পর দিন অল্প কিছু খরচের (রক্ষণাবেক্ষণ জনিত) সাপেক্ষে এ ব্যবস্থাটি ব্যবহার করতে পারবেন। কারণ সূর্যের আলোর জন্য খরচ নেই বলে এ বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয়ও নেই।

সৌরবিদ্যুতের সুবিধা

সৌর বিদ্যুত উৎপাদনে জ্বালানির প্রয়োজন হয় না।
আপনি নিজেই আপনার বিদ্যুতের মালিক হতে পারেন।
এ বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় কোনো লোডশেডিং নেই।
এ বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় কোনো বিল দিতে হয় না।
এ বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় মূল যন্ত্র সৌর প্যানেলের স্থায়ীত্ব প্রায় ২০ বছর।
ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ
সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থায় কোনো গতিশীল অংশ নেই। ঘরের আসবাবপত্রের মতোই এটি নিঃশব্দে নিরুপদ্রবে বছরের পর বছর নিজ স্থানে পড়ে থেকে কাজ করে যায়।
সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিরাপদ; কারণ এ বিদ্যুৎ-এ উচ্চ ভোল্টেজ না থাকায় তড়িতাহত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
দেশের যে কোনো জায়গায় স্থাপন করা যায়।
এটি শব্দ ও পরিবেশ দূষণ মুক্ত বিদ্যুৎ।
সূর্য এর শক্তির উৎস কাজেই তা অফুরন্ত।

সীমাবদ্ধতা

 # আবহাওয়ার ওপর কিছুটা নির্ভরশীলতা
বেশি মেঘলা দিনে বা দিনভর বৃষ্টি বাদলায় কাটলে যথেষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন নাও হতে পারে। পরপর বেশ কয়েকদিন এভাবে কাটলে সঞ্চিত বিদ্যুতে টান পড়ে এবং বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় কিছু সময় কাটাতে হতে পারে।

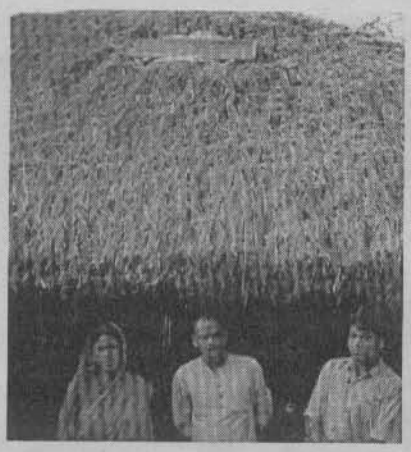

সোলার হোম সিস্টেমের দাম কমানো এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইডকল সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি এককালীন অনুদান দিয়ে থাকে। সোলার হোম সিস্টেমের বাণিজ্যিকীকরণই ইডকলের প্রধান লক্ষ্য। এ কারণে, ক্রমান্বয়ে ইডকল অনুদান কমিয়ে দেয়ার নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

 # প্রারম্ভিক ব্যয় : সৌরবিদ্যুতের প্রারম্ভিক ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু দীর্ঘমিয়াদি হিসেবে এটি বেশ লাভজনক।

 # ভারী কাজের ক্ষেত্রে : কলকারখানা চালাতে বা অনুরূপ ভারী কাজগুলোর জন্য সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা ততটা সুবিধাজনক নয়। কারণ এক্ষেত্রে প্যানেলের সংখ্যা হবে অনেক বেশি; যা জায়গার সংকুলান, প্রারম্ভিক ব্যয়সহ অন্যান্য দিক থেকে অসুবিধাজনক।

সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, তাঁতী, দর্জি, নাপিত এবং কুটিরশিল্পীরা তাদের কর্মসময় বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় বাড়াতে পেরেছেন। ছাত্রছাত্রীরাও অধিক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পারছে। অধিকন্তু, রেডিও ও টেলিভিশন ব্যবহারের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে গ্রামের জনগণের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। অনেক মহিলা সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর মতে, সোলার হোম সিস্টেম থাকায় রাতে তারা অধিক নিরাপদ বোধ করেন। সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষ, অদক্ষ উভয় জনগোষ্ঠীর জন্য আগস্ট ২০০৫ পর্যন্ত সহস্রাধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

সোলার হোম সিস্টেম দেশীয় প্রযুক্তি প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ সিস্টেমের অন্তর্গত যন্ত্রপাতিসমূহ হলো সোলার মডিউল, ব্যাটারি, চার্জ কন্ট্রোলার, বৈদ্যুতিক বাতি এবং সুইচ। সোলার মডিউল ব্যতীত অন্যান্য উপাদানসমূহ এখন দেশেই প্রস্তুত হয়।

উন্নত, স্বল্পোন্নত কিংবা অনুন্নত বিশ্বের সংজ্ঞায়নে কোনো দেশের জনগণের বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্তির মাত্রা উন্নয়নের একটি অন্যতম নির্ণায়ক হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এ মাপকাঠিতে বাংলাদেশ এখনও অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩০ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। বাকি ৭০ শতাংশ জনগণ, যাদের অধিকাংশই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বাস করে, এখনও এ সুবিধা হতে বঞ্চিত রয়েছে।

সম্প্রতি সরকার ২০২০ সালের মধ্যে সকল জনসাধারণের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাংক আর্থিক সহায়তায় প্রচলিত বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য শক্তি সম্প্রসারণের পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের অধীনে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে অদূর ভবিষ্যতে গ্রিড সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই সেসব এলাকায় জানুয়ারি ২০০৩ হতে জুন ২০০৮ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ বছরে মোট ৫০,০০০ সোলার হোম সিস্টেম অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

ইডকল প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত ৫টি সহযোগী সংস্থা যথা গ্রামীণ শক্তি, ব্র্যাক ফাউন্ডেশন, সৃজনী বাংলাদেশ, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) এবং কোস্ট ট্রাস্ট এর মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। পরবর্তীতে দু'দফায় আরও পাঁচটি সহযোগী সংস্থা; যথা : সুবসতি, ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ), সেন্টার ফর মাস এডুকেশন ইন সায়েন্স (সিএমইএস), সিঙ্গার বাংলাদেশ ও উপকূলীয় বিদ্যুতায়ন ও মহিলা উন্নয়ন সংস্থাকে নির্বাচিত করা হয়।

সোলার হোম সিস্টেমের দাম কমানো এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইডকল সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি এককালীন অনুদান দিয়ে থাকে। সোলার হোম সিস্টেমের বাণিজ্যিকীকরণই ইডকলের প্রধান লক্ষ্য। এ কারণে, ক্রমান্বয়ে ইডকল অনুদান কমিয়ে দেয়ার নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

ইডকলের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো গ্রাহকরা নগদে অথবা মাসিক সহজ কিস্তিতে সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করতে পারে। সহযোগী সংস্থাসমূহ এ সিস্টেম ক্রয়ের জন্য গ্রাহকদেরকে ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে এ ঋণ প্রদান করে। ঋণের মেয়াদ-১-৫ বছর হয়ে থাকে। ঋণ পরিশোধ সম্পন্ন হলেই গ্রাহক উক্ত সিস্টেমের মালিক হয়ে যান।

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলারই প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে গ্রিড সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিকট ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ সেসব এলাকাতে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে যথাক্রমে ৮,৩৫৫টি; ১২,৪১৯টি; ৬,০৭০টি; ১০,১৬৯টি; ৭,০৫৩টি ও ৫,৯৩৪টি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে গ্রামীণ শক্তি, ব্র্যাক ফাউন্ডেশন, সৃজনী বাংলাদেশ, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ, সুবসতি, কোস্ট ট্রাস্ট, আইডিএফ, সিএমইএস, উপকূলীয় বিদ্যুৎতায়ন ও মহিলা উন্নয়ন সংস্থা ও সিঙ্গার বাংলাদেশ যথাক্রমে ৩১,৫২৭; ১,২০৭; ২,০৬৫ ও ৮৮০; ৭১৭; ৬৮৯; ৭১৩, ৯০১, ৪৫০ ও ৩১টি সিস্টেম স্থাপন করেছে।

আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে এলে চোখ ধাঁধায় কেন?

মানুষের দৃষ্টিশক্তির বৈশিষ্ট্য হলো তার অসাধারণ দক্ষতা। সে তীব্র আলোতে যেমন দেখতে পায়, তেমনি আবার প্রায় অন্ধকারেও দেখতে পায়। যেসব ক্যামেরা দিনের আলোয় ভালো কাজ করে সেগুলো অন্ধকারে প্রায় অকেজো। আবার কম আলোতে ভালো কাজ করে যেসব ক্যামেরা, সেগুলো প্রবল আলোতে ভালো কাজ দেয় না। মানুষের চোখ কিন্তু আলো-অন্ধকার নির্বিশেষে কাজ করে। তবে আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে গেলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। মনে হয় চোখ বুঝি একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। কয়েক মিনিট পর ধীরে ধীরে সব দৃশ্যমান হয়। চোখ আলো অনুভব করে 'রড' ও 'কোন' নামক দু'ধরনের সেল বা অণুর সাহায্যে। কোন সেল তীব্র আলোয় রঙের অস্তিত্ব ধরতে পারে আর রড সেল স্বল্প আলোয় সাদা-কালো দৃশ্য দেখতে পায়। তাছাড়া রড সেলে রডপসিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যা ফোটন শুষে নিয়ে আলোর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। রডপসিন অণু যখন ফোটন অণু শোষণ করে তখন সে রেটিনাল ও অপসিন অণুতে বিভক্ত হয়ে যায়। এ দুটি বিভক্ত অণু পরে আবার বেশ ধীরগতিতে সম্মিলিত হয়ে রডপসিন অণুতে পরিণত হয়। তাই যখন আমরা তীব্র আলোতে দেখি তখন সবগুলো রডপসিন রেটিনাল ও অপসিনে বিভক্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায় যদি আমরা কোনো অন্ধকার ঘরে ঢুকি তাহলে প্রথমে চোখে কিছুই দেখা যায় না। কারণ যথেষ্ট আলো না থাকলে কোন দেখতে পারে না, আর রডে কোনো রডপসিন থাকে না বলে রডও অকার্যকর। তবে ধীরে ধীরে রেটিনাল ও অপসিনে বিভক্ত অণুগুলো সম্মিলিত হয়ে আবার রডপসিনে পরিণত হতে থাকে এবং তখন আবার অন্ধকারেও দেখা সম্ভব হয়। এজন্যই অন্ধকারে অভ্যস্থ হতে চোখের কয়েক মিনিট সময় লাগে।

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৫ সংখ্যা ৫০ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

মঙ্গল অভিযান
সংকট ও সম্ভাবনা

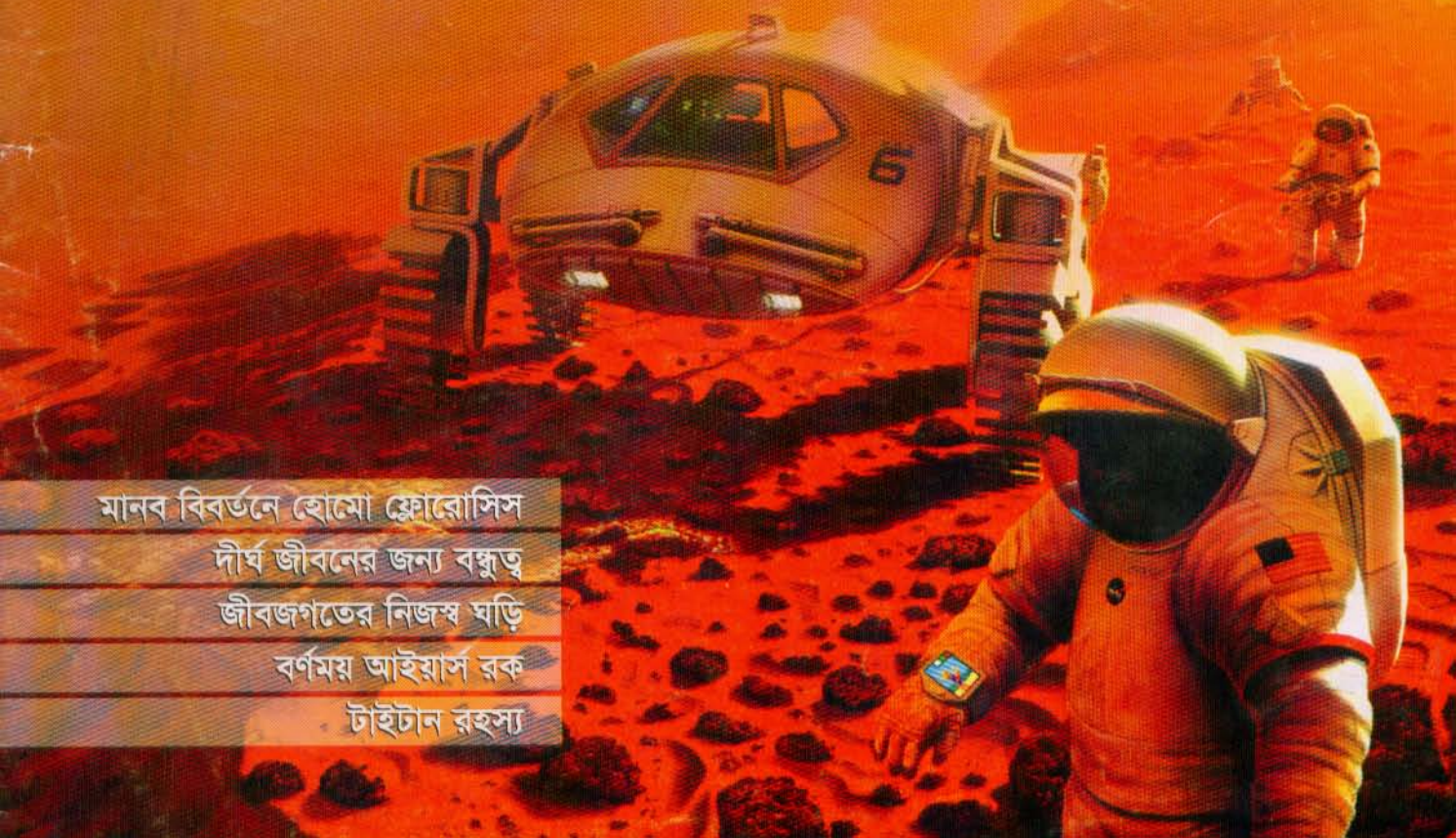

মানব বিবর্তনে হোমো ফ্লোরেসিস

দীর্ঘ জীবনের জন্য বন্ধুত্ব

জীবজগতের নিজস্ব ঘড়ি

বর্ণময় আইয়ার্স রক

টাইটান রহস্য

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-কম্পিউটার-স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ম্যাগাজিন

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৫ ■ সংখ্যা ৫০ ■ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

এ সংখ্যার সূচি

প্রচ্ছদ রচনা

৯ মঙ্গল অভিযান
সংকট ও সম্ভাবনা

বিশেষ রচনা

১৬ উন্নয়নে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

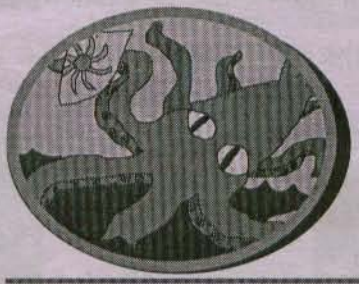

পার্শ্ব রচনা

২৭ আবহাওয়ার পরিবর্তন, আক্রান্ত পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন মানুষ

অন্যান্য রচনা

টাইটান রহস্য /৮
গ্যালিলিও গ্যালিলি /১৫
বর্ণময় আইয়ারস রক /১৯
মানব বিবর্তনে হোমো ফ্লোরেসিয়েসিস /২০
ক্যামেরা ফোন /২২
সেই ট্র্যাজেডি /৩০
জীবজগতের নিজস্ব ঘড়ি /৩২
ন্যানো ক্রিস্টালাইন ফাস্ট-অ্যাক্ট পাউডার /৩৪
ভেজাল ওষুধ ও চিকিৎসা বিড়ম্বনা /৩৭
দীর্ঘ জীবনের জন্য বন্ধুত্ব /৪০
ইন্টারনেটে তথ্য অনুসন্ধানে সার্চ ইঞ্জিন /৪২
ইলেক্ট্রিক ডিজিটাল পেপার /৪৪
এনিসথেশিয়ার বিকল্প পাউডার ইনজেকশন /৪৫

নিয়মিত বিভাগ

৩ চিঠিপত্র
৪ বিজ্ঞান বিশ্বের নতুন খবর
৬ স্বাস্থ্য সংবাদ
৭ প্রযুক্তি
বিজ্ঞান প্রজন্ম ২৪
বিতর্ক ৩৬
সায়েন্স ফিকশন : জীবনের মিছিল ৪৬
বিজ্ঞান কুইজ ৪৮

সম্পাদক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

সহযোগী সম্পাদক
এস এম মুকুল

সহকারী সম্পাদক
সরোয়ার হোসেন

সার্কুলেশন
আমিনুল ইসলাম সোহাগ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫০৯৫
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৭১২৩৯১৩

বিপণন
৩৭/১, বাংলাবাজার, দ্বিতীয় তলা
ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫০৫৪,০১৭১-১২০৭০১

মূল্য : পনের টাকা

প্রফেসর'স প্রকাশন, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত।

ই-মেইল : editor_sworld@yahoo.com

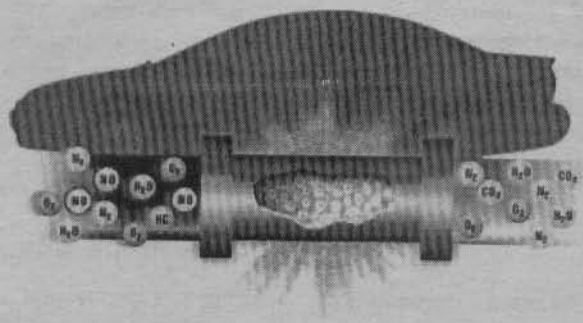

নতুন আবিষ্কার

শেখ আনোয়ার

টমেটো ভ্যাকসিন

অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানী চার্লস আর্নটজেন গত পাঁচবছর ধরে চেষ্টা করছেন টমেটোর রস দিয়ে এমন একটি ভ্যাকসিন তৈরি করতে যা দিয়ে ডায়রিয়ার মতো ভয়ঙ্কর রোগ নির্মূল করা সম্ভব। ডায়রিয়ায় সারাবিশ্বে প্রতিবছর বিশ লাখ মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে শিশুদের সংখ্যা বেশি। তবে সাধারণ টমেটো দিয়ে আর্নটজেনের ভ্যাকসিন তৈরি করা সম্ভব নয়। এজন্য দরকার ই কোলাই ব্যাকটেরিয়াম আছে এমন টমেটো। এ ব্যাকটেরিয়াম দিয়ে একটি বিশেষ প্রোটিন তৈরি করা হবে যা ভ্যাকসিন হিসেবে কাজ করবে। এ ভ্যাকসিন শরীরে ঢুকে ডায়রিয়ার জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করে তাকে মেরে ফেলবে। ডায়রিয়ার যেসব ভ্যাকসিন পাওয়া যায় সেগুলোর উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। আর্টজেন মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশ, বিশেষ করে ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের চিকিৎসা বঞ্চিত মানুষের জন্য তার ভ্যাকসিন তৈরি করছেন। আর যে টমেটোর রস দিয়ে এ ভ্যাকসিন তৈরি হয়েছে, সে জাতের টমেটো এসব দেশে সহজেই চাষ করা সম্ভব। ফলে স্থানীয়ভাবে, কম খরচে ভ্যাকসিন উৎপাদন করা সম্ভব হবে। আর্নটজেন তার টমেটো ভ্যাকসিন এ বছরেই পশুদেহে প্রয়োগ করে দেখবেন। আশা করছেন সফলতাও পাবেন। তারপর মানুষের দেহে ভ্যাকসিন দেবেন। শুধু ডায়রিয়া নয়, কলেরা হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের চিকিৎসার জন্যও ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চিন্তাভাবনা করছেন আর্নজেন। তবে তিনি একা নন, আরও চার ডজন গবেষণাগারে এ নিয়ে কাজ চলছে। শুধু টমেটো নয়, কলা এবং আলু দিয়েও ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টা চলছে। আশা করা যায়, কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের ভয়ঙ্করতম কিছু রোগের চিরতরে ধ্বংস ঘটবে এসব ভ্যাকসিন চিকিৎসার দৌলতে।

নিরাপত্তা সিঁড়ি

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হওয়ার পরে গোটা বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছে বিপদের সময় আকাশ ছোঁয়া দালান থেকে কীভাবে দ্রুত এবং অল্প সময়ে নিচে নেমে আসা যাবে। এ সমস্যার একটা সমাধানও মিলেছে। AMES-1 নামে একটি ইভাকুয়েবান সিস্টেম, সেটি দেখতে অনেকটা বিনোদন পার্কের ওয়াটার স্লাইডের মতো, এর সাহায্যে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে উঁচু উঁচু বিল্ডিং থেকে নিচে নেমে আসা সম্ভব। এ জিনিস বসানো থাকবে দালানের বাইরের দেয়ালে। ইমার্জেন্সির সময় খুলে যাবে ইউনিট স্প্রিং হঠাৎ করে মাটিতে নেমে আসবে সরু, ঢালু পথটা। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এ ধরনের ওয়াটার স্লাইডে এগারতলা দালান থেকে মাটিতে নেমে আসতে মাত্র উনিশ সেকেন্ড সময় লাগে। আমাদের দেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে এ সিস্টেম অবিলম্বে চালু করা উচিত, গার্মেন্টস কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য। একেকটি ইভাকুয়েশন সিস্টেমের দাম কুড়ি হাজার ডলার। বিস্তারিত খোঁজ নিতে পারেন www.ames-1.com-এ।

খুঁজে বের করে ধ্বংস করা

সারা পৃথিবীতে, মাটির নিচে শিকারের জন্য ওঁৎ পেতে আছে মরণঘাতী ল্যান্ড মাইন। প্রতিদিন এ মাইনের শিকার হয়ে কত মানুষ যে মারা পড়ছে, আর প্রাণে বেঁচে যাওয়া হতভাগারা বিস্ফোরণে হাত-পা হারিয়ে বিকলাঙ্গ জীবনযাপন করছে তার হিসাব নেই। মাটির নিচের এ মরণ ফাঁদ খুঁজে বের করার চেষ্টারও ত্রুটি নেই। ডেভিড সামার্সের এলাডিন নামের যন্ত্রটি এ প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অনেকদূর। মাইন খুঁজে বের করতে এলাডিনকে সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তাধারার ফসল বলা যায়। এলাডিন মাইন ফিল্ডে পানি ছুঁড়ে এবং শব্দ মনিটর করে কোথায় মাইন আছে তা খুঁজে বের করতে তো পারবেই, ওটাকে অকেজো করার ক্ষমতাও রাখে। আর এলাডিনের টার্গেটের অভাব হবে না কোনো। কারণ বিশ্বজুড়ে যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে লাখ লাখ মাইন ছড়িয়ে আছে।

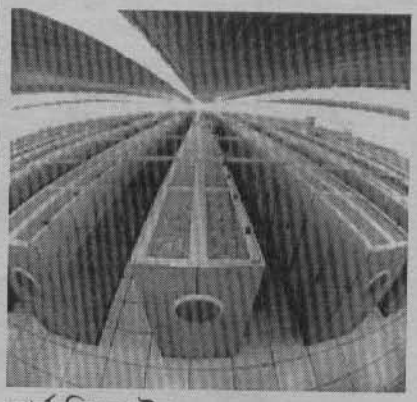

আর্থ সিমুলেটর

১৯৯৭ সালে একদল জাপানি ইঞ্জিনিয়ার এমন একটি কম্পিউটার তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা হবে অসম্ভব শক্তিশালী, বিশ্বের ঘটমান সবকিছু নখদর্পণে থাকবে সে যন্ত্রের। বলিভিয়াব বাষ্পীভূত রেইন ফরেস্ট, মেক্সিকোর ধোঁয়া উদগীরণ করা কলকারখানা, জেট স্ট্রিম, গালফ স্ট্রিম, লোকজনের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সবকিছুর খবর রাখবে এটা। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের অর্থাৎ কম্পিউটারটি তৈরির সাহসও তারা দেখান। ২০০২ সালের ১১ মার্চ তারা এ কাজ শেষ করেছেন। ইঞ্জিনিয়াররা এমন একটি কম্পিউটার তৈরি করেছেন যার শক্তির তুলনা নেই। তারা তাদের আবিষ্কারের নাম দিয়েছেন : আর্থ সিমুলেটর।

আর্থ সিমুলেটর এক অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার। এরকম শক্তিশালী কম্পিউটার এর আগে তৈরি হয়নি। এ যেন আরেক পৃথিবীর সৃষ্টি। আর্থ সিমুলেটর তৈরির আগে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন কম্পিউটারটি ছিল একটি আমেরিকান মিলিটারি মেশিন যা সেকেন্ডে ৭.২ ট্রিলিয়ন ক্যালকুলেশন করতে পারতো। আর আর্থ সিমুলেটর প্রতি সেকেন্ডে এ কাজটা পারে প্রায় পাঁচ গুণ বেশি অর্থাৎ ৩৫ ট্রিলিয়ন ক্যালকুলেশন। আগামী পৃথিবীতে ১২টি সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন সুপার কম্পিউটারের একক শক্তি ধারণ করবে আর্থ সিমুলেটর।

ইয়োকোহায় রাখা হয়েছে এ আশ্চর্য যন্ত্রটিকে। এর আয়তন চারটে টেনিস কোর্টের সমান। 'দাম' ৩৫০ মিলিয়ন ডলার।

দাম বেশি হলেও এ কম্পিউটারে 'কাম' দেয় অনেক। স্যাটেলাইট আর সামুদ্রিক বয়া থেকে প্রাপ্ত ডাটার সাহায্যে এ কম্পিউটারের মাধ্যমে

বিজ্ঞানীরা গোটা বিশ্বের একটি কম্পিউটার মডেল তৈরি করে সহজেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন, আগামীতে বিশ্ব পরিবেশের অবস্থা কী হবে। বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে আগামী ৫০ বছরের বিশ্ব সামুদ্রিক তাপমাত্রার আবহাওয়া বার্তা তৈরি করে ফেলেছেন। আর আগামী পাঁচ দশকে বিশ্ব আবহাওয়া ও পরিবেশ কেমন দাঁড়াবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার কর্মসূচি প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছেন। এমনকি ১০০০ বছর পরে পৃথিবীর অবস্থা কেমন হবে তাও বলে দিতে পারবে আশ্চর্য কম্পিউটারটি। নিঃসন্দেহে পরিবেশবিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটাতে চলেছে আর্থ সিমুলারেটর।

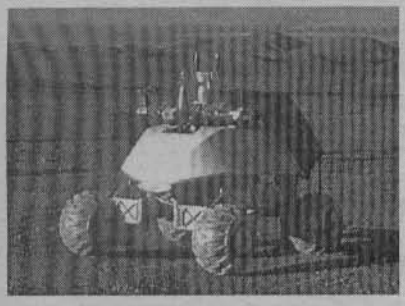

রেড রোভার

চলতি সালে নাসা মঙ্গলগ্রহে দুটো রোবোটিক রোভার পাঠানোর তোড়জোড় করছে। সোলার পাওয়ার সমৃদ্ধ এ দুটো গাড়ি নভোযান সোজার্নার এর চেয়ে আরও বিশগুণ বেশি জোরে ছুটবে। রোভার দুটোতে থাকবে নয়টি ক্যামেরা এবং তিনটা স্পেকট্রোমিটার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের জন্য।

ভ্রমণ আনন্দে শেড পট

এ শেড পট তাবুগুলো লেমিনেটেড পেপার বোর্ড দিয়ে তৈরি। এগুলোর মেঝে এবং দরজাও আছে। প্রবল বাতাসেও শক্তিশালী এ তাবু উড়ে যায় না। চমৎকার ওয়াটার প্রুফ আলাদা করে রাখা যায় এবং এ জিনিস খাটাতে তেমন পরিশ্রমও নেই। যুদ্ধকালীন বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কোড পড নামের এ তাবু অস্থায়ী আশ্রয়ের সন্ধান দেয়। আর যারা ঘুরতে যেতে চান ঠ্যাংওয়ালা শেড পড নিয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়তে পারেন। এ গ্রীষ্ম থেকেই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে ৭৮৫ ডলার দামের শেড পড।

ট্রিক্কি

তিন চাকার এক মজার সাইকেল ট্রিক্কি। দেখতে অদ্ভুত লাগলেও, এয়ারক্রাফট তৈরির অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি এ সাইকেল পৃথিবীর যে কোনো সাইকেলের চেয়ে মজবুত এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন। ট্রিক্কি সাইকেলের আবিষ্কর্তা ট্রিক্কি টেক। হলিউডের সেলিব্রেটিদের মধ্যে এ সাইকেল ইতোমধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। জেনিফার অ্যানিস্টোন, টিমোথি হাটন এবং ডেভিড নেপড ট্রিক্কিতে চড়ে বেশ মজা পাচ্ছেন। ট্রিক্কির দাম দুশ থেকে তিনশ ডলার। এ সাইকেল সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে www.trikke.com ওয়েব সাইটে খোঁজ নিন।

টাওয়ার অব পাওয়ার

সস্তা, সবুজ বিদ্যুৎ চান? অস্ট্রেলিয়ানরা সে ব্যবস্থা করে দেবে আপনার জন্য। প্রথমে ২০,০০০ একর বিশিষ্ট গ্রিন হাউজের ব্যবস্থা

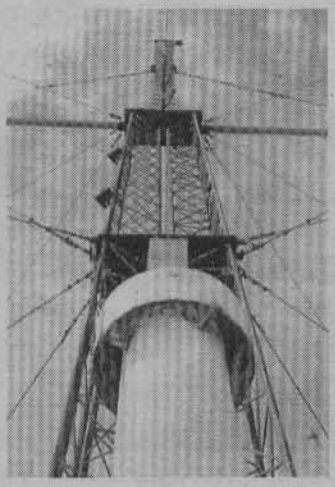

করতে হবে বাতাস ধরে রেখে উষ্ণ করে তোলার জন্য। তারপর মাঝখানে বসাতে হবে ১ কিলোমিটার লম্বা একটি প্রকাণ্ড টাওয়ার। গ্রিন হাউজের গরম বাতাস টাওয়ার থেকে উঠতে শুরু করবে চিমনির মতো, ঘুরবে টারবাইন এবং উৎপাদন করবে কমপক্ষে দু লাখ অস্ট্রেলিয়ানের বাড়ি আলোকিত করে তোলার মতো বিদ্যুৎ। সায়েন্স ফিকশন মনে হচ্ছে! কিন্তু এ প্রজেক্ট ইতোমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সরকারের বৈধ অনুমতি পেয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে। কাজ শেষ হওয়ার পরে ৮০০ মিলিয়ন ডলারের এ সোলার টাওয়ারটি হবে মানুষ নির্মিত সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার। আশা করা যায় ২০০৬ সাল নাগাদ শেষ হয়ে যাবে কাজ।

সূত্র : টাইম ম্যাগাজিন

বিজ্ঞান বিচিত্রা

নখের সাদা দাগ

ছোটবেলায় বলতে শুনেছি, নখে ফুল (সাদা দাগ) থাকলে নতুন জামা পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় প্রবাদ আছে যে, নখের ফুলে পিন্দে পায়ের ফুলে নিন্দে। নখের ওপরে স্বচ্ছ দাগ সাধারণত কোনো আঘাত, সংক্রমণ অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে জৈব রাসায়নিক অপূর্ণতা থেকে হতে পারে। নখের শক্ত অংশটির নিচে চামড়ার একটি নির্দিষ্ট স্তর রয়েছে। ক্যারটিন নামের একপ্রকার রাসায়নিক স্তরের স্তূপে এ স্তরটি শরীরের অন্য যে কোনো চামড়ার চেয়ে পৃথক। ক্যারটিন স্বাভাবিক চামড়াকে আস্তে আস্তে লম্বা একটি অংশে (অঙ্গ) পরিণত করে। আর এটিই একসময় নখে রূপান্তরিত হয়। নখ লম্বা হওয়ার এ সময়টিতে ছত্রাক অথবা অন্য কোনো কারণে সংক্রমণ হলে স্ত রটিতে সাদা দাগ পড়ে যায়। পরবর্তীতে নখ যখন শক্ত হয়, সাদা দাগটি স্থায়ীভাবে থেকে যায়। আমাদের অজান্তেই জৈবিক প্রক্রিয়ার পুরানো নখ মরে গিয়ে নতুন নখ গজায়। তখন আবার ক্যারটিনের নতুন স্তর পড়ে। নখে সাদা দাগ পড়া স্থায়ী কোনো প্রক্রিয়া নয়। এটি আতঙ্কজনক কোনো বিষয়ও নয়।

মোঃ ফরিদুল ইসলাম (আফিফ), চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

ডিম বা চিংড়িতে এলার্জি হয় কেন

আমাদের শরীরে রোগজীবাণু ঢুকলেই শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠে; রক্তের মধ্যে রোগপ্রতিরোধকারী এক ধরনের প্রোটিন তৈরি হতে থাকে। এর নাম 'ইমিউনোগ্লোবিউলিন'। এর আবার নানাভাগ। শুধু রোগজীবাণুর ক্ষেত্রেই নয়, অনেক সময় অচেনা কিছু শরীরে অনুপ্রবেশ করলেও রোগ প্রতিরোধকারী প্রোটিনটি তৈরি হয়। এর ফলেই এলার্জির উপসর্গ দেখা দেয়। ধরা যাক, কারও ডিমে এলার্জি আছে। জীবনে প্রথম যেদিন সে ডিম খেয়েছিল, সেদিন ডিমের বিরুদ্ধে তার শরীরে বিশেষ ধরনের 'ইমিউনোগ্লোবিউলিন' তৈরি হয়েছিল। এ জিনিসটা চামড়ার নিচে অথবা শরীরের যেসব জায়গায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি রয়েছে, সেখানকার বিশেষ কোষের মধ্যে জমা হয়। এরপর যতবারই সে ডিম খাবে, তা শরীরের ওই বিশেষ কোষগুলোকে সক্রিয় করবে এবং সেখানে জমে থাকা ইমিউনোগ্লোবিলিনের কারসাজিতে 'হিস্টামিন', 'সেরোটনিন', 'হিপানিশ' নামে রাসায়নিক জিনিস বের হতে থাকে। এর ফলেই এলার্জির উপসর্গ দেখা দিতে পারে। মজার কথা, শুধু ডিম বা চিংড়িই নয় মানুষভেদে যে কোনো জিনিস থেকেই এলার্জির উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

মোঃ সামসুজ্জোহা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

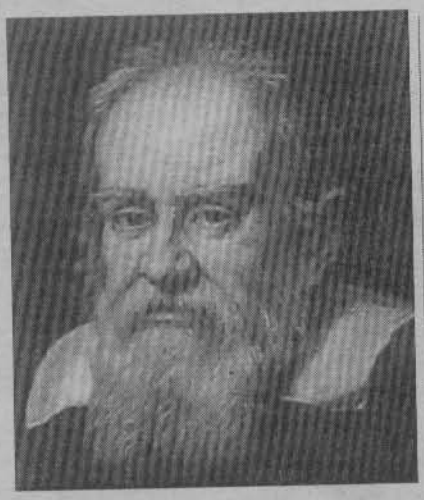

জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ

গ্যালিলিও গ্যালিলি

এম. হাসান

যাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ বলা হয়ে থাকে; যিনি আবিষ্কার করেছেন টেলিস্কোপ, পেন্ডুলাম ঘড়ি ইত্যাদি; 'The law of a Mortion' যার শ্রেষ্ঠ রচনা, প্রচলিত ধারণার পরিপন্থি মতবাদ প্রকাশ করার দায়ে শক্তিশালী চার্চ যাকে আমৃত্যু গৃহবন্দি রাখেন। তিনি হচ্ছেন গ্যালিলিও গ্যালিলি। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তার ৪৪২তম জন্মবার্ষিকী। তার এ জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে তার কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবারের আয়োজন।

জন্ম ও পরিচয়

গ্যালিলিও গ্যালিলি ১৫৬৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইতালির বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর পিসায় জন্মগ্রহণ করেন। সাত ভাইবোনদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। গ্যালিলিও'র বাবা ভিনসেনজো গ্যালিলিও ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। মা ছিলেন গৃহিণী।

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলো গ্যালিলিওকে আকর্ষণ করত। প্রকৃতির রহস্যময় নিয়মগুলো কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে তার আগ্রহ ছিল প্রচণ্ডরকমের।

গ্যালিলিও ১৫৮২ সালে ১৮ বছর বয়সে তার বাবার ইচ্ছায় পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়ার জন্য ভর্তি হন। ক্লাসের বইয়ের প্রতি তার তেমন মনযোগ ছিল না। ক্লাসের পড়া বাদ দিয়ে তিনি নানারকম বিজ্ঞানের বই পড়তেন এবং বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা করতেন। প্রতিটি ক্লাসে শিক্ষকদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলতেন। নিজের ছোট ঘরে গড়ে তোলেন একটা পরীক্ষাগার।

গ্যালিলিও তখন পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ঠিক এ সময় গ্যালিলিও পরিচিত হন তার পিতার বন্ধু রিচির সাথে।

রিচি ছিলেন ইতালির রাজপরিবারের অঙ্কের শিক্ষক। রিচি একদিন বাড়িতে ছাত্রদের মধ্যে ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়াচ্ছিলেন। ঠিক সে সময় গ্যালিলিও রিচির বক্তব্য শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলেন। ফলে তার মধ্যে নতুন করে অঙ্কের প্রতি আকর্ষণ জেগে ওঠে প্রবলভাবে। ডাক্তারি বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে পড়তে আরম্ভ করেন ইউক্লিড আর্কিমিডিস। ডাক্তারিতে আর মন নেই, দিনরাত চলতে থাকে অঙ্কের চর্চা। আর তাকে সাহয্যের জন্য এগিয়ে আসেন রিচি। ঠিক এ সময় তার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে।

প্রার্থনার সময় তিনি লক্ষ করলেন, একটি বিরাট ঝাড়লণ্ঠন। একজন কর্মচারী ঝাড়লণ্ঠনে প্রদীপ জ্বালানোর সময় সেটা সামান্য দুলে ওঠে। আর এতে প্রতিবার ঝাড়লণ্ঠন দোলার সাথে সাথে তার ঘর্ষণের আওয়াজ হতে থাকে এবং ঝাড়লণ্ঠনের দোলনের আওয়াজ হতে থাকে। ঝাড়লণ্ঠনের দোলনা ক্রমশ কমে আসছে। এ থেকে আবিষ্কার করেন পেন্ডুলাম ঘড়ি। ১৫৮৫ সালে তিনি ডাক্তারি পড়া শেষ না করেই পিসার বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেন এবং ফ্লোরেন্স শহরে তার মা-বাবার কাছে চলে যান।

কর্মজীবন

পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যালের ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি নানানরকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন। গবেষণার কারণে তিনি খুব খ্যাতি লাভ করেন। খ্যাতির কারণে ১৫৮৯ সালে তিনি পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। ১৫৯২ সালে তিনি ইতালির 'ইউনিভার্সিটি অব পাডুয়াতে গণিতের শিক্ষক পদে যোগদান করেন। গ্যালিলিও ১৬০৪ সাল থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়ে মনোনিবেশ শুরু করেন। এ সময় আকাশে একটি নতুন তারা দেখা গেল। বিভিন্ন লোকের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো। কেউ বলে উল্কা, কেউ বললেন নতুন কোনো তারা।

গ্যালিলিও কয়েকদিন পর্যবেক্ষণ করে সর্বসমক্ষে তার মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এটি কোনো গ্রহ নয়, উল্কাও নয় সৌরমণ্ডলে অবস্থিত নিতান্তই একটি তারা। তার বক্তৃতা শুনতে দলে দলে লোক এসে হাজির হতো। এরপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর। তার সাথে লিখতে থাকেন গতিতত্ত্ব, বিশ্ব প্রকৃতি, শব্দ, আলো, রং প্রভৃতি নানা বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ।

১৬০৯ সাল। চারধারে গুজব শোনা গেল একজন ডাচ চশমার দোকানের কর্মচারী কাজ করতে করতে এমন একটি জিনিস আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে নাকি অনেক দূরের জিনিস দেখা যায়। গ্যালিলিও কথাটি শুনে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর একটি ফাঁকা নলের মধ্যে একটি উত্তল ও অবতল লেন্সকে নির্দিষ্ট দূরত্বে বসাতেই দেখতে পেলেন বহু দূরের জিনিসপত্র মনে হচ্ছে খুব কাছে। অবশেষে ১৬০৯ সালের ২১ আগস্ট তিনি সর্বসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য টেলিস্কোপ নিয়ে গেলেন ভেনিসের এক উঁচু বাড়ির ছাদে। জনসাধারণ অবাক বিস্ময়ে রাতের আকাশের তারা দেখতে পেলেন। গ্যালিলি অনেক পর্যবেক্ষণের পর বললেন, চাঁদ একটি উপগ্রহ। তার মধ্যে রয়েছে ছোট বড় অসংখ্য পাহাড় এবং গিরিখাদ। এরপর তিনি আবিষ্কার করেন শনির বলয়, জুপিটারের উপগ্রহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহাণুপুঞ্জ। এ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে লেখেন প্রথম বই SIDERUS NUNCIUS (The Messenger)। ফলে প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। এছাড়া তিনি নানা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করেন। কম্পাস, বাতাসের উত্তাপ পরিমাপের জন্য থার্মোমিটার, পানি উত্তোলনের জন্য উন্নত লিভার কল তৈরি করেন।

বৈবাহিক অবস্থা

গ্যালিলিও'র ছিল দু মেয়ে ভার্জিনিয়া ও লিভিয়া এবং এক ছেলে ভিনসেজো। তাদের মা মেরিনা'র সাথে গ্যালিলিও কখনও বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হননি।

কাঠগড়ায় গ্যালিলিও

গ্যালিলিও ১৬১১ সালে রোমের ধর্মযাজক পোপ পল-৫ কে তার টেলিস্কোপ সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ধর্মযাজকরা ধর্ম বিষয়ে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও'র অনাধিকার চর্চা পছন্দ করতেন না। ১৬১৩ সালে গ্যালিলিওর টেলিস্কোপের সাহায্যে সূর্যে সৌরকলঙ্কের অস্তিত্ব দেখতে পান। সৌরকলঙ্কের কথা প্রকাশ করার পর পোপ রাগান্বিত হয়ে গ্যালিলিও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত সমস্ত গবেষণা পর্যবেক্ষণগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পোপ ১৬১৬ সালে কোপারনিকাসের মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন।

গ্যালিলিও ১৬৫২ সালে তার সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণগুলো থেকে পাওয়া সত্যগুলোকে বই আকারে প্রকাশ করেন। চার্চের পোপ বইটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। পোপ গ্যালিলিওকে রোমে হোলি অফিস (ধর্মীয় আদালত) এ যাওয়ার আদেশ দেন। অপরাধের শাস্তি হিসেবে তাকে জীবনের বাকি সময় গৃহবন্দি অবস্থায় কাটাতে হয়। চারবছর গৃহবন্দি থাকার পর ১৬৩৭ সালে গ্লুকোমিয়া নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান।

শেষ জীবন

গ্যালিলিও ১৬৪২ সালের ৮ জানুয়ারি গৃহবন্ধি অবস্থায় ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ফ্লোরেন্স শহরের একটি চার্চের সামনে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার মৃত্যুর পরও চার্চ তাকে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করেন। অবশেষে ১৯৭৯ সালে পোপ জন পল-২ গ্যালিলিওকে নির্দোষ ও তার মতবাদ সঠিক বলে ঘোষণা করেন।

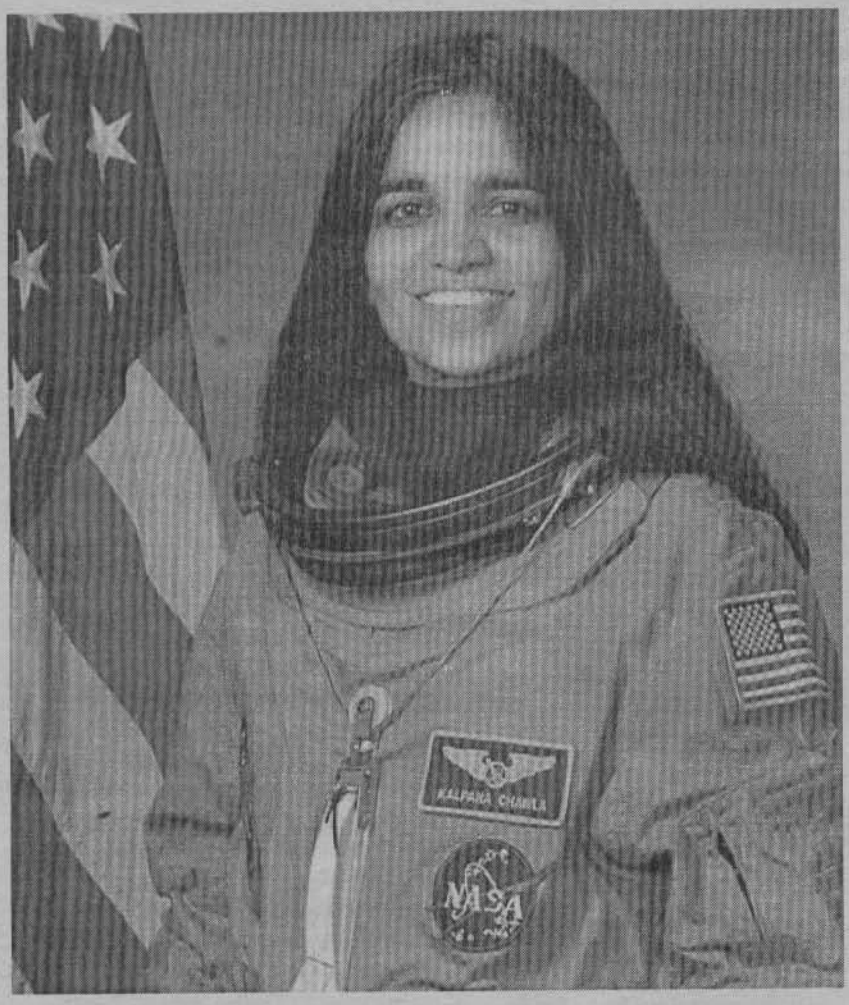

কল্পনার স্বপ্ন ছিল তারার দেশে পৌছানোর। সে স্বপ্নটাকে বাস্তব করতে তিনি চলে গেলেন। তার বাসনা ছিল একটা স্পেস শাট্‌ল-এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করবেন, সেটাই ঘটেছে তার জীবনে।

সেই ট্র্যাজেডি

জেবুন নাহার

একদিন মঙ্গলগ্রহের মাটিতে পা রাখবেন তিনি। এমন স্বপ্নই ছিল তার মনে। এমন স্বপ্নের কথাই কল্পনা চাওলা তার বন্ধু এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় সান্টা ক্লারা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অতুল্য সারিনকে বলেছিলেন। লাল গ্রহে পৃথিবীর মানুষ অভিযানে গেলে, প্রথম দলের সদস্যা হওয়ার সাধ ছিল তার। কল্পনার দাদা সঞ্জয় বলেছেন, "একটা ব্যাপারে বেশ দৃঢ় ছিল ও। বুঝিয়ে দিতে চাইত আর পাঁচটা মেয়ের মতো হওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। কোনো ব্যাপারে অন্য মেয়েদের চেয়ে শুধু নয়, যে কোনো ছেলের চেয়েও এগিয়ে থাকতে চাইতো আমার বোন।"

কল্পনা চাওলা হলেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট এবং সেখানকার দ্বিতীয় মার্কিন নভশ্বর যিনি দুর্ঘটনায় প্রাণ দিলেন। তার শেষ সাক্ষাৎকারে কল্পনা বলেছিলেন যে, তাকে বাল্যে অনুপ্রাণিত করেছিল বৈমানিক জে আর ডি টাটা-র একক ওড়া, কল্পনার ভাষায় 'যে ছোট্ট প্লেনটায় করে উনি ডাকহরকরায় কাজ করেছেন সে প্লেনটা দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছি, ভাবতেই আমার কল্পনা বন্দি হয়ে গেল চিরকালের মতো।'

কল্পনার খুব দুঃখ ছিল যে নভশ্চর হওয়ার জন্য তাকে ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হয়েছিল; কারণ সেটা না করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাবিশ্ব কর্মসূচিতে অতখানি গুরুত্ব পাওয়া সম্ভব ছিল না।

কল্পনার স্বপ্ন ছিল তারার দেশে পৌছানোর। সে স্বপ্নটাকে বাস্তব করতে তিনি চলে গেলেন। তার বাসনা ছিল একটা স্পেস শাট্‌ল-এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করবেন, সেটাই ঘটেছে তার জীবনে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশের মতে, কল্পনার স্বপ্ন ছিল তারার দেশে পৌছনোর, কিন্তু শেষ অবধি তিনি সে তারার দেশও পেরিয়ে গেলেন।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল তাকে তার প্রথম মহাকাশ অভিযানের পর বলেছিলেন, "তুমি ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটা দৃঢ় সেতুর কাজ করলে।" তার উত্তরে কল্পনা বলেছিলেন, "আমি যদি তাই করে থাকি তাহলে আমি ভীষণই গর্বিত যে এমনটা করতে পেরেছি।" নভশ্চরদের অফিসে ক্যাপ্টেন কেন্ট রমিঙ্গার বললেন, "কল্পনা সবসময় খুঁজতো টেকনিক্যাল পারফেকশন। তাকে সবাই সমাদর করত তার অস্বাভাবিক দয়ালু স্বভাবের জন্য।"

রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশের মুখপাত্র আরি ফ্লেশার বললেন, "কল্পনা হলেন ভারতের হিরো, তিনি হলেন এক বিরল উদাহরণ এবং কোটি কোটি মানুষের কাছে রোলমডেল, বিশেষ করে মহিলাদের কাছে।"

১ ফ্রেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মহাশূন্যের মহাকাশফেরি কলম্বিয়া ১৬ দিনের সফর শেষে পৃথিবীর বুকে নেমে আসার মাত্র ১৫ মিনিট আগের এক দুর্ঘটনায় আরও ছয় মহাকাশচারীর সাথে মারা গেলেন তিনি। সোনপতের ব্যবসায়ী বানারসী লাল ও তার স্ত্রী সানি ও গীতার চতুর্থ ও কনিষ্ঠ সন্তান কল্পনার জন্ম তৎকালীন অবিভক্ত পাঞ্জাবের কারনাল-এ। এক দাদা ও তিন বোনের সংসারে এ মেয়েটি যেন প্রথম থেকেই আলাদা। মায়ের কথায়, "শেষ সন্তান হিসেবে ছেলে কামনা করেছিলাম; হলো মেয়ে।" ১৯৬১ সালে আসন্নপ্রসবা একজন ভারতীয় রমণীর এরকম বাসনা এবং হতাশার কারণ অনুমান করা যায়। উচ্চশিক্ষার সাহায্য পাননি বানারসী লাল কিংবা তার স্ত্রী। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর কপর্দকশূন্য হয়ে পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পৌছান ভারতে। হয়তো সেজন্য সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে রীতিমতো সজাগ ছিলেন ঐ দম্পতি। আর শিক্ষার ছোঁয়ায় রীতিমতো স্বাতন্ত্র্যে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাদের ছোট মেয়ে।

টেগোর বাল নিকেতন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে কল্পনার ইংরেজির মাস্টারমশাই কামলিশ শর্মা-ও একই কথা বলেছেন। "ওর দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা সবকিছু ছিল আলাদা।" চণ্ডিগড়ে পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির সময় দাদা সঞ্জয় সাথে ছিলেন। তার অভিজ্ঞতা হয়েছিল বিচিত্র। কল্পনা পছন্দ করতেন এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। সঞ্জয় অবাক। অবাক বাড়ির অন্যরাও। "বিষয়টি শুধু একটু আলাদাই নয়, দেখলাম মেয়েদের মধ্যে শুধু ও একাই ওই

বিষয়টা পছন্দ করেছে," বলেছেন সঞ্জয়। "বাড়ি ফেরার পর অনেক বোঝানো হলো ওকে, যদি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে পড়ে। কোনো লাভ হলো না। সে তার মতোই।"

১৯৮২ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাড়ি। টেক্সাস ইউনিভার্সিটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ডক্টরেট কলোরাডো ইউনিভার্সিটি থেকে। বিষয় অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং। সেটা ১৯৮৮ সাল। ছয় বছর পরে ১৯৯৪ সালে ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)-এ যোগদান এবং পরের বছর মার্চ থেকে জনসন স্পেস সেন্টারে প্রশিক্ষণ। বিষয় রোবোটিক্স ও কম্পিউটার সায়েন্স। নাসা-র একাধিক গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্বও দিয়েছেন কল্পনা। পড়াশোনা চালিয়ে যেতে মেয়ের আমেরিকায় পাড়ি দেয়ায় কিছুটা আপত্তি ছিল বাবার। বাড়ির সাথে একটু মানসিক দূরত্বও তৈরি হয়েছিল প্রথমে। সেটা বেড়ে যায় বিয়ের জন্য পাত্র নির্বাচনে। কল্পনা পছন্দ করেন ফ্লাইট ইনস্ট্রাক্টর জঁ পিয়ের হ্যারিসনকে। বিয়ের পর অবশ্য সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে শুরু করে ধীরে ধীরে। ১৯৯৭ সালের ১৯ নভেম্বর প্রথম মহাশূন্যে যান কল্পনা। সেদিন তার কৃতিত্বে মায়ের মন্তব্য 'আমি গর্বিতা।'

আমেরিকার নাগরিক হয়ে যাওয়ার পরেও ভারতে তার শিকড়কে ভুলে যাননি কল্পনা। তার অনুরোধে রাজি হয়ে নাসা আমন্ত্রণ জানায় টেগোর বাল নিকেতন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ 'সামার স্পেস এক্সপেরিয়েন্স প্রোগ্রাম'-এ যোগ দিতে। প্রকল্পের পরিচালন ভার কাঁধে নিয়েছে হিউস্টনের ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্কুল ফাউন্ডেশন। ১৯৯৮ সাল থেকে ফি-বছর কল্পনার স্কুলের দুজন ছেলেমেয়ে হিউস্টনে কাটায় কয়েক সপ্তাহ। বেশিরভাগ সময়টাই নাসা-র বিভিন্ন কাজকর্ম দেখতে দেখতে কাটে ওদের। অবশ্য, এ প্রোগ্রামের একটা বিশেষ অংশ কল্পনাদিদির বাড়িতে ডিনার, ভারতীয় খাবার সহযোগে। রান্না কল্পনা কিংবা তার স্বামী পিয়েরের।

একদা যে স্কুলে বেণী দুলিয়ে পড়তে যেতেন তিনি, সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে কী নিজেকে খুঁজে পেতেন কল্পনা? হয়তো তাই। ২০০১ সালে বাল নিকেতনের দু ছাত্রছাত্রী সুশীল ও মিশার সাথে কয়েকদিন কাটানোর পর স্কুলের ডিরেক্টর দলজিৎ কাউর মদনকে এক চিঠিতে কল্পনা লিখেছিলেন, "ভীষণ ভালো লাগল ওদের দেখে। স্কুল ওদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করতে পেরেছে তা প্রতিভাত হয়েছে ওদের আচরণে। বুঝতে পারছি ওদের জন্য আপনাদের পরিশ্রম। যেন সোনার খনি রয়েছে আপনাদের হাতে। আমার শ্রদ্ধা নেবেন।"

আর স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা? কল্পনাদিদির সংস্পর্শে এসেছিল নেহা শর্মা। ভুলতে চায় না হিউস্টনের কয়েকটা দিন। দিদি শুনিয়েছিল ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের কিছু ক্যাসেট। তার পছন্দের কয়েকটা রাগ। গল্প করতে করতে নেহাকে বলেছিল কল্পনা, "তোমার যা ভালো লাগে, তা-ই করো। অনুসরণ করবে শুধু নিজের স্বপ্নকে। ভেবো না কেউ তোমায় উৎসাহ দিতে এগিয়ে এলো কিনা। কী আসে যায় তাতে?"

১ ফেব্রুয়ারি বাল নিকেতনে ছাত্রছাত্রীরা সকালে এসেছিল খুশির মেজাজে। ১৬ দিনের মহাকাশ যাত্রার শেষে কল্পনাদিদির সেদিন পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা। তাই নাচ-গান বা বাজি ফাটানোর আয়োজন ছিল। এমনকি ব্যবস্থা ছিল আগাম উৎসব উদ্‌যাপনের। তবে সকালের উৎসব বিষাদে পরিণত হয় সন্ধ্যায় দুঃসংবাদে! অকালমৃত্যুতেও প্রেরণা জুগিয়েছেন কল্পনা। নেহা জানিয়েছেন, "আমি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যেতে চাই। দিদিই আমার রোল মডেল। সি জাস্ট কান্ট ডাই।" নেহা যেন পুরনাবৃত্তি করেছে আরেকজন মহিলার কথা। তিনি ইভলিন হাজব্যান্ড; শাট কম্যান্ডার রিক হাজব্যান্ড-এর স্ত্রী। স্বামীকে যিনি হারিয়েছেন কলম্বিয়ার দুর্ঘটনায়। দেশে বিদেশে যখন আলোচনা শুরু হয়েছে মানবারোহীসমেত মহাকাশযাত্রা বাতিল করা উচিত কিনা, তখন শোকের মাঝেও ইভলিন বলেছেন, "আমরা বেদনাহত। যেমন শোকার্ত হয়েছিল অ্যাপোলো-১ এর নভশ্চরদের পরিবারের লোকজন। কিংবা ১৯৮৬ সালে চ্যালেঞ্জার দুর্ঘটনায় মৃত মানুষগুলোর বাড়ির সকলে। তবু চলবে, মহাকাশযাত্রা চলুক। মানুষের অভিযান যেন থেমে না যায়। কলম্বিয়া দুর্ঘটনার কারণ খোঁজা হোক। শুধরে ফেলা হোক ত্রুটিগুলো। কিন্তু এ পরম্পরা যেন শেষ না হয়। আমাদের কিংবা অন্যদের ছেলেমেয়েদের উপকারে লাগুক মহাকাশ গবেষণা।"

নেহা কিংবা ইভলিনের কথায় মনে পড়ে যাচ্ছে গ্রিক পুরাণের কাহিনী। দিদালাস ত্যাগ করছে স্বভূমি ক্রিট। সাথে পুত্র ইকারুস। দুজনে উড়ে চলেছে পাখনায় ভর করে। পাখনা বানিয়েছে দিদালাস। পাখির পালক আর মোম দিয়ে। মুক্তির আনন্দে শিহরিত ইকারুস। সে ক্রমশ উড়তে থাকে আকাশ পানে। পিতা শঙ্কিত। সে বারবার সাবধান করে দিতে থাকে পুত্রকে। সূর্যের তাপে গলে যাবে মোম! পাখনা যাবে খুলে! ইকারুসের ভ্রুক্ষেপ নেই এসবে। সে উড়ে যায়। আরও, আ-র-ও উঁচুতে। একসময় খরতাপে সত্যিই গলে যায় মোম। আর খুলে যায় পালকগুলো। ইকারুস পড়ে যায় পৃথিবীর সমুদ্রে। এ পুরাণকাহিনী বড় প্রিয় ছিল আমাদের নোবেলজয়ী জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী ড. সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখরের। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অধ্যাপক ওই কাহিনী স্মরণ করতেন মানুষের গবেষণা কিংবা অভিযানের অদম্য স্পৃহা বোঝাতে; বলতেন গল্পে ইকারুসের করুণ পরিণতি সলিল সমাধিতে।

ওদিকে তাকিয়ে অনেকে ভাবতেই পারেন এক নাবালকের অবিমৃশ্যতার কথা। মনে হতে পারে পিতার সাবধান বাণী অগ্রাহ্য করার ফল পেয়েছিল পুত্রটি। কিন্তু যদি অন্যভাবে ভাবি গল্পটাকে? স্বল্পকালের জন্য যদি উপলব্ধি করি ইকারুসের আনন্দ? মুক্তির প্রেরণা? ইকারুস আসলে অভিযাত্রীর প্রতীক। সেসব মানুষের প্রতিনিধি, সাহস যাদের পাথেয়। ভয় অতিক্রম করে যারা এগিয়ে যায় ক্রমশ। আরও, আ-র-ও উঁচুতে। 'লেট আস সি হাউ, হাই উই ক্যান ফ্লাই বিফোর দ্য সান মেলটস দ্য ওয়াক্স ইন আওয়ার উইংস।"

১ ফেব্রুয়ারি বাল নিকেতনে ছাত্রছাত্রীরা সকালে এসেছিল খুশির মেজাজে। ১৬ দিনের মহাকাশ যাত্রার শেষে কল্পনাদিদির সেদিন পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা। তাই নাচ-গান বা বাজি ফাটানোর আয়োজন ছিল। এমনকি ব্যবস্থা ছিল আগাম উৎসব উদ্‌যাপনের। তবে সকালের উৎসব বিষাদে পরিণত হয় সন্ধ্যায় দুঃসংবাদে!

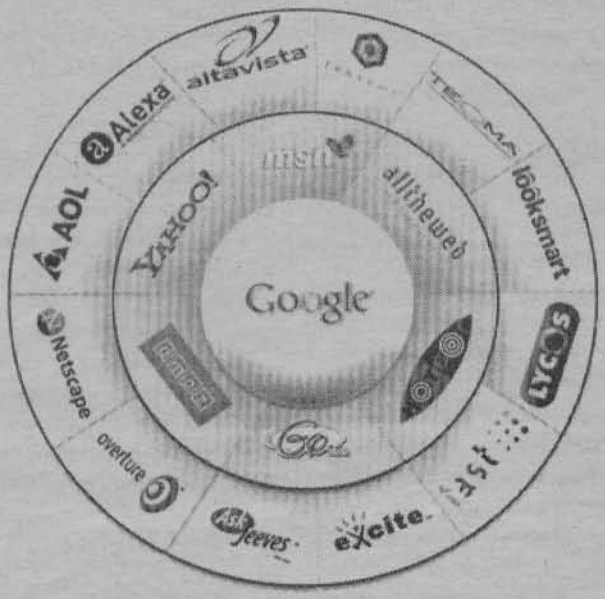

ইন্টারনেটে তথ্য অনুসন্ধানে সার্চ ইঞ্জিন

মোঃ গোলাম মোস্তফা

বর্তমানে এ তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তির বৈপ্লবিক জোয়ারের যুগে সাইবার বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ওয়েবে কাঙ্ক্ষিত তথ্যটি খুঁজে বের করা খুবই দুঃসাধ্য কিংবা বিধ্বংসী মনে হতে পারে। সঠিক উপায় না থাকলে তথ্যের অথৈই সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া গতি নেই।

কোনো কোনো মুহূর্তে ওয়েব সাইটের অবস্থান নির্দেশে সক্ষম এমন একটি প্রধান ডিরেক্টরির অভাব প্রকটভাবে ধরা পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সার্চ ইঞ্জিনের সহায়তায় তথ্যটির সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

তথ্য পুনরুদ্ধারকরণ

ওয়েব সার্চকে আমরা নির্দ্বিধায় ইনফরমেশন রিট্রিভ বা তথ্য পুনরুদ্ধার নামে অভিহিত করতে পারি। তবে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, সুনির্দিষ্ট কোনো গঠনশৈলী ডাটাবেজে রক্ষিত তথ্য অপেক্ষা সাধারণ টেক্সট জাতীয় ডকুমেন্টের তথ্য অনুসন্ধান করা নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য। ডকুমেন্টের গঠনপ্রণালী সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় করতে ইনডেক্স প্রস্তুত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটি ডকুমেন্টে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিংবা জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন জিনিস বা বিষয়বস্তু বর্ণনাকারী পদ বা টার্ম; যেমন— বিষয়, লেখকের নাম, প্রকাশকাল, প্রকাশক, ইউনিভার্সাল রিসোর্স লোকেটর (URL) অথবা বিষয়বস্তু নির্দেশক পদ ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসই ইনডেক্সের প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এবার কয়েক ধরনের তথ্য পুনরুদ্ধারের মডেল তুলে ধরা হলো :

সেট থিয়োরিটিক মডেল

এ মডেলের প্রতিটি ডকুমেন্টের ইনডেক্স কয়েকটি পদের বা শব্দের সমাহার বা সেট হিসেবে বিবেচিত হয়। এ সেটের প্রতিটি উপাদান আবার যৌক্তিক চলরাশি বা লজিক্যাল ভেরিয়েবল রূপে চিহ্নিত হয়।

এখানে ডকুমেন্টে কোনো উপাদানের উপস্থিতিকে 'সত্য' এবং অনুপস্থিতিকে 'মিথ্যা' এ মাত্রা দুটো বাইনারি ভেরিয়েবল দিয়ে নির্দিষ্ট হয়।

বীজগাণিতিক মডেল

এ মডেলে ডকুমেন্টকে একগুচ্ছ দিকরাশি বা ভেক্টর রাশির সেট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ভেক্টরগুলো সার্চিংকালে বীজগাণিতিক নিয়মে একে অপরের সাথে নানা ধরনের সংমিশ্রণে ব্যবহৃত হয়।

হাইব্রিড মডেল

এটি মূলত সেট থিয়োরিটিক এবং বীজগাণিতিক মডেল দুটোরই সমন্বয়ে গড়া আরও একটি অত্যন্ত কার্যকর ডকুমেন্ট পুনরুদ্ধার মডেল।

সার্চ টুলস

সার্চ ইঞ্জিন নির্মাতারা সাধারণত দু-ধরনের সার্চ টুলস প্রয়োগ করে। একটি পুরো ডিরেক্টরি অধ্যয়ন এবং অপরটি স্পাইডার বা মাকড়সা রোবট। তবে পুরো ডিরেক্টরি অধ্যয়নের ব্যাপারটি বেশ সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। অপরদিকে দ্বিতীয় সার্চ টুলসটি মূলত একটি বুদ্ধিমান মাকড়সার মতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েবের জালিকা বিন্যাস ধরে ধরে এগোয়। এ রোবটটি কোয়েরি অনুযায়ী ধাপে ধাপে ডাটাবেজ তদন্ত করে এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেসের মাধ্যমে গ্রাহক বা ব্যবহারকারীর সামনে ফলাফল এনে দেয়।

সার্চ সার্ভিসেস

সার্চ সার্ভিস-এর দায়িত্ব হলো ব্যবহারকারীর কোয়েরি একযোগে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনসমূহে এবং অন্যান্য তথ্যভাণ্ডারসমূহে পাঠিয়ে দেয়া। অতঃপর ওই ইঞ্জিন এবং তথ্যভাণ্ডারগুলো থেকে ফেরত আসা যাবতীয় উত্তর সংগ্রহ করে ডুপ্লিকেট হয়েছে কিনা তা যাচাই করে। এদেরকে যথাযথভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে HTML পৃষ্ঠা বা ওয়েব পেইজের মতো করে লিঙ্কযুক্ত URL হিসেবে ব্যবহারকারীর সামনে ফুটিয়ে তোলে।

সার্চ সাইট

ওয়েবে দু ধরনের সার্চ সাইট রয়েছে। এগুলো হলো সার্চ ডিরেক্টরি এবং সার্চ ইঞ্জিন। সার্চ ডিরেক্টরি ওয়েব সাইটগুলো শ্রেণী ও উপশ্রেণী হিসেবে উচ্চক্রমানুসারে সাজানো থাকে। অন্যদিকে সার্চ ইঞ্জিনগুলো বস্তুত লক্ষ লক্ষ ওয়েব সাইটের তথ্যসমৃদ্ধ ডাটাবেজ ভিন্ন কিছু নয়। এখানে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে সব তথ্য রোবট বা স্পাইডার সময় সময় ওয়েব সাইট খুঁজে বের করে এবং তথ্যের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধনের মাধ্যমে আপডেটেড করে রাখে।

সার্চ ইঞ্জিন যেভাবে কাজ করে

তথ্যের রোবট বা স্পাইডারই হচ্ছে আসল তথ্য উদ্ধারের কারিগর। মাকড়সার মতোই ওয়েবের রশি বা লিংক বেয়ে ধাপে ধাপে পৌঁছে যায় লক্ষ্যবস্তুর স্বতন্ত্র হোম পেইজে। সেখান থেকে ইনডেক্স প্রস্তুত করে ডাটাবেজকে আপডেট করে দেয়াই হলো এর কাজ।

সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করাও খুব সহজ। কোনো একটি সার্চ ইঞ্জিনের চলতি পেইজে নির্ধারিত শূন্যস্থানে কাঙ্ক্ষিত তথ্যটি লিখে পাশের 'স্টার্ট'

একটি হোমপেজ যতবেশি বদলানো যায় স্কুটার তত বেশিবার ঐ পেইজ ভ্রমণ করে।

বা 'সার্চ' বোতামে ক্লিক করুন। এবার দেখবেন সার্চ ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে। একটু সময় পর লক্ষ করবেন যে, আপনার লিখে দেয়া তথ্য ধারণকারী যাবতীয় ওয়েবসাইটের তথ্য এবং সার্চ ফলাফল URL লিঙ্ক সমৃদ্ধ পৃষ্ঠা হাজির করেছে। যেমন— ইয়াহু সার্চ ইঞ্জিনের ব্যবহারের কথাই ধরুন। www.yahoo.com ওয়েব সাইটে প্রবেশ করুন। ওখানে খালি জায়গায় আপনার পছন্দের শব্দটি টাইপ করে ডানপাশে সার্চ বোতামে চাপ দিন। তাহলেই পেয়ে যাবেন কাঙ্ক্ষিত ফলাফল।

বেছে নিন আপনার সার্চ ইঞ্জিনটিকে

কিওয়ার্ড অনুযায়ী তথ্য খোঁজার সুবিধা ছাড়াও হোম পেইজ সুবিধা, ওয়েব সাইট রিভিউ বা সমীক্ষণের সুবিধা ইত্যাদি নানা ধরনের পরিসেবা নিয়ে ওয়েবে রয়েছে নানা ধরনের সার্চ ইঞ্জিন। নিম্নে কয়েকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিনের পরিচয় তুলে ধরা হলো :

ইয়াহু (www.yahoo.com)

বহুল পরিচিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন হলো ইয়াহু। ব্রাউজ করার মতো ও অনুসন্ধানযোগ্য ওয়েব সাইটগুলোর উচ্চক্রমানুযায়ী সাজানো ডিরেক্টরি হিসেবেই একে ভাবা যায়। ব্যবহারকারীর সরবরাহ করা তথ্যের ভিত্তিতে এবং তথ্য রোবট বা স্পাইডারের মাধ্যমে এ দুটি কায়দায় বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে ইয়াহু। ওয়েব সাইট, ইউজনেটের সংবাদ এবং ইমেইলের ঠিকানাসমূহের ইনডেক্স তৈরি করা ছাড়াও বিনামূল্যে ই-মেইল ঠিকানা, সাইট সমীক্ষণের সুযোগ এলাকা বা দেশভিত্তিক কিংবা বিষয়ভিত্তিক ওয়েব সাইটের নির্দেশনাসহ ডিরেক্টরি সরবরাহ করে ইয়াহু। সার্চ পেইজ কিংবা সার্চ অপশন এ দু মোডে ইয়াহু ব্যবহার করা সম্ভব। সার্চ পেইজ মোড (+) ইনক্লুসিভ, (−) এক্সক্লুসিভ, (T) টাইটেল, (U) ইউআর এল এবং (*) ওয়াইড কার্ড ইত্যাদি অপারেটর প্রয়োগ করে। তবে আরও জটিল তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সার্চ অপশন মোড ভালো। ইয়াহু সাধারণত রিলেভেন্সি র‍্যাংকিং পন্থায় র‍্যাংকিং হিসাব বের করে।

আলটাভিসটা (www.altavista.digital.com)

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক কর্পোরেশনের গবেষণার ফসল আলটাভিসটা আরেকটা বহুল ব্যবহৃত সার্চ ইঞ্জিন। একটা ডকুমেন্টের পুরো টেক্সট পড়ে ইনডেক্স তৈরি করার পাশাপাশি ডকুমেন্টের প্রথম কয়েকটি বাক্যকে এবস্ট্যাক্ট বা সারাংশ হিসেবে ব্যবহারকারীর সামনে তুলে ধরাই হলো এ স্কুটারের কাজ। মেটাট্যাগও ব্যবহার করা হয় ইনডেক্স তৈরিতে। আর দিনে অন্তত একবার এ ইনডেক্স আপডেট করা হয়। একটি হোমপেজ যতবেশি বদলানো যায় স্কুটার তত বেশিবার ঐ পেইজ ভ্রমণ করে। একটি পেইজ যদি দীর্ঘদিন ধরে অবিকৃত থাকে তবে স্কুটারের ভ্রমণও দীর্ঘদিন পরপর সম্পন্ন হবে। তথ্য খোঁজার সময় বুলিয়ান বা যৌক্তিক সম্পর্ক, শব্দগুচ্ছ এবং ছোট হাতের বড় হাতের অক্ষর বিচার বিশ্লেষণ করে। সহজ সার্চের বেলায় কতকগুলো মূল অপারেটর যেমন কোটেশন (" "), যোগ (+), বিয়োগ (−) এবং ওয়ার্ল্ড কার্ড (*) ইত্যাদি প্রয়োগ করে একটি ওয়েব পেইজে ব্যবহারকারীর সরবরাহকৃত শব্দ বা শব্দগুচ্ছটির উপস্থিতি গণনা করতে থাকে। যে পেইজে ঐ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেশি থাকবে সে পেইজটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে। এ অপারেটর ছাড়াও Anchor; host; image; link; text; little, url; ইত্যাদি অপারেটর সমূহও ব্যবহৃত হতে পারে। ইউজনেটের নিউজগ্রুপ অনুসন্ধানে প্রয়োগ করা হয় এমন অপারেটরগুলো হচ্ছে : from; subject; newsgroup; summary এবং keyword; আলটাভিসটা অনুসন্ধান শেষে ব্যবহারকারীর সামনে যা উপস্থাপন করে তাতে থাকে একটি শিরোনাম, সংক্ষিপ্ত সারাংশ সাইজ এবং সর্বশেষ পরিবর্তনের তারিখ। তবে আলটাভিসটা কোনো নিউজ, হটসাইট বা শ্রেণীবিন্যস্ত তথ্য সরবরাহ করে না।

হটবোট (www.hotbot.com)

ওয়ার্ক স্টেশনের একটি সমান্তরাল নেটওয়ার্ক এবং স্লার্প নামের একটি তথ্য রোবট ব্যবহার করে ওয়েবে তথ্য উদ্ধার এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করে সার্চ টুলস হটবোট। লাইট (lite) এবং একটিভেক্স (Activex) দুটো প্রকরণ রয়েছে হটবোটের। এর রোবট ফেরত আনা সমস্ত ডকুমেন্টের URL সংগ্রহ করে একটি শিডিউলিং কাঠামোয় সংরক্ষণ করে। অতঃপর কোনো হোস্ট সিপিইউতে কত বেশিবার প্রবেশ করেছে তার কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে URI গুলোকে বিন্যস্ত করা হয়।
সাধারণত কিওয়ার্ড ধরে অনুসন্ধান ছাড়াও বুলিয়ান বা যৌক্তিক সম্পর্ক অনুযায়ী অনুসন্ধানের সুযোগ হটবোট দেয়। হটবোটকে বলে দেয়া সম্ভব যে এটি যেন সবগুলো শব্দ কিংবা যে কোনো শব্দ কিংবা সঠিক Phrase বা শব্দগুচ্ছকেই কেবল অনুসন্ধানে প্রয়োগ করে। আর উদ্দিষ্ট পেজে শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অবশ্য উপস্থিতি সম্ভাব্য উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিও যেন বিবেচনা করা হয়। এও হটবোটকে আপনি বলে দিতে পারেন।

ওয়েব ক্রলার (www.webcrawler.com)

ওয়েবক্রলারে রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং পছন্দমতো অনুসন্ধানযোগ্য সার্চ মেকানিজম। ওয়েববট কতকগুলো জানা এইচটিএমএল ডকুমেন্ট নেয় এবং এদের URL দিয়ে তার যাত্রা শুরু করে এবং এভাবে সে পৌঁছে যায় একের পর এক নতুন ডকুমেন্টে। সার্চ গাইড এবং ফাইন্ড এ তিনটি মোডে ওয়েবক্রলার বাস্তবিকই একটি কাজের সার্চ ইঞ্জিন। ওয়েব রাউলেট বিচ্ছিন্ন সাইট নির্বাচনের জন্য এবং সার্ফ দ্য ওয়েব ব্যাকওয়ার্ড URL ধরে ধরে সাইট ভ্রমণের জন্য অপশন পাওয়া যাবে ওয়েব ক্রলারে।

এক্সাইট (www.excite.com)

পুরো টেক্সট ঘেটে ইনডেক্স তৈরি করতে পারদর্শী একটি স্পাইডার কেবল ওয়েব আর ইউজনেট নিউজগ্রুপের ডকুমেন্ট উদ্ধার করা সম্ভব এ এক্সাইট সার্চ ইঞ্জিনে। এটি সাধারণ কিওয়ার্ড সার্চ ছাড়াও ফাজি সার্চের সুযোগ দেয়। একই ওয়েব সাইটের একই পেইজে উল্টো ফিরে আসা সম্ভব নয় এ এক্সাইট ইঞ্জিন ব্যবহার করে। এটি একটি প্রধান অসুবিধা। সার্চ, বিভিউস, লাইভ, রেফারেন্স এবং জিপ কোড ইত্যাদি কয়েকটি সেবা বা সার্ভিস পাওয়া যায় এ সার্চ ইঞ্জিন থেকে। যৌক্তিক AND, NOT কিংবা OR অপারেশন ব্যবহারক্ষম এক্সাইটের একটি মজাদার উপহার হলো বিনামূল্যে এক্সাইট ডিরেকট নামের একটি টুল। এটি ডাউনলোড করলে আপনি এড্রেস টুলবার থেকেই এক্সাইটের ডাটাবেজে সরাসরি প্রবেশ করতে পারবেন।

ইনফোসিক (www.infoseek.com)

অত্যন্ত জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন, এটি HTML এবং PDF ডকুমেন্টকে উদ্ধার করে। ওয়েব, ইউজনেটগ্রুপ, ওয়েব FAQ ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্য ইনফোসিক খুবই ভালো ও দক্ষ ব্যবস্থা। চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত সার্চ ইঞ্জিনটি হলো আলট্রাস্মার্ট, আলট্রাসিক, স্মার্ট ইনফো ও সার্চ। রিলেভেন্সি র‍্যাংকিং পন্থায় ডকুমেন্টের প্রথমদিকে কোয়েরি টামটির উপস্থিতির আধিক্য বা স্বল্পতাই র‍্যাংকিং স্কোর তৈরিতে হিসাবে আনা হয়।

উপসংহার

সত্যি কথা বলতে কী ইন্টারনেট ক্রমাগত যতই তথ্য, বাণী, চিত্র আর যোগাযোগের অত্যাবশ্যকীয় ও অনিবার্য মাধ্যম হয়ে উঠেছে এর জগৎটিও ঠিক ততই জটিল আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জালের আবর্তে জড়িয়ে পড়ছে। ইন্টারনেট তথা ওয়েবের তথ্যভুবন থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্যটি উদ্ধার করার প্রক্রিয়াটিও ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে।

তবে আশার কথা আভ্যন্তরীণ কর্মকৌশলটি যতই জটিলতার আবর্তে জড়াক না কেন ব্যবহারকারীগণ কিন্তু ক্রমেই বন্ধুভাবাপন্ন বা ইউজার ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস একের পর এক পেয়ে যাচ্ছেন তার নিজস্ব চিন্তা, রুচি, শিক্ষার ক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র আর সেবা পরিসেবা কাঠামোর সাথে সংগতি রেখেই। কেননা সেটা সার্চ ইঞ্জিন ধরনের বর্তমান প্রজন্মের সার্চ টুলস আর সার্ভিসগুলোর কার্যক্ষমতা তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে আশাতীত দ্রুততায়। এদের সুবাদে ওয়েবের জগৎ পরিণত হচ্ছে তথ্য বিনোদনের কেন্দ্রে।

ইলেকট্রিক ডিজিটাল পেপার

নুসরাত রহমান

ই-পেপার (ইলেকট্রিক ডিজিটাল পেপার) সারাবিশ্বে প্রতিনিয়ত প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটছে। যুগের চাহিদা পূরণ করতে প্রযুক্তির উন্নয়ন এখন অবশ্যম্ভাবি হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর মেধার ব্যবহারে তাই বিশ্বে নতুন নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের পাশাপাশি সময়ের চাহিদায় এবার এসেছে 'ই-পেপার'। চমকপ্রদ এ আবিষ্কার ইতোমধ্যেই বেশ সাড়া জাগিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন এর মাধ্যমে কাগজ শিল্পের উন্নয়নে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। ইলেকট্রিক ডিজিটাল পেপার।

ইলেকট্রিক ডিজিটাল পেপার

নতুন আবিষ্কৃত কাগজের এক নতুন প্রকৃতি। এটি এমন একপ্রকার কাগজ যেটা বারবার ব্যবহার করা যায়; সাধারণ সাদা কাগজের চেয়ে ভিন্নতর কিন্তু কাগজের মতোই হালকা, সহজে ব্যবহারযোগ্য। দারুণ মোলায়েম এ কাগজের রয়েছে রিরাইটেবল ক্ষমতা অর্থাৎ যতবার ইচ্ছা ততবার লেখা যায়। তবে এ পেপারে সাধারণ কলম ব্যবহার করা যাবে না। এজন্য রয়েছে বিশেষ প্রকৃতির কলম। ই-পেপার ব্যবহারের রয়েছে বিভিন্ন সুবিধা।

ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ছাপানো বলে এ কাগজে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। অল্প জায়গা ব্যবহার করে বলে বিশাল বইয়ের স্তূপ বয়ে বেড়ানোরও কোনো ঝামেলা নেই। সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক পদ্ধতি বলে এতে ডাটা আদান-প্রদান করাও খুব সহজ। এর স্ক্রিন পড়া যায় যে কোন দিক থেকেই। অন্যান্য কাগজের মতো একেও ভাঁজ করে রাখা যাবে। তবে এক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা হলো অন্যান্য কাগজে যেমন ভাঁজ করলে ছবি কিছুটা ম্লান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ই-পেপারে তার সম্ভাবনা কম। এতে করে যে কোনো প্রকারের ডাটা আদান-প্রদান দ্রুত করা সম্ভব হবে। এছাড়াও এ পেপারে যে কোনো ধরনের এনিমেশন কিংবা ডাটা যাই হোক না কেন তার আউটলুক বেশ নিখুঁত হবে। প্রয়োজন অনুসারে এর ফন্টও পরিবর্তন করা যাবে। এর স্টোরেজ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় এখানে একের মাঝেই অনেক কিছু স্থাপন বা রাখা সম্ভব। এ ডিজিটাল পেপারগুলোকে চাইলে ডিসপ্লে বা বিলবোর্ড বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। বরং অন্যান্য কিছুর চেয়ে এটি অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী এবং সাশ্রয়ী হবে। সেক্ষেত্রে কোনো ইমেজ এখানে সেট করে সেটাতে একটা ব্যাকলাইট এবং আলো সংযোগ করতে হয়। প্রিন্টিং করার ক্ষেত্রে একই পেপার বারবার ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও আমরা সাধারণভাবে যা কিছু করে থাকি ই-পেপারে সে সংক্রান্ত যাবতীয় সবকিছুই করা সম্ভব।

ই-পেপারের কার্যপদ্ধতি

ইলেকট্রিক ডিজিটাল পেপার তৈরিতে সাইরিকন টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়। এ কাগজগুলো দেখতে ট্রান্সপ্যারেন্ট কাগজের মতো। এ প্রযুক্তিতে লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট দানা যেগুলোর প্রতিটি ছোট ছোট সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে অবস্থান করে এবং ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় থাকে, সে দানাগুলো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করে। এগুলোর ধর্ম অনেকটা ইলেকট্রনিক ডাইপোল এর মতো। এ অবস্থানগুলোতে লেখার সুবিধার জন্য যখন নির্দিষ্ট মাত্রার ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তখন সেগুলো এমনভাবে অবস্থান নেয়, যাতে সেখানে একটি কালার ফুটে ওঠে। ফলক অঙ্কন বা লেখা ফুটে ওঠার জন্য যে পরিমাণ বা যেভাবে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় ঠিক সেভাবেই সেন্সরগুলো নিজেদেরকে সাজিয়ে নিয়ে প্রয়োজনীয় এনিমেশন, ফরম্যাট বা টেক্সট তৈরি করে। এভাবেই এ পেপারে আবার পরবর্তী ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে সে ধরন অনুসারে পরবর্তী ছবি এবং লেখা তৈরি হয়। এর দারুণ বিশেষত্ব বিভিন্ন রংয়ের ছবি এর মেমোরিতে ধারণ করে রাখতে পারে এবং যখন কাগজটি ভাঁজ করা হয় তখন ছবিগুলো নষ্ট হয় না। এ প্রযুক্তি ব্যবহারে খুবই স্বল্প পরিমাণ বিদুৎ খরচ হয়। এতে রয়েছে বিশেষ ধরনের ইমেজ মেমোরি ফাংশন যা অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ বিদুৎ খরচ করেই তার মেমোরিতে রাখা ছবিগুলোকে পরিবর্তন করে প্রদর্শন করতে পারে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় এ প্রযুক্তি বেশ সাশ্রয়ী।

ই-পেপারের প্রচলন এবং ভবিষ্যৎ

ইতোমধ্যেই এ প্রযুক্তির প্রয়োগ বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে। কিছুদিন আগেই এ প্রযুক্তির ইলেকট্রনিক বুক লিবরি বাজারে এসেছে। সনি, ফিলিপস এবং ডিজিটাল পেপারের উদ্ভাবক সংস্থা ম্যাসাচুসেটস ভিত্তিক ই-ইঙ্ক যৌথভাবে বইটি বাজারে প্রকাশ করেছে। প্রতিটি বইয়ের দাম ধরা হয়েছে ৩৭৫ ডলার। এর মেমোরিতে রয়েছে ৫০০টি টেক্সট। বইটির সাথে রয়েছে একটি পিসির সংযোগ। এর ডিসপ্লের প্রতি ইঞ্চিতে রয়েছে ১৭০ পিক্সেলের রেজ্যুলেশন। ই-ইঙ্ক এবং টোপ্পান তৈরি করেছে এটি। আর এর ডিসপ্লে ড্রাইভ করার সামগ্রী তৈরি করেছে বিশ্বখ্যাত নির্মাতা ফিলিপস। পুরো বিষয়টি ডিজাইন করেছে সনি। মাত্র চারটি এএএ ব্যাটারি প্রয়োজন হয় এর জন্য। প্রতিবারে প্রায় ১০ হাজার পৃষ্ঠা ডিসপ্লে করা যাবে। ব্যাটারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডিসপ্লে বজায় থাকবে।

ই-পেপারের এতসব সুবিধা দেখে আশা করা হচ্ছে, ডিজিটাল পেপারের প্রচলন বদলে দেবে আমাদের জীবনধারা। ইলেকট্রিক ডিজিটাল পেপার আমাদের সামনে খুলে দিয়েছে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার। এখনও এ টেকনোলজি সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠেনি তবে এর উন্নয়নের কাজ চলছে। বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো একই সাথে এ টেকনোলজি নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। আশা করা হচ্ছে , সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে অচিরেই এ কাগজ সাধারণের হাতের নাগালে চলে আসবে। সেজন্য হয়তো আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে।

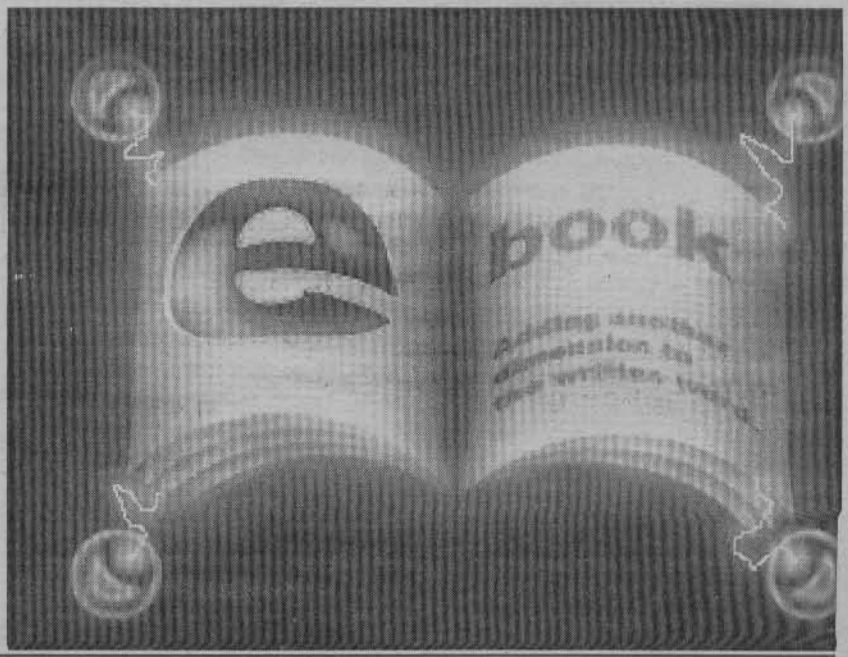

বিজ্ঞান চেতনা

বর্ষ ৫ | সংখ্যা ৫১ | মার্চ ২০০৬

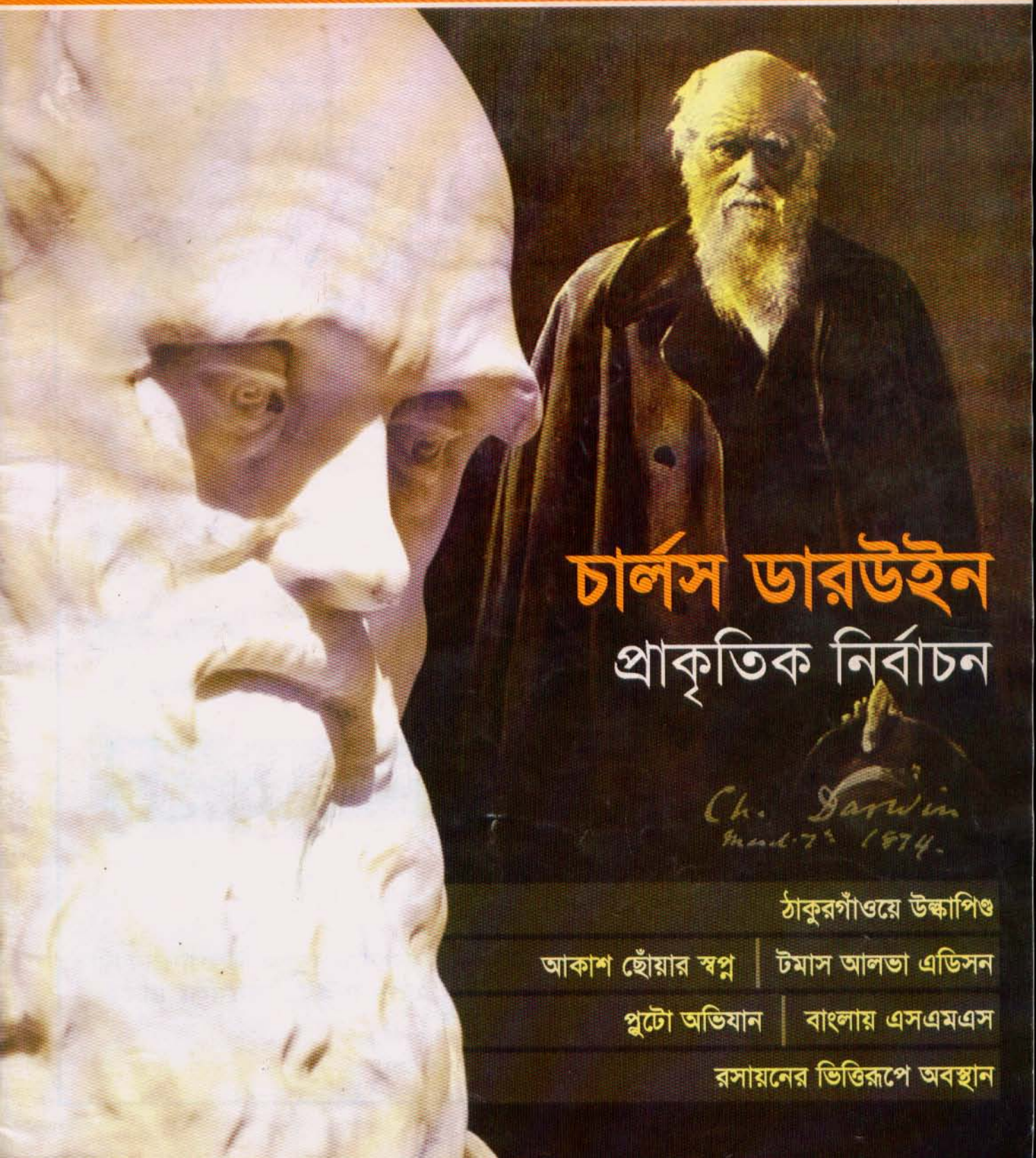

চার্লস ডারউইন
প্রাকৃতিক নির্বাচন

ঠাকুরগাঁওয়ে উল্কাপিণ্ড

আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন | টমাস আলভা এডিসন

প্লুটো অভিযান | বাংলায় এসএমএস

রসায়নের ভিত্তিরূপে অবস্থান

সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

বর্ষ ৫ । সংখ্যা ৫১। মার্চ ২০০৬

সূচি

প্রচ্ছদ রচনা
চার্লস ডারউইন
প্রাকৃতিক নির্বাচন
—দ্বিজেন শর্মা ৭

পার্শ্ব রচনা
কোয়ান্টাম
পদার্থবিজ্ঞানের স্থপতি
১৬ —খালেদা ইয়াসমিন ইতি

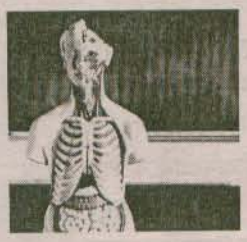

ঠাকুরগাঁওয়ে
উল্কাপতন
—এফ আর সরকার ১৩

বিমানের ১০২ বছর
আকাশে উড়ার স্বপ্ন পূরণ
৪০

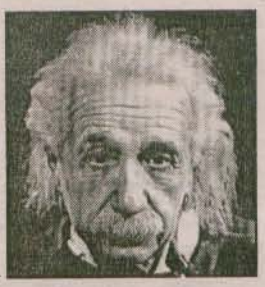

অস্তিত্ব রক্ষার্থে ৩১

টমাস আলভা
এডিসন
২০

রসায়নের
ভিত্তিরূপে অবস্থান ২৭

বাহারি রঙের
অর্কিড
৩৭

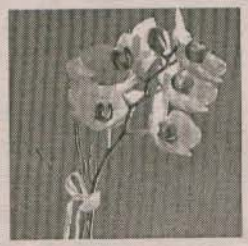

অন্যান্য রচনা

১৫ — প্লুটো অভিযান
২৩ — সূর্যের মতো নক্ষত্র আবিষ্কার
২৯ — চাঁদের ধুলো
১৯ — স্বর্গীয় নন্দন কানন
৩৫ — বাংলায় এসএমএস
৪২ — ইউপি এস প্রযুক্ত ও পরিচর্যা
৪৬ — ক্রেতা সংকটে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রকাশনা

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র — ৩
বিজ্ঞান বিশ্বের নতুন খবর — ৪
স্বাস্থ্য সংবাদ — ৬
বিজ্ঞান প্রজন্ম — ২৪
বিতর্ক — ৩৯
সায়েন্স ফিকশন-গন্তব্য — ৪৪
বিজ্ঞান কুইজ — ৪৮

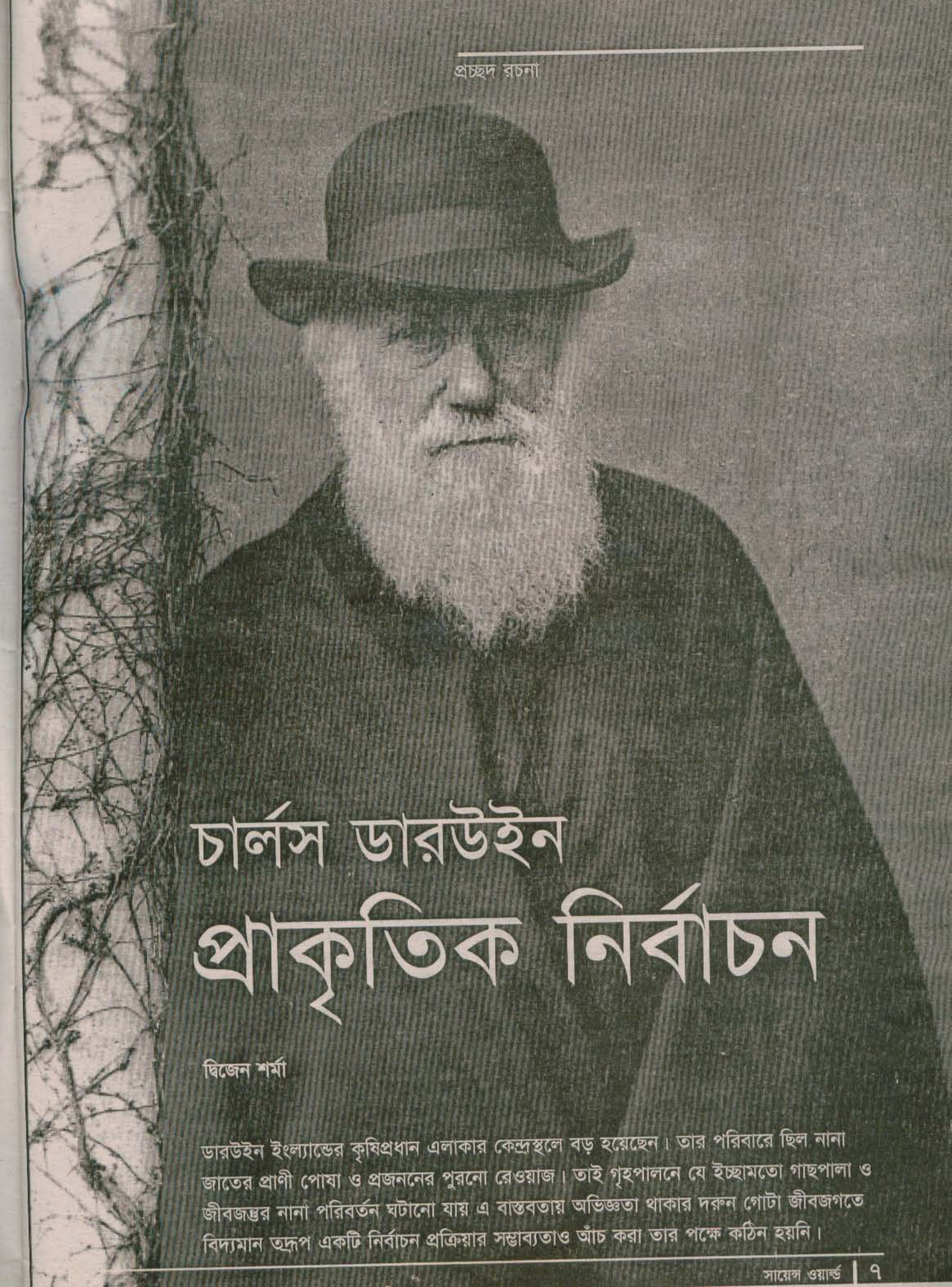

চার্লস ডারউইন
প্রাকৃতিক নির্বাচন

দ্বিজেন শর্মা

ডারউইন ইংল্যান্ডের কৃষিপ্রধান এলাকার কেন্দ্রস্থলে বড় হয়েছেন। তার পরিবারে ছিল নানা জাতের প্রাণী পোষা ও প্রজননের পুরনো রেওয়াজ। তাই গৃহপালনে যে ইচ্ছামতো গাছপালা ও জীবজন্তুর নানা পরিবর্তন ঘটানো যায় এ বাস্তবতায় অভিজ্ঞতা থাকার দরুন গোটা জীবজগতে বিদ্যমান তদ্রূপ একটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার সম্ভাব্যতাও আঁচ করা তার পক্ষে কঠিন হয়নি।

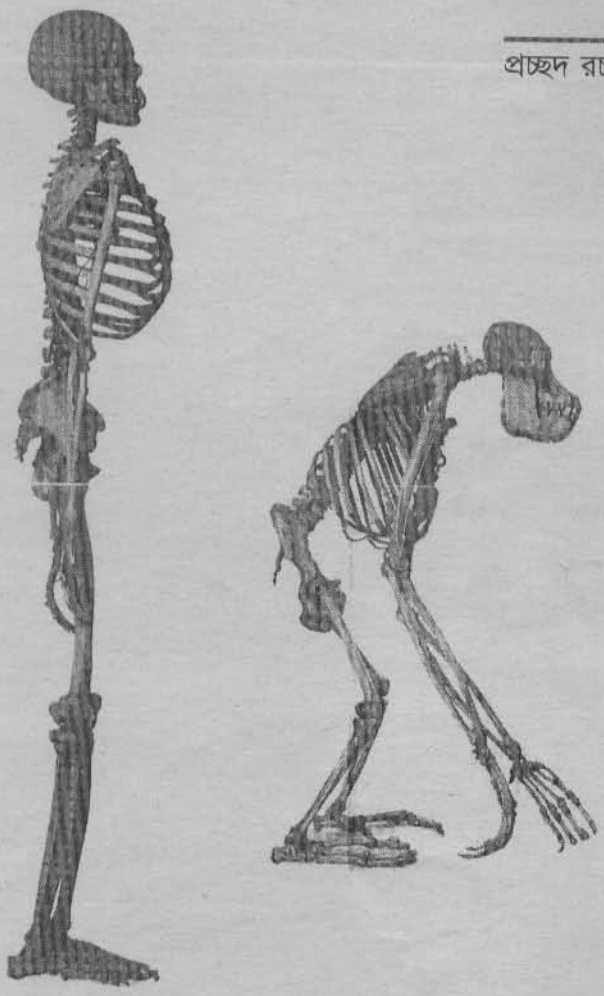

ডারউইন লামার্কের তত্ত্বকে অবশ্যই পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেন, কেননা এর আগে উল্লিখিত যাবতীয় বিবর্তন ব্যাখ্যার মধ্যে লামার্কবাদ ছিল সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক এবং এটি খণ্ডন ব্যতীত তার পক্ষে এগুলো অসম্ভব হতো।

চার্লস ডারউইন তার 'অরিজিন অব স্পিশিস' গ্রন্থের শুরুতেই Historical Sketch অধ্যায়ে 'প্রজাতির উৎপত্তি' বিষয়ক ধারণার বিবর্তন সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা এঁকেছেন। তিনি অ্যারিস্টোটলসহ অন্যান্য প্রাচীন দার্শনিকের আনুষঙ্গিক আধা-বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা এড়িয়ে বর্তমানকালে সরাসরি চলে এসে ফরাসি প্রত্নজীববিদ বুফোঁ (Georges Buffon, ১৭০৭-১৭৮৮) থেকেই আলোচনার সূত্রপাত করেছেন।

বুফোঁ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রজাতির উৎপত্তি ব্যাখ্যার প্রয়াস পেলেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতামত এবং প্রজাতি উৎপত্তির মহল প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকার দরুণ ডারউইন তার ধারণাকেও আমল দেননি। ডারউইন লামার্কের তত্ত্বকে অবশ্যই পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেন, কেননা এর আগে উল্লিখিত যাবতীয় বিবর্তন ব্যাখ্যার মধ্যে লামার্কবাদ ছিল সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক এবং এটি খণ্ডন ব্যতীত তার পক্ষে এগুলো অসম্ভব হতো। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের স্থানীয় কিছু রোগের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা ও তাতে শ্বেতাঙ্গদের প্রবণতা সম্পর্কে ১৮১৮ সালে ডা. উয়েলসকৃত বিশ্লেষণে ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের স্বীকৃতি লক্ষ করেন। অধিকন্তু জীবগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান জন্মগত রকমফের আর নির্বাচনের মাধ্যমে উন্নততর ফসল সৃষ্টিতে কৃষকদের সাফল্যও ডা. উয়েলস লক্ষ করেন।

উষ্ণমণ্ডলে কৃষ্ণাঙ্গ ও শীতপ্রধান এলাকায় শ্বেতাঙ্গদের একক আধিপত্য যে প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই ফল, তাতে পূর্বোক্ত বিজ্ঞানী নিঃসন্দেহ ছিলেন। অবশ্য তার বিশ্লেষণ মানুষের বিভিন্ন জাতিগঠনের মধ্যে সীমিত ছিল, গোটা জীবজগতে প্রযুক্ত হয়নি। ১৮২৬ সালে প্রফেসর গ্রান্ট Edinburgh philosophical Journal -এ তার এই অদ্ব্যর্থ বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে, প্রজাতি থেকেই প্রজাতির উদ্ভব (অর্থাৎ প্রজাতি দৈব সৃষ্ট নয়) এবং পরিবর্তনের মধ্যেই তাদের ক্রমোন্নতি। ১৮৩১ সালে প্যাট্রিক ম্যাথু লিখিত Naval Timber and Arboriculture প্রবন্ধে প্রজাতির উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যক্ত অভিমত ছিল পরবর্তীকালে লিনিয়ান সোসাইটিতে পঠিত ও সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত ডারউইন ও ওয়ালেসের প্রবন্ধগুলোর সিদ্ধান্তের অনুরূপ। তবে বিশ্লেষণ বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত ছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত লেখাটি কারো নজর কাড়েনি। ১৮৪৪ সালে ছদ্মনামে লেখা Vestiges of Creation বইটি বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানী মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তাতে বিবর্তনে ঈশ্বরের ভূমিকা স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও লেখক রক্ষণশীল মহলের দ্বারা অত্যন্তনিন্দিত হন। ডারউইনের ভাষায়, 'খুব কম নির্ভুল তথ্য ও বৈজ্ঞানিক সতর্কতার মারাত্মক বরখেলাপ সত্ত্বেও এ ব্যাপারে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ, কুসংস্কার দূরীকরণ ও অনুরূপ মতবাদকে স্বাগত জানানোর ভূমি নির্মাণে বইটি এদেশে চমৎকার কাজ করেছিল।' ১৮৫২ সালে হার্বার্ট স্পেনসর এক প্রবন্ধে বহু তথ্য-প্রমাণসহ প্রজাতির পরিবর্তনশীলতা সমর্থন করেন। অবস্থাসৃষ্টে প্রতীয়মান যে, জীববিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উনিশ শতকের শুরু থেকে প্রজাতির মতোই ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে একটি স্থায়ী তত্ত্ব হয়ে উঠেছিল। এ কালপর্বে ভূবিদ্যা, প্রত্নজীববিদ্যা, জীব ভূগোল, অঙ্গসংস্থান ও শারীর স্থান, ভ্রূণতত্ত্ব, শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যার ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে। ম্যালথাস *On population* নিবন্ধটি লেখেন (১৮২৬) এবং গ্রেগর ম্যান্ডেল বংশগতিবিদ্যার মূল সূত্রগুলো আবিষ্কার করেন (১৮৬৬)। আমরা জানি, ম্যালথাসের ওই লেখাটি ডারউইনকে তার তত্ত্বগ্রন্থনায় কতটা সহায়তা জুগিয়েছিল এবং আরো জানি, যথাসময়ে ম্যান্ডেলের আবিষ্কারটি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ডারউইন আপনতত্ত্বটি পরিমার্জন ও শুদ্ধতর করার সুযোগ পেতেন।

লামার্কের বিবর্তনবাদ *Philosophie Zoologique* প্রকাশিত হয়েছিল ডারউইনের জন্মবর্ষ ১৮০৯ সালে। বিবর্তনের প্রথম এ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মর্মসার নিম্নরূপ : জীবজগতের বর্তমান রূপ দীর্ঘ ক্রমবিবর্তনের ফল। আমরা, মানুষরা আসলে মাছ, ব্যাঙ, টিকটিকি, গরু অর্থাৎ জলচর, উভচর, সরীসৃপ স্তরের মধ্য দিয়ে স্তন্যপায়ীতে পৌঁছে শেষে বানর পর্যায় পেরিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছি। কিন্তু কিভাবে? চাহিদার চাপে, পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রবল ইচ্ছের তাড়নায় ও এভাবে 'অর্জিত চরিত্র্যের বংশানুসৃতির' (Inheritance of Acquired Characters) দৌলতে এবং প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারের নিয়মে। জিরাফের সামনে উঁচু পা ও লম্বা গলার উৎপত্তির ব্যাখ্যা লামার্কবাদের অন্যতম ক্লাসিক দৃষ্টান্ত। জিরাফের পূর্বপুরুষেরা একদা জেব্রার মতো ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আবাসস্থলে ঘাস ও ঝোপঝাড় বিনষ্টদ্ব হলে ও গাছের পাতা একমাত্র আহার্য হয়ে উঠলে পাতা সংগ্রহের জন্য তাদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং তারা উঁচু ডাল থেকে পাতা খাওয়ার ফলে তাদের সামনের পা ও গলা কিছু উঁচু হতে

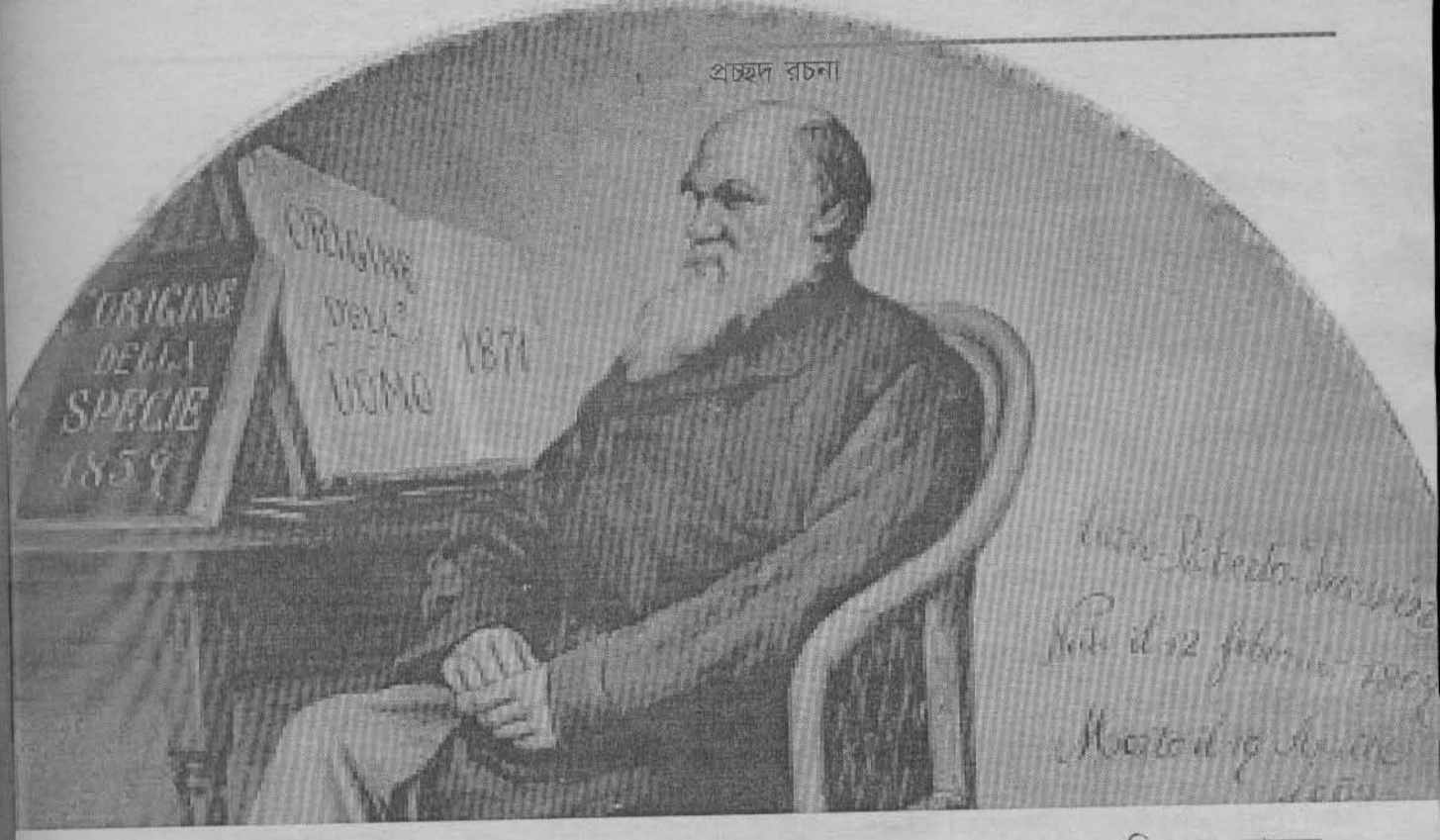

প্রচ্ছদ রচনা

ডারউইনের জীববিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠার পরও তিনি কখনোই কোনো আপস করেননি এবং আমৃত্যু তার ছাত্রের এ তত্ত্বকে ধিক্কার দিয়েছেন। সে যুগের জীববিদরাও সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন এবং ঈশ্বরসৃষ্ট প্রত্যেকটি প্রজাতিকে অপরিবর্তনশীল ভাবতেন।

থাকে (ব্যায়ামে যেভাবে আমাদের পেশির বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটে) এবং এ অর্জিত পরিবৃত্তি রূপান্তরিত হয়। এভাবে খাদ্য লাভের পরিস্থিতির কোনো উন্নতি না ঘটায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ক্রমাগত চেষ্টার ফলে হাজার হাজার বছরে জিরাফ বর্তমান দেহকাঠামো লাভ করেছে। এ কঠিন সংগ্রামে যারা সবচেয়ে সচেষ্ট, জেদি ও উদ্যমী তাদের সামনের পা ও গলা বেশি লম্বা হয়েছে, তারাই আহার্য সংগ্রহ করতে পেরেছে, বেড়েছে, আর নিশ্চেষ্ট অলসরা অনাহারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তৎকালীন ওই জিরাফের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছার, অর্থাৎ তাদের বিবর্তনের মূলে আছে পরিবেশের প্রবল চাপ, বাঁচার অদম্য ইচ্ছা, পা ও গলার অত্যধিক ব্যবহার এবং আনুষঙ্গিক পরিবর্তন ও এ অর্জিত পরিবৃত্তির বংশানুসৃতি।

তুলনা হিসেবে জিরাফের বর্তমান প্রজাতি উৎপত্তির ডারউইনি ব্যাখ্যাটি উল্লেখ্য। প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে এক প্রজন্মে জিরাফের পা ও গলা কিছুটা লম্বা হলেও পরবর্তী প্রজন্মে এ উত্তরাধিকার বর্তায় না, যেভাবে ব্যায়ামপুষ্ট পিতামাতার সন্তানরা ব্যতিক্রমী না হয়ে সাধারণ শিশুর স্বাস্থ্য নিয়েই জন্মায়। রহস্যটি অন্যত্র। যে কোনো জীবগোষ্ঠীর সব প্রাণী হুবহু অভিন্ন নয়, তাদের মধ্যে নানা রকমফের থাকে– রঙে, গড়নে, স্বভাবে। এসব বৈচিত্র্যেও কোনোটি বাঁচার জন্য সুবিধাজনক হলে সেটির বিকাশ ঘটে। উল্লিখিত জিরাফদের সবার সামনের পা ও গলার দৈর্ঘ্য অবশ্যই সমান ছিল না, সেখানে তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক (যেমন- একটি গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে)। আর এসব বৈশিষ্ট্য জন্মগত ও বংশানুক্রমিক। তাই চরম খাদ্যাভাবজনিত প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রামে যাদের সামনের পা ও গলা সামান্য উঁচু তারা অন্যদের তুলনায় পাতা সংগ্রহে স্পষ্টতই সুবিধাভোগী ও ভাগ্যবান। বলাবাহুল্য, পরিস্থিতি না বদলানোর জন্য প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রামে খাটো গলার জিরাফেরা লোপ পেয়েছে লম্বা গলার জিরাফ টিকে থেকেছে। এখানে চেষ্টা ও ইচ্ছার ভূমিকা শূন্য, জন্মসূত্রে পাওয়া পা ও গলার সামান্য উচ্চতাটুকুই আসল।

এভাবে কিছুটা লম্বা গলা জিরাফের একটি গোষ্ঠীর উৎপত্তি ঘটেছে এবং তাদের মধ্যেও আবার গলার দৈর্ঘ্যের জন্মগত তারতম্যের দরুণ প্রতিযোগিতা অব্যাহত থেকেছে, খাটোরা ক্রমাগত লোপ পেয়েছে, উঁচুরা টিকে থেকেছে। প্রক্রিয়াটি হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে আর এ নির্বাচনে নতুন জাতের জিরাফ জন্মেছে। এটাই প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং জন্মগত পরিবৃত্তির ওপর কার্যকর এ নির্বাচনই নতুন প্রজাতি উৎপত্তির চাবিকাঠি। তাই ডারউইনের জগদ্বিখ্যাত বইটির পূর্ণ নাম 'The origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life' (প্রাকৃতিক নির্বাচন মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি বা জীবন-সংগ্রামে সুবিধাপ্রাপ্ত জাতিগুলোর স্থায়িত্ব। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভূবিদ ও জীববিদরা বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে, অর্থাৎ ঈশ্বরই পৃথিবী ও জীবজগতের স্রষ্টা এমন বিশ্বাসে বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তারা পৃথিবীর সংঘটিত যাবতীয় পরিবর্তনে হেতুর বদলে শুধু পরিবর্তনের ধরন ব্যাখ্যাই নিজেদের কর্তব্য ভাবতেন। কিন্তু ক্রমে এ বিশ্বাসে ফাটল ধরে। শিলারাশি থেকে পাওয়া পৃথিবী ও ফসিল থেকে পাওয়া জীবজগতের জন্ম-ইতিহাস বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের (৬০০০ বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি) বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং পৃথিবীর ও জীবজগতের বর্তমান রূপ যে কোনো একটা শক্তির অল্পদিনের সৃষ্টি নয়, বহু শক্তির সুদীর্ঘকালীন জটিল বিক্রিয়ার ফল এমন একটি বস্তুবাদী ধারণা তাদের মনে দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে।

তৎকালে ভূবিদদের দুটি দল ছিল : স্বতসিদ্ধবাদী (Uniformitarian) ও প্রলয়বাদী (Catastrophist)। প্রথম দলের মতে, পৃথিবী একটি নিয়ত পরিবর্তনশীল সত্তা। বৃদ্ধি, বাত্যা ও তুষার পর্বতকে ক্ষয় করে, নদীনালা স্থলভাগ লেহনক্রমে অন্যত্র পলি জমায়, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি ভূতল ভাঙে, ডোবায়, ওঁচায়। তাই স্থলভূমি, হ্রদ, পর্বত ও সমুদ্রের পরিবর্তন একটি লাগাতার ঘটনা। এর শুরু নেই, শেষ নেই। জীবজগতের ক্ষেত্রেও তারা অনুরূপ বাস্তবতায় বিশ্বাসী। জীবের উদ্ভব ও লয় একটি নিয়মিত ঘটনা। তারা জন্মে, লড়াই করে, লড়াই অত্যধিক কঠিন হলে লোপ পায়, কখনো ফসিলে আপন অস্তিত্বের সাক্ষ্য রাখে। স্বতসিদ্ধবাদীরা জীববিবর্তনে অবিশ্বাসী ছিলেন,

আঠার শতকের শুরুতে উন্মেষিত প্রজাতির রূপান্তর সম্পর্কিত ভাবনাগুলো ডারউইনের যৌবনেও সৃষ্টিতত্ত্বের বালুকবলিত চিন্তাজগতের ফল্গু নদীতে শুধু অন্তবাহী অদৃশ্য ধারা হিসেবেই বহতা ছিল। ডারউইন সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করেননি।

প্রাণ ও প্রজাতি সৃষ্টি সম্পর্কে নীরব থাকতেন। ডারউইনের জ্যেষ্ঠ বন্ধু, স্বতসিদ্ধবাদী চার্লস লায়েল (১৭৯৭-১৮৭৫) জীবজগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঈশ্বর ও জড় প্রকৃতি উভয়ের ভূমিকা স্বীকার করলেও মানুষ যে এককভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাতে নিঃসন্দেহ ছিলেন।

প্রলয়বাদীরা পৃথিবীর উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হতে হতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ধারা দেখতেন। তারা বাইবেল বর্ণিত পৃথিবী সৃষ্টির ছ'দিনের সময়সীমাকে প্রতীক ভাবতেন এবং প্রত্যেকটি দিনকে একটি যুগ ধরতেন। তাদের মতে, পৃথিবীর ইতিহাসের গোড়ার দিকে অনেকগুলো মহাপ্রলয় ঘটে– ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, প্লাবন। শেষ প্লাবনটি ঘটে নোহর আমলে, অতঃপর পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত শান্তি বিরাজিত। প্রলয়বাদীরা মনে করতেন, ঈশ্বর বারবার জীবজগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস করেছেন বলেই এক যুগের ফসিলের সঙ্গে অন্য যুগের ফসিলের এতটা ফারাক। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের জীব-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সরল। ঈশ্বর উপযুক্ত পরিবেশের জন্য উপযুক্ত জীব সৃষ্টি করেন বলেই তো আদিম যুগে আদিম জীবজন্তু, অপেক্ষাকৃত উন্নতর পরিবেশে উন্নতর জীবজন্তুর বসবাস। আর এজন্যই সর্বোন্নত পরিবেশের জন্য ঈশ্বরের সর্বশেষ সৃষ্টি মানুষ। ডারউইনের ভূবিদ্যার প্রথম শিক্ষক অ্যাডাম সেজউইক (১৭৮৫-১৭৭৩) ছিলেন প্রলয়বাদী এবং বিবর্তনের ঘোর বিরোধী। ডারউইনের জীববিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠার পরও তিনি কখনোই কোনো আপস করেননি এবং আমৃত্যু তার ছাত্রের এ তত্ত্বকে ধিক্কার দিয়েছেন। সে যুগের জীববিদরাও সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন এবং ঈশ্বরসৃষ্ট প্রত্যেকটি প্রজাতিকে অপরিবর্তনশীল ভাবতেন। জীব-শ্রেণীবিন্যাসের পিতৃপুরুষ কেরলাস লিনিয়াস (১৭০৭-১৭৭৮) প্রজাতির অভ্যন্তরীণ নানা পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থেকেও প্রজাতির নিত্যতা সম্পর্কে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেন। ডারউইনের উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষক জন স্টিফেন হেনশ্লো (১৭৯৬-১৮৬১) কখনোই সৃষ্টিতত্ত্বে আপন বিশ্বাস ত্যাগ করেননি, এমনকি লায়েলের মতো স্বতঃসিদ্ধবাদীর আপসপন্থি মতবাদকেও নাস্তিকতাদুষ্ট ভেবেছেন।

না-ঐতিহ্য, না-শিক্ষাক্ষেত্রে কোনোভাবেই চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদী হওয়ার কথা নয়। পিতা ছিলেন ধর্মপ্রাণ। কৈশোরে পিতামহ এরেসমাস ডারউইনের Zoonomia (১৭৯০ সালে প্রকাশিত) পাঠ তাকে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করেনি। ছাত্রজীবনে এডিনবরায় ড. গ্রান্টের মুখে লামার্কবাদের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা তার ওপর কোনোই প্রভাব ফেলেনি। আঠার শতকের শুরুতে উন্মেষিত প্রজাতির রূপান্তর সম্পর্কিত ভাবনাগুলো ডারউইনের যৌবনেও সৃষ্টিতত্ত্বের বালুকবলিত চিন্তাজগতের ফল্গু নদীতে শুধু অন্তবাহী অদৃশ্য ধারা হিসেবেই বহতা ছিল। ডারউইন সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করেননি। তিনি বিবর্তনবাদী হন 'বিগল্' ভ্রমণের সময় জীবজগতের ভূবিস্তরণ লক্ষ করে, বিশেষভাবে গ্যালাপেগস্ দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন জাতের চড়ুই ও কচ্ছপের মধ্যে মিল ও অমিল আবিষ্কার করে। এভাবেই তিনি প্রলয়বাদী থেকে স্বসিদ্ধবাদী ও শেষে বিবর্তনবাদী হয়ে ওঠেন এবং সত্যিকার নিয়ম ও দৈবের মধ্যে প্রথমটিকেই বরণ করেন। কিন্তু বিবর্তনবাদী হওয়াটাই তো যথেষ্ট নয়, চাই বিবর্তন-ক্রিয়ার সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ডারউইন ইংল্যান্ডের কৃষিপ্রধান এলাকার কেন্দ্রস্থলে বড় হয়েছেন আর পরিবারে ছিল নানা জাতের প্রাণী পোষা ও প্রজননের পুরানো রেওয়াজ। তাই গৃহপালনে যে ইচ্ছামতো গাছপালা ও জীবজন্তুর নানা পরিবর্তন ঘটানো যায় এ বাস্তবতায় অভিজ্ঞতা থাকার দরুণ গোটা জীবজগতে বিদ্যমান তদ্রূপ একটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার সম্ভাব্যতাও আঁচ করা তার পক্ষে কঠিন হয়নি। প্রজননবিদদের কর্মকাণ্ড তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, যারা পছন্দসই জীবজন্তু ও গাছপালার নানা প্রকারভেদ জন্মান, কেবল সেরা গরু-ভেড়া পোষেণ, শুধুই ভালো ফল-ফসল ফলান, তাতে পশু বেশি লোমশ ও মাংসল হয়ে ওঠে, ফলমূল ও শাকসবজি বাড়ে। নির্বাচনের সাহায্যেই তারা এ অসাধ্য সাধন করেন এবং তার মাত্র কয়েক প্রজন্মে। ইউরোপীয় ও আরবি ঘোড়ার পার্থক্য সবাই জানেন। দুটি অনুসিদ্ধান্ত (conclusion)। বাস্তব ব্যবস্থাগুলো :

জীবের অত্যধিক বংশ বৃদ্ধির প্রবণতা, তাদের সংখ্যা বাড়ে গুণোত্তর প্রগতিতে, অর্থাৎ ২, ৪, ৮, ১৬ এই হারে; তা সত্ত্বেও প্রত্যেক প্রজাতির জীবসংখ্যা মোটামুটি একই থাকে; ৩. প্রজাতির সদস্যরা সামান্য হলেও পরস্পর থেকে কিছুটা পৃথক হয়। মানুষের মধ্যে একমাত্র যমজ ছাড়া এক পিতামাতার সন্তানরা কখনোই সম্পর্কে অভিন্ন নয়।

অনুসিদ্ধান্ত :

প্রথম দুই বাস্তব অবস্থা থেকে থেকে স্পষ্ট যে, জীবজগতে টিকে থাকার অর্থাৎ অস্তিত্বের একটি সংগ্রাম নিরন্তর বিদ্যমান এবং এ সংগ্রামই প্রত্যেকটি প্রজাতির জীবসংখ্যা সীমিত রাখে; সংগ্রামে শুধু যোগ্যতমেরই জয় হয়, অযোগ্যরা লোপ পায়। এটাই প্রাকৃতিক নির্বাচন।

অস্তিত্বের সংগ্রামে কে যোগ্যতম? টিকে থাকার অধিকার কার? আমরা এখন জানি বংশসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যের দৌলতে যে প্রকৃতির কাছে অন্যদের তুলনায় কিছুটা সুবিধাভোগী সে-ই অস্তিত্বের সংগ্রামে টিকে থাকে, অন্যরা পরাজিত ও বিলুপ্ত হয়। কিন্তু কেউ চিরকালীন যোগ্যতার সনদ পায় না। তাদের মধ্যে আবারো লড়াই শুরু হয়। বাছাই চলে, সংখ্যাগুরুরও বিলুপ্তি ঘটে, সংখ্যালঘু টিকে থাকে। এ নির্বাচনের চাপের মুখে হাজার হাজার প্রজন্মের একটি প্রজাতি ক্রমাগত নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য। অর্জন করে শেষাবধি আরো একটি নতুন প্রজাতি হয়ে ওঠে। এ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় জীবের জন্মলব্ধ পরিবৃত্তিগুলোর (variations) ওপর কাজ করে প্রকৃতি, একটি নতুন প্রজাতি গড়ার ক্ষেত্রে এগুলোই তার কাঁচামাল, সে অনুকূল পরিবৃত্তিকে আমল দেয়, অনুপযোগীদের নাকচ করে। প্রাকৃতিক নির্বাচন তাই জীববিবর্তনের চালিকাশক্তি।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাঁচামাল হিসেবে প্রকৃতির রাজ্যে জীবগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবৃত্তির অঢেল অস্তিত্বের খুঁজে পেতে ডারউইনের কোনোই অসুবিধা হয়নি। 'বিগল্' ভ্রমণে উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছাড়াও তিনি দীর্ঘ বিশ বছর গোটা পৃথিবীর সিরিপিডার (এক ধরনের কবচি, যারা জাহাজ, জলমধ্য পাথর ও নানা আশ্রয় আঁকড়ে থাকে) শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে কাজ করার সময় একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের নানা পার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত হন। বিভিন্ন প্রজাতির অধঃস্তনবর্গ হিসেবে উপপ্রজাতি, ভ্যারাইটির অস্তিত্ব তো আসলে প্রজাতির নমনীয়তারই প্রকৃতিদত্ত প্রমাণ এবং পরিবৃত্তির সঞ্চয় ছাড়া তা অসম্ভব।

লেখক : প্রকৃতিবিদ, সাহিত্যিক ও অনুবাদক।

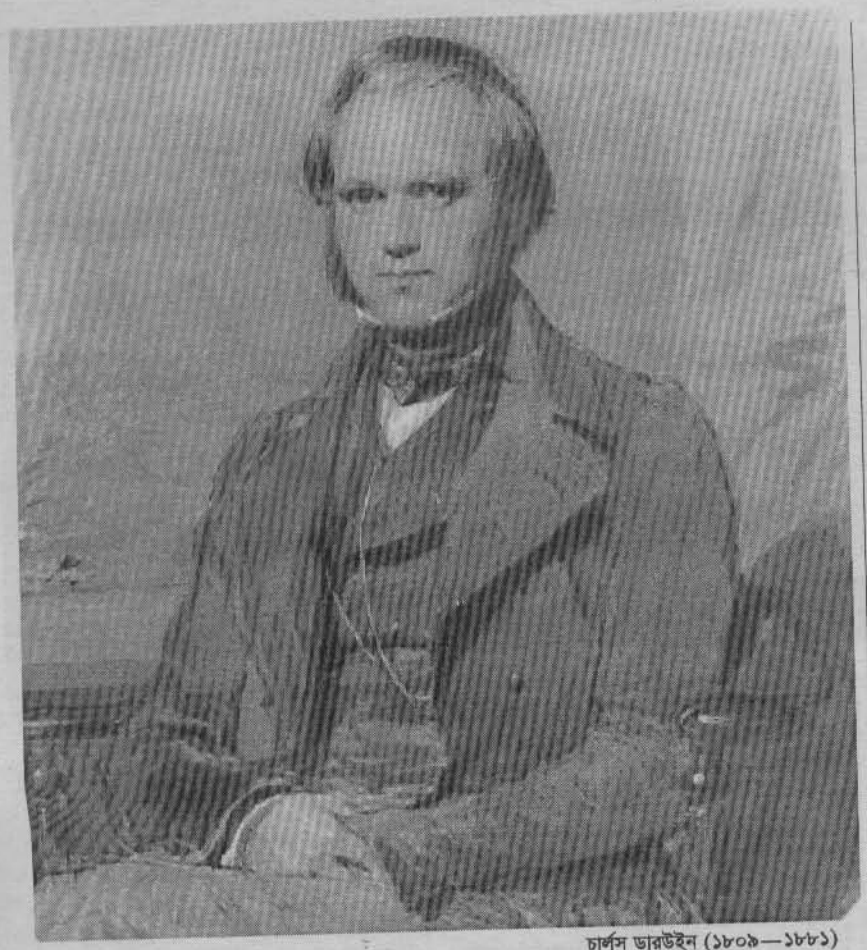

চার্লস ডারউইন (১৮০৯—১৮৮১)

ডারউইনের জীবন

মানুষ মূলত পরীবর্তনশীলতা তৈরি করে না; সে নিজের অজান্তে জীবকে শুধুমাত্র নতুন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয় — *চার্লস ডারউইন*

বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের জনক চার্লস ডারউইনের জন্ম ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। পেশাগত দিক দিয়ে তার পিতা ও পিতামহ উভয়েই ছিলেন ডাক্তার। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। তার মধ্যে ছোটবেলা থেকে কীটপতঙ্গ সংগ্রহ, নানারকম উদ্ভিদের নাম জানা, খনিজ পদার্থ, শিলা, ফসিল সংগ্রহের ঝোক দেখা যায় বেশি। এর ফলে তিনি ১৮২৫ সালে দু বছর ডাক্তারি পড়ার পরও তা সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হন। ১৮২৭ সালে ক্যাম্ব্রিজে যাজক হওয়ার আশায় ধর্মতত্ত্ব পড়ার জন্য গেলেও তা সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হন।

১৮৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর, ক্যাপ্টেন ফিটজরয়ের অধিনায়কত্বে প্লাইমাউথ বন্দর থেকে ২৩৫ টন ওজনের বিগল জাহাজে আমেরিকার দক্ষিণ উপকুলে জরিপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। এ জাহাজে ডারউইন অবৈতনিক উদ্ভিদবিদ হিসেবে এ অভিযানে যোগ দেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর তার এ ভ্রমণ স্থায়ী হয়, ১৮৩৫ এ ফিরে আসেন। তাহিতি, নিউজিল্যান্ড , অস্ট্রেলিয়া, মরিসাস, ব্রাজিল, সেন্টহেলেনা, আটলান্টিক দ্বীপপুঞ্জ ও গ্যালপোগাস দ্বীপপুঞ্জের উপকুলে জাহাজ জরিপ চালায়। তিনি প্রত্যেক জায়গা থেকে উদ্ভিদ, পতঙ্গ, প্রাণী ও ফসিলের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং সেই সাথে ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ করেন। জাহাজ প্রত্যেক বন্দরে পৌছার সাথে সাথে তিনি সংগৃহীত নমুনাগুলো দেশে হেনশ্লোর কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

হেনশ্লো হলেন কেমব্রীজের একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, কেম্ব্রিজের থাকাকালীন সময়ে তার কাছ থেকে চার্লস লায়েলের প্রিন্সিপাল অফ জিওলজি নামে একটি অসাধারণ বই পড়েন, যা তার পূর্বের চিন্তা চেতনাকে পরিবর্তিত করে দেয়। এ অনুসন্ধানে গ্যালপোগাস দ্বীপপুঞ্জই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর দেশে ফেরার পর হেনশ্লোর কাছে পাঠানো বিভিন্ন পাঠানো তথ্যাদি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরবর্তী ২০ বছর সময়কাল তিনি তার ভ্রমণকালীন ভূতাত্ত্বিক নিরীক্ষা ও প্রাণিজগতের বিবর্তন নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এরই ফলাফল হিসেবে বিবর্তনের মূলতত্ত্ব প্রাকৃতিক নির্বাচন আবিষ্কৃত হয় এবং বিখ্যাত বই The Origin Of Species by Means of Natural Selection or the preservation of favoured races in the struggle for life অথবা সংক্ষেপে Origin Of Species আর বাংলায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রজাতির উৎপত্তি বা জীবন সংগ্রামে সুবিধাপ্রাপ্ত জাতিগুলোর স্থায়িত্ব। অরজিন অব স্পিসিস লেখা হয়। এ কথাটাই আলফ্রেড ওয়ালেস ডারউইনের কাছে লেখা ছোট প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। এ কাজ করতে গিয়ে ডারউইনকে ম্যালথাসের পপুলেশন থিওরি পথ দেখায়। মানুষকে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয় এবং অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে একই কথা, যারা এ সংগ্রামে টিকে যায় বা পরিবেশ যাদের জন্য অনুকূল হয় তারাই বংশ বৃদ্ধি করে। হার্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায়, প্রজাতির বিবর্তনের মূলকথা হচ্ছে যোগ্যতমের উর্ধ্বতন বা সারভাইবেল অব দ্য ফিটেস্ট। তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় প্রচুর কাজ করেন। এ সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত বই ভেরিয়েশনস এ হ্যাবিটাস অব ক্লাইমিং প্লান্টস (১৮৬৮)। ১৮৮১ সালের ১৯ এপ্রিল তিনি মারা যান। তাকে চার্লস লায়েল ও নিউটনের পাশে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবিতে সমাহিত করা হয়।

প্রজাতির উৎপত্তি গ্রন্থে অরিজিন অব স্পিসিসে ডারউইন যা বলেছেন :
মানুষ মূলত পরিবর্তনশীলতা তৈরি করে না; সে নিজের অজান্তে জীবকে শুধু নতুন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয় এবং প্রকৃতি তারপর জীবতন্ত্রের ওপর কাজ করে এবং এর পরিবর্তনশীলতা ঘটায়। প্রকৃতি প্রদত্ত তার কাছে দেয়া পরিবৃত্তিগুলো থেকে মানুষ নির্বাচন করতে পারে এবং করে থাকে, এবং এভাবে সেগুলোকে সঞ্চিত করতে পারে যে, কোনো ইচ্ছামতো। সে এইভাবে তার নিজস্ব লাভ ও আনন্দের জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদকে অভিযোজিত করায়। সে এটা করতে পারে পদ্ধতিগতভাবে (methodically), অথবা তার সময়ে সবচেয়ে উপকারী প্রাণী বা উদ্ভিদের কোনো স্বতন্ত্র শ্রেণীকে অসচেতনভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে, প্রজননে পরিবর্তন ঘটানোর কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই।.....। যেসব নিয়ম গারস্থ্যায়নের সময় এত দক্ষভাবে কাজ করেছে সেগুলো কেন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থান করবে না, তার কোনো কারণ নেই.....।
যতগুলো টিকে থাকে তার থেকে অধিকসংখ্যক প্রজাতির জন্ম হয়। যে কোনো যুগে/বয়সে বা যে কোনো ঋতুতে একটি প্রাণের ক্ষেত্রে সামান্য সুবিধা তাদেরকে অতিক্রম করে যাদের সাথে এটা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীতে উদ্ভব ঘটেছিল, অথবা চারদিকের পরিবেশ পরিস্থিতির থেকে যেভাবেই হোক সামান্যমাত্রায় অপেক্ষাকৃত ভালো অভিযোজন সাম্যবস্থা উল্টে দেবে।

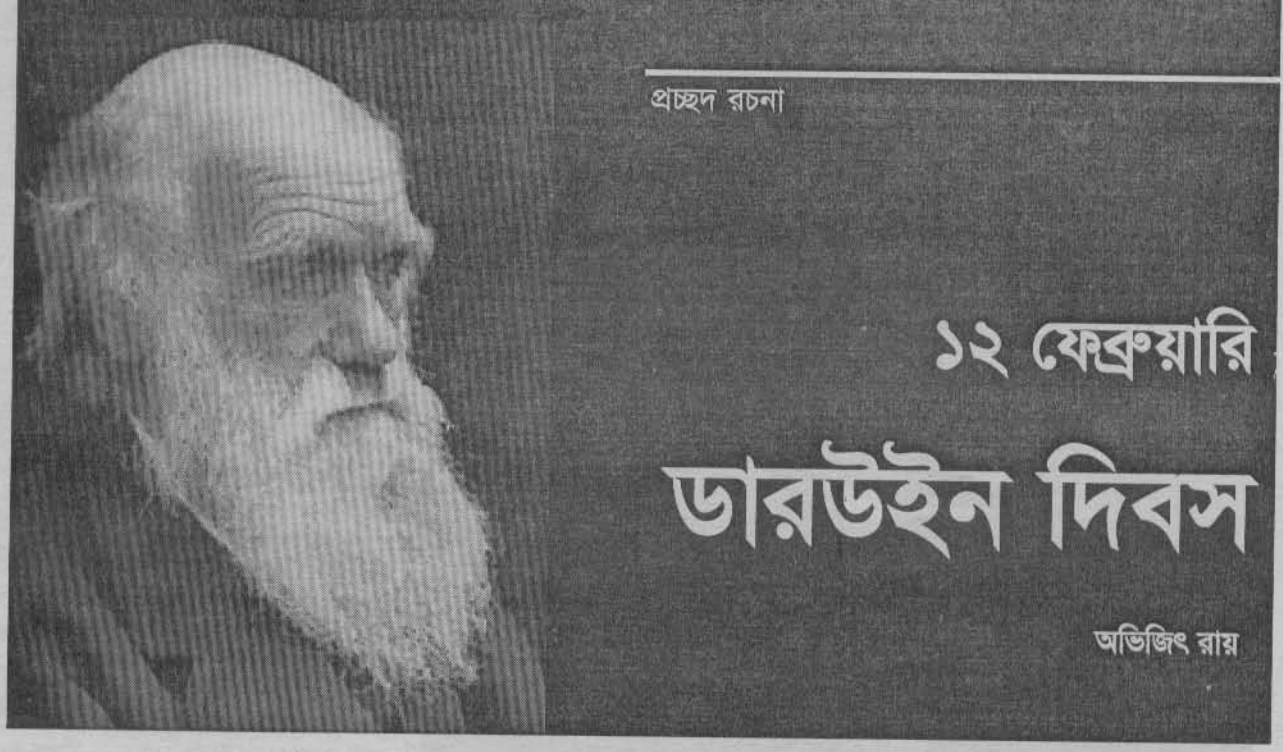

১২ ফেব্রুয়ারি ডারউইন দিবস

অভিজিৎ রায়

সারা পৃথিবীতেই ১২ ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহে ডারউইন দিবস পালিত হয়েছে। তবে আঙ্গিকে আর বৈচিত্র্যে এ ডারউইন ডের ধারণা আমাদের জন্য একেবারেই নতুন, বলা যায় ব্যতিক্রম। আমার জানা মতে 'মুক্তমনা' নামের একটি সংগঠন বাদে আর কোনো বাঙালি সংগঠন এ দিনটি পালন করছে না। তবে অচিরেই আমরা আশা করছি 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র মতো এ দিনটিও হয়তো একদিন পশ্চিমা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও প্রবল উদ্যমে পালিত হবে। কিছুদিন আগে এমনকি পশ্চিমা বিশ্বেও ডারউইন ডে নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। বেচারা ডারউইনকে নিয়ে এত ঘটা করে একটি বিশেষ দিনে টানাহেঁচড়া করারও প্রয়োজন ছিল না বোধ হয় কারো। কিন্তু এ কয় বছরে সারা পৃথিবীতে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গেছে। অত্যন্ত ধূর্ত নব্য এক ধর্মবাদী আন্দোলন বিজ্ঞানের মুখোশ পরে খোদ বিবর্তনকেই বিজ্ঞানের এলাকা থেকে হটিয়ে দিতে ময়দানে নেমেছে আজ। বিজ্ঞানের বাকছাল গায়ে জড়ানো মহুলত আমেরিকার এ বকধার্মিকেরা আবার নিজেদের তত্ত্বের এক গালভরা নামও খুঁজে পেয়েছে– 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' বা আইডি।

আসলে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোর ছয়দিনে বিশ্ব সৃষ্টিআর বিশ্বজুড়ে প্লাবনের কেচ্ছা-কাহিনী গিলিয়ে আর বোধ হয় জনসাধারণকে ধর্মমুখী করে রাখা যাচ্ছিল না; জন উইটকম্ব, হেনরি মরিস, ডুয়েন গিশ কিংবা হাল আমলের মরিস বুকাইলি আর হারুন ইয়াহিয়ারা যতই ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে সৃষ্টিতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে আর বিবর্তনের বিপরীতে ধর্মীয় ছাইপাশগুলোকে আরেকটি 'অলটারনেটিভ' তত্ত্ব হিসেবে দাঁড় করাতে প্রয়াসী হোন না কেন, অধিকাংশ বিজ্ঞানীর কাছে সেগুলো সত্তর বা আশির দশকেই 'বর্জ্য পণ্য' হিসেবে পরিত্যক্ত হয়েছিল। শুধু তো বৈজ্ঞানিক মহলেই নয়, রাজনৈতিক মঞ্চেও সৃষ্টিতত্ত্ব হটে গেল যখন আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৭ সালে এ তত্ত্বকে 'বৈজ্ঞানিক নয়' বরং 'রিলিজিয়াস ডগমা' হিসেবে চিহ্নিত করে লুজিয়ানা আইনকে 'অসাংবিধানিক' হিসেবে ঘোষণা করে রায় দিলেন। কাজেই, তখন থেকেই (তাদের জন্য) প্রয়োজন পড়েছিল আরেকটু 'সফিসটিকেটেড' তত্ত্বের। আর সে জন্যই যেন আজ মাঠে নেমেছেন ফিলিপ জনসন, মাইকেল বিহে আর উইলিয়াম ডেম্বস্কি আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। তাদের সংজ্ঞায়িত আইডি নামধারী এ 'সফিসটিকেটেড' বিটকেলে তত্ত্বের তেতো আর ঝাঁঝালো গল্পে বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী তো বটেই, যুক্তিবাদী সচেতন সব মহলকেই অবশেষে নড়েচড়ে বসতে হয়েছে, নতুন করে আরেকবার খুঁজে নিতে হয়েছে উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর এক মনীষীকে, নাম চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)। বলা যায়, এ অন্তর্মুখী চরিত্রের নিপাট ভালো মানুষটিই আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন আমাদের মস্তিষ্কের কোষে কোষে রূপকথা মিছে কথাগুলো পুরে রাখার হাত থেকে; নতুন করে তাকাতে সাহায্য করেছে আমাদের চিরচেনা এ জগতের দিকে– শতাব্দী প্রাচীন কেচ্ছা-কাহিনী দিয়ে নয় বরং বৈজ্ঞানিক আর যুক্তিবাদী দৃষ্টি দিয়ে।

রিচার্ড ডকিন্স তো প্রায়ই বলেন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ রঙ্গমঞ্চে আসার আগে কারো পক্ষেই বোধ হয় পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি তত্ত্বকে অস্বীকার করে সত্যিকারের যুক্তিবাদী হওয়া সম্ভব ছিল না!

আসলে পৃথিবীতে খুব কম বৈজ্ঞানিক ধারণাই কিন্তু জনসাধারণের মনসপটে স্থায়ীভাবে বিপ্লব ঘটাতে পেরেছে। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব যেমন বিপ্লবী তত্ত্ব, তেমন জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হলো বিবর্তনতত্ত্ব। এ তত্ত্বই আমাদের শিখিয়েছে যে, কোনো প্রজাতিই চিরন্তন বা স্থির নয়, বরং আদিম এককোষী প্রাণী থেকে শুরু করে এক প্রজাতি থেকে পরিবর্তিত হতে হতে আরেক প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে, আর পৃথিবীর সব প্রাণীই আসলে কোটি কোটি বছর ধরে তাদের পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হতে হতে এখানে এসে পৌঁছেছে। ডারউইন শুধু এ ধরনের একটি বিপ্লবাত্মক ধারণা প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হননি, বিবর্তনের এ প্রক্রিয়াটি (প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে) কিভাবে কাজ করে তাদের পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন সবিস্তারে, প্রথমবারের মতো ১৮৫৯ সালে 'প্রজাতির উদ্ভব' বা 'অরিজিন অব স্পিশিজ' বইয়ে। খুব অবাক হতে হয় এই ভেবে, যে, সময়টাতে সৃষ্টি রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে প্রায় সব বিজ্ঞানী আর দার্শনিকই ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিলেন আর বাইবেলীয় গণনায় ভেবে নিয়েছিলেন পৃথিবীর বয়স সর্বসাকুল্যে মাত্র ৬০০০ বছর, সে সময়টাতে জন্ম নিয়েও ডারউইনের মাথা থেকে এমনি একটি যুগান্তকারী ধারণা বেরিয়ে এসেছিল, যা শুধু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকেই ত্বরান্বিত করেনি, সেই সাথে চাবুক হেনেছিল আমাদের ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মতো সওয়ার হওয়া সব সংস্কারের বুকে।

দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট এজন্যই বোধ হয় বলেছিলেন, 'আমাকে যদি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণাটির জন্য কাউকে পুরস্কৃত করতে বলা হয়, আমি নিউটন, আইনস্টাইনদের কথা মনে রেখেও নির্দ্বিধায় ডারউইনকেই বেছে নেব।' কাজেই ডারউন দিবস আমাদের জন্য ডারউইনের দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখচ্ছবির কোনো স্তব নয়, বরং তার যুগান্তকারী আবিষ্কারটির যথাযথ স্বীকৃতি, তার বৈজ্ঞানিক অবদানের প্রতি নির্মোহ আর বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। ডারউইন দিবস উপলক্ষে সব পাঠককে শুভেচ্ছা জানাই।

লেখক : বিজ্ঞান লেখক, বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ গবেষণারত

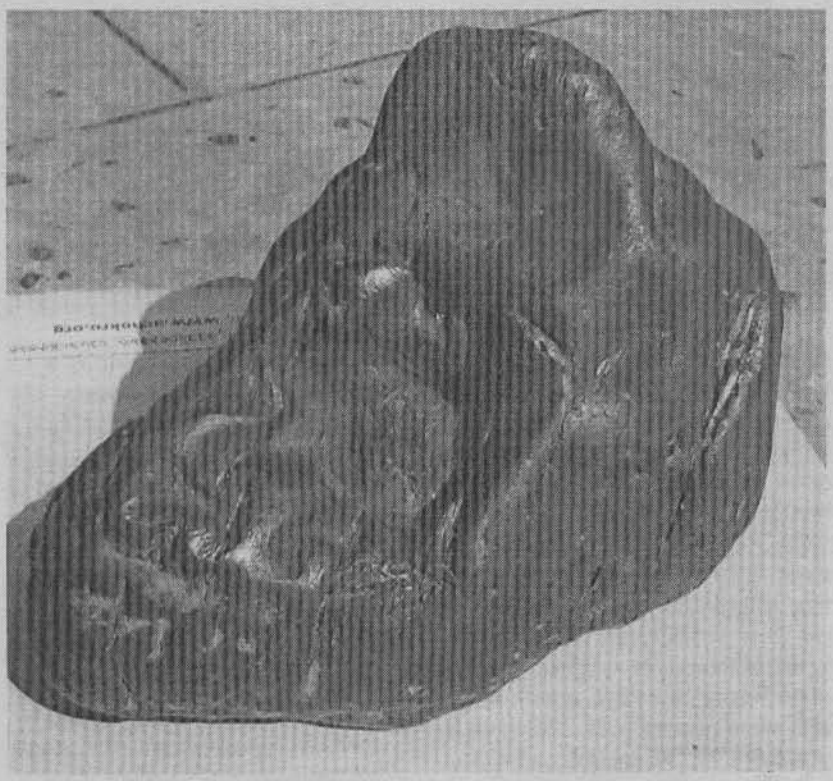

ঠাকুরগাঁওয়ে উল্কা পতন

এফ. আর. সরকার

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যতগুলো উল্কাপিণ্ড পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভারী ও বৃহৎ উল্কার সন্ধান পাওয়া যায় নামিবিয়ার 'হোবা' এলাকায়। সম্প্রতি বাংলাদেশেও একটি উল্কাপিণ্ড পতিত হয়েছে। আর এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্বিজ্ঞান মহলে বিরাট সাড়া পড়ে গেছে

রাতের আকাশে কোনো কোনো সময় আমরা দেখতে পাই যে, উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি হঠাৎ করে দ্রুত বেগে ছুটে গিয়ে নিভে যাচ্ছে। এগুলোকে অনেকেই বলেন 'স্যুটিং স্টার' বা 'পড়ন্ত তারা'। কিন্তু এগুলো তারা নয়, উল্কা। উল্কাগুলোকে তাদের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে যেসব উল্কাপিণ্ড আকাশে ভেসে বেড়ায় সেগুলোকে বলা হয় উল্কা। আর যেগুলো পৃথিবীর অভিকর্ষে এসে আবহাওয়ামণ্ডলের ঘর্ষণে পুড়ে গিয়ে উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি করে সেগুলোকে বলা হয় উল্কাপাত। আবার যেগুলো আবহাওয়ামণ্ডলের সংঘর্ষকে ভেদ করে পৃথিবীর বুকে পতিত হয় সেগুলোকে বলা হয় উল্কাপিণ্ড।

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ১২০টির মতো বড় ধরনের উল্কাপিণ্ড পতনের ফলে সৃষ্ট খাদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে পৃথিবী ২/৩ অংশ সমুদ্রবেষ্ঠিত বিধায় অনুমান করা হয় অধিকাংশ উল্কাপিণ্ডই সমুদ্রে পতিত হয়েছে। ভূমিতে পতিত উল্কাপিণ্ডের ফলে যে ধ্বংসলীলা হয়েছিল তার নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। ১৯০৮ সনের ৩০শে জুন সাইবেরিয়ার তুঙ্গাসকাতে এক বিরাট উল্কাপিণ্ডের পতন হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। যার ফলে চারপাশের কয়েক হাজার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গাছপালা উপড়ে পড়েছিল এবং বহুদূর থেকে এর আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখা গেছে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যতগুলো উল্কাপিণ্ড পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভারী ও বৃহৎ উল্কার সন্ধান পাওয়া যায় নামিবিয়ার 'হোবা' এলাকায়।

উল্কাগুলোর গঠনপ্রণালীকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- শিলা, লৌহ ও লৌহ-শিলা মিশ্রিত। উল্কাগুলোর মধ্যে প্রায় ৯২% কঠিন শিলা, ৫.৭% লৌহ, এবং ১.৫% লৌহ-শিলা দ্বারা গঠিত।

সম্প্রতি বাংলাদেশেও একটি উল্কাপিণ্ড পতিত হয়েছে। আর এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্বিজ্ঞান মহলে সাড়া পড়ে গেছে। গত ৩১ জানুয়ারি মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে দিনাজপুর জেলার সিংপাড়া গ্রামে এ উল্কা পিণ্ডটি পতিত হয়। গ্রামের লোকেরা জানান, তারা কিছুক্ষণ ধরে শো শো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন আর এরপরই দেখা গেল পশ্চিম-দক্ষিণ দিক থেকে একটি বস্তু এসে মাটির ওপরে আছাড় খেয়ে ঢুকে গেল। গ্রামবাসীরা প্রথমে মনে করেছিলেন, এটা বোধ হয় কোনো মর্টারের গোলা। কারণ অনতি দূরেই ভারতীয় সীমানা আর সেখান থেকে মর্টারের গোলা আসতেও পারে। তাই তারা দৌড়ে গিয়ে দিনাজপুরের কোতোয়ালী থানায় সংবাদ দেয়।

যেহেতু দেশে বর্তমানে বোমাবাজীর মতো নাশকতামূলক কাজকর্ম চলছে এটাও তার অংশ কিনা তা তদন্তের জন্য থানা থেকে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে আধা ঘণ্টার মধ্যেই এসে হাজির হন। তারা জায়গাটাকে খুঁড়ে পাথরের মতো একটি বস্তু উদ্ধার করেন এবং থানায় নিয়ে যান। এ খবর শোনা মাত্র অত্র এলাকার মানুষ থানা ঘিরে ফেলে এবং ওই বস্তুটি আসলে কী তা দেখার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে গুজব ছড়িয়ে যায় এটি একটি মহামূল্যবান পাথর, আকাশ থেকে নেমে এসেছে। এতে মানুষের উৎসুক্য আরো বেড়ে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত উৎসুক জনতাকে থানার পাশে ভিড় করতে দেখা যায়। এদিকে থানা কর্তৃপক্ষ আসলে এটা কি বস্তু তা নিয়ে চিন্তিত হন কারণ আকাশ থেকে আগত কোন বস্তুতে তেজস্ক্রীয় পদার্থ থাকতে পারে আর তাতে তাদের ক্ষতিও হতে পারে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ঢাকার

১৯৪০ সালের পর ৬৫ বছর চলে গেছে এর মধ্যে অনেক উল্কাপিণ্ড বাংলাদেশের মাটিতে পতিত হয়েছে কিন্তু সরকারিভাবে তার কোনো রেকর্ড রাখা হয়নি। আমাদের দেশের বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞানকে পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস থেকে বিতাড়িত করেছেন।

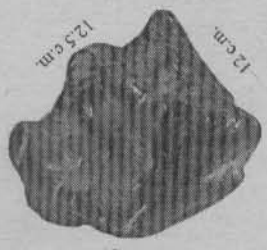

উল্কাপিণ্ডটির আকার

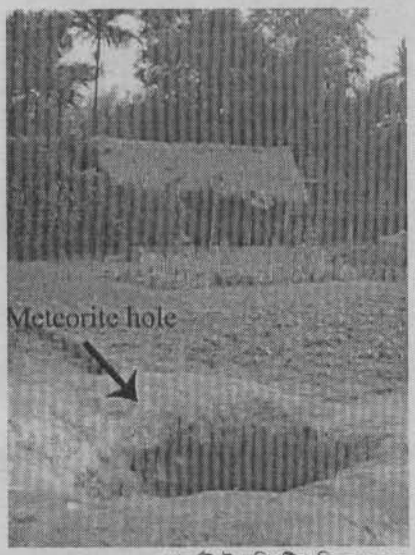

এ গর্তেই উল্কাপিণ্ডটি পতিত হয়েছে

পরমাণু শক্তি কমিশনের কাছে পাঠিয়ে এ উল্কাপিণ্ডটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২ জানুয়ারিতে ঢাকার ডেইলি স্টারে এ সম্পর্কে একটি খবর ছাপা হয় তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান মহল বাংলাদেশে পতিত এ মহাকাশবস্তুটি সম্পর্কে জানার জন্য ব্যাপকভাবে খোঁজখবর নিতে থাকেন। আর এ খবর পাওয়ার পর ঢাকা থেকে নাইমুল ইসলাম অপুর নেতৃত্বে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞান চক্রের একটি দল সিংপাড়া গ্রামে ছুটে যান। তারা সরেজমিনে সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। স্থানীয় জনগণ, প্রশাসনের কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের সাথে ঐ উল্কাপিণ্ডের পতন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। নাইমুল ইসলাম অপু তার রিপোর্টে জানিয়েছেন যে, উল্কাপিণ্ডটি এবড়ো-থেবড়ো গঠনের। এর শরীরে অনেকটা গর্তের মতো জায়গা দেখা যায়। এটি একটি পাথর ও লৌহ মিশ্রিত উল্কাপিণ্ড যার দৈর্ঘ্য ১২.৫ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ১০ সেন্টিমিটারের মত আর ওজন হবে প্রায় ২.৫ কেজির মতো।

যেখানে উল্কাপিণ্ডটি পড়েছিল তার গর্ত কতটুকুন তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি কারণ ওই ঘটনার কিছুক্ষণ পর থানা থেকে পুলিশ এসে প্রায় সাড়ে ৩ ফিট মাটি খুঁড়ে এটিকে তুলে নিয়ে যায়। যাহোক, বর্তমানে এটি ঠাকুরগাঁও সদর থানার হেফাজতে আছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এটিকে ঢাকার পরমাণু শক্তি কমিশন বা বিজ্ঞান যাদুঘরে পাঠাবেন কিনা এ নিয়ে ওপরের নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। ইতোমধ্যে এ উল্কাপিণ্ডটির ছবি পৃথিবীর বেশ কয়েকজন উল্কা বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তারা বলেছেন, এটি একটি উল্কাপিণ্ড। এখন মোটামুটি ধরে নেয়া যেতে পারে যে, বাংলাদেশের ভূমিতে এ পর্যন্ত জ্ঞাতসারে সিংপাড়ার এ বস্তুটি প্রথম উল্কাপিণ্ড হিসেবে পরিচিত হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বা মহাকাশ বিজ্ঞানের চর্চা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অথচ যখন এদেশ ব্রিটিশের অধীনে ছিল তখন তারা উল্কাপিণ্ডের সন্ধান রাখতেন।

১৯৪০ সালের পর ৬৫ বছর চলে গেছে এর মধ্যে অনেক উল্কাপিণ্ড বাংলাদেশের মাটিতে পতিত হয়েছে কিন্তু সরকারিভাবে তার কোনো রেকর্ড রাখা হয়নি। আমাদের দেশের বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞানকে পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস থেকে বিতাড়িত করেছেন। আর কোথায় উল্কা বা ধুমকেতু পড়লো না পড়লো তা নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না, যদিও সমগ্র বিশ্ব এ বিরল ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্য বাংলাদেশের দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে।

ছবি : অনুসন্ধিৎসু চক্রের সৌজন্যে।

নিম্নে ১৮৬৩ সালের ১১ আগস্ট থেকে ১৯৪০ সনের ২৭ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোথায় কখন ও কত ওজনের উল্কাপিণ্ডের পতন হয়েছিল তার একটি তালিকা দেয়া গেল :

উল্কাপিণ্ডের নাম (অফিসিয়াল)	উল্কাপিণ্ড পতনের সময়	উল্কাপিণ্ড পতনের স্থান (অফিসিয়াল)	উল্কাপিণ্ডের ওজন	উল্কাপিণ্ডের বৈশিষ্ট্যসমূহ
সাইটাল (Shytal)	১১ আগস্ট, ১৮৬৩ (দুপুর ১২টা)	মধুপুর জঙ্গল, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ২৪°২০' N ৯০°১'E	৩.২ কেজি	L6 / Stone Stone.Olivine-hypersthene chondrite (L6), brecciated.
গোপালপুর (Shytal)	২৩ মে, ১৮৬৫ (সন্ধ্যা ৬টা)	পাবনা, রাজশাহী ২৪°১৪' N ৮৯°০৩'E	১.৬ কেজি	H6 / Stone Stone.Ohvine-bronzite chondrite(H6).
পীরজঙ্গি (Pirgunje)	২৯ আগস্ট, ১৮৮২	দিনাজপুর ২৫°৪৮' N ৮৮°২৭'E	৮৪২ গ্রাম	L6 / Stone Stone. Olivine-hypersthene chondrite (L6), veined.
ডকাচি (Dokachi)	২২ অক্টোবর, ১৯০৩ (সন্ধ্যা ৭টা)	মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা ২৩°৩০' N ৯০°২০'E	৩.৮৪ কেজি	H5 / Stone Stone.Olivine-bronzite chondrite (H5), veined.
মুরেদ (Muraid)	৭ আগস্ট, ১৯২৪ (দুপুর ২.৩০মিনিট)	ঘাটাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা ২৪°৩০' N ৯০°১৩'E	৪.৭ কেজি	L6 / Stone Stone. Olivine-hypersthene chondrite (L6).
পার্পেটি (Perpeti)	১৪ মে, ১৯৩৫ (রাত ১১টা)	ত্রিপুরা (Tippera), চট্টগ্রাম ২৩°১৯'৩০" N ৯১°০'E	২৩.৪৭ কেজি	L6 / Stone Stone. Olivine-hypersthene chondrite (L6).
পেটোয়ার (Patwar)	২৯ জুলাই, ১৯৩৫ (দুপুর ২.২০মিনিট)	ত্রিপুরা (Tippera), চট্টগ্রাম ২৩°০৯' N ৯১°১১'E	৩৭.৩৫ কেজি	MES / Stony-iron Stony-iron. Mesosiderite (MES).
ভোলা (Bhola)	২৭ মার্চ, ১৯৪০	বাখেরগঞ্জ, খুলনা ২২°৪১' N ৯০°৩৯'E	১.৪৭ কেজি	LL3-6 / Stone Stone.Olivine-hypersthene chondrite, amphoterite (LL3-6), brecciated.

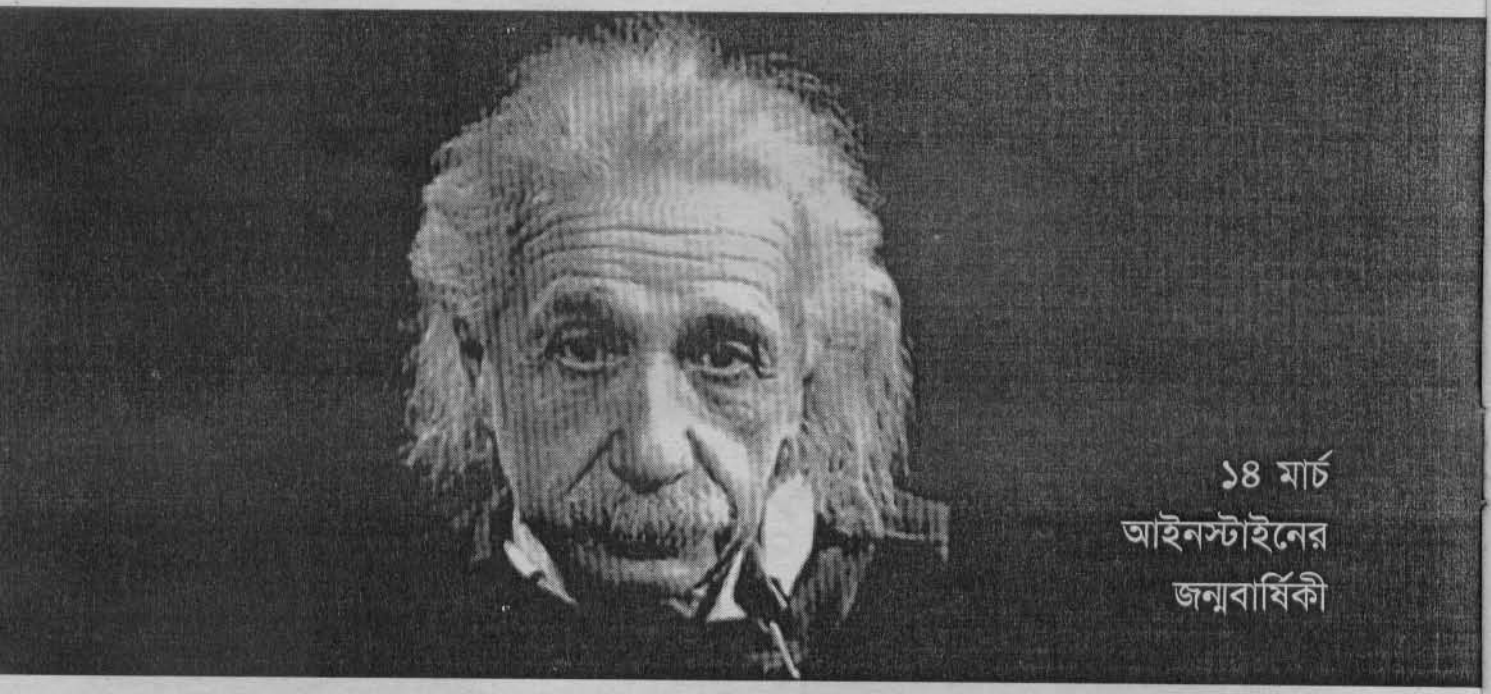

কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানেরও স্থপতি

খালেদা ইয়াসমিন ইতি

আইনস্টাইন স্কুলের পড়াশুনায় মোটেও মনযোগী ছিলেন না। শিক্ষকরা বলতেন 'ছেলেটি একেবারে বোকা'। তিনি মিউনিখের বাগানঘেরা বাড়িতে একা একা ঘুরে বেড়াতেন এবং আপন মনে ভাবতেন। বাবা-মা তাকে নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তবে মা তার এ গাম্ভির্য সম্পর্কে বলতেন, 'আমার ছেলে বড় হয়ে অধ্যাপক হবে'। চাচা রাডি এ কথা শুনে হাসতেন আর মনে মনে বলতেন 'কেবল ভালো ছাত্ররাই অধ্যাপক হওয়ার যোগ্যতা রাখে'। কিন্তু ইতিহাস মায়ের অনুভবকে সত্য প্রমাণ করেছিল

কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের জনক ম্যাক্স প্লাঙ্কের আপেক্ষিকতত্ত্বের প্রতি প্রচণ্ড উৎসাহ তার সহকারী ম্যাক্স ভন লুকে ভালোভাবেই উদ্দীপ্ত করেছিল। লু হলেন সলিড স্টেট ফিজিক্সের লু-ডায়াগ্রামের আবিষ্কারক এবং আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের একজন স্থপতি। ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মে তিনি বার্লিন থেকে সুইজারল্যান্ড যান ওখানকার ৪ হাজার মিটার পাহাড়ে চড়ার জন্য। আরেকটি কারণও ছিল, মূলত সেটাই প্রধান কারণ। তা হলো আপেক্ষিকতত্ত্বের স্রষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করা। 'লু' যখন সুইস প্যাটেন্ট অফিসের অভ্যর্থনা কক্ষে প্রবেশ করলেন তখন একজন অফিসার একটি করিডোর দেখিয়ে বললেন ওখানে তার আগ্রহের ব্যক্তিটি তার সাথে দেখা করবেন। লু যখন উল্লেখিত স্থানে

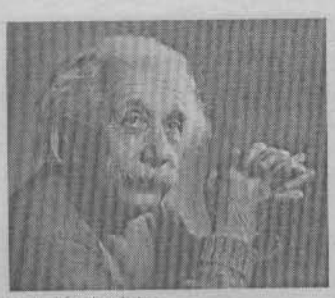
আলবার্ট আইনস্টাইন

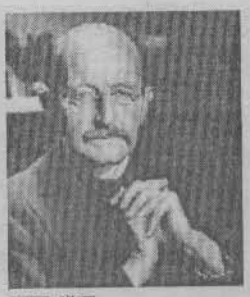
ম্যাক্স প্লাংক

ম্যাক্স ভন লু

একজন শিক্ষক এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে আইনস্টাইনের নাম দিয়েছিলেন 'কুড়ে কুকুর'। এ শিক্ষকই ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হারম্যান্ড মিনস্কি এবং পরবর্তীতে তিনি আইনস্টাইনের চতুর্থ মাত্রিক জগতের (স্থান-কাল) উপর গাণিতিক কাজ করেছিলেন

পৌছলেন, ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে যে লোকটি আসলেন ঐ একই জায়গায় তাকে তিনি খেয়াল করলেন না। এরকম একজন সাদামাটা লোক আর যাই হোক আপেক্ষিকতত্ত্বের জনক হতে পারেন না। সুতরাং তিনি তাকে অতিক্রম করে গেলেন। সেই সাদামাটা লোকটি আবার যখন অভ্যর্থনা কক্ষ থেকে বের হয়ে ফিরে আসলেন তখন 'লু' এর সাথে পরিচয় ঘটলো এবং তাঁকে বিশ্বাস করতেই হলো প্যাটেন্ট অফিসের এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীটি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী আপেক্ষিকতত্ত্বের জনক, নাম তার আলবার্ট আইনস্টাইন।

আইনস্টাইনের জন্ম ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ, জার্মেনীর উলম শহরে। বাবার নাম ছিল হেরম্যান আইনস্টাইন এবং মায়ের নাম পলিন আইনস্টাইন। তার বাবা ছোট একটি রাসায়নিক কারখানার কর্মচারী ছিলেন। আইনস্টাইনের এক বছর বয়সের সময় তার পরিবারে দেখা দিল চরম অর্থনৈতিক দুর্দশা। ফলে তাদের বাধ্য হয়ে মিউনিখের শহরতলীতে চলে যেতে হলো। আইনস্টাইন স্কুলের পড়া-শুনায় মোটেও মনযোগী ছিলেন না। শিক্ষকরা বলতেন 'ছেলেটি একেবারে বোকা'। তিনি মিউনিখের বাগানঘেরা বাড়ীতে একা একা ঘুরে বেড়াতেন এবং আপন মনে ভাবতেন। বাবা-মা তাকে নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তবে মা তার এ গাম্ভির্য সম্পর্কে বলতেন, 'আমার ছেলে বড় হয়ে অধ্যাপক হবে'। চাচা রাডি একথা শুনে হাসতেন আর মনে মনে বলতেন 'কেবল ভাল ছাত্ররাই অধ্যাপক হবার যোগ্যতা রাখে'। কিন্তু ইতিহাস মায়ের অনুভবকে সত্য প্রমাণ করেছিল।

আইনস্টাইনের ৫ বছর বয়সে বাবা তাকে একটি কম্পাস কিনে দিয়েছিলেন। যে কম্পাসের কার্যাবলী তার শিশুমনকে ভীষনভাবে আলোড়িত করেছিল। আইনস্টাইনের ছিল সঙ্গীতের প্রতি প্রচন্ড আকর্ষণ। তাঁর মা তাঁর এ সঙ্গীত প্রিয়তা লক্ষ্য করে একটি বেহালা কিনে দেন। তিনি বিটোফেন, মোজার্টের সুর খুব পছন্দ করতেন এবং সেগুলো বাজাতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আইনস্টাইনের শয্যাপাশে মায়ের দেওয়া বেহালাটি ছিল। ইউক্লিডীয় জ্যামিতি তার কাছে ছিল অতিপ্রিয় এবং পবিত্র। তিনি ১২ বছর বয়সে একবার ইউক্লিডের সমতল জ্যামিতির উপর একটি বই পেয়েছিলেন, বইটি তাকে এতটা আকর্ষণ করেছিল যে তিনি সারারাত জেগে বইটির সমস্ত প্রশ্নমালার সমাধান করে ফেলেন। তিনি ইউক্লিডের এলিমেন্ট গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, যৌবনে যিনি এই বই পড়ে অনুপ্রাণিত হননি তিনি তত্ত্ব চর্চার জন্য জন্ম গ্রহন করেননি। একাডেমিক শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে রিতিমত বিতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল, তিনি ঘৃণা পোষণ করতেন। তিনি বহু কষ্টে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা শেষ করেন। তিনি বলতেন "যে শিক্ষা মানুষকে মুক্তভাবে চিন্তা করতে শেখায় না, মুক্ত চিন্তার প্রেরণা যোগায় না তা মানুষের মানষিক বিকাশের পরিপন্থি (অবশ্য আমাদের অবস্থা দেখলে তিনি বেঁচে থাকলে আত্মহত্যা করতেন)। একবার তাকে মিউনিখের লুটপোল্ড ডিমনেসিয়াম স্কুল থেকে বহিস্কারও হতে হয়। বহিস্কারে মূল কারণ ছিল তার তিক্ষ্ণ প্রশ্ন যা গণিতের শিক্ষককে বিপর্যস্ত করেছিল। এ অভিজ্ঞতাকে কাটিয়ে উঠার জন্য এক বছর ঘুরে কাটিয়ে দিলেন আলপাইন পর্বত, বিভিন্ন মিউডিয়াম। তিনি সুইস উচ্চ বিদ্যালয়ে একবছর পড়াশুণার পর তিনি জুরিখ পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হন। এখানেও তিনি লেকচারে ফাঁকি দিতেন, নিজের ইচ্ছামতো পড়াশুনা পড়তেন। এরফলে শিক্ষকদের রুদ্ররোষে পড়েন। একজন শিক্ষক এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে আইনস্টাইনের নাম দিয়েছিলেন 'কুড়ে কুকুর'। এই শিক্ষকই ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হারম্যান্ড মিনস্কি এবং পরবর্তীতে তিনি আইনস্টাইনের চতুর্থ মাত্রিক জগতের (স্থান-কাল) উপর গাণিতিক কাজ করেছিলেন।

যাহোক অবশেষে বন্ধু মার্সেলের সহযোগিতায় অনেক চেষ্টা চরিত্র করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে বেরোলেন, ১৯০০ সালে। তখন এখনকার মতো চলছিল শতাব্দী বদলের দিন। শিক্ষকদের সাথে খারাপ সম্পর্ক থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী তার জুটলো না। এই সময় তিনি প্রতি ঘন্টায় তিন ফ্রাঙ্ক হিসেবে প্রাইভেট শিক্ষা দেওয়া, অস্থায়ী স্কুল শিক্ষকতা করে জীবন ধারণ করেছিলেন। ১৯০১ সালে আইনস্টাইনের প্রথম গবেষণা পত্র দ্বিতীয় প্রভাবশালী পত্রিকা 'এনালেন ডার ফিজিকে' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তারপরও জুড়িখ বিশ্ববিদ্যালয় তা পি.এইচডির জন্য যথেষ্ট নয় বলে বাতিল করে দেয়। তিনি এই গবেষণাপত্রের একটি অনুলিপি অধ্যাপক ভিল্ডহেম অস্টওয়ালডের কাছে পাঠান যিনি পরবর্তীতে নোবেল পুরুস্কার পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "আমি আপনার সাধারণ রসায়নশাস্ত্রের উপর পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, সেইজন্য আপনার কাছে পাঠাবার স্বাধীনতা নিচ্ছি। আমি সাহস করে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই একজন গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানীর আপনার প্রয়োজন আছে কিনা.... এই অনুরোধ করার স্বাধীনতা আমি নিলাম শুধু এ জন্য যে আমি এখন সঙ্গতিহীন..."। কিন্তু কোনো উত্তর পেলেন না। এরপর তিনি লাইডেনের অধ্যাপক কামেলিং ওনসের কাছে একই অনুরোধ করে চিঠি দেন তাতেও কোন উত্তর আসে না। এ সময় তাঁর ব্যর্থ ব্যাবসায়ী, অসুস্থ এবং শিক্ষিত সমাজের বহিরাগত বাবা তাঁকে না জানিয়ে চিঠি লেখেন অস্টওয়াল্ডের কাছে: তিনি লিখেছেন, পিতা তার সম্মানের স্বার্থে লিখছে বলে ক্ষমা করবেন; আমার পুত্র আইনস্টাইনের বয়স ২২ বছর, যারা তার বিচার করতে পারেন তারা প্রত্যেকে তার প্রতিভার প্রশাংসা করে। তাঁর বেকার অবস্থার জন্য সে গভীরভাবে অসুখী...আপনি তার প্রবন্ধটি পড়বেন এবং তাকে উৎসাহ দিয়ে কয়েক লাইন লিখবেন যাতে আবার সে তার জীবনে এবং তার কাজে আনন্দ ফিরে পায়। কিন্তু তারপরও কোন উত্তর আসেনি। এরপর ১৯০২ সালে বন্ধু মার্সেল গ্রসের বাবার সহায়তায় সুইস প্যাটেন্ট অফিসে 'তৃতীয় শ্রেণীর টেকনিক্যাল এক্সপার্ট' হিসেবে চাকুরী পেয়েছিলেন। এ চাকুরীর ফলে ফলেই সম্ভব হয়েছিল তার সহপাঠিনী মিলেভার সাথে বিয়ে। এখানে উপযুক্ত গ্রন্থাগার থেকে দূরে, চাকুরীর মুল্যবান সময় চুরি করে তিনি ১৯০৫ সালে

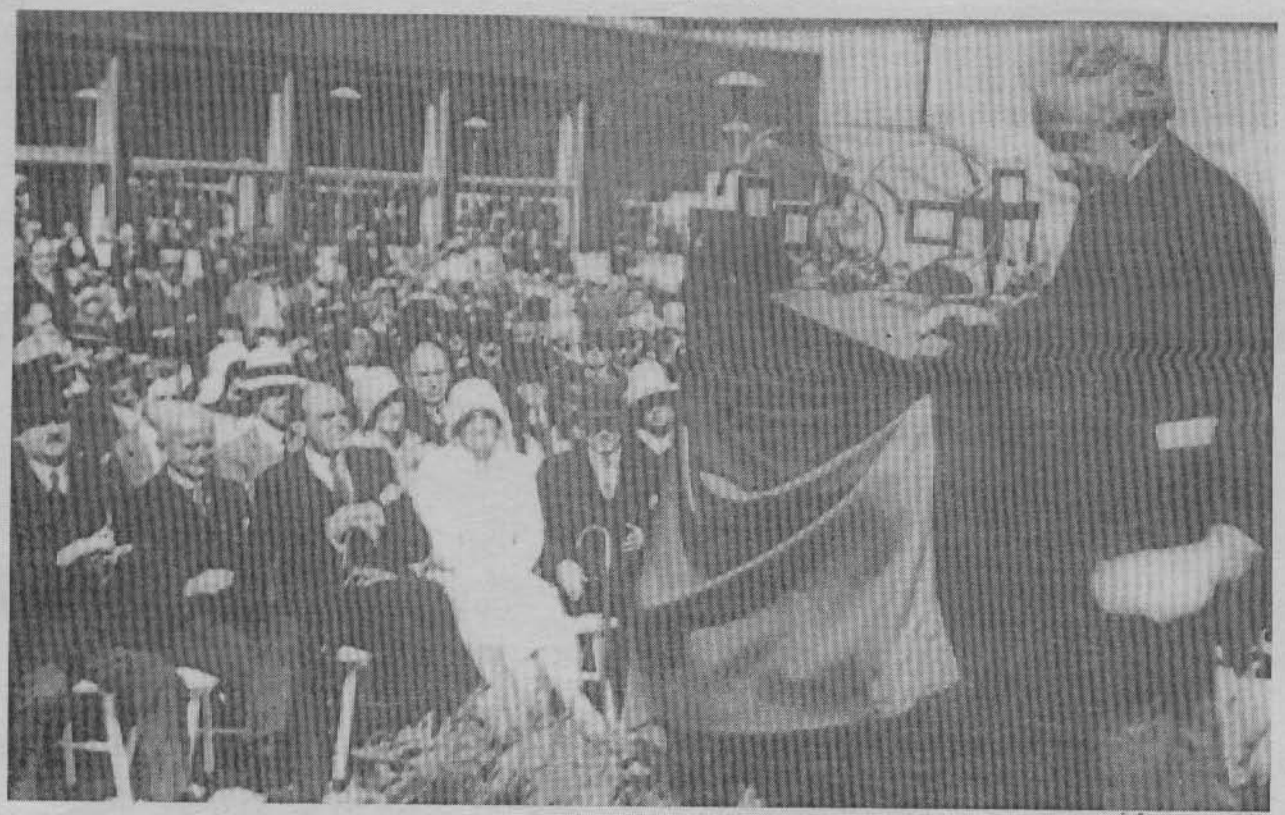

এনালেন ডার ফিজিকে প্রকাশিত অসাধারণ তিনটি প্রবন্ধ লেখেন যা পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসে নতুন দিগন্ত রচনা করে। প্রবন্ধ তিনটি প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি ছিল Photoelectric Effect ও Brownian motion উপর তৃতীয়টি ছিল On the Electrodynamics of Moving Bodies, এর উপর যা পরে বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯০৭ সালে তিনি উষ্ণতার সাথে আপেক্ষিকতাপ পরিবর্তনের বিষয়টি কোয়ান্টামতত্ত্বের ভিত্তিতে সামাধান দেন।

১৯০৫ সালে ফটোইলেকট্রিক প্রক্রিয়ার ব্যখ্যায় তিনি বলেছিলেন আলো বিকিরণ কোয়ান্টাইজ বা খন্ড খন্ড (hv) আকারে থাকে। ঝাক ঝাক ফোটনের সমষ্টি আলোক প্রবাহ ধাতব প্লেটের পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। তখন তা স্থিতিস্থাপকের রূপ নেয় এবং এতে পরমাণু ইলেক্ট্রনের সর্বশক্তি শোষণ করে অথবা করেই না। সকল শক্তি শোষন করলে পরমাণুর সেই ইলেক্ট্রনের শক্তি (hv) আকারে বৃদ্ধি পায়। পরমাণু থেকে ইলেক্ট্রনকে বিচ্যুত করতে গেলে পরমাণুতে ইলেক্ট্রনের বন্ধনের থেকে পতিত ফোটনের শক্তি বেশি হওয়া লাগবে। মুক্ত হওয়ার নূন্যতম শক্তিকে ওয়ার্ক ফাংশন বলে। কিন্তু তারপরও তাঁর মতো প্রতিভা এগুলোর (ফোটনগুলোর) ভরবেগ আছে সে সংক্রান্ত সমীকরণ লিখতে প্রায় ১২ বছর সময় লাগিয়ে দেন। ১৯১৭ সালে বিকিরণ তত্ত্বের উপর একটি ক্লাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। যা থেকে ৪০ বছর পরে লেসার এবং মেসার উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছিল। ১৯১৬ সালে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশের মাধ্যমে মহাকর্ষকে

আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশের মাধ্যমে মহাকর্ষকে স্থান কালের বক্রতা হিসেবে দেখান। প্রকৃতির যে দ্বৈতধর্ম আছে তা ১৯২৩ সালে ডি ব্রগলি তার কণা-তরঙ্গ মতবাদে প্রকাশিত হয়। এই মতবাদকে ধারণ করে ১৯২৫ সালে শ্রোডিঙ্গারের 'তরঙ্গ বলবিজ্ঞান' গড়ে উঠে।

স্থান কালের বক্রতা হিসেবে দেখান। প্রকৃতির যে দ্বৈতধর্ম আছে তা ১৯২৩ সালে ডি ব্রগলি তার কণা-তরঙ্গ মতবাদে প্রকাশিত হয়। এই মতবাদকে ধারণ করে ১৯২৫ সালে শ্রোডিঙ্গারের 'তরঙ্গ বলবিজ্ঞান' গড়ে উঠে। কণা-তরঙ্গ প্রকল্প প্রকাশিত হওয়া আগে আইনস্টাইনের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। তিনি ব্রগলি গবেষণাপত্র পড়ে সংগে সংগে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দেন। ফলে ব্রগলির শিক্ষক ল্যাঞ্জাভিন তা গ্রহন করে নেন। সেই হিসেবে হারুণ-অর-রশিদের ভাষায় আইনস্টাইন শুধু কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের তিনজন স্থপতির একজনই নন বরং তরঙ্গ বলবিজ্ঞানের sol god-father-ও বটে। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনই ফটোইলেকট্রিকের ব্যখ্যায় বললেন আলোক বিকিরণ শুধু কণাকারে শোষিত বা নিঃসরিত হয় না বরং তা চলাফেরা করেও কণাকারে। তিনি তার গবেষণাপত্রে কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য প্রমাণের জন্য তাপ বলবিদ্যার যুক্তি দেন। অতএব আইনস্টাইনের বিশ্বাস ছিল প্লাংকের বিকিরণের নিয়ম বিশুদ্ধ কণা ধারণার উপর ভিত্তি করে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তারপরও ১৯ বছর তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল তা করেছিল বাংলাদেশের সতেন্দ্রনাথ বসু পরে এই তত্ত্ব বোস-আইনস্টাইন হিসে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রফেসর আব্দুস সালাম বলেছিলেন, "এ শতাব্দীতে আইনস্টাইনের মতো কোনো মানুষ জন্মগ্রহন করেন্নিসম্ভবত মানুষ্যজাতির সমগ্র চিন্ত ার ইতিহাসেও নয়; অন্তত পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এরকম আর কেউ ছিলেন না। ১৯৫৫ সালে ১৮ই এপ্রিল মাত্র ৭৬ বছরে আইনস্টাইন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর পর প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট হারব্লকের ছবি একে পৃথিবীর উপরে লিখে দেন *Albert Einstein lived here.*। যেন মনে হয়, যদি কোন দিন আন্তনাক্ষত্রিক সভ্যতার কোন মহাকশযান এই সৌরজগতের পাশদিয়ে যায় তাহলে বলবে ঐ হলো পৃথিবী যেখানে আইনস্টাইনের মতো অসাধারণ প্রতিভার জন্ম হয়েছিল যিনি চতুর্মাত্রিক ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন। যিনি একিভূত ধারণার স্বপ্ন নিয়ে একাকী চলে ছিলেন নিঃসঙ্গভাবে; কিন্তু কি আশ্চর্য তারপরও তার জীবনের মাত্র ২০টি বছর মহাজাগতিক দূর্বোধ্যতা রহস্য উন্মোচনে সময় কাটিয়েছিলেন অথচ ৪০টি বছর সংগ্রাম করেছিলেন মানবিকতার জন্য।

সূত্র: এ.এম হারুন অর রশীদ অনূদিত বিজ্ঞানী সালামের আদর্শ ও বাস্তবতা; ডিসকাশন প্রজেক্ট

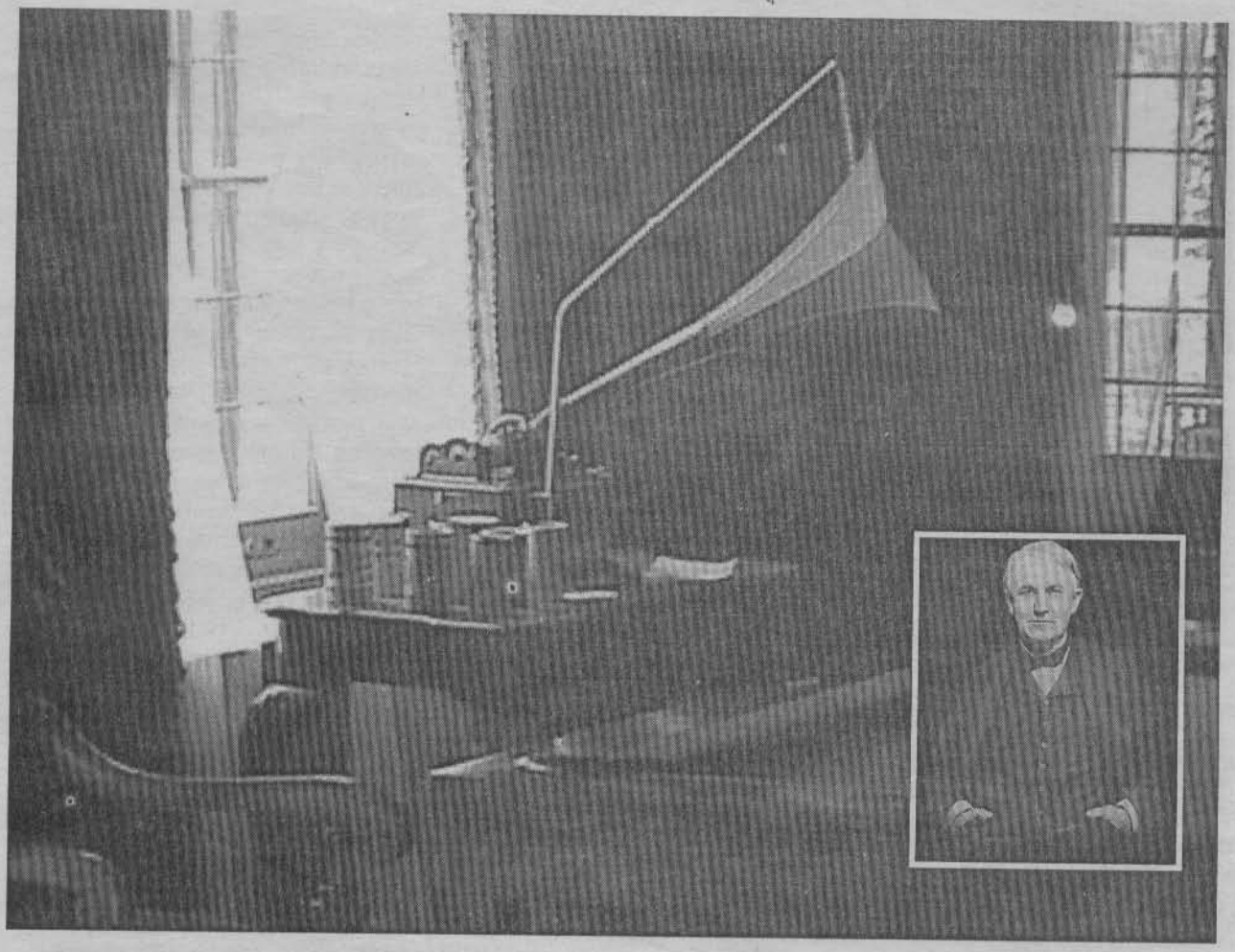

আধুনিক বিশ্বের আলোর পথপ্রদর্শক

টমাস আলভা এডিসন

রাজীব বিশ্বাস

বর্তমান এ তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্বে রূপকারদের মধ্যে আলভা এডিসন অন্যতম। তিনি আধুনিক বিশ্বকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখে এ অন্যতম মহান বিজ্ঞানীর ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী। এ জন্মবার্ষিকীতে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ আয়োজন

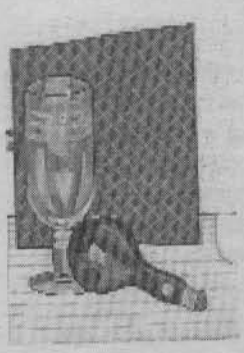

বর্তমান এ তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্বে রূপকারদের মধ্যে আলভা এডিসন অন্যতম। তিনি আধুনিক বিশ্বকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখে এই অন্যতম মহান বিজ্ঞানীর ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী। এ জন্মবার্ষিকীতে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ আয়োজন।

বাল্যবেলার কৌতূহল

ছোটবেলায় আলভা এডিসন অত্যন্ত কৌতূহলী ছিলেন। তিনি একবার মুরগির ঘরে গিয়ে মুরগির ডিমের ঝুড়িতে বসে ছিলেন বাচ্চা ফোটাবেন বলে। কিন্তু বাচ্চা তো তিনি ফোটাতেই পারলেন না, আর প্যান্টে মুরগির ভাঙা ডিম লাগিয়ে নিয়ে সবার সামনে হাসির পাত্র হলেন। তার জন্ম ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি। পিতার নাম স্যামুয়েল এডিসন, বাবা-মা তার নাম রাখলেন টমাস আলভা এডিসন। সংক্ষেপে টম।

এডিসন এতই কৌতূহলী ছিলেন যে মাত্র ৬ বছর বয়সে খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে তিনি দেখতে চান কী ঘটে! বেলুনে বাষ্প পুরলে বেলুন ওড়ে। তাই বন্ধুকে ওড়ানোর জন্য তাকে সিড়লিজ পাউডার খাওয়ান কিন্তু ফলস্বরূপ তার বন্ধুকে হাসপাতালে নিতে হয়। তিনি তবুও বলেন যে, কাজ করে যাও ফল পাবে। নিশ্চয়ই কোনো কারণে ভুল হওয়ায় তার বন্ধু উড়তে পারেনি।

এডিসন তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিগান প্রদেশের পোর্ট হোর্নের বাড়িতে ভাড়ার ঘরে তার ল্যাবরেটরি রুম বানান। নানা রকম বোতলে নানা জিনিস পুরে তিনি তার ল্যাবরেটরিতে সাজাতেন। সুরক্ষার জন্য তিনি তার বোতলে 'বিষ' লেখা লেবেল এঁটে দিতেন।

শখের সাংবাদিক, উদ্দেশ্য পড়াশুনার খরচ চালানো

আশ্চর্য হলেও সত্য এডিসন মাত্র তিন মাস স্কুলে পড়েছেন। স্কুলে কখনোই মনোযোগ দিতে পারতেন না। তাই তাকে স্কুল থেকেই ছাঁটাই করে দেয়া হয়। তারপর তিনি বাড়িতে তার মায়ের কাছে পড়তে থাকেন। এতে তিনি অত্যন্ত ভালো ফলাফল করেন।

এডিসনের বাড়ির পাশে পোর্ট হোর্ন থেকে ডেট্রয়েট পর্যন্ত নতুন রেল লাইন বানানো হয়। এডিসন মাত্র ১২ বছর বয়সে ওই রেলে কাজ করতে চান। তিনি অনেক কষ্টে বাড়ি আর রেল কর্তৃকপক্ষের অনুমতি নিয়ে যাত্রীদেরকে নানা ফলমূল ও খাবার বিক্রি করে তার গবেষণার খরচ চালাতেন। তারপর রেলগাড়ির একটা কামরায় অনুমতি নিয়ে সেখানে গবেষণার জিনিসপত্র তোলেন। ট্রেন থামলে তিনি ফলমূল বিক্রি করতেন আর অবসর সময়ে গবেষণা করতেন। অবসর সময়ে অনেক পত্রিকা বিক্রি হতো। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় পত্রিকা ছিল কম। তাই তিনি নিজের একটি পত্রিকা বের করার জন্য লাগলেন। একটা হোটেলের খাদ্য তালিকা ছাপানোর মেশিন কিনে তিনি নিজে তার বন্ধুদের কাছ থেকে তাজা খবর নিয়ে প্রথম চলন্ত রেল লাইন থেকে 'গ্রান্ডট্রাঙ্ক হেরাল্ড' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি একাধারে পত্রিকাটির মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক, রিপোর্টার, প্রচারক ও বিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু একদিন ট্রেনে গবেষণা চালানোর সময় গাড়িটি দ্রুতগতিতে মোড় ঘোরার সময় ধাক্কা খেয়ে একটি বোতল ভেঙে কিছু ফসফরাস পড়ে যেতেই বাতাসের সংস্পর্শে আগুন জ্বলে ওঠে। অনেক কষ্টে পাশের বগি থেকে কন্টাকটর ও এডিসন আগুন নেভান কিন্তু ফলস্বরূপ এডিসনকে তার জিনিসপত্র নিয়ে নেমে যেতে হয়। তখন এডিসন তার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। আর বাড়িতে গবেষণা চালাতে থাকেন।

টেলিগ্রাফ : সংকেতের সফল আদান প্রদান

এডিসন টেলিগ্রাফ প্রযুক্তিটি নিয়ে অত্যন্ত কৌতূহলী ছিলেন। তিনি প্রায়ই টেলিগ্রাফ অপারেটরের কাছে নানান রকম প্রশ্ন করতেন

এডিসন জোড়া ট্রান্সমিটার বা যাতে এক তারে দুটি বার্তা পাঠানো যায় সেই 'কোয়াড্রোপ্লেক্স' পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

কিন্তু সন্তোষজনক ফল পেতেন না। একদিন প্রতিক্রিয়া দেখতে তিনি টেলিগ্রাফ অপারেটর বার্তা পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তার হাত চেপে ধরেন। ফলস্বরূপ কিছু তো হয়ই না, বরং তিনি মার খেতে খেতে বেঁচে যান।

তারপর বন্ধু জিম ক্ল্যানসী আর এডিসন নিজের বাড়ির মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইন বসালেন। তারকে চামড়া আর নানানরকম ন্যাকড়ায় মুড়ে বাড়ির বেড়ার খুঁটি আর গাছের গুড়ির সাথে আটকে দিলেন। তার ইনসুলেটরের বদলে খালি বোতল আর পিতলের টুকরো দিয়ে চাবি বানালেন। আর হাতে তৈরি ব্যাটারি দিয়ে তাদের টেলিগ্রাফটিতে খুব হালকা কিছু সংকেত পাঠানোর মতো করে বানালেন।

একবার টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে যাওয়ার পর এডিসন কিছু ইঞ্জিনিয়ারসহ একটা ইঞ্জিন নিয়ে ইঞ্জিন থেকে ইঞ্জিনের বাঁশির সাহায্যে টেলিগ্রাফ বার্তা বাজালেন। তারপর একজন কানাডিয়ান অপারেটর বিষয়টা বুঝতে পারলেন। তারপর তিনিও সংকেত পাঠালেন। এভাবে লাইন না সারা পর্যন্ত সংকেত আদান-প্রদান করেন তারা।

কোলাহল থেকে দূরে আপন গবেষণায়

১৯৬২ সালের আগস্টে একদিন রেললাইন যখন লাইন বদল করছিল, তখন এডিসন নিচে নেমে এসে দেখেন একটা ছোট ছেলে পাথর কুড়াতে কুড়াতে রেললাইনের ওপর চলে গেছে। এদিকে ট্রেন আসছে। তখন এডিসন বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে দৌড়ে গিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে পাশে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর চিৎকার শুনে মি. ম্যাকেঞ্জি নামক স্টেশন মাস্টার দৌড়ে এলেন। ছেলেটি তার সন্তান ছিল। তারপর তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে এডিসনকে টেলিগ্রাফের প্রধান অপারেটর বানিয়ে দিতে চান। আর তিন মাসেই তিনি সবকিছু রপ্ত করে নেন।

একদিন এডিসন গাড়ি থেকে নেমে কাগজ বিক্রি করতে করতে কখন যে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে বুঝতে পারেননি। তারপর দৌড়ে গিয়ে তিনি ট্রেনের হাতল ধরে বসলেন। এমনিতেই তিনি ক্লান্ত ছিলেন তারপর আবার পিঠে কাগজের বোঝা। পাশের কামরার এক ব্র্যাকমান এসে তার কান ধরে তাকে টেনে তোলেন। কিন্তু এর বিনিময়ে তাকে চিরদিনের মতো বধির হতে হয়। এডিসন বলেছিলেন, "এটা আমাকে পৃথিবীর কোলাহল থেকে দূরে রাখে"। আর আমি নিজের কাজে মনযোগ দিতে পারি।"

চাকরি ও গবেষণা

কানে চোট লাগার পর এডিসন রেল স্টেশনে টেলিগ্রাফারের কাজ জোগাড় করেন। কিন্তু একদিন একটি খবর বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে একটি খবর পাঠানো বাদ দিয়ে অন্য একটি খবর পাঠান। তাতে তার চাকরি চলে যায়। তাই এডিসন ভাবতে লাগলেন কীভাবে এক তারে দু বার্তা পাঠানো যায়। এদিকে চাকরি খুঁজতে খুঁজতে তিনি সিনমিনাটিতে গিয়ে আবার বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন। তার ঘরটি আরশোলা ভরা ছিল। তাদের জন্য কোনো কাজ ভালোভাবে করা যেত না। তাই এডিসন তড়িৎ প্রবাহিত করে তাদেরকে মেরে ফেলেন। তখন এডিসন জোড়া ট্রান্সমিটার বা যাতে এক তারে দুটি বার্তা পাঠানো যায় সেই 'কোয়াড্রোপ্লেক্স' পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

এরপর এডিসন ভোট গোনার যন্ত্র বানিয়েছিলেন কিন্তু আইন পরিষদের লঘিষ্ঠ দলটি এ নিয়ম মেনে নেননি। তাই এডিসনের আবিষ্কার অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

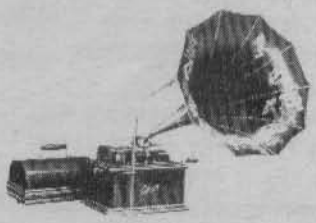

বন্ধুর ঠিকানায় নিউইয়র্কে

১৮৬৯ সালে এডিসন নিউইয়র্কে চলে এলেন। তার কাছে তার এক বন্ধুর ঠিকানা ছিল। কিন্তু তার কাছে গিয়ে দেখে সেও বেকার। সে এডিসনকে মাত্র ১ ডলার সাহায্য করতে পারে। এডিসন থাকার জন্য অনেক কষ্টে ইন্ডিকেটর কোম্পানির ব্যাটারি রুমে থাকার জায়গা পেলেন। সে সময় স্বর্ণদালালদের খুব সুদিন ছিল। কাগজী মুদ্রার মান হ্রাস পাওয়ায় ওয়াল স্ট্রিটে স্থাপিত হয়েছিল ইন্ডিকেট কোম্পানির ব্যাটারির রুম। সেখানে একটি যন্ত্রের সাহায্যে তিনশ ইন্ডিকেটর চালানো হতো। এডিসন আসার তিন দিন পর জনৈক দালালের ইন্ডিকেটরটি ভেঙে পড়ে। এডিসন খুব সহজেই যন্ত্রটি সারাই করে দেন। আর তখন সেখানে উপস্থিত কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট এডিসনকে তৎক্ষণাৎ তিনশ ডলারের চাকরি দেন।

একবার এডিসনের ট্রেনে কোথাও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ট্রেন আসতে দেরি হবে শুনে এডিসন সময়টাকে নষ্ট করতে না চেয়ে স্টেশনেই গোল্ড কোটেশনের যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেন। এ আবিষ্কার জানাজানি হওয়ার পর গোল্ড অ্যান্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানি এটি কিনে নিয়ে এডিসনকে চল্লিশ হাজার ডলার দেন। তখন এডিসন এ টাকা দিয়ে নিউইয়র্কে আধুনিক যন্ত্রপাতির একটি কারখানা খোলেন। এদিকে এডিসন মাকে দেখতে যাওয়ার আগেই তার মা মারা গেলেন। সে বছরেই মেরি স্টিলওয়েলের সাথে তিনি বিয়ে করেন। বিয়ের পর এডিসন একটি স্বয়ংক্রিয় টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করলেন। বিদ্যুতশক্তির প্রভাবে একটি কলম রাসায়নিক পদার্থ মাখা একটি কাগজের ওপর দিয়ে লিখে যাবে। এতে অপরপ্রান্তে কোনো অপারেটর প্রয়োজন ছিল না। তারপর সি.এল সোলস নামক এক ভদ্রলোকের কিম্ভূতকিমাকার একটা টাইপরাইটার যন্ত্র তিনি পরিবর্তন করে এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, যা তা কাজকর্মের ব্যাপারে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনলো। এদিকে এডিসনের এক মেয়ে মেরিয়ন ও ছেলে জুনিয়র এডিসনের জন্ম হলো। এডিসনের বাবা এডিসনের বাড়িতে স্থায়ীভাবে চলে এলেন। আর এডিসন নির্জনে গবেষণার জন্য সেনলো পার্কে একটি বাড়ি বানালেন।

উদ্ভাবনের দশ দিগন্ত

আলেকজান্ডারের আবিষ্কৃত টেলিফোনটিতে একই চুঙ্গীতে বলতে হতো ও শুনতে হতো। এডিসন আলাদা ইয়ারপিস ওমউথপিস বানান। এ যন্ত্রটির বিনিময়ে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন তাকে এক লক্ষ টাকা দেয়। বিলেতে এক লোক তাকে তিরিশ হাজারের বিনিময়ে টেলিফোন সরবরাহ করতে বলে। অঙ্কটা কম ছিল। কিন্তু এডিসন রাজি হয়ে যায়। কিন্তু চেক হাতে পেয়ে দেখে ত্রিশ হাজার ডলার নয়। তিরিশ হাজার পাউন্ড যার মূল্য মার্কিন ডলারের হিসাবে দেড় লাখ ডলার।

ফনোগ্রাম

দুপাশে দুটো ঠেস তার ওপর একটা লোহার দণ্ড। মাঝে ধাতুর তৈরি গোলাকার বস্তু। দণ্ডের একপাশে হাতল সমেত চাকা। হাতলটা ঘুরিয়ে দিলে গোলাকার বস্তুটা সামনের দিকে ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে। গোলাকার এ বস্তুটার ওপর টেলিফোনের ট্রান্সমিটারের মতো মুখ দেয়ার যন্ত্র। এ যন্ত্রটাতে একটা ডায়াফ্রম আছে। তার শেষ দিকটাতে তীক্ষ্ণ। এটা হালকাভাবে গোলাকার বস্তুটার ওপর বসানো। এটাই এডিসনের ফনোগ্রাম যন্ত্র। তিনি তার ছোটবেলার কবিতা 'মেরির ছিল ছোট মেষ' আবৃতি করেন। যন্ত্রটি আবার তার কথা পুনরায় শোনায়। এটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এলাকায়। অনেক লোক বিশ্বাস করছিল না। কিন্তু যখন তাদের নিজের কণ্ঠ তাতে শুনতে পেল তখন তারা হা হয়ে গেল।

বাল্ব

এডিসনের সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কার বৈদ্যুতিক বাতি। যদিও এর আগে ইংল্যান্ডের একজন বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তবুও তার বাতি এবং অর্থ কোনো কাজেই আসে না। ১৮৭৯ সালের ২১ অক্টোবর বাল্বে প্রথম আলো জ্বলে। তিনি নিউইয়র্ক শহরকে আলোয় আলোকিত করতে থাকেন। ১৮৮২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর সমগ্র নিউইয়র্ক শহর আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। এদিকে ১৮৮৪ সালের ৯ আগস্ট এডিসনের স্ত্রী মারা যান। তারপর তিনি ১৮৮৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তার এক বন্ধুর বোন মীনা মিলারকে বিয়ে করেন

চলচ্চিত্র

এডিসন চলমান বিশ্বকে ধরে রাখার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। তিনি কাঁচের পত্রের বদলে স্যালুলয়েডের ফ্লিম ব্যবহার করলেন। তিনি এ যন্ত্রটির নাম দিলেন 'কাইনেটোস্কোপ'। কিন্তু প্রথমদিকে তার এ যন্ত্রে ৮/১০ জন দেখতে পারতেন। কিন্তু এডিসনের তাতে মন না ভরায় অনেক কষ্ট করে তিনি সাদা পর্দায় হাজার হাজার লোকের সামনে চলচিত্র ফুটিয়ে তোলেন। তখন লোকে এতই আশ্চর্য হয়েছিলেন যে নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গিয়েছিল। তারিখটা ছিল ১৮৯৭ সালের ২৭ এপ্রিল। তার অন্যান্য আরও আবিষ্কার আছে। যেমন গাড়ির ব্যাটারি, সিমেন্ট, কয়লা না দিয়ে কার্বলিক এসিড, গুপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র নির্ণয়ের কৌশল, বিষাক্ত গ্যাস প্রতিরোধক মুখোশ, আত্মগোপনের যান্ত্রিক উপায়, টহলদার জাহাজে রাতের উপযোগী আলো, যুদ্ধ জাহাজে দ্রুতগতি পরিবর্তনের যন্ত্র নকল রবার ইত্যাদি।

মৃত্যু

এডিসনের জীবনের শেষের দিকে একবার সভায় আমন্ত্রণ করা হয়। প্রেসিডেন্ট সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সভাতেই তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাময়িকভাবে সেরে উঠলেও তার শরীর অত্যন্ত ভেঙে পড়ে অল্প দিনেই। ১৯৩১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তার শেষ জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। আর ১৯৩১ সালের ১৮ অক্টোবর তার মৃত্যু ঘটে।

এডিসন এ শতাব্দীর অন্যতম মহান ও শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিবিদ। তিনি সব শ্রেণীর লোকদের সম্মান করতেন। সারাক্ষণ পড়ে থাকতেন তার গবেষণার জগতে। তিনি এতই বেখেয়ালী ছিলেন, একবার অনেক ক্লান্ত হয়ে খেতে বসে তিনি দু'চামচ মুখে দিয়েই ঘুমিয়ে যান। মজা করার জন্য তার কর্মচারী তার খাদ্য খেয়ে উচ্ছিষ্ট প্লেটে তুলে রাখেন। ঘুম থেকে জাগার পর কর্মচারী তাকে জিজ্ঞেস করেন, "মধ্যাহ্ন ভোজ কেমন লাগল?"
এডিসন বললেন, "ভালোই কিন্তু আমার ক্ষিধে কেন মিটল না বুঝলাম না।" তখন কর্মচারীটি সব কথা বললে তিনি রেগে ওঠেন আর তাকে আবার নতুন করে খেতে দিয়ে শান্ত করতে হয়। এ মহান প্রযুক্তিবিদের কোনো অহংকার ছিল না। তিনি এক সাক্ষাৎকারে প্রতিভা সম্পর্কে বলেছিলেন,
"প্রতিভা আবার কি? লোকে যে জিনিসটাকে প্রতিভা বলে, সেটা আসলে আমার পরিশ্রমের ফলমাত্র। শতকরা আটানব্বই ভাগ দৈহিক খাটুনি আর দু ভাগ অলৌকিক অবদান।"

এডিসন চলমান বিশ্বকে ধরে রাখার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। তিনি কাঁচের পত্রের বদলে স্যালুলয়েডের ফ্লিম ব্যবহার করলেন। তিনি এ যন্ত্রটির নাম দিলেন 'কাইনেটোস্কোপ'।

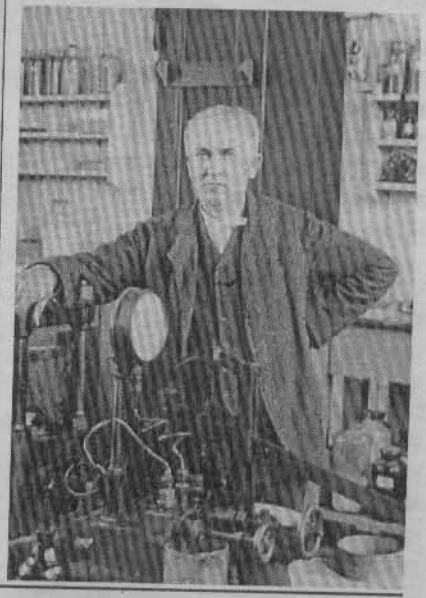

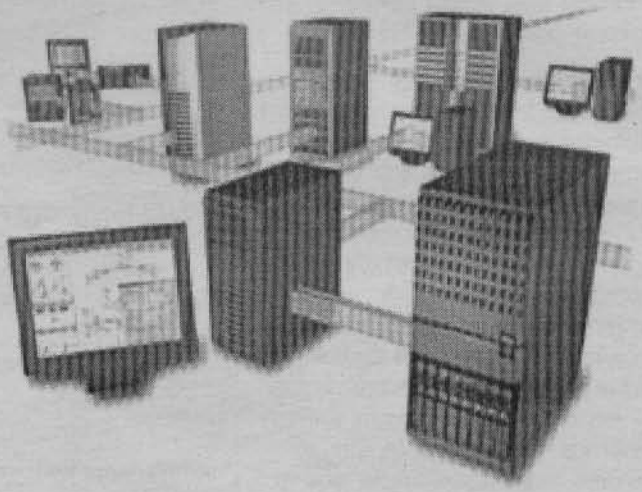

ইউপিএস প্রযুক্তি ও পরিচর্যা

মোঃ গোলাম মোস্তফা

ইউপিএস বিদ্যুৎ বাড়া কমার ক্ষতির প্রভাব থেকে কম্পিউটারকে বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসকে রক্ষা করে।

বর্তমানে লোডশেডিং আমাদের দেশের জন্য এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোডশেডিংয়ের জন্য বিশেষ করে কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা বোধ করি একটু বেশি মাত্রায় বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন বা বিভিন্ন রকমের ক্ষতির সম্মুখীন হন। কম্পিউটারে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করার সময় যদি হঠাৎ করে ক্ষণিকের জন্যও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন দীর্ঘক্ষণের শ্রম নিমিষের মধ্যেই পণ্ডশ্রমে পরিণত হয় যদি না আটো সেভ ফিচার এনাবেল থাকে কিংবা পূর্বে যদি সেভ না করা হয়। এ অবস্থায় একমাত্র ইউপিএসই সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

এই কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে ইউপিএস-এর দাম ছিল অত্যন্ত বেশি। অর্থাৎ সাধারণ হোম ইউজারদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে ছিল ইউপিএস। কিন্তু বর্তমানে ইউপিএস একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। তাই ইউপিএস কেনার আগে বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এতে করে প্রতারণা বা বিড়ম্বনার সম্ভাবনা থাকে না। তাই পাঠকদের সুবিধার্থে নিচে সে বিষয়গুলোই তুলে ধরা হলো।

ইউপিএস পরিচিতি

ইউপিএস হলো আনইন্টারাপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাই। সহজ কথায় বলা যায় ইউপিএস হলো একটি বৈদ্যুতিক আধার যা হঠাৎ করে বিদ্যুতের অনুপস্থিতিতে পিসি বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসকে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে ইউপিএস সেগুলোকে সচল রাখে; ন্যূনতম ডকুমেন্ট সেভ করা ও নিয়মমাফিক কম্পিউটারকে সার্টডাউন করা পর্যন্ত। তাছাড়া কিছু কিছু ইউপিএস বিদ্যুৎ বাড়া কমার ক্ষতির প্রভাব থেকে কম্পিউটারকে বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসকে রক্ষা করে। যেমনটি করে থাকে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার। ইউপিএস মূলত এক ধরনের কনভার্টার, রেকটিফায়ার, সুইচ এবং ব্যাটারি সমন্বিত রূপ। ইউপিএস প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে।

ইউপিএস-এর শ্রেণী বিভাগ

ইউপিএস-এর পাওয়ার এবং ব্যাকআপ টাইম নির্ধারণ করার পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন ধরনের ইউপিএস কিনবেন। বর্তমান বাজারে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি প্রযুক্তির ইউপিএস পাওয়া যায়। এগুলো হলো অফ-লাইন, লাইন-ইন্টারেক্টিভ এবং অন-লাইন।

অফ-লাইন

বর্তমান বাজারে প্রচলিত সবচেয়ে সহজ প্রযুক্তির ইউপিএস হলো এটি। এ ধরনের ইউপিএস শুধু তখনই পাওয়ার সাপ্লাই করে যখন বিদ্যুৎ থাকে না। তখনই ইউপিএস-এর ব্যাটারি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ডিভাইসগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে। বিদ্যুৎ এর উপস্থিতিতে এটি ব্যাটারি রেগুলেটর হিসেবে কাজ করে। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সাথে সাথে অফ লাইন সিস্টেম ব্যাটারিতে সুইচ করে। অফলাইন সিস্টেমটির সুইচিঙের কারণে ব্যাটারি থেকে ডিভাইসগুলোতে পাওয়ার সরবরাহ হতে বেশ দেরি হয়। একটি ভালো মানের অফলাইন ইউপিএস-এর সুইচ ও ভারের জন্য ৫ মিমি সেকেন্ডের কম সময় নেয়। এটি এত অল্প সময় যে, এর মধ্যে পিসি রিবুট হয় না। অর্থাৎ পিসি তার স্বাভাবিক কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে পারে।

লাইন-ইন্টারেক্টিভ

লাইন-ইন্টারেক্টিভ ইউপিএস ইনকামিং লাইন ভোল্টেজকে সবসময় মনিটর করতে থাকে এবং স্ট্যাবল পাওয়ার আউটপুট দিয়ে থাকে। যদি মেইন ভোল্টেজে ওঠানামা হয় তবে তা নিয়ন্ত্রণ করে স্ট্যাবল আউটপুট দেয়।

আমাদের দেশে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে বেহাল অবস্থা, তাতে যারা গুরুত্বপূর্ণ প্রেজেন্টেশন, ডকুমেন্ট তৈরি, ডাউনলোড বা প্রিন্টিংয়ের কাজ তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করতে চান, তাদের জন্য ন্যূনতম এক ঘণ্টা ব্যাকআপ দিতে সক্ষম ইউপিএস ব্যবহার করা উচিত।

অনলাইন

এ ধরনের ইউপিএস অন্য দুটির তুলনায় বেশ জটিল এবং সর্বোচ্চ প্রটেকশন দিতে সক্ষম। অপর দুটির তুলনায় দামও অনেক বেশি। সার্বক্ষণিকভাবে ব্যাটারির মাধ্যমে লোডেড পাওয়ার সাপ্লাই করে। তাই বিদ্যুতের অনুপস্থিতিতে অপর দুটি ইউপিএস-এর মতো একটি সুইচ ও ভারের মাধ্যমে পাওয়ার সাপ্লাই করে না, তাছাড়া এ ধরনের ইউপিএস সবসময় কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ আউটপুট দেয়।

ইউপিএস-এর লোড যেমন হওয়া উচিত

কোন ধরনের বা কত লোডের ইউপিএস কিনবেন তা নির্ধারণ করার আগে জানতে হবে আপনার পাওয়ার রিকয়ারমেন্ট কত? এজন্য প্রথমে পিসি ও পিসির সাথে যুক্ত অন্যান্য ডিভাইসগুলোর প্রতিটি কতটুকু করে পাওয়ার কনজিউম করছে তা জেনে নিয়ে সর্বমোট পাওয়ার কনজিউমের পরিমাণ বের করে নিন। সাধারণত ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস কতটুকু পাওয়ার কনজিউম করে তা ডিভাইসের ব্যাক লেটে উল্লেখ থাকে।

তবে বিদ্যুৎ খরচ ওয়াট (Watt) ভোল্ট + অ্যাম্পস, (Volt+Amps) এ নির্দেশিত থাকে। যেমন ধরুন, মনিটরে উল্লেখ করা আছে বিদ্যুৎ খরচ ১১০ ভোল্ট (V) এবং ১.৫ অ্যাম্প (A)। তাহলে এর অপারেটিং পাওয়ার হবে V+A=165VA। একই নিয়মে প্রতিটি ডিভাইসের অপারেটিং পাওয়ার নির্ণয় করে যোগ করলেই মোট বিদ্যুৎ খরচ জানা যাবে।

ব্যাকআপ টাইম কেমন হওয়া উচিত

ইউপিএস-এর বিদ্যুৎ লোডিংয়ের পরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো ব্যাকআপ টাইম। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ইউপিএস যতক্ষণ পর্যন্ত পিসিকে পাওয়ার সাপ্লাই করতে পারে তাই ব্যাকআপ টাইম। ইউপিএস জেনারেটর নয়, ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাইয়ার মাত্র। সাধারণত ডকুমেন্ট সেভ ও ব্যাকআপ করে সিস্টেমকে বিধিসম্মতভাবে বন্ধ করতে যতটুকু সময় প্রয়োজন সে সময়কেই ইউপিএস এর স্ট্যান্ডার্ড ব্যাকআপ টাইম বলা হয়। আমাদের দেশে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে বেহাল অবস্থা, তাতে যারা গুরুত্বপূর্ণ প্রেজেন্টেশন, ডকুমেন্ট তৈরি, ডাউনলোড বা প্রিন্টিংয়ের কাজ তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করতে চান, তাদের জন্য ন্যূনতম এক ঘণ্টা ব্যাকআপ দিতে সক্ষম ইউপিএস ব্যবহার করা উচিত। ক্ষেত্র বিশেষে এর চেয়েও বেশি ব্যাকআপ টাইমের ইউপিএস দরকার হতে পারে। সুতরাং ব্যাকআপ টাইম কত হতে হবে তা কাজের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখে নির্ধারণ করা উচিত।

ইউপিএস-এ কী ধরনের ব্যাটারি ব্যবহৃত হচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করছে ইউপিএস সিস্টেমের ব্যাকআপ টাইম। জনপ্রিয় ও বিখ্যাত কিছু ইউপিএস মডেলে বিল্ট ইন ব্যাটারি সিলড অবস্থায় থাকে, যার মেইনটেন্যান্স ফ্রি।

ইউপিএস কেনার আগে লক্ষণীয় বিষয়

ইউপিএস কেনার আগে আপনার এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা কেমন তা ভালো করে যাচাই করে নিন। তাই একজন অভিজ্ঞ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে বিদ্যুৎ সমস্যা কতটুকু, তা ভবিষ্যতে আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো জেনে নিন। বিশেষ করে আপনার প্রতিষ্ঠান বা অবস্থান যদি কোনো শিল্প এলাকায় হয়, তবে বড় বড় মেশিন চলার কারণে ভোল্টেজ আনস্ট্যাবল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যেমন- হেভি মটরের কারণে হঠাৎ করে ভোল্টেজের উত্থান-পতন হতে পারে। সুতরাং আপনি যে ইউপিএস কিনবেন তা যেন ভোল্টেজ রেগুলেটেডে সক্ষম হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখবেন। এতে করে আপনার পিসিসহ অন্যান্য ডিভাইস নিরবচ্ছিন্নভাবে রান করতে পারবে।

ইউপিএস ছাড়াও অন্যান্য পাওয়ার কন্ডিশনিং যন্ত্রের দরকার হতে পারে। এ কারণে আপনার এলাকার পাওয়ার লাইনের অবস্থা কেমন তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে, বিশেষ করে যে লাইনটির মাধ্যমে আপনাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে সেটি। যদি তা ত্রুটিযুক্ত হয়, তবে ভোল্টেজ সার্জ বা স্পাইক হতে পারে।

বর্তমান বাজারে ব্র্যান্ড ইউপিএস-এর পাশাপাশি অনেক নন ব্র্যান্ড ইউপিএস পাওয়া যাচ্ছে এবং এদের দামও তুলনামূলকভাবে কম, ফলে ক্রেতারা কিছুটা বিভ্রান্ত হন। তাই ইউপিএস কেনার আগে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিন—

ইউপিএস এ যেসব ফিচার বিদ্যমান; যেমন- চার্জ প্রটেকশন, সফটওয়্যার কন্ট্রোল, টেলিফোন লাইন প্রটেকশন, পোর্ট লাইন নয়েস ফিল্টার এবং চার্জ সাপ্রেশনযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা।

ইউপিএস এর সার্কিটারি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিন। জেনে নিন ইউপিএস এর যেসব কম্পোনেন্ট এবং মেটেরিয়াল রয়েছে সেগুলোর মান কেমন।

ইউপিএস-এ ব্যবহৃত ব্যাটারিগুলোর মধ্যে সিলড মেইনটেন্যান্স ফ্রি ধরনের ব্যাটারি সর্বোৎকৃষ্ট। তাই ইউপিএস কেনার আগে জেনে নিন এতে ব্যবহৃত ব্যাটারিটি কোন ধরনের।

ইউপিএস সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা জানা যায় ফ্রন্ট প্যানেল ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে। সুতরাং ইউপিএস কেনার আগে দেখে নিন এর ইন্ডিকেটরটি ঠিক আছে কিনা।

ইউপিএস-এর আর্থেনিং এর বিষয়টিকে আমরা অনেক সময় এড়িয়ে যাই। অথচ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থেনিং না থাকার কারণে অনেক সময় ব্যবহারকারী ইলেকট্রিক শক পেতে পারেন।

যে ইউপিএসটা কিনতে চান, সেটা আপনার ডিভাইসগুলো সাপোর্ট করবে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে নিন। যদি তা সাপোর্ট করে তবে ইউপিএস-এর ব্যাটারি সেগুলো রান করাতে সক্ষম হবে। প্রয়োজনবোধে আপনার ডিভাইসগুলো ইউপিএস-এর সাথে কানেক্ট করে পরীক্ষা করে নিন।

আমাদের দেশে পাওয়ার ব্যবস্থা স্ট্যাবল নয়। একেক জায়গায় একেক রকম। এমন অবস্থায় আপনার ইউপিএস সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করে নিন।

শেষ কথা

আপনার চাহিদা ও বাজেটের ওপর লক্ষ রেখে সতর্কতার সাথে ইউপিএস নির্বাচন করুন। যদি একটি পিসি বা ছোট হোম অফিসের জন্য ইউপিএস কেনার প্রয়োজন হয় তাহলে অফ-লাইন ধরনের ইউপিএস আপনার প্রয়োজন মেটাতে পারবে। এ ধরনের ইউপিএস ইনস্টল করা যেমন সহজ তেমনি মেইনটেইন করাও সহজ, তাছাড়া এটি বেশ সাশ্রয়ী।

লেখক : সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।